ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

সম্পাদক

ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীহরিবন্ধু মুখটি

দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রকাশকের নিবেদন

প্রণাম জানাই তত্ত্ববোধিনী যুগের প্রতিভাধর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে। তাঁর কবিতা দিয়েই আরম্ভ করি—পাঠকসাধারণের কাছে আমাদের নিবেদন।

"শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর্ বেড়েছে চার গুণ বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে॥
শুনে জিনিসের দর গায়ে আসে জ্বর
ছুটে যাই ঘর বাড়ী ফেলে।"

বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের শাশ্বত সমস্যার রূপটি যিনি ঠিক তাদের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বহুযুগ আগে, সেই মহান কবি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আজ খুব আনন্দ লাগছে। দেরী হয়েছে মানি, গ্রাহকেরা অনেকে বিরক্ত হয়েছেন জানি, কেউ কেউ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন তবুও আজ আনন্দ লাগছে। কারণ যে কোন সৃষ্টির ব্যথা-বেদনা-গ্লানি সৃষ্টির ঠিক পর মুহূর্তেই আর মনে থাকে না। আমিও তাই ভুলে গেছি সব অভিযোগ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্কলন প্রকাশনে সময় লাগবেই, ব্যস্ত হলে চলবে না। তবে ক্রমবর্ধমান বাজারের দিকে নজর রেখেই বলছি, তাড়াতাড়ি প্রকাশের ব্যাপারে আমিও যথেষ্টই সচেতন। যে দরের উপর ভিত্তি করে বই-এর দাম ঠিক হয়েছিল আজ আর তা নেই। দাম বেড়েছে কাগজের, কালির আর খরচ বেড়েছে ছাপার ও বাঁধাইসহ নানা জিনিসের। এ জেনেও কি বই প্রকাশে কারো অহেতুক দেরী করতে ইচ্ছে করে? কিন্তু করছি,—শুধু যথার্থই সার্থক প্রকাশনার খাতিরে।

এই রচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করছি। তিনি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন। বইটি নির্ভুল করার জন্য তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং গ্রন্থ-পরিচিতি লিখেছেন। এজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তবে একেবারে নির্ভুল ছাপা হয়েছে এমন কথা প্রকাশক হিসাবে স্বীকার করবো না।

সঞ্জীব দত্তচৌধুরী

নিবেদন

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর রচনা সংগ্রহ প্রকাশে প্রচেষ্ট হয়েছি, কারণ তাঁর রচনাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। সাধারণ পাঠকরা সহজে আর তাঁর কাব্য সাহিত্য পড়তে পান না। তাঁর অধিকাংশ রচনাই "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রিকাখানায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সংরক্ষণের অভাবে এই "সংবাদ-প্রভাকর"-এর বিভিন্ন সংখ্যাগুলো বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলা সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ বিলুপ্ত হবার মুখে। সামান্য কয়েকটি জায়গায় এখনও এর কিছু কিছু সংখ্যা অতি জীর্ণ-অবস্থায় রয়েছে। কাজেই এখন থেকে সচেষ্ট না হলে গুপ্ত-কবির কাব্য সাহিত্যের অবশিষ্টাংশটুকুকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অবশ্য কবিবরের কাব্য সমূহের সঙ্কলন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ নয়। এ ব্যাপারে কতদূর সফল হতে পারবো তা এখনই বলতে পারছি না। তাই সঙ্গত কারণেই প্রতি খণ্ড প্রকাশে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'গুপ্ত-কবির' কবিতাগুলোকে 'মার' প্রসাদরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি এই 'মার' প্রসাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁর মতো শক্তিও নেই পারিপার্শ্বিকতাও নেই—কাজেই সফলতা সম্বন্ধে সংশয় থাকবেই। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁর ললাটে খাঁটি বাঙালী কবির গৌরব-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন, দুঃখের বিষয় আজ সেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। শুধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নন, তাঁর মতো আরও বহু কবি এবং সাহিত্যিক যাঁরা আমাদের ভাষাকে ঋদ্ধিমতি করেছেন তাঁদের অনেকেরই সৃষ্টি আজ অবলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। ইংরাজী ভাষায় যেমন Palgrave-এর "Golden Treasury" নামক পুস্তকে ইংরাজী ভাষায় রচিত প্রাচীন কবিদের কিছু কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা একত্রে গ্রথিত করে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে, সে ধরনের কোন সংকলন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে বোধ হয় প্রাচীন কবিদের কবিপরিচিতি নিশ্চিহ্ন হবার হাত থেকে রক্ষা করা যেতো।

—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ ও বাংলা সাহিত্যের

একনিষ্ঠ সেবক

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

(১৮১২-১৮৫৯)

কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী না হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কাব্যসাহিত্যে একক, সেখানে তাঁহার সমগোত্রীয় কেহ নাই। বাংলার কাব্যসাহিত্যে যিনি ছিলেন একদিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার কবি-যশ প্রায় লুপ্ত হুইয়াছিল, শ্রীমধুসূদন একটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় সে কথা ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। গুপ্ত-কবির পরলোক-গমনের প্রায় সাত বৎসর পরে তিনি লিখিয়াছেন—

'আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?'

অথচ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে দীর্ঘকাল তাঁহার দেশবাসীদের চিত্তে অম্লান হইয়া বিরাজ করেন নাই, ইহাও নিতান্ত অহেতুক নহে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই এবং ঈশ্বরচন্দ্রের রুচিও তাঁহাদের মনকে সময়ে সময়ে পীড়া দিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক আখ্যান-কাব্য প্রকাশিত হইলে (১৮৫৮) বাংলার শিক্ষিত-সম্প্রদায় এমন একখানি কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন যাহার মধ্যে তাঁহাদের সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে, তারপর, মেঘনাদ-বধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন যুগপৎ যে ভেরী-নিনাদ ও বংশী-ধ্বনি করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গসাহিত্য-দ্বেষী ও প্রতীচ্য সাহিত্যে অনুরাগী পাঠক-সমাজও স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন, যদিও মধুপ্রতিভার বিরাটত্ব ও অনন্যসাধারণত্ব সম্পর্কে ইঁহাদের অনেকেরই তেমন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পরও কিছুদিন তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, অন্যান্য লেখকদের কথা ছাড়িয়া দিলেও রঙ্গলালের আখ্যানকাব্যে ও দীনবন্ধুর রচনায় সে প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও সত্য যে, যাঁহারা কাব্যে প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, তাঁহারাও দীর্ঘকাল ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা হইতে রস আহরণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রথম কারণ,—যে কল্পনাবিলাস, শিল্প-নৈপুণ্য এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইলে কোন কবি বা লেখক আমাদের হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতে পারেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তাহা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য-রচনা তো অনুপ্রাস-যমকাদি অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় প্রায় অপাঠ্যই হইয়াছে কিন্তু তাঁহার কবিতাও যে স্থানে স্থানে অলঙ্কারের অযথা প্রয়োগের জন্য কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই, এ কথা বলা চলে না। অবশ্য, যিনি প্রথম জীবনে কবি ও হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং দাশরথি রায় প্রভৃতি পাঁচালিকারদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অলঙ্কার-প্রয়োগের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক, সে যুগের রুচিও অবশ্য এজন্য

অনেকটা দায়ী, তথাপি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় অলঙ্কার প্রয়োগ সর্বত্র রসের পরিপুষ্টি সাধন করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার রচনায় যে বাস্তব রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রয়োজনের বস্তু হইতেও প্রয়োজনের অতীত যে কাব্যরস আহরণ করিয়াছেন, উহা সহজে আস্বাদনযোগ্য বলিয়াই দীর্ঘকাল উপভোগ্য হয় নাই। তাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই ধরনের রচনা সহজেই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরচন্দ্র বহু সংখ্যক পারমার্থিক ও ভক্তিরসাত্মক কবিতা রচনা করিলেও এবং স্থানে স্থানে দেহের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যের মহিমার কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেও সাধকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও কাতর আকুতি তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নাই। 'মনের মানুষ' প্রভৃতি দুই-একটি কবিতায় যে বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়, তাহাতেও কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কোন পরিচয় মিলে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—ঈশ্বর গুপ্তের ঈশ্বরের প্রতি পিতৃ-ভাব ও রামপ্রসাদের জগজ্জননীর প্রতি মাতৃভাবে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যকে তাঁহার সাহিত্য-গুরুর উদ্দেশ্যে অতিপ্রশস্তি হিসাবেই গ্রহণ করা চলে।

তথাপি, কয়েকটি কারণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে একক। তাই তিনি চিরকাল আমাদের স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সর্বপ্রথম বাংলার কাব্যক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন, তাঁহার রচনায়ই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রথম উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে, বিভিন্ন সাময়িক পত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি প্রথম সাহিত্যিক-সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার 'প্রভাকর'কে কেন্দ্র করিয়াই এক সময়ে বালক বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও স্বল্পজীবী দ্বারকানাথ কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া ওঠেন, আবার তিনিই সর্বপ্রথম সম-সাময়িক যুদ্ধাদি অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করেন। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সমস্ত কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শুধু ব্রিটিশ শক্তির মহিমাই কীর্তন করেন নাই, ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলনকেই তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এবং ঝান্সীর রানীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও তাঁহার জঘন্য আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন।) তাঁহার কবিতায়ই জাতীয় চেতনার প্রথম স্ফুরণ ঘটে, তিনিই প্রথম বাঙালীর প্রাণের কথা বাঙালীর প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত করেন অথচ তাঁহার রচনায়ই সর্বপ্রথম শুধু ইংরেজী শব্দ নহে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাও স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করে; (ইহা প্রধানতঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'নীতি-তরঙ্গিণী সভা' প্রভৃতির সহিত সংশ্রবের ফল) আবার তাঁহার রচনায়ই সর্বপ্রথম বাংলার কাব্য-সাহিত্যের সহিত পল্লীর জনসাধারণের যোগ-বন্ধন প্রায় ছিন্ন হয়, এবং ইহার ফলে কবিতা-সরস্বতী সত্য সত্যই নগর-বাসিনী হইয়া উঠেন, নূতন ধরনের ব্যঙ্গরচনারও তিনিই পথ প্রদর্শন করেন (অবশ্য একথাও সত্য যে, এই সব রচনার মধ্য দিয়া তিনি ক্ষীয়মান রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই এই সব রচনার সাহিত্যিক মূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নহে) এবং সর্বোপরি তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন। (তাঁহার সম্পাদিত 'কালী-কীর্তন' ও তাঁহার রচিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।)

মোট কথা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভিতরেও একটা দ্বৈতসত্তা ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন, বাঙালী ইংরেজের অনুকরণ-মোহ ত্যাগ করিয়া খাঁটি বাঙালীর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হউক, বাংলার মেয়ে বিবিয়ানার মুখে লাথি মারুক কিন্তু 'উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে,' আদি

ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল অথচ কবিওয়ালা-সুলভ রুচি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' কবিতাটির ভাষায় কবিওয়ালাদের প্রভাব ও চিন্তাধারায় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব নিরপেক্ষ সমালোচকগণ সহজেই লক্ষ্য করিবেন। যেটুকু অভিমানের সুর কবিতাটির মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, তাহাও হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। আবার তাঁহার মধ্যে যেটুকু জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে, তাহা বাঙালীত্বের প্রতি একটা অন্ধ মোহ বা মমত্ব-বোধ মাত্র হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ স্বদেশ-প্রীতি সময়ে সময়ে উৎকট বিদ্বেষের আকারে প্রকট হইয়াছে, তাই 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমগ্র সত্তার পরিচয় মিলে না। এই জন্যই বর্তমান যুগে কবির রচনাবলীর নূতন করিয়া মূল্য-নির্ধারণের (re-valuation) প্রয়োজন হইয়াছে। গুপ্ত-কবির রচনাবলীর সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রাক্তন সমালোচকগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে আংশিক সত্য, সুতরাং বিভ্রান্তিকর (misleading)। মনে হয়, ইঁহারা অনেকেই গুপ্ত-কবির সমগ্র রচনাবলী ধীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পান নাই, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে তাঁহার উক্তি নির্বিচারে গ্রহণ-যোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গুরুর সম্পর্কে অনেক সত্য কথা বলিয়াছেন, কিছু সত্য গোপন করিয়াছেন, কিছু অর্ধ-সত্য উক্তিও করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ উপলক্ষ্যে লিখিত প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনার নিদর্শন হইলেও ইহাতে গুপ্ত-কবির সম্যক পরিচয় মিলে না।

গুপ্ত-কবির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

(ক) "ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি। আর যেই কেলাকা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এই দেশী জিনিসগুলি (ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা) মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাংলাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ।"

(খ) "ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই।* মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ, কেবল ঘোর ইয়ারকি। পুনশ্চ—অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর।"

(গ) ঈশ্বর গুপ্তের পরমার্থ-বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখি হইয়া কথা কহিতেন।* বাংলার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট।* এক রামপ্রসাদ সেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।* রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

(ঘ) "অশ্লীলতা তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে যমকানুপ্রাসে অনুরাগ—দেশ, কাল, পাত্র।"

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র আপন সময়ের অগ্রগামী ছিলেন।" এই

প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেশ-বাৎসল্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধর্মে ও রাজনীতিতে তাঁহার উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির কথা বলিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে খাঁটি বাঙালী কবি বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—খাঁটি বাঙালী কবি বলিতে আমরা কি বুঝি ? যদি আমরা বলি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি, কেন না, তাঁহার রচনা বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, তবে কথাটি মানিয়া লইতে কাহারও বিশেষ আপত্তি নাই। যদি আমরা বলি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি, কেন না, তিনি বাঙালীর প্রাণের কথা বাঙালীর প্রাণের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তবে বলিব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কোন কোন কবিতা সম্পর্কে একথা সত্য। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি, কেন না, তাঁহার রচনায় বৈদেশিক শব্দ বা বিজাতীয় চিন্তাধারার কোন সন্ধান মিলে না, তবে কবির সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত কোন পাঠকই কথাটি মানিয়া লইবেন না। কবির রচনায় কয়েকটি ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এ যুগের একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি, একথা আংশিকভাবে সত্য।' কিন্তু ইংরেজী শব্দের যথাযথ বা বিকৃত প্রয়োগ করিলেই কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় না, আসল কথা এই যে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা কবির কোন কোন রচনায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের বাংলা দেশের কেহ বা কান্তভাবে কেহ বা মাতৃভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি 'ওঁ পিতা নোঽসি' বলিয়া প্রার্থনা করিলেও পিতৃভাবে ভগবদুপাসনা বাঙালীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও তাঁহার ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কশূন্য। পিতৃভাবে ভগবানের উপাসনা খ্রীস্ট ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। খ্রীস্ট ধর্ম দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) প্রতিবেশীদের সঙ্গে আত্মবৎ ব্যবহার করিবে, এবং, (২) তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রতি ভক্তিমান হইবে (**Love thy neighbour as thyself and love thy Father which is in Heaven**)। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্ম-ধর্মকে বিধিবদ্ধ করেন। তিনি উপনিষদের ঋষির নিম্নোক্ত প্রার্থনা-মন্ত্রটি উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ—

'ওঁ পিতা নোহসি ওঁ পিতা নোবোধি ওঁ নমস্তেহস্ত মা মা হিংসীঃ।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিন্তাধারা আদি ব্রাহ্ম সমাজের ভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। তাই তিনি নিখিল বিশ্বের জনকরূপে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছেন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক সভা-সমিতিতে সম্পাদক পরিচালক ইত্যাদি ভাবে যোগদান করিয়া তিনি কালের গতির সহিত সমানে তাল রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী সভা', টাকীর 'নীতি-তরঙ্গিণী সভা', দর্জিপাড়ার 'নীতিসভা' প্রভৃতির সভ্য পদে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন।' [সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১০, পৃঃ ৮—৯]।

'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায় যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব আছে, তাহা বোধ হয় অনস্বীকার্য। অবশ্য, কবিতাটির মধ্যে একটা আন্তরিকতার সুর আছে, উহাই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এখানে লক্ষণীয় যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম' অর্থেই 'নির্গুণ ঈশ্বর' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন,—ভারতীয় দর্শনে 'নির্গুণ ব্রহ্ম' আছেন, কিন্তু ভারতীয়

দার্শনিকগণ স্বর্গে, মর্তে, পাতালে কোথাও 'নিগুণ ঈশ্বরে'র দেখা পান নাই। বেদান্তের 'নিগুর্ণ ব্রহ্ম' কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্ম-স্তোত্রেরও ভাষাগত পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, 'নিগুর্ণ ঈশ্বর' নামক কবিতার রচয়িতাকে আমরা আর যাহাই বলি, খাঁটি বাঙালী কবি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত **Realist** এবং ঈশ্বর গুপ্ত **Satirist**, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।' যিনি 'এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ', 'পাঁটা', 'আনারস' প্রভৃতি ভোজ্য-দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াও কাব্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, 'পৌষ-পাবণ' বর্ণনা করিতে গিয়া যিনি সম-সাময়িক বাঙালী হিন্দুর অন্তঃপুরের চিত্র যথাযথ-রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনি যে বস্তু-তান্ত্রিক কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার একথাও সত্য যে, ঈশ্বব গুপ্তই বাংলা সাহিত্যে নূতন ধরনের হাস্যরসের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই', একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ অনেক স্থলে উপভোগ্য, সকল স্থলে নহে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যঙ্গ বিদ্বেষ-বর্জিত, আবাব কোথাও বা বিদ্বেষ-প্রসূত। আমরা পরে সে কথার আলোচনা করিব। 'নীলকর' কবিতায় যেখানে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন,—

'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস॥
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভূষি পেলেই খুসী হব—
ঘুষি খেলে বাঁচব না॥'

সেখানে চমৎকার হাস্যবসেব সৃষ্টি হইয়াছে। আবার যখন দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার দর্শন করিয়া এবং বাঙালী যুবকগণের পরানুচিকীর্ষা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন—

'যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরেজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে?
আগে মেয়ে গুলো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে॥

এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ?
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?'

তখন মনে হয় না কি যে ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতনের পক্ষপাতী হইলেও নূতনের প্রতি তাঁহার তেমন কোন বিদ্বেষ বা আক্রোশ ছিল না ? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শুধু এই ধরনের ব্যঙ্গ কবিতাই রচনা করেন নাই। তাঁহার যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায় যে বিদ্বেষ-প্রসূত ব্যঙ্গের নিদর্শন আছে, সে কথা তো ভুলিলে চলিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে ও ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও সাধক, তবে রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে ও গুপ্ত-কবি পিতৃভাবে ভজনা করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—ঈশ্বরচন্দ্রের পরামার্থ-বিষয়ক কবিতা কি রামপ্রসাদের গানের মত আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীকে গভীরভাবে স্পর্শ করে ? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতার সঙ্গে রামপ্রসাদের একটি গানের তুলনা করিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জগৎ-পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি নাহি দেও কান॥
সর্বদিকে সর্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব প্রবেশ না হয়॥
হায় হায়! কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে তুমি হোলে কালা॥'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই কবিতাটিতে অভিমানের সুর আছে বটে, কিন্তু সে অভিমান আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে না। রামপ্রসাদের গানে যে তীব্র ও মর্মস্পর্শী আকুলতা আছে, বিশ্বজননীর সঙ্গে যে তদাত্মতাবোধের নিদর্শন আছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় তাহা নাই। রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি—

'মা মা বলে আর ডাকব না,
তারা দিয়েছিস দিতেছিস কতই যন্ত্রণা,
বারে বারে ডাকি মা, মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছিস চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মাতা বিদ্যমানে এ দুখ সন্তানে
মা বেঁচে তাহার কি ফল বল না;
আমি ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাবো
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না ?

এই গানে সাধকের অন্তর হইতে যে অভিমান উৎসারিত হইতেছে, তাহার মূলে আছে বিশ্ব-জননীর সঙ্গে তদাত্মানুভূতি ; এ অনুভূতির নিবিড়তা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় কোথায় ?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্ন-দর্শন', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকা', 'সখীর প্রতি রাধিকা' প্রভৃতি যে কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে 'মহাজন-পদাবলী' অপেক্ষা কবিগানের প্রভাবই বেশী লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সখীর প্রতি রাধিকা বলিতেছেন—

'আমি হে গোপের বধূ　　বচনে নাহিক মধু
রসিক নাগর বঁধু পাছে সই চটে গো।
ফলে এই অনুপম　　পুরুষ 'পরশ' সম
পরশে হই যে সোনা, বটে কিনা বটে গো ॥'

সেখানে কি আমরা মহাজন-পদাবলীর মহাভাবময়ী রাধিকাকে দেখিতে পাই ? ভক্তের হৃদয়-সিংহাসন শ্রীমতী রাধিকার যে ভাব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে উহা যেন চূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রীরাধিকা বলেন—

'ভালবাসে যেবা যাকে　　যতনে গোপনে রাখে
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরে ভুলি　　তুলিয়া প্রণয়-তুলি
লিখিয়াছি কাল রূপ মম মন-পটে গো ॥'

তখন সত্যই প্রেমময়ী রাধিকার অন্তরের একখানি ছবি আমাদের মানস-পটে উদ্‌ঘাটিত হয়। যাহা হউক, বৈষ্ণব মহাজনগণের অথবা শক্তিসাধকগণের অনুভূতির গভীরতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না, কেন না, ঈশ্বরচন্দ্র সাধক ছিলেন না, কোনরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা তো দূরের কথা। রামপ্রসাদের মত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও আগমনীর গান রচনা করিয়াছেন, শুধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কেন,—দাশরথি রায়, রাম বসু, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবি ও পাঁচালিওয়ালাগণ, এমন কি, আধুনিক অনেক কবি পর্যন্ত আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করিয়াছেন কিন্তু রামপ্রসাদের আগমনী গানে স্নেহময়ী জননীর স্তন্য হইতে দুগ্ধধারার ন্যায় বাৎসল্য-রস যেমন সহজে ক্ষরিত হইতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বা অন্য কোন কবির গানে তাহা হয় নাই, এমন কি, সাধক কমলাকান্ত পর্যন্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন নাই, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তো দূরের কথা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মে ও রাজনীতিতে ঈশ্বরচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করিয়াছেন। ধর্মে উদারতা কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই বৈশিষ্ট্য নয়। যে দেশের সাধক-কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে',

যে দেশের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া বিদেশী কবিওয়ালা গাহিয়াছেন—

'খ্রীষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভেদ নাই রে ভাই',

যে দেশের সাধক রামদুলাল গাহিয়াছেন—

'জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী'

সে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের উদার ধর্মমত তেমন-কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়

না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন কোন বিষয়ে সময়ের অগ্রগামী ছিলেন সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিল না। 'মাতৃভাষা' ও 'স্বদেশ' কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, উহাই তাঁহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঋতু-বিষয়ক কবিতার উল্লেখ করেন নাই। এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ চিত্রধর্মী। কবি উহাতে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষায় লোকের অবস্থা,' 'শরদের আগমনে লোকের অবস্থা-বর্ণনা,' 'শীত' প্রভৃতি কবিতায় কবির নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় আছে! কিন্তু নিতান্ত আত্মগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-ভাবনা কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ-প্রভাকরে' যে সমস্ত ঋতু-বিষয়ক কবিতা (স্বামী-স্ত্রীর আলাপচ্ছলে গ্রথিত) লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে;—এই সব কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির মতই অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা শীত ঋতু-বর্ণনা-উপলক্ষ্যে স্ত্রীর উক্তি—

'হইয়াছে জল বড়ই শীতল
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়,
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন
সে বন এখন নাহিক সয়'!—ইত্যাদি

পরবর্তী কালে রঙ্গলালের কাব্যে প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে অতিক্রম করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, এ কথা সর্বত্র সত্য নহে। তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ আইন,' 'বিধবা-বিবাহ' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-কবিতার কথা বলিতেছি না, আমরা বলিতেছি সম-সাময়িক যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার কথা। এই সব কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজের মহিমা-কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন এবং যাঁহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শুধু বিদ্রূপের কশাঘাতই করেন নাই, জঘন্য ভাষায় আক্রমণও করিয়াছেন। 'শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়,' 'দিল্লীর যুদ্ধ,' 'কাবুলের যুদ্ধ,' 'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম' ও 'যুদ্ধ-শান্তি,'—এই কয়টি কবিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রাজনৈতিক মত বড় উদার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যেখানে নানা সাহেবকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন অথবা ঝান্সীর রানীর চরিত্রের প্রতি কুৎসিত ভাষায় কটাক্ষ করিয়াছেন, সেখানে আমরা কবির বিদ্বেষ-প্রসূত-ব্যঙ্গের নিদর্শন পাই। আমরা এবার কবির যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতার আলোচনা করিব। শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভে উল্লসিত হইয়া কবি বলিতেছেন—

'কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবারে শশী।
ঊর্ধ্বভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খর গতি খর করে শখ।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।

শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয়॥
এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে,
ধন্য চিফ্ কমাণ্ডার ধন্য দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়।
শতলজ পার হ'ল শত্রু সমুদয়।
জয় ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয়॥'

দ্বিতীয় যুদ্ধ-সম্পর্কে কবি লিখিয়াছেন—

'পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্যহেতু রণসজ্জা পর॥'

নানা সাহেবকে লইয়াও কবি ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই।—

'নানা পাপে পটু নানা নাকি গুণে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ॥'

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা লইয়া তর্কের অবকাশ থাকিতে পারে, বিদ্রোহিগণের ব্যর্থতা ও পরাজয়ে যে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও ভারতের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এ কথাও হয় তো যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে কবি নানা সাহেব বা ঝান্সীর রানীর চরিত্রকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারি না। ইহার পরও কি কেহ বলিবেন যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রাজনৈতিক মত বড় উদার ছিল? পরবর্তী কালে চণ্ডীচরণ সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নানা সাহেব বা ঝান্সীর রানীর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় নাই। 'কানপুরের জয়' কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঝান্সীর রানী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো কস্মিন্‌কালে ক্ষমার্হ নহে।

'পিঁপীড়া ধরেছে ডানা মরিবার তরে।
হাদে কি শুনি বাণী?
হাদে কি শুনি বাণী ঝান্সির রানী
ঠোঁটকাটা কাকী॥
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি
নানা তার ঘরের ঢেঁকি মাগী খেঁকী
গোয়ালের দলে।
এত দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে॥'

এইসব কবিতায় যদি বিদ্বেষ-প্রসূত-ব্যঙ্গের নিদর্শন না মিলে, তবে বিদ্বেষ-প্রসূত-ব্যঙ্গ কাহাকে বলে তাহা আমরা জানি না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই বাংলার প্রথম কবি যিনি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। পরবর্তী কালের রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমন ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন—

'পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে'।। (দিল্লীর যুদ্ধ)
'ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ'।।' (দিল্লীর যুদ্ধ)
'ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাই রে।।' (যুদ্ধ-শান্তি)

যদিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বুড়ো শিবের স্তুতি' কবিতায় মার্শম্যানকে হিন্দুত্বের বিলোপ-সাধন-প্রচেষ্টার জন্য ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং 'বিধবা-বিবাহ-আইন' কবিতায় রাজপুরুষগণের ধর্মে হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছেন যে, ইংরেজ কর্তৃক ভারতের শাসন ভারতবাসীর জীবনে বিধাতার অমোঘ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। তাই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি রাজদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কবির এই প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায় কবি যে সংযম ও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, উহাতে আমাদের মনে তীব্র আঘাত লাগে। আমাদের মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেও একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হিন্দু ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙালী, তিনি বাঙালীর সাহেবিয়ানার পরম শত্রু, বাঙালীত্ব ও হিন্দুদের প্রতি কতকটা অন্ধ মমত্ব-বোধকে তিনি মনোমধ্যে সযত্নে লালন করেন, কিন্তু ইংরেজের বল-বীর্য-পরাক্রমে তিনি মুগ্ধ, ইংরেজের জয়ে তিনি উল্লসিত, ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের তিনি পরম শত্রু। সুতরাং কবি ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বৈত-সত্তা ছিল,—'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী' প্রভৃতি ছত্রে কবির অবচেতন মনের এই দ্বৈত রূপই প্রকট হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই দ্বন্দ্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিরোধ ও সমন্বয়-প্রয়াসের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। তাই প্রতীচ্য অনুশীলন তত্ত্বের সঙ্গে ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণু-পুরাণের, ক্রমবিকাশ-বাদের সঙ্গে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা-তত্ত্বের, অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-দর্শনের একটা সমন্বয়ের প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকট হইয়াছে। এইরূপ প্রয়াসের মূলে আছে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি মোহ। ভারতীয় সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করিব আবার উহা যে প্রতীচ্য সংস্কৃতির চেয়ে কম গৌরবান্বিত নয়, এ কথাও তারস্বরে ঘোষণা করিতে হইবে,—এইরূপ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ সুস্থতার পরিচায়ক নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী-প্রীতি ও ইংরেজ-প্রীতি যুগপৎ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। অবশ্য, ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' একথা তিনিই সর্ব্ব প্রথম বলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার ইংরেজপ্রীতি এমন প্রবল ছিল যে তিনি নানা সাহেব বা ঝান্সীর রানীকেও কদর্য ভাষায় আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুপ্ত-কবির মধ্যে এই দ্বৈত রূপ ছিল বলিয়াই তিনি যথার্থ যুগসন্ধির কবি।

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন*

এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি-দলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মদাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনের দ্বারা কিছুই করিতে পারি না, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপার যতদূর-পর্য্যন্ত করিতে পারি, তাহাই করিয়া থাকি। অস্মদ্দেশীয় ধনি মহাশয়দিগের এ বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে আমারদিগের এই দারুণ দুঃখ সহজেই দূর হইত, ও দেশের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না। ক্রমে বহুল ব্যাপারে কত প্রকার উপকার হইত, তাহা সুবোধ সমূহের অবোধের বিষয় কি? যাহা হউক, যদবধি এই দেশের সংকার্য্য না হয় তদবধি এই সংকার্য্য সাধনে যদ্যপি সর্ব্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখনই ক্ষান্ত হইব না। এই স্থলে আক্ষেপ এই, যে, ভবাধ্যক্ষ ভগবান্ আমাকে অর্থ দেন নাই, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ করি না, যদি শরীরটা সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতেন তাহা হইলেও বাহুল্যরূপে এরূপ বিলাপ করিতে হইত না। একে সঙ্গতি শূন্য জন্য ধনাগম তৃষা কৃশা হয় না, তাহার উপর আবার নানা প্রকার রোগ ভোগ করিলে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? প্রাণনাশা "নাসা" নাসা বাসায় বাসা করিয়া নিয়তই সর্ব্বসুখের আশা হরণ করিতেছে। হর্ষনাশক "অর্শঃ" বপুর্বর্ষ স্পর্শ করিয়া মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিমর্ষ করিতেছে। বাতের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইলে বাতের আর অত্যাচারের পরিসীমা থাকে না, তাহার চর্ম্মভেদি ও মর্ম্মভেদি যন্ত্রণার সময়ে মনের মধ্যে কোনরূপ মন্ত্রণার আবির্ভাব হয় না। অতি সুবিখ্যাত "কালাচাঁদ" ও "গোরাচাঁদ" কবিরাজ মহাশয়েরা উদরাময়ের দৌরাত্ম্য নিবারণে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। একখানা নয়, নানা খানা। আবার সময়ে সময়ে ফোড়া পাচ্‌ড়া প্রভৃতি ছ্যাচ্‌ড়া ব্যাধি অত্যন্ত জ্বালাতন করিতে থাকে। কি করি, ইহার কোন উপায় নাই, জগদীশ্বর যাহা করেন সন্তোষপূর্ব্বক তাহাই ভোগ করিতে হয়।

পুরাতন গ্রন্থকর্ত্তা "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কেতকীদাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র" প্রভৃতির জীবন চরিত ও প্রকাশিত গীত বা পদ অথবা পদ্য সকল।

---

* সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ১ শ্রাবণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ জুলাই ১৮৫৪।

"কমলাকান্ত, নরচন্দ্র,, দুর্গারাম, অন্ধ রামচন্দ্র, নন্দকুমার, দেওয়ান মহাশয়, নীলমণি ঘোষ, কালী ব্রজা, রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা শ্রীকণ্ঠ, রাজা গিরিশচন্দ্র, রাধামোহন সেন" ইত্যাদি মহাশয়দিগের জীবন বৃত্তান্ত ও সংগীত সকল।

সংকীর্ত্তন ও টপ এবং কালীয় দমন যাত্রার সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের জীবনচরিত ও পদাবলী।

"রাসু নৃসিংহ, রঘু, রামজী, হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈষ্ণব, ও রামবসু" প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের কৃত উত্তম কবিতা ও জীবন চরিত।

যে মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবেন, আমরা বিনা বেতনে চিরকাল তাঁহারদিগের নিকট বিক্রীত রহিব।

অপিচ যাহারা উপকারের বিনিময়ে ধনের প্রার্থনা করেন সে পক্ষেও আমরা কোনমতে সাধ্যের ত্রুটি করিব না।

অপরন্তু, অধুনা যে যে কবি মহাশয়েরা সজীব থাকিয়া কবিতা রচনা করিতেছেন, তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর আপনাপন বিবরণ ও আপনাপন বিরচিত কবিতা সমস্ত লিখিয়া প্রেরণ করত চিরবাধ্য করিবেন।

আমরা যে উদ্দেশ্যে অদ্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, যিনি পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন, এতদ্বারা গত কালের কত গৌরব প্রকাশ পাইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

সর্ব্বশেষে এই মাত্র প্রার্থনা, সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হউক, যিনি অধিক বা অত্যল্প যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই পাঠাইবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন।*

আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটী গীত প্রকটন করিয়াছিলাম† তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিত অমূল্য গীত রত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক, ও ভক্ত এবং জ্ঞানি ছিলেন, ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য, ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইহার কৃত একটীও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে, যখনি যাহা শুনা যায় তখনি তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে। কোন সুগায়ক ব্যক্তি অপর কোন কবি রচিত গীত অতি সুস্বরে গান না করিলে শ্রুতি-সুখকর হয় না, তাহাতে বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে, রামপ্রসাদি পদে ইহার কোন বিষয়েরি প্রয়োজন করে না, কাকের ন্যায় অতি নিরস কর্কস-কণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এই গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার বিষয় কি। যিনি মানুষ হইবেন শ্রবণ করিতে তাঁহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয়পদার্থ আছে তৎকালে তাঁহার চিত্ত এতদপেক্ষা পরম প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে না। কোন কোন রামপ্রসাদি পদের কোন কোন চরণের কোন কোন শব্দ ও কোন কোন ভাব এরূপ রমণীয় ও এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল-পরিপূরিত যাহার স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহু শাস্ত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তদ্দারা সিদ্ধান্ত সূর্য্যের সন্দীপনে সমুদয় সংশয় ধ্বান্ত অন্ত হইলে হৃদয়ারবিন্দ আনন্দ মকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভূত করিতে থাকে।

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন কস্মিন্ কালে দৎ কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্ন চিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিলনা, বিষয়-বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতা বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতি কল্পে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশ যদ্রূপ ধনিলোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয় বিভবে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনা-বিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিকে সমহ সুখে সুখি করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই

---

* সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬০ সাল। ইংরেজি ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৩।

† রচনা শেষে সংযোজিত হলো—সম্পাদক

সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করে অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপা সোণার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে পদ, তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদ-নাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সংকল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিগে দৃক্‌পাতো করিতেন না, প্রতি দিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটী গান লিখিয়া বসিলেন। যথা।

"আমায় দেও মা তবিল্ দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নাই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ্ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি॥১
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়্গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায়্ চাকর কেবল্ চরণ ধূলার অধিকারী॥২
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥৩
প্রসাদ বলে এমন্ পদের বালাই লোয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ পাইতো, সে-পদ্ লোয়ে বিপদ সারি॥৪"

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যাগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন "মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাস পূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতা খানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগ্‌লামি করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগাগোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলকোন [বিলোকন] ও "আমায় দেওমা তবিল্‌দারি" এই পদটী সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করত অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন "তুমি পাগল না মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ঈঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই

সঙ্গীতের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পার নাই, তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবীপুত্র, অতি সাধুব্যক্তি” পরে অতি প্রিয়বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন “রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ তাহাতে এপদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব* তোমার আর ক্ষণ কাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।”

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দ-চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুল-রূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, একারণ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শক্তি ভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরি অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামি স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহুপ্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র, অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎক্ষণাৎ তৎ সমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এ দিগে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্ত-হস্ত-পুরুষ ছিলেন, এজন্যই তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না। কন্যা পুত্র, স্ত্রী কিম্বা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক মনের ভাবে এক এক বার এক একটা গান করিতেন। যথা।

“তুমি এ ভাল কোরেছ মা,
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু,
আমারে দিলে না॥

কিছু দিলেনা, পেলেনা, দিবেনা, পাবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর্।
হোক্ দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর্ গো॥১
এমা দিতিস্ দিতাম্, নিতাম্, খেতাম্, মজুরি করিয়া তোর্।
এবার মজুরি হোলোনা, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর্ গো॥২
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর্।
শুধু শোর্ করা সারা, তোর্ যে কুধারা, মোর্ যে বিপদ ঘোর্ গো॥৩
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কায তার কঠোর।
আমার একুল ওকুল, দুকুল মজিল, সুধা না পেলে চকোর্ গো॥৪
এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে, দারুণ করম ডোর্।
রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে দুটানায়, মরে মন ভূঁড়াচোর গো॥৫”

---

* এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন। —সম্পাদক।

এই গীত যখন রচনা করেন তখন তাঁহার মনের ভাব কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনেরা বিবেচনা করিবেন। ইহার গূঢ়ার্থ যিনি গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের অভাব কালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে যখন তিনি সহজে সহজকে* জানিতে পারিবেন।

এই স্থলে আর কয়েকটী গীত প্রকাশ করিলাম এতৎপাঠে কবির মানসিক ভাবের যথার্থ পরীক্ষা হইবেক। যথা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী॥
অর্থ বিনা, ব্যর্থ যে, এ, সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কন্দোল করেছ বোলে শিব ভিখারী।১
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে যান্নি ব্রজেশ্বরী॥২
নাতোয়ানী কাচ, কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ, ধরি।
ওমা কোথায়, লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥৩
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥৪

তথা।

তারানামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন্ স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদি উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেম্‌নি ধারা, তেমনি তো দেখায়॥১
যেজন গৃহস্থলে, দুর্গাবলে, পেয়ে নানা ভয়।
এমা তুমিতো অন্তরে জাগো, সময় বুঝ্‌তে হয়॥২
যার পিতা মাত ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয়, ট্যাকা এ বড় সংশয়॥৩
প্রসাদে ঘেরেছে তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বদ্ধ থেকোনা, রামপ্রসাদের আশায়॥৪

কোন আত্মীয় ব্যক্তি এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়া ছিলেন "সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর" এই কথার তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল। যথা।

"মন্ কোরনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে দেবের দেব, সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য-দশা॥
সে যে দুঃখিদাসে দয়া বাসে, সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্মতনয়, তেজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা॥১

* সহজ, পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের সহজ

হরিষে বিষাদ আছে মন, কোরনা এ কথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুখ, দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥২
মন ভেবেছ কপট্ ভক্তি, কোরে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া, তস্য কড়া, এড়াবেনা রতি মাসা ॥৩
প্রসাদের মন্ হও যদি মন্, কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন্ মতন্, কর যতন্, রতন্ পাবে অতি খাসা ॥৪"

এই প্রকার কত চমৎকার চমৎকার বিষয় আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে। এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছে" তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে রসনা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন "ভট্টাচার্য মহাশয় কি করিলেন! রামপ্রসাদ সেন অতি সাধু ব্যক্তি, তাহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাস্যবদনে ও তার্কিক ভট্টাচার্য্য! কি বলিতেছ? এই বলিয়াই গান ধরিলেন। যথা।

"রসনে কালী রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, কেবল বাদার্থ মাত্র, ঘট পটরে।১
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস, গান কর, পান কর, পাত্র বটরে ॥২
সুধাময় কালী নাম কেবল কৈবল্য ধাম, করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে।৩
শ্রুতি রাখ সত্ব গুণে, অন্য নাম নাহি শুনে, প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিবে কঠোরে ॥৪"

তথা। "সুরা পান করিনেরে।
সুধা খাই কুতুহলে ॥
আমার মন্ মাতালে মেতেছে আজ, মদ্ মাতালে মাতাল বলে।"

আহা এইস্থলে রামপ্রসাদ সেন কি বিচিত্র কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও পরমার্থ রসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন! বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকেই প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরতই ইঁহার কণ্ঠে জাগ্রতাবস্থায় বিহার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার রটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে।

রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কী দেপাক্, দেপাক্, বলিয়া চড়ক গাছে ঘুরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন "সেন মহাশয় দেখ কেমন সুন্দর ঘুরিতেছে" প্রসাদ তাহাতে হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "ভাই। এ কি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দিবা নিশি যে চড়কে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে!" তাঁহারা কহিলেন সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন। যথা।

"ওরে মন চড়কী, ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে ॥

যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে। মনরে,
ওরে কর পঞ্চ বিম্বদলে, পূজিছ তাহারে।১
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক্। মনরে,
ওরে, বৃন্দাবলী, খ্যাম্‌টা চালী, বাজায় নানা স্বরে॥২॥
কাম দীর্ঘ ভাড়ায় চোড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পোড়ে। মনরে,
ওরে যাতনা কোরেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥৩॥
দীর্ঘ আশা চড়ক্ গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। মনরে,
ওরে মায়া-ডোরে বড়্‌শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥৪॥
প্রসাদ বলে বারবার, অসারে জন্মিবে সার। মনরে,
ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো কেলে মারে॥৫॥"

এই প্রেমভক্তি পরিপূরিত পীযুষময় সাধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলে তাঁহারদিগ্যেই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধা পান করত তৃপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন। অপিচ কি পরিতাপ! আমরা ঐ সুখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূপে উক্ত মহাভূতের অলৌকিক কার্য্য সকল সাক্ষাতে দর্শন করিতে পারি নাই। সেই কাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল, যদিও এই কাল সেই কালি বটে, তথাচ এ কালের তুলনা কোনমতেই হইতে পারে না, কারণ এ কাল কি কাল এবং কোন্ কালে কোন্ কালের সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহারো নিশ্চয়তা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে। এই কাল রাজার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগই বা কোথা? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি, পাণ্ডুকুল প্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহি না। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারত্ন বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিব না, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম-প্রকাশকারি রবি স্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন, গৌরব পূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও কবিদিগ্যে যথাসাধ্য সম্ভব মত সাহায্য করত সম্যক্ প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই। এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহারদিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য

প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব কর্ণাইলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সংপ্রতি দেশ কাল পাত্র সকলি সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও গুণির গৌরভ প্রকাশ হইতে পারে না। জগদীশ্বর যাঁহারদিগ্যে ধনি করিয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবতেরি ধনি বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধনির কার্য্য প্রায় কাহারো নাই, শুদ্ধ ধনীর কর্ম্মই দেখিতে পাই। শাস্ত্রালাপ একেবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কাল হরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার:বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে এক রাত্রি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, যাত্রাওয়ালা "কেলুয়া, ভুলুয়া" সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গ ভঙ্গি ও রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল।

"কেন নকীব ডাক্‌ছ আমারে।
আমি হাজির আছি হুজুরে॥
কাঁহে বোলাতো হোঁ। কেঁই কেঁই কেঁই। এং এং এং॥"

বাবুরা এই প্রকার সং, ঢং, রং দেখিয়া ও টং শুনিয়া আহ্লাদে আপনারাই জং বাহাদুর সাজিয়া বসেন। পরে মালিনী আসিয়া গান ধরিল।

"ব্যাটা বল কেটা তোর মাসি।
মাসী মাসী বোলে আমার গলায় দিলি ফাঁসি॥"

তথা। "শাক দিয়ে মাচ্ ঢাকো তুমি, সে সব
কথা জানি আমি, ওলো মালিনী।"

এইরূপে গীতে আহ্লাদিত হইয়া পেলা দিবার কত ধুম পড়িয়া যায়।

কোন ক্ষমতাবান পুরুষ অনেক সম্ভাবিত সৎকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গা যাত্রার সময়ে এক সখের যাত্রা করিলেন। যথা।

"ধোবানীকে এক্‌লা, রেখে যেতে পারিনে"

যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য, অধুনা যেমন নময় তেমনি রসিক ও তেমনি গীত হইয়াছে।

তথা। "প্রাণনাথ এসেছ ক্ষণিক বসো টেঁক্কেলে।
আমি প্রাণ যোড়া আছি হাক্কেলে।
মনেতে করেছ বঁধু ফেলে পালাব, পায়ে শিকলি লাগাব,
আঁকা বাঁকা কোরে পানের খিলি বানাব,
প্রাণনাথকে খাওয়াব, আর তোমায় আমায় কর্ব্ব মজা নিজপতি ঘুম্-গেলে॥"

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি শর্ম্ম-গ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সংপ্রতি সর্ব্বত্রেই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোন খানেই একখানা কলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে কেবল দলের আঁটাআঁটি, বলের আঁটাআঁটি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণিলোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে ন', গুণগ্রাহি না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে .কিঞ্চিৎ অনুরাগি ও মনোযোগি হয়েন তবে এ পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত

দুরবস্থা হয় না ; অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে। কর্ত্তারা তাহা না করিয়া "মোসায়েব" নামধারি কতকগুলীন চমৎকারচিত্ত অবতারদিগ্যে আদর পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মা-লক্ষ্মীর বরযাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণনা করিতে হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই। আহা! যখন আমরা কোন ধনীর সভায় গমন করিয়া তাঁহার সভাসদ ও পারিষদ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণসম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কত আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে, আমরা কত সুখি হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমারদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল সৎকার্য্যের সৎকার্য্যই দেখিতে পাই। যাহা-হউক, এই স্থলে এ বিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, যে এক সদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি তাহারি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নাস্তপাত করুন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বুধ গণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন ; যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, অথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন। "বলা ফেণ-চাটা" নামক একজন কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদী কালীকীর্ত্তন গান করিত, ঐ ফেণ-চাটা এক দিবস কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধু-বর্ষণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, রাজা সেই গানে পুলকিত হইয়া কীর্ত্তনকারীকে কহিলেন, "বলরাম! এত দিন তোমার নাম ফেণ-চাটা ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম মধু-চাটা রাখিলাম।" এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলরাম কহিল মহারাজ! আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার ফেণ ঘুচাইয়া দিলেন, চাটাটুকু ঘুচাইতে পারিলেন না।" রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কারণ তৎকালে রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয়-বাসনা হইতে এক-কালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজস্থাপিত কাছারী বাটীতে কিছুদিন প্রবাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজ-কৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম "কবিরঞ্জন" রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্ট করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞার ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল, একারণ তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে। রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনাকল্পে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয়

হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এই ক্ষণেও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বোধ করি রামপ্রসাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে এইক্ষণে এমন লোক কেহই নাই, যদি কোন গুণিব্যক্তি আপনি রাগ সুর প্রস্তুত করিয়া গান করাইতে পারেন তবে একটা উত্তম কীর্তি স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্বঅঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ, ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসিকাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবেক।"

বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/ চৌদ্দ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, তাহার সনন্দপত্রে লিখিত আছে "গরআবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, ঐ ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীত যুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্-পাগ্‌লা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্য ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

এক দিবস রাজ সমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন।

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল্, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি॥
যেমন্ শরার্ জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি॥১
গর্ভে যখন্ যোগ তখন্, ভূমে পোড়ে খেলেম্ মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির্ বেড়ি কিসে কাটি॥২
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান্ কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥৩
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী॥৪"

অজু গোসাই শ্রুতমাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন।

"এই সংসার রসের কুটি।
খাইদাই বাজারে বোসে মজা লুটি॥
ওহে সেন্ নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু যারা সুত, পিঁড়ি-পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

কবিরঞ্জন গান করিলেন।

"আয় মন্ বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলেরে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক্ নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥১
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি॥
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধোরে রবি।২
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥৩
প্রথম ভার্য্যের সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হোলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মন হবি॥৪"

গোসাইজী ইহার উত্তর করিলেন।

"বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন্ বেড়াতে যাবি॥
তার কথায় কোথাও যেওনারে।
সাধকের মনের ভাব সে কি জানেরে॥"

রামপ্রসাদ সেন কালীকীর্ত্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গোচারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

"গিরিশ-গৃহিণী গৌরী, গোপ-বধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি, প্রথম বয়েস॥
সুবভীর পরিবার, সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেণু॥
জগদম্বারে, যব পূরে বেণু। যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু। উড়ে পদ রেণু। রেণু
ঢাকে ভানু। ভাবে ভোর তনু।" ইত্যাদি।

গোস্বামী ইহার উত্তর দিলেন।

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে॥"

রামপ্রসাদ সেন কহিলেন।

"কর্ম্মের খাট্টু, তেলের কাট্টু, আর পাগলের ছাট্টু, মোলেও যায় না।"

অজু গোঁসাই তখনি উত্তর দিলেন।

"কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।"

রামপ্রসাদ কহিলেন।

"শ্যামাভাবসাগরে ডোবোরে মন, কেন আর বেড়াও ভেসে।"

গোঁসাই উত্তর দিলেন।

"একে তোমার কোপো নাড়ী।
ডুব্ দিওনা বাড়াবাড়ী॥
হোলে পরে জ্বর জাড়ি।
যেতে হবে যমের বাড়ী॥"

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গোঁসাইজীর বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন।

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না?"

প্রসাদ তাহার উত্তর ছলে এই গান গাহিলেন। যথা।

"তারার জমী আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ওযে, দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে, মহা মন্ত্রে বীজ্ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক্ রোয়েছে॥ ১
দেখে শুনে ছটা বলদ্ ঘরে হোতে বার হোয়েছে।
কালীনাম্ অস্ত্রের তীক্ষ্ন ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে॥২
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায় অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালীকল্পতরু বরে, রে ভাই, চতুবর্গ ফল ধোরেছে॥৩"

রামপ্রসাদ সেনের অবস্থা ভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়া কাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ বিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরম পূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি-রসে পরিপুরিত। নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালী নাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষ্যণ কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের শক্তি ভক্তি বিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন "অন্নপূর্ণা" প্রতি দিবসই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন, এ বিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে। যথা।

"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়া বন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ বাঁকারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ, বাঁকারি, দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথা স্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল "যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।" এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কত আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ভিন্ন কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।

অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটী পদ সাক্ষি স্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যথা।

"জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে ফরেদি দাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ্‌বেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্ত কিবে, মাগো।
ওমা, দেওয়ান্ দেওনা নিজে, আস্তা কি কথার রে।১
লাক্ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া, মাগো।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥২
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী, মাগো।
রামপ্রসাদ্ বলে প্রাণকালী, করিলে আমার রে॥৩"

রামপ্রসাদ সেন লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদ বিন্যাসে বিরত হয়েন নাই। মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহারি কবিতা করিয়াছেন। কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকট তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক পূজা করণ কালে সেই পুঁতির উপর ফুল চন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সেই পদাবলী প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। এইরূপ গোপনেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। কীটের আঘাতে ও ভূতের দৌরাত্ম্যে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পোকায় কাটিয়াছে, জলে ও সর্দ্দিতে পচিয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে, যেমন ক্লীব ব্যক্তি স্বরূপসী কামিনী ক্রোড়ে পাইলে না আপনিই ভোগ করিতে পারে, না প্রাণ থাকিতে অন্যকেই দিতে পারে, এ বিষয়ের গোপনকারি মহাশয়েরা অবিকল তদনুরূপ করিয়া রামপ্রসাদি কীর্ত্তিকে এককালে উচ্ছন্ন দিলেন।

পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একালপর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই। হয় মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়াছে, নয়

লেখকের লেখার দোষে প্রমাদ করিয়াছেন, ইহাতেই ভাবার্থ স্থাপন করণে ঘোরতর বিপদ ঘটিতেছে। এই স্থলে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, সংপ্রতি যে যে মহাশয়ের নিকট এই মহাবস্তু আছে তাঁহারা যেন আর যক্ষের ন্যায় বক্ষে করিয়া রক্ষে না করেন, অবিলম্বেই অস্মদাদির যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমরা সানন্দে সাদরে তাহা মুদ্রাঙ্কন করত সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিব, তদ্দ্বারা এই দেশের কত উপকার হইবেক তাহা অনির্ব্বচনীয়, যদিও আমরা অনেক কষ্টে অনেক হস্তগত করিয়াছি তথাচ আর দুই এক খানা প্রাপ্ত হইলে পরস্পর ঐক্য করত মনের সংশয় ছেদন করিতে পারি।

৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রাসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবেক না। প্রাচীন লোকেরা কহেন "তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী-তটে গান করিতে আইলেন" ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভক্তিরসের বিদায়ি পদ অনেক গুলীন রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাযাত্রার সময়ে পথিমধ্যে যে কয়েকটা গান করেন তাহার একটা গান এই। যথা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে॥১
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারি অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥২

তথা। বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥১
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য কোরে সব্ খোয়ালে॥২
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, ভাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হোয়ে সে মিশায় জলে॥৩

তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এ গান করিলেন। যথা।

নিতান্ত যাবে দীন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হার কোরে বোসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো॥১
দশের ভরা ভোরে লায় দুঃখি জান ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥২

প্রসাদ বলে পাষাণ্ মেয়ে, আসান্ দে মা ফিরে চেয়ে
আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥৩

এরূপ প্রবাদ আছে যে নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাহার মৃত্যু হইল। যথা।

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন্ যেমন্ রাখ্‌লে সুখে, তেম্‌নি সুখ্ কি পাছে ॥
শিব যদি হন্ সত্যবাদী তবে কি তোমায় সাধি, মাগো।
ওমা, ফাকির উপরে ফাকি, ডান্ চক্ষুঃ নাচে ॥১
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই, মাগো।
ওমা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥২
প্রসাদ্ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মাগো।
ওমা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥৩

"দক্ষিণা হয়েছে" এই উক্তি করিবা মাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ-শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণনা করণের মানস ছিল, কিন্তু স্বাবকাশাভাব ও স্থানের স্বল্পতা এই উভয় প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অদ্য তদ্বিষয়ে অক্ষম হইলাম, সময়ক্রমে বিস্তারিত লিখিতে ত্রুটি করিব না। আমাদের এই বর্ত্তমান লেখাতে যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ তাহা শোধন করিলে আমরা আনন্দচিত্তে সেই বিষয় প্রভাকরে প্রকটন করিব।

রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুল বাটীতে বাস করতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।

কবিরঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন গীত অনেকের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নাই, এজন্য আমরা অবস্থা ভেদের পদ সকল উদ্ধৃত করিয়া স্থানে স্থানে প্রকটন করিলাম এ সমস্ত গানের অধিকাংশই এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল, ভিখারি ও গানওয়ালারা না পাওয়াতে বাজারে ব্যক্ত হয় নাই। এই মহাশয় "আগমনী" "সপ্তমী" বিজয়া" রামলীলা" কৃষ্ণলীলা" শিবলীলা" যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনা ঘটিত 'পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না, একারণ তাহাই সর্ব্বাগ্রে উদিত করিলাম, সুধীজনেরা কবিরঞ্জন কবিরঞ্জনের পদরঞ্জনকে নয়নারঞ্জন করিয়া মনের আক্ষেপ ভজন করুন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল রূপক

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হোয়ে হর-হৃদে। কত নাচ গো রণে ॥
তরুণ অরুণ শশী ঘনচয় প্রকাশে চারু চরণে।
সদ্যোহতদিতি-তনয়মস্তকহারলম্বিতসুজঘনে
কত রাজিত কটিতটে নিকর নরকর, কুণপ শিশু শ্রবণে।১

অধর সুললিত, বিম্ব লজ্জিত, কুন্দ বিকশিত, সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে ॥ ২ ॥
সজল জলধর, কান্তিসুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
শ্রীরামপ্রসাদ ভণে, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥৩॥

রাগিণী বিভাগ। তাল তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা মার মার, মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী, গতি রতিপতি মতি মোহেরে ॥
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী, নিশুম্ভ নিপাত কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম্ দায়, এ জন্মের মত বিদায় ॥
কাল বলে এতকাল, এড়ালাম্ যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রম্ভা ফল, গঙ্গাজল বিল্বদল, শিব পূজার এই ফল অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি করব রটায়। ১ ॥
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব কার ভরসায় রব হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায় ॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্ম সায়। ২ ॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘোটেছে ঘটে, এ শঙ্কটে প্রাণ বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয়, কর দৈত্যরায় ॥
ওহে দৈত্যরায়, এই ভজ দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায়। ৩ ॥

রাগিনী ঝিঁজিট। তাল জলদ তেতালা।

আরে, ঐ আইল কেরে, ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ রহিতা, ভুবন মোহিতা, একি অনুচিতা, কুলের কামিনী ॥
কুঞ্জরবরগতি আসবে আবেশ, লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করয়ে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবেরে দনুজদলনী ॥
কেরে নব নীলকমলকলিকাদল বলিয়া দংশন করিছে অলি।
নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ, করত পূর্ণ শশধর বলি ॥
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে করত হি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করয়ে ধ্বনি। ১ ॥
জঘন সুচারু কদলীতরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।
তদূর্দ্ধ কটিবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে ॥
করতল স্থলনলদল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গে সাঙ্গিনী ॥২॥
উর্দ্ধতর ভূধর হেরি হেরি করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে।
অপরূপ কি এ আর, চণ্ড মুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে ॥
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী ঝলকে,
রবি অনল শশি ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥৩॥

প্রসাদ কথয়তি, শুন দনুজপতি, কায নাহি সমরে।
যেইরূপ ভাব সেই দেবেশ ঐ দেখ শ্রীচরণবরে॥
গরল চিহ্ন গাল ললাটে অনল, শিরোপরি গঙ্গা তরত টল টল,
অকুল অনাদি পুরুষ মহাকাল, কালভয় জিনিবারে আপনি॥ ৪॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তল-জাল।
বিমল বিধুবর তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব, সমর করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়নবিশাল॥ ১॥
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তাতা থেই থেই দ্রিমিকি দ্রিমিকি ধূ ধূ ডম্ফ বাদ্য রসাল॥ ২॥
প্রসাদ কথয়তি শ্যামা সুন্দরি রক্ষ মম পরকাল।
দীন জন প্রতি কুরুকৃপালেশ বারয় কাল করাল॥ ৩॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলবালা উলঙ্গ ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তরঙ্গ বয়েস্!
দনুজদলনা ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ॥
ঘন-ঘোর-নিনাদিনী, সমর-বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ। ১॥
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিনীবর সঙ্গিনী নগনা সমান বেশ॥২॥
গজ রথ রথি করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটিদেশ। ৩॥
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাঙ্কুরু জননি কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ॥ ৪॥

রাগিণী বিভাস। তাল ঢিমে তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে॥
গদগদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে, অতনু সতনু জনু অনুভবে। ১॥
রবি-সুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি, ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥ ২॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে, অনলে অনল মিলে অনল নিভে। ৩।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি, নিরখিলে পাপ তাপ, কোথা রবে॥ ৪॥

রাগিণী ঝিঁজিট। তাল আড়া।

শ্যামা বামা কে। তনু দলিতাঞ্জন শারদ-সুধাকর মণ্ডল বদনী।
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কায লাজ ছেড়েছে দূরে। ঐ রথ রথি গজ বাজি বয়ানে পূরে।
মমদল প্রবল সকল কৃত হতবল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে। ১॥

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী। ঐ কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লজ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর ঐ যুবতী চকিত নয়ন পলকে ॥ ২ ॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু। ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন কুরু কৃপালেশ জননি কালিকে। ৩ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে।
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী ॥
নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণ চন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।১॥
একি করে করি করে ধরে রণে পশি।
তনু-ক্ষীণা স্তনবীনা বস্ত্রহীনা এ ষোড়শী।
নীলকমলদল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুরহাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী ॥২॥
কত ছলা, কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি।
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দিতিসুত-চয় সমরচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা হরে সেটা দুঃখরাশি ॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী।
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে জয়ী কালে তুচ্ছবাসি।
কথা নিতান্ত কৃতান্ত শান্ত শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥৩॥

রাগিণী ছায়ানাট। তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী অপরা কুসুমাপরাজিতা-বরণী ; কে রণে রমণী ॥
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজবিন্দু, শ্রীমুখ একি শরদ ইন্দু,
কমলবন্ধু বহ্নি সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী।
আ মরি আ মরি, মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ-বাসিনী ॥
ফণি ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী, কেশাগ্র ধরণীপর বিরাজ,
অপরূপ শব শ্রবণ সাজ, না করে লাজ, কেমন কায, মম সমাজ তরুণী।১॥
আ মরি আ মরি, চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল, একি বিশাল, ভাল ভাল, কাল-দণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর কর-নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিতবস্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে,
চরণোপান্তে, মন দুরন্তে, রাখ কৃতান্তদমণি। ২ ॥

আ মরি আ মরি, সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদনাশিনি॥ ৩॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল। তাল একতালা।

কে মোহিনী, ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী, বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু অনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা, সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখি দনুজ ভূপ, সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে, পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥১॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে বপু বিরাট, বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, গিলে রথ রথি গজ, বাজি রাশি রাশি॥২॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার, চৈতন্য রূপিণী নিত্য ব্রহ্মমহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, আকারে আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশি॥৩॥

কালীকীর্ত্তনের গোষ্ঠলীলার একস্থানে রামপ্রসাদ সেন বর্ণনা করিয়াছেন।

আকার তোমার নাই, অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী, হোয়েছ সাকার॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে, বেদাগম সার।
যোগির কঠিন ভাবা, রূপ নিরাকার॥
বেদবাক্যে নিরাকার, ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি, বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদের কালো রূপে সদা মন ধায়।
যথা রুচি তাই কর, নির্ব্বাণ কে চায়॥

কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনের রাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

জগদম্বা কুঞ্জবনে, মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনু রুচি, স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, ঝরে মুখ চাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহু, ভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দুর অরুণ আভা, বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতা-নন্দন চঞ্চু, সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম, শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
ওরূপ লাবণ্য, জলনিধি, স্থির জলে।
নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি, মাণিক্য রাগ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী, ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল, প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারু চক্র রথে চড়ি, এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু, ধরে অচলজা।
মীন নিকেতনে কি, উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিবর ভুজঙ্গ মণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয়, বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার, একমাত্র স্থান।
সুরতরুবর শাখা, এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ, যমুনা লোমশ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে, স্বয়ম্ভূযুগল।
স্নান কর মনরে, অনন্ত জন্ম-কাল॥
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী, বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা, যে ঘটে যে জ্ঞান।
মণিকর্ণিকার ঘাটে, সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার, কিবা কব কাণ্ড।
রূপসিন্ধু মন্থিবার, মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তার, বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি, ক্ষীণতর ক্ষীণ॥

মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি, সন্দেহ কি তার। ভব স্থানে মনোভব, পরাভব চেয়ে।
সহজে জঘনে ধরে, গুরুতর ভার ॥ তূণ বাণ দ্বিগুণ, এসেছে বুঝি লোয়ে ॥
জঙ্ঘাতৃণ, পদাঙ্গুলি, নখফলী শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত, জিতিবে বুঝি হরে ॥

রামপ্রসাদের কৃষ্ণ কীর্ত্তনের এক স্থান হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রথম বয়স রাই রস রঙ্গিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী ॥
রাই বদন্ চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী।
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুসুম শরে।
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ। সখী বকুলে বানাইল বেশ ॥
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস। মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ ॥
উরে কলিকা যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয় তরাস।
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার। অপরূপ শোভা হোলো তার ॥
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি, সদন মদন রাজার।
অলকা কোলে মতি-হার, কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার ॥
যেন রাহুর মুখ মাঝে, বদন রাজি রাজে, চাঁদেরে করেছে আহার ॥
আঁখি লোল অনুমানি এই। চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই ॥
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, দিগ নিহারই সেই।
চারু অপাঙ্গ কাম কামান। নাসা তিলক শর খরসান ॥
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর, ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান।"

রামপ্রসাদ সেনের আগমনী।

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণী নগরে কোলাহল, উঠ চল চল
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসোনা সঙ্গে আমার গো ॥১॥
জয়া কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার অদেয় কি আছে, এসো দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥২॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো ॥৩॥

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো ॥৪॥
রথে হোতে নাবিয়া শঙ্করী, মায়ে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো ॥৫॥

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ। গিরি বরহে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার!
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বোসে মহাকাল
বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার।১॥
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হোলো বিদার।২॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।৩॥
প্রসাদের এই বাণী. হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন্, নিরাশা সুধার।৪॥

ষট্‌চক্র ভেদের গীত।

কুলগুলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা তুমি.
আছ গো অন্তরে। মা আছ গো অন্তরে ॥
এক স্থান মূলাধার. আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।১॥
শিব শক্তি সব্যবামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥২॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।৩॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভি স্থান,
অনাহত বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥৪॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব. ল, ড, ক, ক, ঠ,
ষোল স্বর, কণ্ঠায় বিহরে।৫॥
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥৬॥

ব্রহ্মা আদি পাঁচব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে ।৭॥
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥৮॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তব বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে ।৯॥
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হৌং স্বরে ॥১০॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে ॥১১॥
তুমি নাদ তুমি বিন্দু সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥১২॥
উপাসনা ভেদ ভেদ ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কালপদ ভরে ।১৩॥
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে ॥১৪॥
মুক্তি-কন্যা তাবে ভজে, সে কি বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে ।১৫॥
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসী রূপে মিল হংসবরে ॥১৬॥
চারি ছয় দশ বারো, ষোড়শ দ্বিদল আরো,
দশ শতদল শিরোপরে ॥১৭॥
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥১৮॥

যিনি আন্তরিক তান্ত্রিক অর্থাৎ অন্তর্যাগ বিষয়ে যাঁহার গাঢ় সংস্কার আছে, তিনিই এই গীতামৃতের যথার্থ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইবেন, নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগূঢ়াভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং ইহলোক হইতে তদ্রূপ মনুষ্য প্রায় তাবতেই অবসৃত হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন।

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটি অতি মনোহর। যথা।

কায্ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ্ বিদেশে।
তখন্ ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে ॥১॥
এখন্ ধন উপার্জ্জন না হইলে দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু, দারা সুত, নির্ধুনে বোলে সবাই রোষে ॥২॥

যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন্ সাজ্‌য়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে ॥৩॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাব অনায়াসে ॥৪॥

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাঁহার অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিল বোধ করি তৎকালীন মনের স্বরূপানুরাগেই ঐ গানটী কণ্ঠ হইতে নির্গত করিয়া ছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহির একরূপ ছিল, মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন, তাঁহার উক্তি দ্বারা ও প্রবাদ দ্বারা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্য পালন পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা! তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন।

শক্তি ভক্তিসূচক উক্তি দ্বারা যুক্তিমতে সকলে রামপ্রসাদ সেনকে শাক্তই বলিতে পারেন, ফলে তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না, যথার্থই ভাক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনা কল্পে তাঁহার মনে দ্বেষ মাত্রই ছিল না। নিম্নস্থ পদটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে। যথা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে, বলে অন্তরে শ্যামা,
মা আমার অন্তরে আছ।
তুমি পাষাণ্ মেয়ে, বিষম্ মায়া, কত কাচ্ কাচাও কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে পাঁচেরে এক্ কোরে ভাবে, তার হাতে কোথা বাঁচ ॥১॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ ॥২॥
প্রসাদ্ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হোয়ে নাচ ॥৩॥

রামপ্রসাদ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বাসের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা কি পর্য্যন্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তাব সাঙ্গ করিলাম।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য এক খণ্ড অধিক প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমারদিগের অতিরেক ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে চারিফার্ম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তথাচ এবিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয় নাই, যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্য রূপে লিখিতে পারিলাম না। অতি অল্পেই শেষ করিতে হইল, এদেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা-রচনা করত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারদিগের তাবতেরি জীবন-চরিত লিপিবদ্ধকরণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা কঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার-সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত নাই, এবং যাঁহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাঁহারা অনেকেই তদ্বিশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ এই যে তাঁহার-দিগের সহিত আবার আমারদিগের এপর্য্যন্তই সাক্ষাৎ নাই। যাহাহউক "মন্ত্রের সাধন কিম্বা

শরীর পতন” এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবেক। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা যত দূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার ত্রুটি কখনই করিব না, ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি অর্থব্যয়ের আবশ্যক করে তাহাতেও সম্ভবমত বিত্ত ব্যয় অবশ্যই করিব। এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্ব সাধারণকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মদাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপাবিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রম সাফল্য সাফল্য জ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব, এমত নহে শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র. এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সাধ্য সত্ত্বে কেহ যেন আলস্যপরবশ না হয়েন. ইহাতে আমারদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি। যেরূপে হউক কার্য্যসিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হইব।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন*॥২

মহাত্মাবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই আমারদিগের নিকট সন্তোষ সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেন কবি মহাশয় অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন, বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশ মধ্যে মহল্লোকদিগের জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, একারণ আমরা দেশ বিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সেন কবি মহাশয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা অতিশয় সন্তোষ চিত্তে তাহা প্রকাশ করিব। আমারদিগের ঐ প্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয় বন্ধু যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

“মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌষমাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরেক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তৎপাঠে অস্মদগণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখণী অসমর্থা; কেননা প্রকাশ্য পত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহি মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অপরিচিত ছিলেন যদিও ঐ দলাক্রান্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটি গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না, যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও এক প্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেন কবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপর কবিরঞ্জনের

* সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ মাঘ ১২৬০ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৪ সাল।

দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা :উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কারণ রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাহার মাহাত্ম্যবিষয়ক আপনার রচনা গ্রামস্থ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বৃদ্ধ মনুষ্যেরদের সমক্ষে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন যে এরূপ লেখা পরম্পরা শ্রুতিবাক্যানুযায়ী বটে, পরন্তু তিনি যে ঐশিক শক্তি প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ বিরহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম ? শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্টস্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন, ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে ? একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সেন কবি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাঁহার বাস নৌকাতেই ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহিমাসূচক গান করিতেন। এক দিবস সায়ংকালে নবাব সেরাজেরদৌল্লা বায়ু সেবনার্থ তরি আরূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের ধ্বনি শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে ? পরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেনকে স্বযানে আহ্বান করিয়া গান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে একটি খেয়াল ও একটি গজল গাইলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত শুনিতে ইচ্ছা করিনা, কালী কালী শব্দে যে গীত আরম্ভ করিয়াছিলা, ঐ গীত আরব্ধ করহ। নবাবের আজ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ স্বীয় রচিত ভক্তি পুরিত একটি শ্যামা বিষয় গান আরম্ভ করিলে পাষাণবৎ কঠোর হৃদয় যে সেরাজেরদৌল্লা তিনিও নয়ন নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান ভঙ্গ হইলে নবাব তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগ্রীত ব্যক্তি তুমি আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙ্ক্ষী নহেন এরূপ নবাবের গোচর হইলে তেঁহ তাঁহাকে আরো অধিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মানুষ ছিলেন, সেরাজেরদৌল্লা কিরূপ দুর্দান্ত ও পাষণ্ড ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে প্রকার গুণগ্রাহী তাহাও বা কোন্ জনের অগোচর আছে অতএব তাঁহাকে বঙ্গীয়ভাষা গানে বিমোহিত করা ও তাঁহার রসনা হইতে যশো ঘোষণা করান দৈববল ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেন কবির বিষয়ে এবম্প্রকার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহা সমুদয় প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়, এতাবতা এ স্থলে তাহা লেখা অনাবশ্যক। পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন ; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ি প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ

জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সকলিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত কর্ম্মের হানি হয় না। যথা গোলাব পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেন কবির কালী নামাদি উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে। ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
অগ্রে কর শশি বশি, ভূতরে তোর শক্তিসারে॥
আছে কোঠার ভিতর চোর-কুঠারী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে।
ষড় দর্শন পেলেনা আগম, নিগম শাস্ত্র ধরে॥
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদা নন্দপুরে বিরাজ করে।
সে ভাব লতে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে॥
হলে ভাবের উদয়, সে মন লোহাকে চুম্বুকে ধরে।
প্রসাদ বলে আমি মাত্‌রি ভাবে তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন* ॥৩

১২৬০ সালের প্রথম দিবসীয় আশ্বিনের প্রভাকরে আমরা মহাকবি মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন প্রণীত কয়েকটি পরমতত্ত্ব পীযূষ পূরিত কবিতা প্রকাশ করি, এবং ঐ বর্ষের ১ পৌষের পত্রে উক্ত মহাশয়ের জীবন চরিত সম্বলিত অবস্থা ভেদের কতকগুলীন গীত ও কালীকীর্ত্তন কৃষ্ণকীর্তনের কিয়দংশ প্রকটিত হওয়াতে তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দ সাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রে কিছু কিছু রামপ্রসাদী পদ উদিত হয়, অনেকেই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমরা আর আর প্রাচীন কবিকদম্বের প্রাচীন কবিতা ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করণার্থ বিষমতর ব্যস্ত থাকাতে এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, অদ্য অবস্থা বিশেষের নানা রসবর্ণিত কালীগীত, ব্রহ্মগীত, রামগীত ও শিব সংগীত প্রভৃতি কতিপয় গীত ও পদ সঙ্কলন পূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম, অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করত সকলে প্রসাদের কবিতার প্রসাদগুণ ও আর আর গুণের পরীক্ষা করুন।

সীতার বিলাপোক্তি সংগীত।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম, কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, নবকুশ দ্বোহে লইয়ে সহিতে,
আইল জীবন নাথেরে দেখিতে, শিরে কর হানি পড়িয়ে মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে।১॥
সীতার লোচনে সলিল্ পড়িছে ঝরিয়া রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া, কোথাকারে প্রভু গেলেহে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে॥২॥

*সংবাদ প্রভাকর, মঙ্গলবার, ১ চৈত্র, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৫৫ সাল।

অভাগিনী ডাকে উঠনা তুরিতো, শুনিয়া, না শুনো একোনউচিতো,
কমল নয়নে চাহনা চকিতো, বিদরে পরাণো করণা স্থকিতো,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে ।৩॥
ধূলায় ধূষর এ হেন শরীর, দুকূল আকুল হোয়েছে কটির।
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির, দিবসে সকলি দেখিহে তিমির,
আলোকের প্রভু জাগিয়ে হে ॥৪॥
করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া, কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া, কেমনে এমন দেখিব বসিয়া পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে ।৫॥
যখন ছিলাম জনক বাসেতে, আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিকো তোমাতে, এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥৬॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে, আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে, আহা নাথ্ নাথ্ কি হোলো আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে ।৭॥
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়, বুঝিলাম তোরা আমারত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়, প্রভুরে লইলি যমের আলয়, ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥৮॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব, তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব, নহে হলাহল অশন করিব,
কি কায এ দেহ রাখিয়ে হে ।৯॥
রাম্‌প্রসাদ কহিছে শুন, মা, জানকী, রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী, এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকি,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ।১০॥

আহা কি চমৎকার! কি চমৎকার! এতদ্ভুত করুণা পূরিত বিলাপ বর্ণনা প্রায় দেখা যায় না, পাঠ করিতে করিতে অমনি অশ্রু পতন হইতে থাকে। হে পাঠকগণ। শ্রুতি পথে এই সুধার আস্বাদন গ্রহণ কর।

শিবসংগীত।

হর ফিরে মাতিয়া। শঙ্কর ফিরে মাতিয়া। শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম,
ভোঁভোঁ ভোঁ, ভমম ভর্মম ববম ববম ববম, বব বব বম বব বম গাল বাজিয়া।
মগন হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাত, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া ।১॥
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ।২॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ।৩॥
আধচাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয়ে থাকি থাকি থাকি, দেখি রিপু যায় ভাগিয়া ।৪॥

বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব অভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া ।৫॥
বৃষভ চালিছে খিমিকি খিমিকি, বাজয়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি, হরি গুণে হর নাচিয়া ।৬॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া ।৭॥
প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর নিজগুণে লহ তারিয়া ।৮॥

কি আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ধন্য ধন্য ।

শব-সাধন বিষয়ক সংগীত ।

জগদম্বার কোটাল । বড় ঘোর্ নিশায় বেরুলো । জগদম্বার কোটাল ॥
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বম্ বম্ বাজাইয়া গাল ।
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ॥
অৰ্দ্ধ চন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল ।
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল ॥
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ।
যেজন সাধক্ বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হোয়ে বলে ভাল ভাল ।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল ।
রাম প্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল ॥
বিভীষিকা সেকি মানে, বোসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ।

যাঁহারা এতদ্রূপ সাধনা রসের রসিক, তাঁহারা এই কবিতা পাঠ করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইবেন ।

নৌকাখণ্ডের সংগীত ।

ওহে নূতন নেয়ে । ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রৈল দূর । ঘন ঘন হানিছে চিকুর ॥

কেমন্ কেমন্ কর হে দেয়া। আজ্ যমুনায় ভাসে খেয়া ॥
শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হোক্ ছানাদধি
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরি,
মিছা তবে হইবেহে বেদ ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরি, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হোলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল, প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরায় কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনী রাধা,
তাহে এত বাদসাধা উচিত কি হয় ॥
ও নৌকা বাওহে ত্বরাতরি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে।
আতপর লাঘব হেতু তরণি তর তরুণী চাল
মনের রঙ্গে ॥
আপন কর হে পণ, চাও হে যৌবনধন,
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে।
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে ॥
এখন হোয়েছ নেয়ে, কোন্ না বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এসো অঙ্গে।
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কায্ কি হে কথার প্রসঙ্গে ॥
সময় উচিত কও, কোনরূপ পার হও,
নাথ দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

এই দুই গীতে কি আশ্চর্য্য রসমাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমাবস্থার গীত।

মোরে তরা বোলে, কেন না ডাকিলাম্।
এ তনু তরণি ভব সাগরে ডুবালাম্ ॥
এ ভব তরঙ্গে তরি, বাণিজ্যে আনিলাম্।
তেজিয়া অমূল্য নিধি, পাপে পুরাইলাম্ ॥১॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে, চেয়ে না দেখিলাম্।
মন ডোরে ও চরণে হেলে না বাঁধিলাম্ ॥২॥

প্রসাদ বলে মাগো আমি, কি কায্ করিলাম্।
তুফানে ডুবিল তরি, আপনি মজিলাম্ ॥৩॥

এই গানের ব্যাখ্যা কি করিব ?

পতিত পাবনি তারা। কেবল তোমার নাম সারা॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাযের ধারা।
বশিষ্ট চিনিয়াছিলো, হাড়ভেঙ্গে শাঁপ দিলো, তদবধি হোয়ে আছো, ফণী যেন মণি হারা ॥১॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য করণ তোমায় নাই, ঙয়ায় সয়, তয় রয়* সেইরূপ বর্ণপারা।২॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা, লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥৩
পাগল ব্যাটার কথায় মোজে, এতকাল মলেম্ ভোজে, দিয়েছি গোলামি খৎ, এখন্ কি আর্ আছে চারা।৪॥
আমি দিলাম্ মাকে খৎ, তুমি দেও ফারখৎ, কালায় কালায় দাওয়া ঝুঁটা, সাক্ষি তোমার ব্যাটা যারা ॥৫॥
বসতি ষোড়শ দলে, ব্যক্ত হোয়ে ভূমণ্ডলে, প্রসাদ বলে, কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা।৬॥

সাধকেরা এই গানের রসগ্রাহি হইবেন।

নটবর বেশ বৃন্দাবনে, কালি হোলে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝ এ কথা, বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুল, চূড়া বংশীধারী ॥১॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ দেব ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো, ভুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি ॥২॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিল শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥৩॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে, বুঝেছি জননি মনে বিচারি।
মহাকাল কালী, শ্যাম শ্যামতনু, একই সকলি বুঝিতে নারি ॥৪॥

অভেদবাদি উপাসকেরা এই গীতের মর্ম্মজ্ঞ হইবেন।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোক্সানি মহল লোয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস্ করি, দিতে হবে কমী ॥১॥
আমি মোলে, এই তরফে আর নাই হামি।
এখন্ ভাল না রাখতো, থাকুক্ রামরামি ॥২॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এ ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা পাবে তুমি ॥৩॥

* ঙ, স, ত, র, অর্থাৎ ঙস্র।

আমি ক্ষেমার খাস্ তালুকের প্রজা। ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥১॥
ক্ষেমার খাসে, আছি বোসে, নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা, সিকস্ত নদী, তাতেও মহল আছে তাজা॥২॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বোয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ্ পেয়েছ, জাননা সে পদের মজা৩॥

মন্ কেনরে ভাবিস্ এতো। যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে, ভাব্‌ছো বোসে, কালের ভয়ে হোয়ে ভীতো।
ওরে কালের কাল, মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥১॥
ফণি হোয়ে ভেকে ভয়, এ, যে বড় অদ্ভুতো।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হোয়ে ব্রহ্মময়ী সুতো॥২॥
মিছে কেন ভাব দুখে, দুর্গা দুর্গা বল মুখে,
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে তোমার তেম্‌নি মত॥৩॥

এবার কালী কুলাইবো। কালী কোষে কালী বুঝে লবো॥
কালী ভেবে, কালা হোয়ে, কালী বোলে, কাল্ কাটাইবো।
আমি কালা কালে, কালের মুখে, কালী দিয়ে চোলে যাবো॥১॥
সে যে নৃত্যকালী, কি অস্থিরা, কেমন্ কোরে তায় রাখিবো।
আমার মন যন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইবো॥২॥
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন্ তোরে তা জানাইবো।
আছে আর যে ছটা, বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিবো॥৩॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিবো।
আমার কিল্ খেয়ে কিল্ চুরি তবু, কালা কালা বাৎ নাছাড়িবো॥৪॥

নামমালা ও স্তব।

জননি পদ পঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে কৃপাবলোকনে তারিণি।
তপন তনয় ভয় চয় বারিণি॥ ধূয়া॥
প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী॥১॥
আগমনিগমাতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী॥২

সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিফল জানি ॥৩॥

পতিতপাবনী, পাবনী পরা, পরামৃতফলদায়িনী।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা, সুখ দায়িনী ॥
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাঙ্কুর স্বগুণে নিস্তার কারিণী।১॥
পাপকৃত ফণিপুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারা রূপে তারয়, নিখিল জননি॥২॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণি তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভব গৃহিণি॥৩॥

ও, জননি, অপরা জন্ম জরা হরা, জননী।
অপারে, ভব সংসারে এক তরণি ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।১॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥২॥
আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি।৩॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তারয় ত্রিলোক তারিণি ॥৪॥

মালসী। আগমনী।

আজ্ শুভ নিশি, পোহাইল, তোমার, এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আনো ঘরে।
মুখ শশি দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি, ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে ॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরি বরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে ॥১॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক্ তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥২॥
যত সহচরী গণ, হোয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে ধরে করে।
কহে, বৎসরেক্ ছিলে ভুলে, এত প্রেম্ কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥৩॥
কবি রাম্প্রসাদ্ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে আনন্দ সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজনে, দিবা নিশি নাহি জানে, আনন্দ পাসরে ॥৪॥

কি সুমধুর! মধুররস ইহার নিকট কি মধুর।

এই গীত ও আর কয়েকটী গীতের রাগ, সুর ও তাল লিখিতে পারিলাম না, গায়ক মহাশয়েরা তৎসমুদয় প্রস্তুত করিয়া গান করিলে পরম সুখলাভ করিবেন।

কালীকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধোরে দে, উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে॥১॥
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন্ ও মুখ দেখি,
মায় ইহা সহিতে কি পারে॥
আয়্ আয়্, মা, মা, বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।২॥
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।৩॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।৪॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে॥
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে।৫॥

রূপ বর্ণনা।

ও, কেরে, মনোমোহিনী। ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল তড়িৎপুঞ্জ মণিমরকত কান্তি ছটা। ও, কেরে মনোমোহিনী।
একি চিত্ত চলনা; দৈত্য দলনা, ললনা, নলিনী বিড়ম্বিনী॥১॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশপ্রিয় নয়নী
শশিখণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥২॥
ললাট ফলকে, অলকাঝলকে, নাসা নলকে, বেসরে মণি।
মরিহেঁকিরূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারসকূপ, বদনখানি॥৩॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী
বামা সমরে বরদা, অশূরে দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি॥৪॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পাড়ল প্রমাদ স্বরূপে মানি।
নাহব জয়িরে, ব্রহ্মময়ী, রে, করুণাময়ীরে বলজননী॥৫॥

মধ্যমাবস্থার গীত

কালো মেঘ উদয় হোলো, অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী, কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥১॥
নিরবধি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥২॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবেনা জঠরে॥৩॥

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা, হয়েছি জোর ফরিয়াদী॥
মন করিছে জানিবদারি নেচে উঠে ছটা বাদি॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো, পুরে হোতে দূর কোরে দি॥১॥
বিমাতা মরেন্ শোকে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হোয়ে যাই আশা-নদী॥২॥
হুজুরে তজ্‌বিজ্‌ কর মা, হাজির ফরিয়াদি দাদি।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজন ধন, সাধারণ নয় যে তাদি॥৩॥
মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ্ অনাদি।
এমা তোমার পুতে, সতিন্ সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥৪॥
প্রসাদ ভণে, ভর্সা মনে, বাপতো নহেন, মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে, খব্‌ চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥৫॥

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার, ভূতের বেগার মর খেটে॥১॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদয় ভূমি গেল টেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেঁটে॥২॥
নানা তীর্থ পর্য্যটন, শ্রম মাত্র, পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বোসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে॥৩॥
রামপ্রসাদ বলে, কিসে কি হয়, মিছে মলেম্ শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন্ ব্রহ্মময়ীর নাম্ কোরে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক্ ফেটে॥৪॥

মন আমার যেতে চায়গো, আনন্দ কাননে। বট মনোময়ী সান্ত্বনা করনা এই মনে॥
শিব কৃত বারানসী, সেই শিব পদবাসী, তবু মন ধায় কাশী, রব কেমন॥১॥

অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চ ক্রোশী পদে কর, নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকা সনে ॥২॥
দ্বিপাশে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা, হৌক পদারবিন্দে, হেরি নয়নে ॥৩॥
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত, কিবা কায অভিমুক্ত, পুরী গমনে ॥৪॥

কালি ব্রহ্মময়িগো। বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ্ তলাসি।
মহাকালী কৃষ্ণ, শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥১॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর, চিরবিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥২॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে, এক বয়সী।
এমা অনুজ ধানুকি সঙ্গে জানকী পরম রূপসী ॥৩॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া, কাশী ॥৪॥

আমায় ধন দিবি তোর, কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা হরের কাছে
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি উপায় আছে।
প্রাণপণে খালাস কর, টাটে ডুবে পাছে ॥১॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য কি তার আছে।
প্রাণ দিয়ে শব হোয়ে, বাঁধা রাখিয়াছে ॥২॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব কার কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে কুপুত্রকে নিরংশি কোরেছে ॥৩॥

আর ভুলালে ভুল্‌বনা গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হোয়ে, বিষের কূপে উল্‌বনা গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান্, মনের আগুন তুল্‌বনা গো ॥১॥
ধনলোভে মত্ত হোয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বনা গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হোয়ে, মনের কথা খুল্‌ব না গো ॥২॥
মায়াপাশে বদ্ধ হোয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ্ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বনা গো ॥৩॥

শ্যামা মারে ডাকো। ভক্তি মুক্তি করতলে ভেবে দেখো ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ কোকনদ্ পদ, কালেরে নৈরাশ কর, কথা রাখো ॥১॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনষ্কাম, অষ্টযামের অর্দ্ধ যাম, সুখে থাকো ॥২॥
রামপ্রসাদ দাস্ কয়, রিপু ছয় করি জয়, মারো ডঙ্কা, তেজ শঙ্কা দূরে হাঁকো ॥৩॥

এ শরীরে কায্ কিরে ভাই, দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্, কালীনাম নাহি বলে॥
কালী রূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডোবে চরণ তলে।
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে।
সে চরণে কায্ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে কালীমূর্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে।
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম্র কি কদাচ ফলে॥

ভাব্না কালী, ভাব্না কিবা।
অরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা।
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমল ভাল্, প্রকাশ করেছে শিবা।১॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনে সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিলে জ্যেষ্ঠামূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥২॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাট,
ওরে যার নেটো, তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা।৩॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভূর, আগুন বেধে কে রাখিবা॥৪॥

আসার আশা আশা, কেবল আসা মাত্র হোলো।
চিত্রের কমলে যেমন, ভৃঙ্গ ভুলে গেলো।
খেল্‌ব বোলে ফাঁকি দিয়ে, নাবালে ভূতলো,
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিলো।১॥
নিম্ খাওয়ালে চিনি দিবে, কথায় কোরে ছলো
ওমা মিঠার লোভে, তিক্ত মুখে, সারা দিন্‌টা গেলো॥২॥

আছি তেঁই তরু তলে বোসে। মনের আনন্দে হরিষে॥
আগে ভাঙ্গবো গাছের পাতা ডাঁটি, ফল্ ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ, আদি দোষ, দেখে দর দেশে।
রব রসাভাসে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ বসে॥১॥
ফলের ফলে, সুফল লোয়ে, যাইব নিবাসে।

আমার্ বিফলকে ফল দিয়া, ফলাফল্ ভাসায়ে নৈরাশ্যে ॥২॥
মন্ কর কি লওরে সুধা, তৃষ্ণাতে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য সম শোষে ॥৩॥
রামপ্রসাদ বলে, আমার কোষ্ঠ, শুদ্ধি "তরারেশে।"
মাগী জানেনা, যে, মন্ কপাটে খিল্ দিয়েছি কোশে ॥৪॥

শেষাবস্থার গীত।

ছি মন্, তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা, ছি মন্, তুই বিষয় লোভা ॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি তুই সতিনে পীরিৎ হয়, তবে শ্যামা মারে পাবা ॥১॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা ॥২॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার বেটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে হাঁকিয়ে দেবা ॥৩॥
আত্মারামের অন্ন ভোগ, দুটো সেই মাকে দেবা।
রামপ্রসাদ্ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥৪॥

মন্ ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা তেজি, কূপে পোড়ে আপন্ খাবে ॥
ভব জরা পাপরোগ, লীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী, সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে।১॥
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে গান কর, পান কর, আত্মারামের আত্মা হবে ॥২॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওর সকলি সম্ভবে তাতে, পরমাত্মায় মিশাইবে ॥৩॥
প্রসাদ বলে মন্ ভায়া, ছাড় কল্পতরু ছায়া,
ওর কাটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥৪॥

ছিছি, মন্ ভ্রমরা দিলি বাজি।
কালী পাদপদ্ম সুধা তেজে, বিষয় বিষে হোলি রাজি ॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীৎ পাজি ॥১॥
অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজি।
তুমি ঠেক্‌বে যখন, জানবে তখন, কর্ব্বে কালে পাপোষবাজী ॥২॥
বাল্য জরা বৃদ্ধদশা, ক্রমে যত হয় গতাজি।
পোড়ে চেরের কোটায়, মন টৌটায়, যে ভজে যে মন্দ গাজি ॥৩॥

কুতূহলে, প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ড পাণি, লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজী ॥৪॥

কোন রাজার সভায় বসিয়া রাজ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গান রচনা করিয়াছিলেন।

মন্ জাননা শেষে ঘটিবে কি লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ কোরে পথে দেবে কাঁটা।
আমি দিন্ থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মার চরণে মনে মনে হওরে আঁটা ॥১॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখি, আটক্ করে কেটা।
ওরে জাননা, যে, তার ভিতরে দুয়ার আছে নটা ॥২॥
পেয়েছ কুসঙ্গি সঙ্গি, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা॥
তারা যা বলিছে, তাই করিছে এমনি বুকের পাটা ॥৩॥
প্রসাদ বলে মন্ জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা ॥৪॥

তারা আর কি ক্ষতি হবে। হ্যাদেগো জননি শিবে॥
তুমি লবে লবে, বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে॥
থাকে থাকে যায় যায়, এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে ॥১॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ, আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি, তুফানে ডরাবে ॥২॥
আপ্‌নি যদি, আপন্ তরি, ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু, অভয় পদে ডুবে॥

এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটী সঙ্গীত উদ্‌ধৃত করিলাম।*

যথা। মনরে আমার এই বিনতি। তুমি পড়া-পাখী হও করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরি সুতা, পড়্‌লে শুন্‌লে দুদি ভাতি।
ওরে, জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি ॥১॥
কালী, কালী, কালী পড় মন্, কালীপদে, রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম্, আত্মজনোর্ কর গতি ॥২॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়্য়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে, ক-দিন চলে, করবে, চার ফলে স্থিতি ॥৩॥

* সংবাদপ্রভাকর, শুক্রবার ১ আশ্বিন ১২৬০ সাল। ইং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ সাল।

রাম্ প্রসাদ্ বলে, কলাগাছে, ফল্ পাবি মন্ শোন্ যুকতি।
ওরে, বোসে মূলে, কালী বোলে, গাছ নাড়া দেও, নিতি নিতি॥ ৪ ॥

তথা। আর কায্ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ, কোকনদ্, তীর্থ রাশি রাশি॥
ওরে, হৃৎ কমলে, ধ্যান্ কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি॥১॥
গয়ায়্ করে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান্, তার গয়া শুনে হাসি॥২॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥৩॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥৪॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্‌লে এলোকেশী॥ ৫ ॥

মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তিশালি মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকারবাদি, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্র চিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি "কালী" নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয় পক্ষেরি তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থ পর্য্যটনাদি ক্রিয়া কর্ম্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। অতএব মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্ঞানী ছিলেন তাহার প্রমাণ করণার্থ এই স্থলে আর একটী পদ প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করুন। যথা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা। ওরে আমার মন বলনা॥
ঋণী আছেন্ ব্রহ্মময়ী. সুখে সাধো সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ, মনরে।
ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥১॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার্ করে যে জানে কল,
মনরে, ওরে, সে জলে মিশায়ে জল ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥২॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মনরে ওরে শ্রীনাথ্ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট্ খোলনা॥৩॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়ো দাদা দিদি ঘাতী, মনরে।
ওরে, জনন মরণাশৌচ্ সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা ॥৪॥
প্রসাদ বলে বারে, বারে, না চিনিলে আপনারে, মনরে।
ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবে বিবেচনা ॥৫॥

এই কবিতার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ যিনি করিবেন তিনিই মহানন্দ-সাগর সলিলে নিমগ্ন হইবেন। এতদ্দ্বারা কবিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুর রূপেই প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ফলভোগ-বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি ভরে সুপবিত্র প্রীতি চিত্তে পরম-পূজনীয় প্রেমময় প্রিয় উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন। সেন সদাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন "যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যা পূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করেনা।" "অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদি ঘাতী, জনন মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা" এই পীযূষ পূরিত পদের নিগূঢ়ার্থ ও ভাব যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, তিনিই অত্যন্ত প্রীত হইবেন। রামপ্রসাদী পদ সকল রত্নাকরবৎ, যত্ন পূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে। পাঠকগণ অবধান করুন। যথা

মায়ারে পরম কৌতুক্। মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবন্ধে লুটে সুখ্ ॥
আমি এই আমার্ এই, এভাবে ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে, ওরে, মিছা-মিছি সার্ ভেবে, সাহসে বাঁধে বুক্ ॥১॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা সুখ্ দুখ্ ॥২॥
দীপ জ্বালে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে, মনরে,
ওরে, তখনি নির্ব্বাণ্ করে, না রাখে এক্ টুক্ ॥৩॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাকো, আপনি আপন্ দেখো, মনরে,
রামপ্রসাদ্ বলে মশারি-তুলিয়া দেখ মুখ্ ॥৪॥

তথা। মন কর কি তত্ত্ব তারে। ওরে, উনমত্ত, আঁধার্ ঘরে ॥
সে, যে, ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
মন অগ্রে শশি-বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে, কোটার্ ভিতর্ চোর্কুটারী, ভোর হোলে সে লুকাবেরে ॥১॥
ষড়দর্শনে দর্শন্ পেলেনা নিগম তন্ত্র ধোরে।
সে, যে, ভক্তি রসের রসিক্ সদানন্দে বিরাজ্ করে পুরে ॥২॥
সে ভাব্ লোভে পরম যোগী, যোগ্ করে যুগ্ যুগান্তরে।
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন্, লোহাকে চুম্বুকে ধরে ॥৩॥
রামপ্রসাদ বলে, মাতৃ ভাবে, আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ী বুঝরে মন্, ঠারে ঠোরে ॥৪॥

তথা। এই সংসার ধোঁকার টাটি। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, জল, শূন্যে এত পরিপাটি।

প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যিটি ॥১॥
গর্ভে যখন যোগ তখন, ভূমে পোড়ে খেলেম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়া কিসে কাটি ॥২॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী
আগে ইচ্ছা মুখে পান্ কোরে, বিষের জ্বালায় ছুট্‌ফটি ॥৩॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী ॥৪॥

তথা। ত্যজ মন, কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ। কাল মত্ত মাতঙ্গেরে, না কর আতঙ্গ ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ, মকরন্দ রসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥১॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন্, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন্,
বিষয় জানিবে তেমন্, হোলে নিদ্রাভঙ্গ ॥২॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে, কর্ম্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার্ কি প্রসঙ্গ ॥৩॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে, তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥৪॥
প্রসাদ্ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা, অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥৫॥

কালী কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীতারা
ত্রিভুবন সারা।
কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ।
লোকান্তর গত ৺ রামপ্রসাদ সেনের কৃত।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক
সংশোধিত হইয়া কলিকাতাস্থ মৃজাপুরে
শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির গুণাকর
যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং
জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায়
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার
নিবাসী শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে
স্বয়ং কিংবা লোক প্রেরণ
করিলে প্রাপ্ত হইতে
পারিবেন ইতি।
শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে।
চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনভ্রান্তিমস্তরয় দেবি কালিকে ॥

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্ত্তনা-ভিধান ভক্তিরসপ্রধান :মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণ-গোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গাথক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্ত-পাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্ত-নয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচ ন্দ্রগুপ্তে।

কালীকীর্ত্তন সংগ্রাহকের উক্তি।

পয়ার

মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়।
যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়॥
কালহরা কালদারা কালিকার পদে।
ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে ২॥
শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়।
স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয়॥
এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে।
যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে॥
ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে২ রবে।
দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে॥
শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে।
শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে॥
ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে।
তারাতত্ত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে॥
ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর।
ভাবি ভাবি ভাবি দুঃখ করিবেন দূর॥
ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয়।
সে ভাব ভাবিলে শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়।
অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন।
তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিন২॥
শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে।
তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে॥
দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে।
কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহে জাগে
কর করযন্ত্রে বাদ্য বিষয় না চাও।
নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও॥
মূলাধার স্থান তাঁর মহাকালনারী।
মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী॥
ন্যায় তাঁর ভাব নেয় নানা ন্যায় পেতে।
ন্যায় যদি ত্যজ সবে পার পেতে॥
তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে২।
তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে॥

দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে।
দরজন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে॥
তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা।
তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা॥
দেখ সেই মায়ার মায়ায় বশ সব।
হররাণী হরে হরে করে সদা শব॥
ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার।
কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥
সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে।
শ্যামা থাকে থাকে২ সদানন্দ ভরে॥
যথা শত২ শতদল ফুটে জলে।
তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে॥
পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব।
কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব॥
ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে।
ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে॥
কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়॥
দ্বেষে২ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়।
নাহি জেনে অহং কার করে অহঙ্কার॥
জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার।
ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা।
না করে সে পদ ভ্যালা ভ্যালা৩॥
বালক বা লোক সব এই কলি কালে।
দিন২ জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে॥
লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদা চালে মনোরথ।
লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ॥
সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে।
উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে॥
নীচের নিকটে সদা উপদেশ লওয়া।
নাবিকেরে অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া॥
সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন।
পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন॥
জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে।
দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে॥
লোকের বারণমন না মানে বারণ।
ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ॥
অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ।
কপালে সকল করে কেন করি রোষ॥
করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর।
সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর॥
শিবের প্রধান পুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।
বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা॥
কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার।
দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার॥
ভাল ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তায়।
অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায়॥
কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পূজ হরদারা।
কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা॥
কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে।
বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে॥
গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি।
ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি॥
একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে।
তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে।

ত্রিপদী

ভাব জীব তেজে মায়া, মহেশমোহিনী মায়া,
মহাবিদ্যা মহেশ্বরী তারা।
গত কালাগতকাল, হৃদে ধর সহকাল,
কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারা॥
করহ নিগূঢ় ভক্তি, তাহে পাবে মহাশক্তি,
যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা।
জানতো বচনসার, করিলে উত্তমাচার,
সরোবরে মীন পড়ে ধরা॥

কে জানে কালীর মর্ম্ম, নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম,
ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা।
ভাবে যথা পুণ্যবানে, তদ্রূপ মা কোলে টানে,
যেমন চুম্বুকে টানে লোহা॥
ত্রিগুণে ভুবনজয়ী, বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী,
কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ।
দুর্গানামামৃত পানে, সবিশেষ গুণজ্ঞানে,
বদন কমলে ক্ষরে মধু॥
কখনো পদ্মিনীবামা, কখনো চিত্রিণীরামা,
ছলেতে পুরুষ ছলে নারী।
নানা বেশে বেশ ধরে, মায়া কত মায়া করে,
সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥
ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি, বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি,
অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে।
কমলে কমলা হন, মাতা কত মতে রণ,
হরগৌরী হন মধ্যে২॥
দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর, জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর,
লহ২ সার উপদেশ।
জীবে দিতে মোক্ষধাম, সেই ব্রহ্ম গুণধাম,
ধারণ করেন নানাবেশ॥
যে জন যে ভাবে ভাবে, তারে তুষ্ট সেই ভাবে,
না দেন ভক্তের মনে কালি।
সদাশিব আত্মারাম, কভু সীতা কভু রাম,
বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী॥
কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে, সদা রাধা নাম করে,
প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল।
কুঞ্জবনে নানা ছলে, গোপিকার মন ছলে,
মনোরম্য স্থান সে গোকুল॥
রাধারূপে ব্রজনারী, সে ভাব বুঝিতে নারি,
কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে।
লজ্জাভয় পরিহরি, মুখে বলে হরি হরি,
হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে॥
কালীরূপে কাল পরে, কটিপরে কর পরে
গলে দোলে শবমুণ্ড সব।
এলোকেশী সর্ব্বনাশী, অট্টহাসি সর্ব্বনাশি,
অসী করে রণে করে শব॥

শিবরূপে যোগবলে, সদা বোম২ বলে,
হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে।
গায় ধূলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা,
শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে॥
ধনুধারি রামরূপে, যুদ্ধ করে নানারূপে,
পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে।
ছলেতে হইয়া সীতা, জনকে বলিয়া পিতা,
নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে॥
হইয়া অদ্বৈতবাদী, জগতের বস্তু আদি,
কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন।
এক ভিন্ন দুই নয়, বিরূপ যে জন কয়,
ধরাতলে মূঢ় সেই জন॥
উপাসনা ভেদমাত্র, বারিপূর্ণ করি পাত্র,
রবিছায়া দেখ সেই জলে।
হবে ব্রহ্ম নিরূপণ, ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ,
প্রশংসা প্রদীপ তবে জ্বলে॥
অতএব বন্ধুবর্গ, তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ,
ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ।
না কর অভক্তি দ্বেষ, লয়ে সার উপদেশ,
ঈশ্বরের ভাব সদা লহ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

অথ গুরুবন্দনা

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং।
অন্ধপট খোলে ধবন্ধ সব হরণং॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং।
তপনতনয়ভয়বারণকারণং॥
সুচারু চরণ দ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ

প্রভাত সময় জানি হিমগিরি রাজারাণী
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি চেতনা জন্মায় রাণী
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে ২ ডাকে রাণী জননি জাগৃহি ৩।
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥
উঠ২ প্রাণ গৌরী এই নিকটে দাঁড়ায়ে
গিরি উঠ গো।
উদয়তি দিনকৃতি নলিনী বিকসতি
এবমুচিতমধুনা তব নহি ৩।
সূত মাগধ বন্দি কৃতাঞ্জলি কথয়তি
নিদ্রাং জহিহি ৩।
গাত্রোত্থানং কুরু করুণাময়ি
সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি ৩।

ভজন

চলগো মন্দাকিনীজলে।
শিবপূজা বিল্বদলে।
মাঈ শুনয়ল-মাইকি ভাষা।
তখন গৌরীর কনক কমল মুখে
মৃদু ২ হাস॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিল কলরুত। শীতল মারুত।
হৃতরুচি সংপ্রতি ভাতি শিখী
নায়ক মলিন বিলোকনে
কুমুদিনী কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীনদয়াময়ি
দুর্গে ত্রাহি ৩।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী
নিকটে মেনকা গিরি
অনিমেষে শ্রী অঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরু ফল
সেই মন্দিরে প্রকাশ
এই দুঁহে ভাষে আনন্দ সাগরে।
প্রভাতে অঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে
তনু সুললিত লোচন
সজল হরল মুখে বাণী।
খেরল অসল সবহুঁ রমণী মুখ মণ্ডল
জয়২ কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল
বিলম্বিত ঝলমল
কো বিধি দেয়ল আনি।
হিমকর বদন রদন মুকুতাবলি করতল
কিসলয় কোমল পাণি।
রাজিত তঁহি কনকমণি ভূষণ দিনকর ধাম
চরণ তল খানি।
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর জপই
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদ বলে সোহি ব্রহ্মময়ী
জগজন মন বিকচকর তঁহি ভানি॥

রাণী বলে ওগো জয়া
ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতী
কি তোমার মনে গো হইল।
রাণী বলে আমি কব কর্‌য়া ভেবেছিলাম।
আর বার আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চায়্যা মনে গো হইল।
রাণী বলে নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি
উমার কায়।
পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ
আমার অঙ্গে শোভা পায়।
এ কথা বুঝাব আমি কারে।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি।
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥
সুকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণের যে গুণ সে গুণজলে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন।
তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যে গুণ সে গুণে মিশাইল॥
উমাছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।
অমন আর কি দেখা যায় তার কি প্রসঙ্গ॥

ভজন

হয় নয় অন্তরে গো রয়্যা।
আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা॥
প্রাণধন উমা আমার গুণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা কর্‌য়া নয়সকল অঙ্গময়
মা বিরাজে যখন যে নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপগুণ।
উমার রূপে নানারূপ প্রসবে সংহারে পুন॥

ভজন

দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে

রাণী বলো ওগো জয়া
কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধায়্যাছে মুখচাঁদে ॥
শুনেছি পুরাণে বহু মুখখান বটে রাহু
শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥

ভজন

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে।
সেই শশী রাহুর শিরে।
কোথা গেলে গিরিবর
শিব স্বস্ত্যয়ন কর
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্ব ঔষধির জলে
স্নান করাও জয়া বলে
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ তাহে জানি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে
এ কথা শুনিয়া হাসে
শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক আমার বচন রাখ
জপ করাও মার দুর্গানাম ॥

ভজন

শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
শিব জপে এই দুর্গানাম ॥
শ্রীদুর্গা নাম গুণ গানে।
শিব না মরিল বিষপানে ॥
মার নামের ফলে, চরণ বলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥
দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি।
কাণ্ডারি তায় ত্রিপুরারি ॥
যে দুর্গানাম বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপা তোমার ঘরে ॥

গিরিজা সুন্দরী স্নান করাইয়া গৌরী
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে
তখন গদ২ ভাবভরে ঝর২ আঁখি ঝরে
সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥
সুচারু বকুল মালে কবরী বান্ধিল ভালে
হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুরবিন্দু রবি কোলে যেন ইন্দু
হেরি২ নিমিষ তেজিল ॥
দোথরি মুকুতা হার কোন সহচরী আর
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন চাঁদ বেড়া তারা যেন
উদয় করেছে মেঘের কোলে ॥
তারার কপালে তারা তারাপতি যেন তারা
ঘেরা তারায় তারা সাজে ভাল।
বদন সুধাংশু যেন তাহে তারা মুক্ত ঘন
কেশরূপ ঘন করে আলো ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে মেঘ নহে কেশ ছলে
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায় দন্তশ্রেণী দেখা যায়
মুক্তা নহে গ্রাস করে শশী ॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল
ইথে দান করা ভাল
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লইতে চায় ॥
জয়া বলে এ বদনে দিল চাঁদের তুলনা।
ছি ছি ও কথা তুল না ॥
ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা সয় ॥
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগধ বিধি।
নিরজনে বসি নিরমিল কলানিধি ॥
শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইলে চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে ॥
এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক ॥
ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার ॥

ভজন

এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥
বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারণে।
চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥
কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ দশ খণ্ড চায়ে দেখ ঐ॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥
চাঁদ বলে ইহা কি আমার সয়।
আমার শোভা যার মুখেরে যায়।
ছিরে কমল তাই হইতে চায়॥
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল
আকাশে।
অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥
উচ্চ পদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥
নিরছি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশে।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রবেশে॥
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শত্রু ভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্র ভাব॥
দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়তঃ সিতপক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগনচাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম,
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছ ভবে,
তেমনি কর‍্যা আর বার নাচিতে হবে।
নূপুর দিয়াছি পায় সুমধুর ধ্বনি তায় গো॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী
চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর মায়ের ইহ পরকাল॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥
চৌদিগে বেড়িল নব২ বধূজাল।
পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিছটা।
শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখ ঘটা॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটামাত্র ছল।
ভুজঙ্গভূষণ রূপ করে টলমল॥

ভজন

রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বাঞ্ছা কি ভূষণ ছলে॥
প্রভাতে নূতন গান রূপ স্মেরযুতা।
ঊষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহাঅন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম
বেশ বানাইলাম জগদম্বা চল পুষ্প
কাননে।
চল ২ পুষ্প বনে জয়া দাসী যাবে সনে॥
জগদম্বে ও চলন্তি চিত্তপদচলনা।

লোহিত চরণ তলারুণ পরাভব
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা ॥
নীলাঞ্চল নিচোল হিলোল পবনে দল
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে বিহরসি
হরসি শিরসি শশিললনা ॥
কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর ভাবে
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর
দীনদয়াময়ী সতত ছল ছলনা ॥

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা।
পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে।
গুণ২ গুঞ্জিত মন্দ২ ভ্রমরে ॥
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠতি চারু কদম্বমূলে ॥
মুখমণ্ডলে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে ॥
চারু সৌরভসঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সবাক্য গভীর ॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে ॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভূ দিগম্বর হে ॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাসুরগর্ব্ব বিনাশকর ॥
জয় বেদবিদাম্বর ভূতপতে।
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে।
মম চারু নামাবলি গান সুখে ॥
সুর শৈবলিনী জলে পূতজটা।
জটাণম্বিত চারু সুধাংশু ছটা ॥
ছটা ব্রহ্ম কটাহে তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥
প্রসীদ২ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ প্রভু শম্ভু হে ॥
ভব ভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে।
ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥

প্রেয়সীর খেদ গানে
সদাশিবের উচ্চাটন করে প্রাণে
লোল চিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী
গমন শিখরিপুরী
নন্দি আন বৃষভে সাজাইয়া ॥
কদম্ব কুসুম অনু
পুলকে পূর্ণিত তনু
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে।
উভয়ত মত্ত গূঢ়
বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়
ভৈরব বেতাল চলে পাছে ॥

ধুয়া

তাল বেতাল রে
নাচিছে কাল বাজিছে তাল
বেতালে ধরিছে তান।
কেহ নাচিছে গায়িছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয়২ কাশীনাথ ॥
প্রেয়সীর প্রেমবশে
গদ২ তনুরসে খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুর তরঙ্গিণী কুল২ উঠে ধ্বনি
সঘনে গরজে বিষধর ॥
ভনে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্ত কাল

উপনীত মন্দাকিনীতীরে।
নিরখি সুন্দরী মুখ মরমে পরমসুখ
লোচন তিতিল প্রেমনীরে ॥

নন্দী একি রূপমাধুরী আহা মরি আহা মরি
আমা গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মন মীন হৃদি সরোবর তেজি
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি ॥
আহা২ মরি২
কিবা রূপমাধুরী
হাসি২ সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী
কি গুণে চৈতন্য নিগূঢ্য হরে ॥
কে রে কুঞ্জরগামিনী
তনু সৌদামিনী
প্রথম বয়স রঙ্গিনী।
যৌবন সম্পদ ভাবে
গদ২ সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥
কে রে নির্ম্মল বর্ণাভা ভুজগমণি
ভূষণ শোভা হরে।
ভূষণে কিবা কায।
পূর্ণচন্দ্র কোলে খদ্যোত যেমন
প্রকাশে না বাসে লাজ ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি
নিরখি সুন্দরী ছবি
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কামরূপ জর২ বপু
সে রূপের কি কব বিশেষ ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের এ কি কথা।
শিব ও শিবা ভিন্ন ভবে কি শুনেছ কোথা ॥
উভয়ত সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ।
উভয়ত চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেতা রব।
কালক্রমে কল্যাণি কৈলাশ পুরে নিব ॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রতন ভূষণে কার নাহি বা যতন ॥
নিজে হংস হংসী সদা মানসগামিনী।
চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী ॥
নখজ্যোতির পরং ব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তবে কেটা ॥
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥
পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহনে আমার বিধবা আকৃতি ॥
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ।
নিগুণে সগুণকর প্রসব ত্রিগুণ ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যা তত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চ ভূত কায়া।
ঘটে২ আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া ॥
বেদে বলে তুমি যোগী তত্ত্ব কর‍্যা ফিরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে ॥
দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ দক্ষে অপমান।
শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান ॥
মর্ম্ম কয়্যা স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী ॥
বাল্যলীলা এই মার জনকভবনে।
গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে ॥

অথ গোষ্ঠলীলারম্ভঃ

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে ॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন ॥

ভজন

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্র বনে ॥
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি উর্দ্ধ মুখে রব ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে ওঠ শুনে মার বেণু ॥

ধুয়া

জগদম্বা রে যব পুরে বেণু
যব পুরে বেণু ধায় বৎস ধেনু।

উঠে পদরেণু রেণু
ঢাকে ভানু ভাবে ভোর তনু ॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেমতরঙ্গ সোমা কি রঙ্গ নেহারে
পতঙ্গ ॥

হত কোকিল মান
সুমাধুরী তান স্বরে হরে জ্ঞান
যোগী তেজে ধ্যান ঝুরে
মন প্রাণ ক্ষণে মন্দ ভাষে।
ক্ষণে মন্দ হাসে চপলা
প্রকাশে রামপ্রসাদ দাসে
প্রেমানন্দে ভাষে ॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপ বধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন তনু প্রথম বয়েস ॥
বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদীকূলে।
স্বয়ম্ভু পুজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে ॥
নাভিপদ্ম তেজি ভ্রমে বাণী ক্রমে২।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে ॥
ঈশ্বরীমোহন ইষু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধ ভাণ্ড ॥
ভালেতে তিলক শোভা সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাসমার এই এক ধ্যান ॥

ভজন

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে ॥
একাম্র কাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন২ হই২ রব করে সঙ্গিনীরে ॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে২।
নীলাম্বরাঞ্চল পবনে চঞ্চল
আকুল কুন্তল ব্যাপল শিরে ॥
মহাচিত্ত অরুন্তুদ কোপে
বিধুন্তুদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে।
বিবিধ বধূ যোগায় মধু
তনু সুশীতল সমীরে ॥
ঘন ঝরে শ্রম-জল গলিত কজ্জল,
যেমন কাল সাপিনী ধায় নাভিবিবরে।

ধুয়া

মা ডাকিছে রে আয় সুরভি
নব২ তৃণ তটিনী জল শীতল
দূরে ধায়ত কাছে আয়রে সুরভি।
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি২ নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে ॥
ঊর্দ্ধ মুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বারবে ডাকে ॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে ॥
সুরভির নব বৎস শোভা উরুপরে।
মন্দাকিনীধারা যেন সুমেরুশিখরে ॥
ঘন২ পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে ॥
কৌতুকে আকাশপথে হরি হর ধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা ॥
ভুবনমোহন মার গোচার্য্য লীলা।
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা ॥
একেবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া
বেণু।
এবে নিজে গোপাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু ॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিল ধন্যা।
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥
আজো তোমার গুণ কে জানে।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার।
নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥
তারা তুমি জ্যৈষ্ঠা মূলা আচরণে সতী।
তব তত্ত্ব মূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি ॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব ॥

অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ঙ্ক মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী।
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণী,
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশত বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন তারা রূপ নিরাকার
আকার তোমার নাহি অক্ষর আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্যে নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালো রূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়।

পয়ার

পশুবংশ কান্তি কান্তি নেত্রে একবার।
নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্কালে।
জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম।
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।
সে তরে সংসার ঘোরে সব পূজ্য সেই।
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোর যুগে যদি দুর্গে বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ুঃ অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুস্বপ্নে গ্রহণ দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারি।
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে।
ইচ্ছা সুখে বিষপান তাপ এড়ে ভয়ে॥
বদন কমল বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর।
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারসমাধুরী কি স্মরহরবধূ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা বিজয়ী হরিচিত্তমোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসন্তি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া।
অকালমরণহরা অচলতনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী।
চিত্তাকাশে প্রকাশে নবীন কাদম্বিনী॥

ইতি কালীকীর্ত্তনং সমাপ্তং

ঈশ্বরো জয়তি।

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া

কলিকাতা

প্রভাকর-যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১ আষাঢ় ১২৬২ সাল।

এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র।

ভূমিকা

বঙ্গভাষাভূষিত প্রাচীন পদ্যপুঞ্জ এবং তত্তৎ প্ররচক পুরাতন কবি কদম্বের জীবনচরিত সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমি প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া প্রতি নিয়তই উৎসাহরথের চালনা করিতেছি, এই বিষয়ের নিমিত্ত ধন, মন, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি,—সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রা ও আর আর কার্য্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি। স্থলপথে ও জলপথে ভ্রমণ পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। স্থান বিশেষে গমন পূর্ব্বক প্রার্থিত পদের ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিতেছি, যেন এই পদ দ্বারা অদ্য ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি শিবপদ প্রাপ্ত হইলাম, কি ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হইলাম। তৎকালে পূর্ব্বকার সকল দুঃখ এককালেই দূর হইয়া যায়, সমুদয় উদ্যোগ, সমুদয় যত্ন এবং সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে থাকি। অপিচ সম্যক্ প্রকার চেষ্টা দ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ আক্ষেপ করিয়াই অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করি। অধুনা এই বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের অপর কোন আমোদেই

আমোদ বোধ হয় না, অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই মন স্থির হয় না, অনবরত মনে মনে শুদ্ধ পুরাতন কবিতার ভাবনাই করিতেছি। মনের মত একটি কবিতা প্রাপ্ত হইলে আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তখন বোধ হয় যেন এই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

দশ বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্য্যের দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেনের "জীবনবৃত্তান্ত" এবং তাঁহার প্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধান-ভক্তিরস প্রধান মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

অনন্তর ৺রামনিধি সেন অর্থাৎ "নিধুবাবু"। ৺হরু ঠাকুর। ৺রাম বসু। ৺নিতাইদাস বৈরাগী। ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ৺রাসু ও নৃসিংহ এবং আর আর কয়েকজন মৃত কবির জীবনচরিত ও কবিতাকলাপ এক এক মাসের প্রথম দিনের পত্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছি, সেই সমস্ত বিষয় পাঠক মাত্রেরি পক্ষে সম্যক প্রকারে সন্তোষকর হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে তাহার কোন বিষয়টীই পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হয় নাই, কেবল সংবাদ-পত্রে পত্রস্থ করিয়াই রাখিয়াছি, অবিলম্বে মূল্য নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিব এমত মানস করিয়াছি, ফলে মনোময় পরম পুরুষের মনে কি আছে বলিতে পারি না। কোনরূপ দৈবঘটনা দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোন ব্যাঘাত না জন্মিলে উৎসাহের কুৎসা নিবারণ পূর্ব্বক অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব, নচেৎ এই পর্য্যন্তই শেষ করিতে হইল।

ইহাতে এতদ্রূপ আশঙ্কা করণের কারণ এই যে এই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্য্যোগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। অনুষ্ঠান করণ মাত্র গাত্র পাত্র অমনি বিষয় ব্যাধির আধার হইয়াছে, অতিশয় দুর্ব্বল ও উত্থানশক্তি রহিত হইয়া দুই মাস কাল শয্যা সার পূর্ব্বক অপর কয়েক মাস নৌকাযোগে কেবল জলে জলে বহু স্থলে ভ্রমণ করিলাম, অথচ অদ্যাপি সুস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ সবলাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই, রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিহার করিয়াছি, তথাচ এ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করি নাই। সুপ্তির যথার্থ রূপ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছিল, অথচ স্বপ্নে স্বপ্নে এমত অনুমান হইয়াছে, যেন আমি আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমি সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাস হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেকাংশেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি এবং ইহার পর যত দূর সাধ্য ততদূর করিব, কোনমতেই ত্রুটি করিব না, ইহার নিমিত্ত যখন মহারত্ন পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য ধনে অধিক কি স্নেহ জন্মিতে পারে।

এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কেহ লিখিয়া রাখেন নাই, এবং

সেই সেই কবি মহাশয়েরাও আপনাপন বিরচিত প্রবন্ধ প্রকরণ প্রকটন পুরঃসর তন্মধ্যে স্ব স্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন নাই, সুতরাং এইক্ষণে তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকের সুগোচর করা যদ্রূপ কঠিন ব্যাপার হইয়াছে তাহা বিজ্ঞজনেরাই বিবেচনা করুন। আমি একপ্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধ এই বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার অবস্থা যদ্রূপ হইয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি, এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী তিনিই জানিতেছেন। আশা ও সাহসের আশ্রয় লইয়া অনুরাগ সহযোগে চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া যদিস্যাৎ আর পাঁচ বৎসর আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বৃথা কালযাপন করিতাম, তবে এই দেশে ঐ সমস্ত কবিদিগের কবিতা ও সর্ব্ববিষয়ের পরিচয়াদি প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত একেবারে লোপ হইয়া যাইত, যুবকেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। এই স্থলে ১০০ এক শত বৎসরের পূর্ব্বকার কথা উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যেরূপ নানা প্রকার চমৎকার চমৎকার বাঙ্গালা কবিতার ও গীতাদি রচনার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, বাক্যদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা সেই সেই ধনির সেই ধ্বনি শরৎকালের মেঘধ্বনির ন্যায় সমুদয় মিথ্যা হইল। যদি ধনাঢ্য মহাশয়েরা ধনের আনুকূল্য এবং কাব্যপ্রিয় উৎসুক মহাশয়েরা সংগ্রহের নিমিত্ত মনের ও শ্রমের আনুকূল্য করেন, তবে গুরুভারকে এত ভার বোধ করিতে হয় না, এই গুরু ভার সহজেই লঘু হইয়া আইসে।—যাহাতে দশের সংযোগ তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? কিন্তু এ পক্ষে কোন মতেই আর বিলম্ব বিধেয় নহে, কারণ প্রায় সমুদয় প্রাচীনলোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইক্ষণেও যে দুই এক ব্যক্তি জীবিত আছেন, তাঁহারাই অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার পর সেই রকম লোকের অভাব হইলেই সমুদয় অভাব হইয়া পড়িবে। তখন কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া বিতরণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যদিও সংপূর্ণরূপে সমস্ত সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হইয়া উঠে তাহাই উত্তম, যখন সর্ব্বস্বই লোপ হইবার লক্ষণ হইয়াছে, সুতরাং তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয়, তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

কেহ যেন এমত বিবেচনা করেন না যে আমরা কেবল উপকারের কামনায় এই শুভস্মত্রের সঞ্চার করিতেছি, ইহাতে আমারদিগের মনে অর্থের আশা কিছুমাত্রই নাই, শুদ্ধ এইমাত্র অভিলাষ করিতেছি যে, এই অভিপ্রায়ানুসারে অপ্রকটিত পদ্যপুঞ্জ প্রকটিত হইলে পূর্ব্বতন মৃত কাব্যকর্ত্তারা আপনাপন কীর্ত্তি সহিত পৃথী সমাজে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন। দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরবপুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারি অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব পর্ব্বত চূড়া সহিত অধোভাগে পতিত হইবেক, এবং যাঁহারা কবিতা প্ররচনাপথে প্রবেশ করিয়া চরণ চালনা করিতেছেন, তাঁহারা চরণ চালনার পক্ষে বিশেষ সদুপায় প্রাপ্ত হইবেন। অনায়াসেই পদ লাভের পদ পাইবেন।

যে সকল নব্য সভ্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ নহেন, সংপ্রতি প্রীতিচিত্তে অনুরোধ করি, আমরা যে সকল প্রাচীন কবিতা পত্রস্থ করিয়াছি ও করিতেছি, তাঁহারা কিঞ্চিৎ

অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া যত্নযোগে স্থিরভাবে ভাব গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখি হইবেন, এবং অতি সহজেই জানিতে পারিবেন যে বঙ্গভাষায় কবি সকল কবিতা দ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা, ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন! শব্দের কি লালিত্য! মধুরত্ব! ভাবের কি মাধুর্য্য! সৌন্দর্য্য! রসের কি তাৎপর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। আমরা যৎকালে সময় বিশেষে রসবিশেষের পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রসসমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরী লীলাদ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে। বিশেষতঃ নায়ক নায়িকা উক্তিভেদের দুই একটী বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলে এখনি বোধ হইবে যেন স্ত্রী, পুরুষ অথবা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানাভাবে নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানারসে কথোপকথন করিতেছেন, কিছুই অসাক্ষাৎকার বোধ হইবে না।

পূর্ব্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গতমাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ব বিখ্যাত মহাকবি ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদিত করিয়াছি, এবং অদ্য সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এ পর্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটী কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর ও আনন্দকর হইবেক। এই স্থলে লিপি বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলে ভাবগ্রাহি মহাশয়েরা ভাবতরঙ্গে কখনো ভাসিতে ও কখনো ডুবিতে থাকিবেন।

যদিস্যাৎ সকলে সমাদর পূর্ব্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করেন, তবে আমরা বহুকালের পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া ক্রমে ক্রমে অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ করণে উৎসাহি হইব। ভারতচন্দ্রের কৃত অন্নদামঙ্গলের সমুদয় কবিতার টিকা করিয়া প্রকাশ করিব, এবং এই প্রণালীক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর এবং অবস্থাভেদের সমস্ত পদ টীকা সম্বলিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব। অপিচ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমধ্যে যে সকল প্রবন্ধ অতিশয় কঠিন, তাহারো ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিব, এবং অপরাপর প্রাচীন কবিদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভেদের পদাবলীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্বরূপার্থ সাধ্যমতে বর্ণনা করত সর্ব্ব লোকের সুবিদিত করিতে কখনই ত্রুটি করিব না। এইক্ষণে গত কালের কথাই নাই, জীবনের অবশিষ্ট কাল যাহা এ পর্য্যন্ত বক্রী আছে তাহা শুদ্ধ এই কার্য্যেই যাপন করিব।

যদিও আমারদিগের এই সঙ্কল্প উচ্চ তরু-ফল-গ্রহণেচ্ছু বামনের ন্যায় হাস্যজনক হইতেছে, অর্থাৎ এই নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হয়। আর ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ুঃ কুবেরের ন্যায় ধন, কর্ণের ন্যায় দানশক্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি, ব্যাসের ন্যায়

লিপিশক্তি এবং ভীমের ন্যায় বল, এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হয়, তবে একদিন প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য কিনা তাহাতেও সন্দেহ করিতে হয়। যাহা হউক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ নিন্দনীয় নহে; সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হয়, কি করিব, পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সাধ্যমত চেষ্টার অন্যথা করিব না। ভাবি ভাবনা ভাবনা করিয়া ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য হয় না, ইহাতে আমারদিগের ভাগ্যক্রমে বাঞ্ছাফলপ্রদ পরম কারণিক পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবেক।

এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বহু স্থান ভ্রমণ ও বহু লোকের উপাসনা করত বহুবিধ ক্লেশ গ্রহণ করিয়াছি, বহুকালের পর বহু পরিশ্রমে অদ্য অভিলষিত ফল সুসিদ্ধ করিলাম। যদিও এই পুস্তক অধিক পৃষ্ঠায় পরিপূরিত হয় নাই, কিন্তু ভূমিকা এবং কবিতা সকল অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হওয়াতে বিষয়ের স্বল্পতা কিছুই দেখিতে পাইবেন না, বড় অক্ষরে ক্ষুদ্র শরীরে প্রকাশ করিলে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা বরং অধিক হইত। সুতরাং ১ একটাকা মূল্য নির্দ্ধারিত না করিলে কোনক্রমেই আমারদিগের গুরুতর পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা এবং ব্যয়ের সফলতা হইতে পারে না। বোধ করি কাব্যানুরাগি গুণগ্রাহি মহাশয়েরা গুণাকর ভারতের "জীবনবৃত্তান্ত" ও পদ্যসমূদয় অমূল্য রত্ন তুল্য বিবেচনা করিয়া এই মূল্যের প্রতি কোনপ্রকার আপত্তি উপস্থিত করিবেন না, সকলেই অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অস্মদাদির উৎসাহ পথের কণ্টক নিবারণ করিবেন।

ইহার পূর্ব্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই,—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম। এতৎপাঠে বিশেষ উপকার বিবেচনা করিয়া যদি সকলে গ্রাহকতা ব্যাপারে উপযুক্তরূপ প্রযত্ন প্রকাশ করেন, তবে আমরা অশেষানন্দ লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে এই নিয়মে এক এক কবির বিষয়ে এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব, তদ্দ্বারা দেশের যে কত প্রকার উপকার হইবে তাহা বাক্যযোগে ব্যক্ত হইবার নহে।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি আমারদিগের এই প্রভাকর যন্ত্রালয়ে, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, হুগলী কালেজের ছাত্র বাবু নবকৃষ্ণ রায়ের নিকট অথবা পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরীতে স্বয়ং যাইলে কিম্বা মূল্য সহিত লোক পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইত্যলং বিস্তরেণ।

কলিকাতা। ১ আষাঢ় ১২৬২।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

সংশোধিতা মপিময়া বহুলপ্রয়াসৈ
বাক্যাবলীং পুনরিমাং প্রতি শোধয়ন্তু।
সন্তঃ সুশান্ত নয়নান্ত নিরীক্ষণেন কৃত্বা
কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে॥

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত

কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহি মনুষ্য মাত্রেই বিষমতর ব্যগ্র হইয়া থাকেন, কারণ ইনি সর্ব্বাংশেই প্রধান ছিলেন; ইঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিষয়ের গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। বঙ্গভাষার কবিতা পাঠে এই মহাশয়কে অদ্বিতীয় কবি বলিয়াই মান্য করিতে হইবে। ভারতের বিরচিত কাব্য এপর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, চিরকাল নূতন রহিল,—সকল সময়েই নূতন বোধ হয়, প্রত্যেক্ বিষয়েই মনকে মোহিত করে। কোকিল বসন্ত আগমনে—মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ মধু পানে—চাতক নবনীল নীরদ নির্গত নীর পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিকজনে রসালাপ আস্বাদনে—এবং দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব না করে, ভাবগ্রাহি অনুরত জনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত" অপ্রকাশ থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। এ বিষয়ে যত দূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই, বহু কাল পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশই যথা বিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কত প্রকারে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছি।—অধুনা দশ বৎসরের পর বাঞ্ছিত বিষয়ে একপ্রকার কৃতকার্য্য হইলাম, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বুঝি এতদ্দিনের পর আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন। এই মহাত্মা যে যে সময়ে যে যে ভাবে "জীবনযাত্রা" নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আমরা তদ্বিশেষ সংগ্রহ করত মহানন্দে প্রকটন করিতেছি, সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে তুষ্টির বীজ বপন করুন।

৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি "ভুরসুট" পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্ব্ব সাধারণে তাঁহারদিগ্যে সম্মান পূর্ব্বক "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি "ভরদ্বাজ গোত্রে" মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বাটীর চতুর্দ্দিগে গড়বন্দি ছিল, একারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ "চতুর্ভুজ রায়" মধ্যম "অর্জ্জুন রায়" তৃতীয় "দয়ারাম রায়" এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ "ভারতচন্দ্র রায়"। এই বিশ্ব বিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

এমত জনরব, যে, অধিকারভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদ সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন, ঐ সময়ে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র অতিশয় শিশু ছিলেন, তাঁহার মাতা মহারাণী সেই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক আপনার দুইজন রাজপুত সেনাপতিকে কহিলেন "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে এখনি বিনাশ কর, নয়, এই রাত্রির মধ্যেই "ভুরসুট" অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর, ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব" এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উক্ত সেনাপতিদ্বয় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই

রজনীতেই "ভবানীপুরের গড়" এবং "পেঁড়োর গড়" বল.দ্বারা অধিকার করিয়া লইল। পর দিবস প্রাতে রাণী বিষ্ণুকুমারী পেঁড়োর গড়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভূপতি নরেন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্রগণ এবং কর্ম্মচারি পুরুষমাত্রে কেহই নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছেন, কেবল কতকগুলীন স্ত্রীলোকমাত্র অতিশয় ভীতা ও কাতরা হইয়া হা! হা! শব্দে রোদন' করিতেছেন। মহারাণী সেই কুলাঙ্গনাগণকে অভয় বাক্যে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করত কহিলেন "তোমারদিগের কোন ভয় নাই, স্থির হও, কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া রহিয়াছি, আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেহ, তবে আমি জল গ্রহণ করিতে পারি" এই বাক্যে পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অমনি তাঁহার সম্মুখে "লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা" আনয়ন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন, রাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে জলপান করিলেন। অনন্তর শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন, আর ভবানীপুরের কালীর ভোগ-রাগের জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু যে সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়াছিলেন তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, শুদ্ধ গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদান পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে পুনর্গমন করিলেন।

এতদ্ঘটনায় নরেন্দ্র রায় এককালেই নিঃস্ব হইলেন, সর্ব্বস্বই গেল, কোনরূপে কায়ক্লেশে দিনপাত করিতে লাগিলেন।— এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য "নওয়াপাড়া" নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেন "ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন করিলে? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে? শিষ্য নাই, ও যজমান নাই, যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে" জগদীশ্বরেচ্ছায় এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার অপেক্ষাও অধিক কল্যাণকর হইল, কারণ তিনি তচ্ছ্র'বণে অতিশয় অভিমানপরবশ হইয়া জিলা হুগলির অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রাম নিবাসি কায়স্থকুলোদ্ভব মান্যবর ৺ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমন পূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুন্সীবাবুরা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ পূর্ব্বক বাসা দিয়া, সিধা দিয়া সুনিয়মে সদুপদেশ করিতে লাগিলেন। এই কালে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন কিন্তু তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করেন না এবং রীতিমত কোন বিষয়েরি বর্ণনা করেন না।—সময় বিশেষে কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন।—নচেৎ প্রতি নিয়তই শুদ্ধ বিদ্যাভ্যাসে পরিশ্রম করেন, অপর কোন ব্যাপারের আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করেন না। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করেন। প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুন পোড়ার অর্দ্ধভাগ এ বেলা এবং অর্দ্ধভাগ ও বেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত মুন্সি বাবুদিগের বাটীতে একদিবস সত্যনারায়ণের পূজার, সির্ণি, এবং কথা হইবে তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইয়াছে।—কর্ত্তাটি কহিলেন "ভারত, তোমার সংস্কৃত

বোধ আছে, বাক্‌পটুতা উত্তম।—অতএব তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁতি পাঠ করিতে হইবেক,—গুণাকর ইহাতে সম্মত হইলে মুন্সী পুঁতি আনয়নের নিমিত্ত এক জনের প্রতি আদেশ করিলেন, তচ্ছ্রবণে রায় কহিলেন, "মহাশয়!—পুঁতি আনাইবার আবশ্যক করে না।—আমার নিকটেই পুস্তক আছে, পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে পুঁতি আনিয়া এখনই পাঠ করিব।"—এই বলিয়া বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করিলেন, যাঁহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা তাবতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে ভারতের নামের "ভণিতা" এবং সবিশেষ পরিচয় বর্ণিত হওয়াতে সকলে আরো অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।—সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন।—ভারত।—তুমিই সাধু।—সরস্বতী তোমার মুখাগ্রে নৃত্য করিতেছেন।—তুমি সামান্য মনুষ্য নহ।—তোমার অসাধারণ ক্ষমতা ও অলৌকিক সাধ্য দৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি।—

হে পাঠকগণ! দৃষ্টি করুন, আমরা আপনারদিগের বিদিতার্থে সেই রচনা অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।—যথা।

ত্রিপদী

গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরী, সত্যপীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র,
যবনে করিতে বলবান!
ফকীর শরীর ধরি, হরি হৈল অবতরি,
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥
নম্রমাণ, দাড়ি গোঁপ, গায় কাঁথা, শিরে টোপ
হাতে আসা, কাঁধে ঝোলে ঝুলি
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি
নমাজে দর্গার চুমে ধূলি॥
জাহির কিরূপে হব, কারে বা কিরূপ কব,
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র, বিষ্ণু নামে এক বিপ্র,
সেইখানে উত্তরিল আসি॥
দীন দেখে দ্বিজবরে, সত্যপীর কন তারে
প্রকাশ করিতে অবতার।
বে সত্য জনারগির, সির্ণি বেদে দরপীর,*
পুলকে প্রসাদ খাও তার॥

দ্বিজ বলে হরি বিনে, পূজি নাই অন্য জনে,
কি বলে ফকীর দুরাচারী।
ফকিরের অঙ্গে চায়, অদ্ভুত দেখিতে পায়,
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি, উঠে দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সির্ণি ইতিহাস।
ক্ষীর, চিনি, আটা, কলা, পান, গুয়া, পুষ্পমালা
মোকাম পিঠের পরে বাস॥
দ্বিজ আসি নিজালয়, আনি দ্রব্য সমুদয়,
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ গুণে, ধন্য হৈল ত্রিভুবনে,
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে, সাতজন কাটুরিয়ে
সির্ণি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি, সকল বিদ্যায় কাব
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সির্ণি মেনে,
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার, জন্মিল দুহিতা তার,
চন্দ্রমুখী চঞ্চল নয়না॥

*এই বঙ্গভাষা মিশ্রিত পারস্য ভাষা ভূষিত পদের মর্ম্ম মর্ম্মজ্ঞ জনেরা গ্রহণ করিবেন।

কাদম্ব কোদর স্থূলা, কাদম্বিনী সুকোমলা,
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে, ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম
কন্যা দেখি রূপযুত, আনিয়া বণিক সুত,
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত, কে জানে কৌতুক কত,
এক তনু নাগরী নাগর॥
সদাগর মত্ত ধনে, সির্ণি নাহি পড়ে মনে
সজামাতা সাজিল পাটন।
বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা, বাতগামি সাত ডিঙ্গা,
দুর্গদেশে দিল দরশন॥
সত্যপীর ক্রোধ মন, রাজভাণ্ডারের ধন,
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে, কোটাল প্রভাতে চলে
লোভ্ পেয়ে বাঁধে সদাগরে
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাখে, বেড়ি পায় বন্দি থাকে,
মেগে খায় লায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি, কাল নিত্য চাহে রতি,
সাধু কন্যা হইল ফাঁপর।
ভেদ পেয়ে দ্বিজ স্থানে, সত্যপীরে সির্ণিমানে
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা
প্রত্যুষে ফকির রূপ, স্বপনে দেখিয়া ভূপ,
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা॥
সাত গুণ ধন লয়ে, সাধু চলে নৌকা বেয়ে,
প্রভু পথে হইলা ফকির।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু, চিনিতে না পারে বিধু,
ক্রোধে ধন হৈল সব নীর
বিস্তর করিয়া স্তুতি, পুন পেলে অব্যাহতি,
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু, ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু,
নিজদেশে দিল দরশন।
নিজদেশে উত্তরিল, সাধু কন্যা বার্ত্তা পেল,
স্বামিরে দেখিতে বেগে ধায়
প্রসাদ সিরুণী হাতে, ফেলে যায় পথে পথে
লাফানে, তা পানে নাহি চায়
সত্যপীর ক্রোধভরে, সাধুর জামাতা মরে
ক্রোন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।
ওরে বিধি, হায় হায়!— এ যৌবন বৃথা যায়,
যেন রতি কামের অবলা॥
ডুবিয়া মরিব জলে, থাকিব স্বামির কোলে,
হেন কালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি, পুন গিয়া খাও ভুলি,
পাবে পতি না কাঁদিও ধনী
উপদেশ পেয়ে মেয়ে, সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে,
মৃত পতি বাঁচাইলে প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি, সদাগর হৈল সুখী,
সিরিণী করিল সাবধানে॥
এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাথা
বদ্ধি রূপ কৈলা নানা জনা
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কেরে গোষ্ঠির সহিত॥
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত॥

এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। যদিও এতন্মধ্যে কোন কোন স্থানে মিলের কিঞ্চিৎ দোষ আছে, কিন্তু গুণাকরের এদোষ দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য হইতে পারে না,—কারণ, একে বয়সের স্বল্পতা, এবং সময়ের স্বল্পতা। তাহাতে আবার এই রচনা প্রথম রচনা—ইনি সর্ব্বশেষে যে সকল গ্রন্থ বিরচন করেন তাহার তুলনা প্রায় দেখিতে পাই না।

উল্লেখিত ব্রত কথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে আর একটি কথা, রচনা করেন।—লেখকের লেখার দোষে তাহার স্থানে স্থানে অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়াছে। কতক পারস্য, কতক বাঙ্গালা ও কতক সংস্কৃত "সাত নকলে আসল খাস্ত" তাহাই হইয়াছে। কোন কোন পদের চারি পাঁচটা কথাই নাই, সুতরাং অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে।—কি করি, উপায় নাই,

আর একখানা হাতের লেখা পাইলে ঐক্য করিয়া দেখা যাইত—যাহা হউক, বহুকষ্টে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করুন। যথা।

চৌপদী

শুন সবে এক চিত, সত্যপীর গুণ গীত, দুই লোকে পাবে প্রীত, সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ, বন্দ সত্য নারায়ণ, সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ,যার যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি, ফকির শরীর ধরি, অবনীতে অবতরি, হরিবারে-যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে, দরিদ্র দ্বিজের ধামে, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কামে, দানে কৈল মন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়, প্রভু দেখা দিলা তায়, হইয়া ফকির কায়, মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ, গলে ছেলি, মুখে গোঁপ, ঝুলিতে ঝুলিছে থোপ, হাতে আশাবাড়ি রে॥
সেলাম হামারা পাড়ে,ধুপ্ মে তোম্ কাহে খাড়ে, পেরেসান্ দেখে বড়ে, মেরে বাৎ ধরতো।
সির্ণি বেদে পির বা, সভি হামছো মিরবা, মোকামে জাহির বা, দরব্ হস্ত ভপতো॥
বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখি দ্বিজ, নিবাসে আসিয়া নিজ, পূজিল গরুড়ধ্বজ, সির্ণি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন, ঘরে ঘরে সর্ব্বজন, পূজে সত্যনারায়ণ, খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট, কাটুরের হৈল নষ্ট, জগতে হইল শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর গুণ গেয়ে, মত মত ধন পেয়ে, সিরণি প্রসাদ খেয়ে, সিদ্ধি করে বাসনা॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সির্ণি মেনে পঞ্চমে পাইল কন্যা, চন্দ্রকলা নামেতে।
কি কব তাহার ছাঁদ, কাম ধরিবার ফাঁদ, মুখখানি পূর্ণ চাঁদ, জিত রতি কামেতে॥
বর আনি নীলাম্বর, রূপে গুণে মনোহর, সদানন্দ সদাগর কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে, সত্যদেবে পূজা মানে সত্যদেব ভাবিমনে, সদা থাকে ধ্যানেতে॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে, জামাতারে সঙ্গে নিয়ে, সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে, পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায়, ধরাপড়ে চোর দায়, গলে ডোর বেড়ি পায়, কারাগারে রহিল॥
এসব প্রকার ষষ্ঠে, সদাগর মুক্ত কষ্টে, সপ্তমে সাধুরে দৃষ্টে, পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এলো, চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো, প্রসাদ খাইতেছিল, ফেলে করে হেলনা॥
জলে ডুবে মরে পতি, উভরায় কাঁদে সতী, কি হবে আমার গতি প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি,হোয়ে তার পূর্ণ শশি, কোথা আছ অহর্নিশি,প্রেমাধীনী ফেলে হে॥
যৌবনে প্রভুর কাল, মদন দাহন জাল, কোকিল কোকিলা কাল, রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল, খেদে হয় প্রাণাকুল, ঝাঁপ দিই জলে হে॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা, বাঁচাইল তার ভর্ত্তা, সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা, পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা, সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা, যেন শশধর রাকা, দুই লোকে তরিল॥
ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত, ফুলের মুকুটি খ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠির সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,-ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥”

এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে তিনি কোন্‌খানি প্রথম বিরচনা করেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না,—কিন্তু অনুমানে এরূপ স্থির হইতেছে যে, ত্রিপদীটিই সর্ব্বাগ্রে রচনা করিয়াছিলেন।—যেহেতু চৌপদীটি ইহার অপেক্ষা অল্পাংশেই উত্তম হইয়াছে। সময়াভাব বশতঃ প্রথমবারের কথা অতি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ফলে তিনি দুই জন নায়কের আদেশক্রমে দুইখানি পুঁতি দুইবার প্রস্তুত করত পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।—বিশেষতঃ চৌপদীচ্ছন্দের গ্রন্থখানির সর্ব্বশেষে ভণিতা স্থলে যেরূপ বর্ষের নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাতে সেই খানিকেই অনুজ বলিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।—যথা "সনে রুদ্র চৌগুণা" এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে ১১৩৪ সালে এই কবিতা রচিত হয়।—সুতরাং তৎকালে ভারতের বয়স ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই, কারণ শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্রূপ তরঙ্গ বয়সে যে প্রকার চমৎকার কবিতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত, পারস্য হিন্দি এবং বঙ্গভাষার যদ্রূপ সংস্কার দর্শাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্টই প্রশংসা করিতে হইবে।—জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতীত কোন ক্রমেই এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষায় বিশেষরূপ কৃতবিদ্য হইয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটী আসিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার অগ্রজগণ দেখিলেন, তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার ন্যায় সদ্বিদ্বান্ ও কীর্ত্তিকুশল হইতে পারেন নাই, অনুজের এতদ্রূপ বিদ্যা ও বিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "ভাই হে! সংপ্রতি পিতা-ঠাকুর বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভূমি ইজারা লইয়াছেন, জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বতোভাবে যোগ্য এবং কৃতী হইয়াছ, অতএব এই সময়ে তুমি আমারদিগের এই বিষয়ের "মোক্তার" স্বরূপ হইয়া বর্দ্ধমানে গমন কর, রাজাকে রাজস্ব দিতে যেন বিলম্ব না হয়, এবং রাজদ্বারে যেন কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তুমি উপস্থিত মতে যখন যেরূপ পত্র লিখিবে, আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিব।—ভাই! তাহা হইলেই আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের আর কোনরূপ ক্লেশ থাকিবে না" সেই আজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে গমন করত কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্য পরিচালন করেন, এমত সময়ে তাঁহার সহোদরেরা যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট কালে কর প্রেরণে অক্ষম হইলেন, ইহাতে রাজদরবারে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটী খাসভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং ভারত তদ্বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত করাতে দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তরে পড়িয়া কারারুদ্ধ* হইলেন। কিন্তু কারাগারের কঠোর ক্লেশ তাঁহাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই। কারারক্ষকের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রণয় ছিল, অতিশয় কাতর হইয়া বিনয় বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন "ও মহাশয়! অমুক অমুক স্থানে খাজানা বাকী আছে, আপনারা লোক পাঠাইয়া আদায় করিয়া লহ, আমাকে এ রূপে বদ্ধ রাখিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে কি ফলোদয় হইবে?" এতদ্রূপ বিনয় বচনে প্রসন্ন হইয়া কারাধ্যক্ষ কহিলেন "আমি এই দণ্ডেই তোমাকে গোপনে গোপনে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু তুমি কোন্ ভাবে কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়া নিস্তার পাইবে, সে বিষয়ের কিছু উপায় স্থির করিয়াছ? এই রাজার অধিকার অনেক

*বোধ হয় তৎকালের বর্দ্ধমানাধিপতি পণ্ডিত ও কবিদিগের বিশেষ গৌরব ও সমাদর করিতেন না, অথবা ভারতের যথার্থ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহা না হইলে এমত মহাত্মা ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করত এতদ্রূপ ক্লেশ প্রদান কেন করিবেন।

দূর পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে তুমি যেখানে থাকিবে সেইখানেই বিপদ ঘটিতে পারে : রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারিরা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে বিস্তর দুরবস্থা করিবেন” ভারত উত্তর করিলেন “আমাকে এই যাতনাযুক্ত কারাভুক্ত দায় হইতে মুক্ত করিলে আমি আর ক্ষণকালের জন্য এ অধিকারের ত্রিসীমানায় বাস করিব না। জলেশ্বর পার হইয়া “মারহাট্টার” অধিকারে গিয়া নিশ্বাস ফেলিব।” কারাপালক অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া রাত্রি কালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ভারতচন্দ্র “রঘুনাথ” নামক একটি নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া “শিবভট্ট” নামক দয়াশীল সুবাদারের আশ্রয় লইলেন, এবং আপনার সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করিলেন।—সুবেদার তাঁহার প্রতি প্রীতচিত্তে অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারি, মঠধারি, ও পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন, যে “ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য যে পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রে অধিবাস করিবেন সেপর্য্যন্ত, যেন কেহ ইহার নিকট কোনরূপ কর গ্রহণ না করে, ইনি বিনাকরে তীর্থবাসী হইবেন, যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে মান পূর্ব্বক স্থান পাইবেন, এবং ইঁহারদিগের আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক একটি “বলরামী আট্‌কে” প্রদান করিবে, আর বিশেষরূপে সম্মান করিবে।”

ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রাসাদে প্রসাদ ভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাস পূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া উদাসীনের ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যটিও সেই প্রকার আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গি ধারণ করিয়া চেলা সাজিল, প্রভুটি “মুনি গোঁসাই” হইলেন, দাসটি “বাসুদেব” হইল।

এক দিবস বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনধাম দর্শনের প্রার্থনা করিয়া ভারতের নিকট তদ্বিশেষ প্রকাশ করাতে ভারত তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছাকুল হইলেন। পরে সকলে একত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করত পদব্রজে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি খানাকুল, কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথাকার শ্রীশ্রী৺গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে দর্শনার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, কীর্ত্তনকারি গায়কেরা “মনোহরসায়ি” কীর্ত্তন করণের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেই দেবমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের সহিত একত্রে প্রসাদ পাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণ লীলারসামৃত পান পূর্ব্বক তৎকালে গুণাকর কবিবর অতিশয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া প্রেমাশ্রু পাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ ভৃত্য তাহা জ্ঞাত ছিল, এখানে ইনি মোহিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন, ও দিগে রঘুনাথ গোপনে গোপনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যের ভবনে গিয়া তাঁহার শালী এবং ভায়রাভাইকে বিস্তারিতরূপে সমুদয় বিবরণ অবগত করিল। তচ্ছ্রবণে ভট্টাচার্য্যেরা অনেকেই একত্রে দেবালয়ে আগত হইয়া গান সমাপ্তির পর বিস্তর প্রবোধ দিয়া ভারতচন্দ্রকে আপনারদিগের বাটীতে আনয়ন করত তৎক্ষণাৎ নাপিত ডাকাইয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া দিলেন এবং গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া উত্তমরূপ ধৌত বস্ত্র পরাইলেন, আর নানা প্রকার অনুরোধ ও উপরোধ দ্বারা তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করত পুনর্ব্বার সংসারধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। রায় সেই প্রস্তাবে উত্তর করিলেন “আমি

আপনারদিগের বিশেষ অনুরোধক্রমে তীর্থ ভ্রমণ, যোগ সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত কোনক্রমেই গৃহে গমন করিব না।

কয়েক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া তাজপুরের পার্শ্বস্থ সারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন, আচার্য্য বহুকালের পর "হারানিধি" জামাতাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, মহা সমাদর পূর্ব্বক স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিলেন। অন্তঃপুরে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল, প্রতিবাসি ও প্রতিবাসিনী সকলে আহ্লাদচিত্তে দেখিতে আইলেন।—ভারতচন্দ্র বিবাহ বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহধর্ম্মিনীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরস্পর উভয়ের মনে যে প্রকার সন্তোষ, প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম না। কয়েক দিবস শ্বশুর সদনে অশেষবিধ আমোদ প্রমোদ করত আপনার স্ত্রীকে কহিলেন "যদি আমার বাবা কিম্বা দাদারা তোমাকে নিতে আসেন, তবে তুমি কোনমতেই সেখানে যেওনা।" এবং শ্বশুরকে কহিলেন "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমারদিগের বাটীতে কখনই পাঠাইয়া দিবেন না, যদবধি আমি অর্থ আনিয়া স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র-স্থানে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিতে না পারি, তদবধি এইখানেই রাখিবেন" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ও মান্যবর শ্রোত্রিয় পালধি বংশ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (যাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট অদ্যাবধি ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে শোভা করিতেছে,) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অতিশয় কাতরতা সহকারে নিবেদন করিলেন "মহাশয়! আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, শরণাগত হইলাম, যে প্রকারে হউক, সদয় হইয়া আশ্রয় দিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবেক" দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ও পুরাতন ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল জানিতে পারিয়া এবং স্তবে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আশ্বাস বাক্যে সাহস প্রদান পুরঃসর কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও প্রধান বংশের মনুষ্য, তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল, তুমি এখানে থাকিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বিহিত চেষ্টায় রহলাম, সুযোগ-যুক্ত সময় পাইলে ও কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তোমার মঙ্গল সাধনে কখনই সাধ্যের ত্রুটি করিব না" এতদ্রূপ করুণাকর অনুকূল বচনে ভারতচন্দ্রের "মানস মুকুল" আনন্দ মকরন্দভরে প্রফুল্ল হইল। তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতি সম্বন্ধীয় কোনরূপ অপবাদ থাকাতে তিনি তাঁহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসি ৺রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন, প্রতি দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে চৌধুরীবাবুর নিকট আসিয়া "উমেদারি" অর্থাৎ উপাসনা করেন। এই উপাসনা এবং সদ্‌গুণ জন্য উক্ত আশ্রিত জনের প্রতি আশ্রয়দাতার ক্রমশই স্নেহের আধিক্য হইতে লাগিল। কোন এক সময় বিশেষে কথোপকথন করিতে করিতে চৌধুরী কহিলেন "ভারত! আমি তোমাকে ফরাসির ঘরে এখনি একটা কর্ম্ম করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখোদয় হইবে না, কারণ গুণের গৌরব গোপন থাকিবে। আমি তোমার নিমিত্ত একটা প্রধান উপায় স্থির করিয়াছি, নবদ্বীপের অধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তিনি দুই চারি লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার

নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিয়া থাকেন, তিনি এবারে যখন আসিবেন, তখন আমি তোমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিব, তুমি যেমন গুণি ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ গুণগ্রাহক, সেই স্থান তোমার পক্ষে যথার্থরূপ উপযুক্ত স্থান বটে, এই বচনে ভারতচন্দ্র বারিদ-বদন-বিনির্গত-বারিবিন্দু পতন-প্রত্যাশী চাতকের ন্যায় মহারাজের আগমনের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এক দিবস প্রাতে তিনি চৌধুরীর সভায় বসিয়া আছেন, এমত কালে দৈবাৎ প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তথায় শুভাগমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান সহযোগে রাজাকে আসনারূঢ় করত অশেষ প্রকার সদালাপ সমাপনানন্তর কহিলেন "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে, এই ভারতচন্দ্র আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, ইনি অমুক অমুকের সন্তান, সংস্কৃত জানেন, পারস্য জানেন, কবিতাশক্তি ভাল আছে, অধুনা দীনাবস্থায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, যাহাতে প্রতিপালিত হয়েন এমত অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আজ্ঞা হউক"—মহারাজ তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এইক্ষণে কলিকাতায় চলিলাম, কালী দর্শন করিয়া কালীঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে ইনি যেন তথায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে গমন করিলে পর ভারতচন্দ্র তথায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া ৪০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করত বাসা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "তুমি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পর আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবা"—তিনি তদনুসারে তন্নগরে থাকিয়া প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান, নবদ্বীপাধিপতি প্রফুল্লিত হইয়া কবি-শ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করত আজ্ঞা করিলেন "ভারত! তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না" ভারত বলিলেন "মহারাজ! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন.) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় "চণ্ডী" রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক প্রস্তুত কর" সেই আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া তৎসমুদয় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদার নামক একজন গায়ক সেই সকল "পালা" ভুক্ত গীতের স্বর রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। রচনা সমাধার পূর্ব্বে রাজা তদ্দৃষ্টে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করত ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে" পরে তিনি অতি কৌশলে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে আহ্লাদ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।—এই চারু গ্রন্থের পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা এ তিন একি পুস্তক কেবল রসমঞ্জরী খানি স্বতন্ত্র।

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব গুণে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র নৃপেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের অতিশয় প্রিয় সভাসদ রূপে গণ্য হইলেন। এই ভাবে কিছুদিন গত হইতে হইতে রাজা এক দিবস

জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে রহিয়াছ, তোমার পরিবার কোথায়? তুমি বাটীর তত্ত্বাবধারণ কর কি না?" ভারত কহিলেন "আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন, ভ্রাতাদিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এজন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই, গঙ্গা তীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে পারি।" রাজা কহিলেন "নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আমার অধিকার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়?" কবি কহিলেন "ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় আমি কল্পতরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার বাটীর নিকটে হইলেই ভাল হয়, যেহেতু তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন, "তবে তুমি "মূলাযোড়ে" গিয়া বসতি কর।" ভারত কহিলেন "যে আজ্ঞা মহারাজ, ঐ স্থানটিই আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে।" পরে উল্লেখিত পণ্ডিত ও কবিপ্রতিপালক বিদ্যানুরাগি নরবর নৃপবর ভারতকে বাটীর নিমিত্ত ১০০ এক শত টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মূলাযোড়খানি ইজারা দিলেন।

ভারত সেই টাকা এবং ইজারার সনন্দ লইয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ভার্য্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করত প্রথমে তথাকার ঘোষাল মহাশয়দিগের ভবনে একটি ঘর লইয়া কিছুদিন তাহারি মধ্যে বাস করিলেন, পরে নূতন নিকেতন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথারীতিক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন "ভারত মূলাযোড়ে গঙ্গাতীরে বাড়ী করিয়াছে, আমার প্রাচীন শরীর, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা কর্ত্তব্য হয় না" এই বলিয়া তিনি মূলাযোড়ে আগমন করিলেন, এবং এখানে অল্পকাল বাস করিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে রায় গুণাকর পুনর্ব্বার কৃষ্ণনগরে গিয়া কিয়ৎকাল বাস করত নিম্ন প্রকাশিত বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা এবং আর আর কবিতা রচনা করেন। এই সকল পদ্য অদ্য পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত

বসন্তবর্ণনা।

চৌপদী

ভাল ছিল শীতকাল, সেতো কামানল জাল,
হৃদয় সহিত শাল, এবে হোলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ,
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপেখেকো, ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো, সঙ্গে লোয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি, শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি আ, আরে বসন্ত॥

বর্ষাবর্ণনা।

চৌপদী

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।

শরদে অম্বিকা পূজা, রাজঘরে দশভুজা,
দেখিনু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর, শীর্ণ করে কলেবর,
পুণ্যাবাদে যাব ঘর, সেই ছিল ভর্সা ।
বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুন তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আ, আরে বর্ষা ॥১॥

ভুবনে করিল তূর্ণ, নদ নদী পরিপূর্ণ,
বিরহিনী বেশ চূর্ণ, ভাবিয়া অভর্সা ।
বিদ্যুতের চক্‌মকি, ডাহুকের মক্‌মকি,
কামানল ধক্‌ধকি, বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ুর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিষ্কর্ষা ।
ভারতের দুঃখমূল, কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল, আ, আরে বর্ষা ॥২॥

পরন্তু কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয় ঘটিত ব্যঙ্গছলে রাজসভাসদ কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ কারয়া উক্তিভেদের যে দুইটি কবিতা প্রকাশ করেন তাহা পত্রস্থ করিলাম সকলে দর্শন করুন । যথা ।

কৃষ্ণের উক্তি ।

চৌপদী

বয়স আমার অল্প, নাহি জানি রস কল্প,
তুমি দেখাইয়া তল্প, জাগাইলা যামী ।
ননী ছানা খাওয়াইয়া, রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানু সুতা, অশেষ চাতুরী যুতা,
তোমার ননদীপূতা, সব জানি আমি ।
আগে হানি নেত্র বাণ, কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এখন্ কর অভিমান, আ, আরে মামী ॥

রাধিকার উক্তি উত্তর ।

চৌপদী

চড়াটি বাঁধিয়া চুলে, মালা পর বনফুলে,
দান মাগো তরুমূলে, আমি তেমন্ মাগিনে ।
মোরে দেখিবার লেগে, অনুরাগ রাগে রেগে,
রাত্রি দিন থাক জেগে, আমি তেমন্ জাগিনে ।

বুক বাড়ায়েছে নন্দ, যার তার সনে দ্বন্দ্ব,
কোন্ দিন হবে মন্দ, আমি তোমায় লাগিনে।
গুণ্ডার বিষম কায, সে ভয়ে পড়ুক্ বাজ,
মামী বোলে নাহি লাজ, আ, আরে ভাগিনে॥

হাওয়া বর্ণন।

চৌপদী

চন্দনের দণ্ড ধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে,
মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে,
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয় ধাওয়া॥
বিয়োগিরে কাঁদাইয়ে, সংযোগিরে ফাঁদাইয়ে,
যোগি যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কাম গুণ গাওয়া।
নর্ম্মিরে প্রকাশিয়ে, গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে,
শীতল করিলি হিয়ে, বহিবারে হাওয়া॥ ১॥

কখনো দারুণ ঝড়, শাখি উড়ে পাখি জড়,
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়, নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে, মেঘ স্থির হোতে নারে,
হুলুস্থুল পারাবারে, প্রলয়ের দাওয়া॥
কভু থাক কোন্ গাড়ে, তাপে প্রাণি প্রাণ ছাড়ে,
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে, আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ, সুগন্ধ আনন্দ কন্দ,
শীতল পরমানন্দ, বহিবারে হাওয়া॥ ২॥

ধূম বড়া ধূম কিয়া, খানে শোনে নাহি দিয়া,
চঁহুয়ার ঘের লিয়া, ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্ কিয়া, কাণাৎ সে ঘের লিয়া,
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া, আগ্ কিসি তাওয়া॥
দেখ্নে মে হুয়া চূর, ছোড়্ লিয়া মেরি পুর,
তোঁহারি বালাই দূর, আও মেরে বাওয়া।
তুজ্ লিয়া নরম্ সটি, উজ্ লিয়া গরম্ সটি,
চিরণ্ জিউ ধরম্ সটি, বহিবারে হাওয়া॥ ৩॥

বাসনা বর্ণনা।

চৌপদী

বাসনা করয়ে মন,	পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ,	তুষি যত আশনা।
আশ্ নাই, আরো চাই,	ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই,	যমে করি ফাঁসনা॥
ফাঁসনা কেবল রৈল,	বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হোতে লাভ হৈল,	লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাস্নাই কারে বলে,	ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হোলে,	আ, আরে বাসনা॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা খেড়ে পুষিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র তাহা দৃষ্টি করিয়া রাজার সাক্ষাতেই খেড়ে ও ভেড়ের সমানরূপ বর্ণনা করেন।

চৌপদী

খেড়েকুলে জন্ম পেয়ে,	বিলে খালে খেয়ে খেয়ে,
বেড়াইতে ঘুষ্ খেয়ে,	লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্,	বেড়াইতে পাছ্ পাছ্,
এখন্ বাছের বাছ্,	দিতে লও কেড়ে॥
কেড়ে লোভে কেহ যায়,	কৌতুক না বুঝ তায়,
ক্রোধে ফোলো বাঘ প্রায়,	ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল,	রাজপুরে পেয়ে স্থল,
তোলা-জলে কুতূহল,	সাবাস্ রে খেড়ে॥
খেড়ে বড় দাগাবাজ,	জলে পেয়ে স্ত্রী সমাজ,
ব্যস্ত কোরে দেয় লাজ,	কূলে ডুব্ পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী,	খোরে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি,	প্রবেশয়ে গেড়ে॥
গেড়ে হোতে পুন আসি,	ভুস কোরে উঠে ভাসি,
সবে দেখে বলে হাসি,	বড় দুষ্ট খেড়ে।
খেড়ে ভেড়ে এক সম,	ঝক্* মারিবার যম,
কেহ কারে নহে কম,	ফেরে যেন দেঁড়ে॥
দেঁড়ে মারে দাঁড় খোটা,	মাগুর খাইয়া মোটা,
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা,	পোঁচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে,	কান্তার উপরে চরে,
সেগুণ শালের ডরে,	ফেরে অঙ্গে ঝেড়ে॥
ঝেড়ে শরীরের ধূলা,	দিয়ে বুলে গোঁপ ফুলা,
ভাল বিধি কল্লে তুলা,	খেড়ে আর ভেড়ে।

*ঝক—মৎস্য

ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে, ধেড়ের বিক্রম বুকে,
ভেড়ে ধেরে ফেরে সুখে, স্থল জল নেড়ে ॥

করদ্রাক্‌থ বর্ণন।

করদ্রাক্‌থ।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা একর্ম্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চপদী

কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে কর্দ্দোরফথ্‌॥
নিদ্রা হতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি, চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভাবে ভাল্‌ কর্দ্দোরফ্‌থ ॥

এই কবিতায় যে আশ্চর্য্য কৌশল ও বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রসজ্ঞ জনেরাই জানিতে পারিবেন।

হিন্দি ভাষার কবিতা।

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী।
হয়ে লগ্‌ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্‌ চল, নন্দলাল, বোলায়ি ॥
দেখ্‌ নাহি আঁখ্‌, শুন্‌ নাহি কাণ্‌।
কা কুছ্‌ আয়ি হো, আওল খায়ি ॥
কাঁহাকে কানায়া লাল্‌ কাঁহা সো পছান্‌ জান্‌
কাঁহা সো তু, আয়ি হ্যায়, খাক্‌পর তেরে ব্রজ্‌কি বস্‌নে ॥
পানি মে আগ্‌ লাগাওনে আয়ি।
কুছ্‌ বাৎ এভোৎ কো, কুছ্‌ বাৎ ও তোৎ কো, বাতোন্‌ শুন্‌
বাৎ, হামারি সাৎ, লাগায়ি হ্যায় ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমবার প্রশ্ন দিলেন। "পায় পায় পায় না।" ভারতচন্দ্রপূরণ করিলেন।

বলিরাজার উক্তি

চৌপদী

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায়না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে একি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না ॥
গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ,
বাকী আছে একপদ, ঋণ শোধ যায় না।

হ্যাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দাদেবি দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না ॥১॥

রাজা দ্বিতীয় প্রশ্ন দিলেন। "পায় পায় পায়।" ভারত পূরণ করিলেন।

বৃন্দাবলীর উক্তি।

চৌপদী

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালি, হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয় ॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইল বামনের, পায় পায় পায় ॥ ২ ॥

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! যথার্থরূপ গুণের দ্বারাই ভারত ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত কবিতা

এক প্রকার চৌপদীচ্ছন্দঃ

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দকে গোয়দ্ রুবর,
কাতর দেখে আদর কর, কাহে মর, রো রোয়্‌কে।
বক্ত্রং বেদং চন্দ্রমা, ছুঁ, লালা, চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেট্টিমে কাহে শোয়্‌ কে ॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দর্ জানে মন্ আয়ৎ খোসি,
আমার হৃদয়ে বসি, প্রেম্ কর গোস্ হোয় কে ॥
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি, ইয়াদৎ মমুদা খাঁ কোসি,
আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত ফকিরি গোয়্‌কে ॥

এই সময়ে ভারত কখনো কৃষ্ণনগরে থাকেন, কখনো বাটী আসেন এবং কখনো কখনো ফরাসডাঙ্গায় গিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তির সহিত সাক্ষাৎ করত তথায় দুই চারি দিবস বাস করেন। এমত কালে রাঢ় দেশে "বর্গির" হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হওয়াতে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের গর্ভধারিণী পুত্র লইয়া বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ "কাউগাছী" নামক স্থানে আসিয়া দোহারা গড়বন্দী বাটী নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বাস করিলেন।—সেই বাটী এতক্ষণে ভঙ্গ হইয়াছে, কেবল কতকগুলীন ইষ্টক ও দুই একটা স্তম্ভ মাত্র চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। গড় অদ্যাপি আছে, তাহার ভিতর অনেক বন্য

*কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাদপূরণ দু'টি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নামেও প্রচলিত আছে। দ্রষ্টব্য শ্যামাধব রায় প্রণীত রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনচরিত (১৩০৫)

পশু বাস করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল সেই গড় হইতে একটা বন্য শূকর এবং ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া অত্যাচার করাতে গ্রামস্থ লোকেরা অস্ত্রাঘাতে তাহারদিগ্যে বিনষ্ট করিল।

ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈন্য আসিয়া কয়েক দিবস রাজপুর ও দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল।

মহারাজ্ঞী দেখিলেন, ভারতচন্দ্র রায় মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্মণ, আমার হস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি গ্রামের ভিতর গিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবেক, অতএব মূলাযোড় গ্রামখানি আমার পত্তনি লওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে, এরূপ ধার্য্য করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপনাথ তৎপ্রদানে স্বীকৃত হইলে রাণী আপন কর্ম্মচারি রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপার অবগত হইয়া কৃষ্ণনগর-রাজের নিকট অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলেন, রাজা কহিলেন "বর্দ্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করিলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর, এবং পত্তনির নিমিত্ত যখন রাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রেই উচিত হইতেছে" ভারত বলিলেন "এরূপ হইলে আমার এ গ্রামে বাস কর্ত্তব্য হয় না" রাজা তাঁহাকে কহিলেন "যদি মূলোযোড়ে থাকিতে নিতান্তই ইচ্ছা না হয়, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি "গুস্তে" নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর।" এই বলিয়া তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত আনরপুরের গুস্তে বাসি মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫/বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি এককালে স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্ররূপে প্রদান করিলেন।

রায় গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুস্তে গ্রামে গমন করণের উদ্যোগ করিলে গ্রামস্থ লোক বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন "মহাশয়, কোনমতেই আমারদিগ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মূলাযোড় অন্ধকার হইবে।" এই অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি আনরপুরে গমন করিলেন না, মূলাযোড়েই বাস করিয়া রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনিদার হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি ও আর আর লোকের উপর দৌরাত্ম্য করাতে রায় কবিবর ক্রোধাধীন হইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে সংস্কৃত কবিতায় "নাগাষ্টক" রচনা করত পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন, মহারাজ সেই পত্র পাঠ এবং নাগাষ্টক পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভারতের রচনা কৌশলের প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বক অনেক গুণ ব্যাখ্যা করিলেন, আর অনুরোধ দ্বারা নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন। ঐ পত্রখানি ও নাগাষ্টক আমরা নিম্নভাগে অবিকল প্রকাশ করিলাল, সকলে সকলে ইহার ভাব, রস ও মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সুখি হউন।

অথ পত্রং।

অবশ্যপ্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনং ॥১॥

মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ, স্ফুরদ্বীর্য্য সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়া স্তাৎচিরস্থা, যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ ॥২॥
যদবধি তব মুখচন্দ্র বিলোকন বিরহিত নয়নচকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশন প্রসরণ বাসরঘোরৌ ॥৩॥
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুক্তরুহাঃ কোকিলাঃ
কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে ॥৪॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মুখপিতকরা নিষ্ফল্গুরাঃ ফাল্গুনো
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে ॥৫॥

অথ নাগাষ্টকং।

গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে, ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাযোড়ে ভবদচুবলাৎ কালহরণং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥১॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া, কৃতা সেবা দেবাদধিক মিতিয়মত্রাপহ রহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজন পরিপাটী পুটকিতা, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥২॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্র শিশুরিহ নারী বিরহিণী, হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিত মনসা বান্ধবগণাঃ।
যশশোস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং, সমস্তং মে নাগো প্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৩॥
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা, শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তৎ সেবার্থং নিয়ম বিনিযুক্তা অতিথয়ঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৪॥
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে, দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসার শ্রুতিধর, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৫॥
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং, পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগ দমনং, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৬॥
হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা ক্ষান্তিরতুলা, যদুক্তপ্তোঽহত্রাহং তব সদসি গঙ্গাম্বুনিকটে।
ত্বদীয়ো গণ্ডুষীকৃতমনুজমণ্ডুক নিকরঃ সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৭॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ, কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষবদনো বক্রগমনঃ।
তদাস্যে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ, সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥৮॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিসদঃ সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

আহা! আহা!—কি সুমধুর!—কি আশ্চর্য্য!—কি চমৎকার কৌশলে, কি সুললিত সুধাময় শব্দে এই পত্র এবং নাগাষ্টক বিরচিত হইয়াছে! ঐ কবিতার প্রসাদ গুণ, ছন্দের পারিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য এবং ভাব ও রসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে আমরা সংপূর্ণরূপেই

অক্ষম হইলাম। জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া যাঁহারদিগ্যে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার স্বরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া পরিতোষিত হইবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এই বঙ্গদেশে বাঙ্গালি শ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষার কবিতা রচকের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উচ্চ ব্যক্তি প্রায় কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অপিচ তিনি যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাও অতি উত্তম, বিশেষ ব্যাখ্যার যোগ্য বটে, তদ্ভিন্ন তেঁহ পারস্য ভাষায় কবিতা প্রস্তুত করিতে পারিতেন, "ব্রজবুলী" হিন্দি ও যাবনিক শব্দে ভিন্ন ভিন্নরূপে এবং সংস্কৃত, ব্রজবুলী, হিন্দি ও যাবনিক ইত্যাদি মিশ্রিত শব্দে যে সমস্ত কবিতা রচিয়াছেন, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।—একাধারে এত অধিক গুণ প্রায় দৃষ্ট হয় না, অতএব তিনি সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্ব লোকের নিকট যশের ব্যাপারে অগ্রগণ্য হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

এই মহোদয় যদ্যপিও অদ্যাপি এই পৃথ্বী সমাজে কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কবিতার প্রতি যখন কটাক্ষ করিতেছি, তখনি তাঁহাকে দেখিতেছি। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহের পালা, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, নাগাষ্টক, চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ, এবং আর আর কবিতা সকল তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়াছে। তথাপি এই মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় যদিস্যাৎ আমরা মানবরূপে মহীমহলে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে কি এক অদ্বিতীয় উল্লাসের বিষয় হইত? কাব্য-তরুর আশ্রিত হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতাম—শাখায় দুলিতাম—ফুলের সৌরভে আমোদিত হইতাম—এবং ফলের আস্বাদনে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইতাম—আপনি ধন্য হইতাম—ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতাম—এবং জন্ম সফল করিতাম।

আহা! কি সুখের সময় সকল গত হইয়াছে!—অধুনা সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাই, সেই অসুদয় উৎসাহদাতা ভাগ্যধর পুরুষ নাই, সেই ভারতচন্দ্র নাই, সেই রামপ্রসাদ সেন নাই, আর সেই কিছুই নাই! এই কাল মিথ্যা কাল। এইক্ষণে যাঁহারা কবি আছেন, কেহই তাঁহারদের সাহস দেন না, আদর করেন না, সুতরাং হৃদয়পদ্ম প্রফুল্লকর, রবি বিরহে আধুনিক কবি সকল মনের দুঃখে কেবল মলিন হইতেছেন।

কাব্যকর্ত্তা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র এইরূপ আমোদ আহ্লাদ, হাস্য কৌতুকে কয়েক বৎসর কাল হরণ করত ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগাধামে যাত্রা করিলেন। প্রদীপ্ত প্রদীপ এতকালেই নির্ব্বাণ হইল।—সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ কহেন, তাঁহার প্রথম রোগের সূত্র বহুমূত্র, কিন্তু তৎপরে ভস্মক রোগ জন্মিয়াছিল।

ইনি ১৬৩৪ শকে, বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। বর্ত্তমান ১২৬২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মের বৎসর গণনা করিলে ১৪৩ বৎসর, এবং মৃত্যুর বৎসর গণনা করিলে ৯৫ বৎসর হইবেক। আহা! কি পরিতাপ! এমত গুণশালী মহাত্মা মহোদয় ৪৮ বৎসরের অধিক কাল এই বিশ্ববাসে বিরাজ করিতে পারেন নাই। এই ৪৮ বৎসরের মধ্যে বিংশতি বৎসর বাল্যলীলা এবং বিদ্যাভ্যাসে গত হয়, তাহার পর দুই তিন বৎসর বর্দ্ধমানে বিষয়কর্ম্ম ও কারাভোগ করিয়া অনুমান ১৫।১৬ বৎসর উদাসীনের বেশে লীলাচলে দেব দর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় গত

হইল,—তৎপরে এক বৎসর কাল শালীপতি ভ্রাতার বাটীতে ও শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির নিকটে ক্ষয় করত ৪০ বৎসর বয়সের-সময়ে নবদ্বীপেশ্বরের অধীন হইলেন, এবং সেই বর্ষেই "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিলেন। উক্ত সংযুক্ত গ্রন্থের বয়স ১০৩ বৎসর হইল, কারণ তিনি ১৬৭৪ শকে, বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে রচনা করেন, অন্নদামঙ্গলে তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা।

"বেদ লয়ে ঋষি রসে, ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত, ভারত রচিলা।"

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই "রসমঞ্জরী" রচনা করেন, তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, ইনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে কি সুখের ব্যাপার হইত। তাঁহার মানস-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত যে সকল ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, তিনি সাধারণকে তাহার লহরী-লীলা দেখাইতে পারেন নাই, বহু দুঃখ বহু কষ্ট ভোগ করিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহতাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মনোনীত স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রাজ কৃপায় তিনি মাসিক বৃত্তি ও ভূমি সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে গ্রন্থ দ্বারা আপনার বিচিত্র ক্ষমতা এবং অদ্ভুত ভাব ঘটিত কবিতা-শক্তি প্রকটন করিবেন, এমত সময়েই বিষমতর বিড়ম্বনা হইল। আহা! দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে ভাষিতে হয়। জগদীশ্বর কবিদিগ্যে অরোগি ও দীর্ঘজীবি করেন না! আয়ুর কথা উল্লেখ করাই বৃথা, যাঁহারা কবি, তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন সুস্থ থাকিতে পারিলেও সুখের পরিসীমা থাকে না। এ জগতে সুস্থতার অপেক্ষা মহামঙ্গলময় ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুখ বল, সন্তোষ বল, আনন্দ বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, শক্তি বল, উৎসাহ বল, অনুরাগ বল, চেষ্টা বল, যত্ন বল, ভজনা বল, সাধনা বল, যে কিছু বল, এই সুস্থতাই সেই সকল বিষয়ের মূল-ভাণ্ডার হইয়াছে। দেহ রোগাক্রান্ত হইলে ইহার কিছুই হয় না, কিছুই হয় না, মনের মধ্যে কিছু ভাল লাগে না। কিছুতেই প্রবৃত্তি জন্মে না, কিছুতেই সুখের উদয় হয় না, বল, বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বিভব, সকলি মিথ্যা হয়, পরমেশ্বরের প্রতি যথার্থ রূপ ভক্তির স্থিরতা পর্য্যন্ত হইতে পারে না।—হে রোগ! কবি-কদম্বের কোমল কলেবর ভোগ করিয়া পবিত্র মনে বেদনা দিতে তোমার মনে কি কিঞ্চিৎমাত্র দয়ার উদ্রেক্ হয় না?—হে কৃতান্ত! তুমি নিষ্ঠুরাচরণে নিতান্তই কি ক্ষান্ত হইবে না? কবিকে অকালে দন্তশ্রেণীর অন্তর্গত করণের নিমিত্তই কি বিশ্বকান্ত অনন্তদেব তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

মরণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা ছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডীনাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক উপাসনা করত সেই কয়েক পাত পুঁতি সংগ্রহ পূর্ব্বক মহানন্দে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কবিতা কুসুমের মধুপ স্বরূপ পাঠকবৃন্দ মকরবৃন্দ পানে আনন্দ করিতে থাকুন। যথা।

চণ্ডীনাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ। নটীর প্রতি। সূত্রধারের উক্তি।

সংগায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ
পঞ্চভির্বক্তে্র্বাদ্যবিশালকৈ র্ডমরুকোথানৈশ্চ

সংনৃত্যতি। যা তস্মিন্ দশবাহুভ র্দশভুজা তালং
বিধাতুং গতা সা দুর্গা দশদিক্ষু বা কলয়তু-
শ্রেয়াংসি না শ্রেয়সে ॥১॥

নটীর উক্তি।

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ চতুর সভাসদ সারি।
নৃতন নাটক, নৃতন কবি কৃত, হাঁস্ তোঁহি, নৃতন নারী ॥
ক্যায়্ সে বাতায়ব, ভাব ভবানী কো, ভাতি বৈঁ মুঝে ভারি।
দানম দলনে, ধরণীমণ্ডলে, তারিণী লে অবতারী ॥
গুরু সম ধীর, বীর সম শুনহ, সম সগুণ মুরারি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ, রাজ শিরোমণি, ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

সূত্রধারের উক্তি।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽভবদ্রাঘব।
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতা ক্ষিতীশো মহান্ ॥
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্য গোত্রাগ্রণী।
স্তৎপুত্রোয় মশেষ ধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোনৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ।
ভূরি শ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দর সমো যত্ততি আসীন্নৃপঃ ॥
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্র রায় কবয়ে কাব্যাম্বু রাশীন্দবে।
ভাষা শ্লোক কবিত্ব গীত মিলিতং যত্তেন সম্বর্ণিতং ॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপুর.বরোধঃ।
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাশা নিলচলদচলাত্যস্ত বিভ্রান্ত লোকঃ ॥
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছ ঘাতোচ্ছলদুদধি জলপ্লাবিত স্বর্গ মর্ত্ত্যে।
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোর নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ।১॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড়গড় গড়গড়্ চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈ—
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈ ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীর নাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধ দৈবেঃ।
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈ প্রবেশতি মহিষা সার্ব্বভৌমোবভূব ॥২॥

মহিষাসুরের উক্তি।

ভাগেগা দেবদেবী, পাখড় পাখড়, ইদ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋত্কো, রীত দেনা, যমঘর যমকো, আগকো আগলাগে ॥
বায়ুঁকো রোধ করকে, করত বরণেকা যব তু সোঁ আব মাগে।
ব্রহ্মা সোঁ, বাসুকি সোঁ, কভি নাহি ঝগড়ো, জোঁউ কুবেরা ন ভাগে ॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোন্‌রে গোয়ার্‌ লোগ্‌,	ছোড়্‌ দে উপাস্‌ রোগ্‌,
মান্‌ হুঁ আনন্দ ভোগ্‌,	ভৈঁষরাজ্‌ যোগ্‌মে।
আগ্‌মে লাগাও ঘীউ	কাহে কো:জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ,	ভোগ্‌ এহি লোগ্‌মে॥
আপ্‌কো লাগাও ভোগ,	কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড়্‌ দেও যোগ ভোগ,	মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান্‌, ক্যা বেগান্‌,	অর্থ নার আব জান্‌,
এহি ধ্যান, এহি জ্ঞান,	আর সর্ব্ব রোগ্‌মে॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধে। প্রথম হাস্য করিলেন'।

কমঠ করটট, ফণি ফণা ফলটট, দিগ্‌গজ উলটট, ঝপ্‌টট ভ্যায়্‌রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত, জলনিধি ঝম্পত, বাড়বময় রে॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত, রবি রথ টুটত, ঘন ঘন ছুটত, যেঁও পবলয় রে।
বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট, অট্ট অট অট অট্‌, আ, ক্যায়া হ্যায়্‌ রে॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রচুর পীড়ায় অশক্ত হইলেন, অচিরাৎ লিখিয়া শেষ করিবেন মানস করিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া জীবনযাত্রাই শেষ করিয়া বসিলেন, এই নাটকখানি সংপূর্ণ হইলে কি এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি হইত তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইহা সম্পন্ন করণে অসমর্থ হওয়াতে তিনি যদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, অধুনা আমরা তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি।

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান রায়, এইক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র পূজ্যবর শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিতেছেন, ইনি অতি বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদ্বিদ্বান এবং সুরসিক, অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, উত্থানশক্তি নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় ৮১ বৎসর গত হইয়াছে। এই মহাশয়ের অপার কৃপায় তাঁহার পিতামহ রায় গুণাকরের "জীবন-বৃত্তান্ত" এবং এই সকল অপ্রকাশিত কবিতার অধিকাংশই প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিলে এতৎ প্রাপণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অতএব এজন্য যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, উক্ত তারকনাথ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র, বাবু অমর নাথ রায়, তিনি কলিকাতা নগরে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করেন, ইঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা উভয়েই অতি শিশু, অধুনা কবিবর ভারতের একটি পৌত্র, একটি প্রপৌত্র এবং দুইটি বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাত্র আছেন, যদিও তাঁহারদিগের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্নবস্ত্রের বিশেষ ক্লেশ নাই।

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের যে যে স্থানে:ভারতচন্দ্র কবিতায় প্রকৃষ্টরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ সাধারণে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং যাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে কোন কোন পণ্ডিতের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, আমরা যথা যোগ্য পরিশ্রম পূর্ব্বক যথা সাধ্যক্রমে মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক টীকা ও প্রমাণ সহিত সেই সকল কবিতা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, বোধ করি এতদ্দৃষ্টে অনেকের অন্তঃকরণে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক,

"রসমঞ্জরী" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, সুতরাং তাহার টীকাকরণের প্রয়োজন করে না, ভূমিকা দেখিলেই বিশেষ জানিতে পারিবেন, ফলে এই অনুবাদে অতিশয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল। দক্ষযজ্ঞ।

দক্ষ কর্তৃক শিবনিন্দা।

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়েসে বাপেরো বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান, অজ্ঞান জ্ঞান সমান॥
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম, চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে, শ্মশানে স্বর্গেতে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়েরে নাহি যম॥
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন, জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাসি কেন নয়, নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা, সর্পের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মেগে খায়, না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে, কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী, ইকি মহা-পাপ হর॥

[ইহার টীকা]

দক্ষপ্রজাপতি শিবনিন্দা করিতেছেন, এস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের বর্ণনার পারিপাট্য এমন, যে, এই সকল নিন্দাগভ বাক্যকেও স্তুতিপক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা—"বয়সে বাপের বড়" নিন্দাপক্ষে—আমার পিতা যে ব্রহ্মা, তাহা হইতেও বৃদ্ধ, অর্থাৎ যাহা হইতে আর বৃদ্ধ নাই, অতিশয় বৃদ্ধতম। স্তুতিপক্ষে—ব্রহ্মা হইতেও বয়োধিক, অর্থাৎ তাঁহারো পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহাতে ছলে পরমেশ্বর বলা হইল।

"কোন গুণ নাই"—নি*—মূর্খঃ। স্তু†—নির্গুণ ব্রহ্ম।

"যথা তথা ঠাঁই" নি—সর্ব্বদ্বারি ভিক্ষুক॥ স্তু—সর্ব্বব্যাপক।

"সিদ্ধি" নি—ভাঙ। স্তু—যোগসিদ্ধি॥

"মান অপমান ইত্যাদি"—নি—নির্ব্বোধ। স্তু—নির্ব্বিকার ও ভেদ রহিত।

"নাহি জানে ধর্ম্ম" নি—অজ্ঞ। স্তু—যিনি পরব্রহ্ম, তাঁহার ধর্ম্ম জানিবার প্রয়োজন কি? জীবের ন্যায় তাঁহার তো যাজন করিতে হইবে না, এই হেতু ধর্ম্ম না জানার ন্যায় ব্যবহার করেন।

* নি—নিন্দা। † স্তু—স্তুতি।

"নাহি মানে কর্ম্ম" নি—নাস্তিক। স্তু—ব্রহ্মকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না, অতএব তাঁহারা স্ববিষয়ে তাহা মানিবার প্রয়োজন নাই, এই হেতু শাস্ত্রে কহে যে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা, কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নন।

"চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান ইত্যাদি" নি—হেয় উপাদেয় বোধ রহিত। স্তু—স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত, সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম।

"গরল খাইল ইত্যাদি" নি—দুরাচার ব্যক্তির কোন প্রকারেই মৃত্যু হয় না ও যমও নাই, এইরূপ আক্ষেপ বাক্য। স্তু—ফলতঃ মৃত্যুঞ্জয় বলা হইল, যম নাই, কি না যম তাঁহার সংহারক নহেন।

"সুখে দুঃখে ইত্যাদি" নি—জড়স্বভাব। স্তু—গুণাতীত, অতএব সুখ দুঃখ সমজ্ঞান।

"পরলোকে নাহি ভয়" নি—নিরঙ্কুশ, অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ কর্ত্তা। স্তু—নিত্য মুক্তস্বভাব, নিজ-ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, অতএব ইহার পরলোকে নরকপাতকাদি জন্য যে ভয় তাহা নাই, এই হেতু নিষিদ্ধাচরণেও দোষ নাই।

"কি জাতি কে জানে" নি—জাতির স্থির নাই। স্তু—যিনি সর্ব্বশরীরে জীব ও অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান, তিনি যে কোন্ জাতি তাহা নিশ্চয় করিয়া কে কহিতে পারে ?

"কারে নাহি মানে" নি—উৎশৃঙ্খল। স্তু—তাঁহা হইতে অন্য মান্যব্যক্তি কেহ নাই, অতএব তিনি কাহাকে মানিবেন ? অথবা কাহারে না মানে, অর্থাৎ সকলকেই মানেন, হীনব্যক্তি দেখিলেও তাহাকে হেয়বুদ্ধি করেন না।

"সদাকদাচারময়" নি—সর্ব্বদা কুৎসিত আচার যে শ্মশান বাস ও ভূত প্রমথগণে আবৃত, চিতাভস্ম লেপন, ইহাতে যুক্ত। স্তু—সদাকদাচার যে ভূত প্রমথগণ তাহাদের সহিত সমভাব প্রাপ্ত, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বস্তু সকলের হেয় শ্রীমহাদেব তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা না করিলে সে সকল ভূত পিশাচাদির সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে ? ইহাতে কেবল অতিশয় দয়ালুতা প্রকাশ পাইয়াছে।

"কহিতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি" নি—যথাশ্রুতার্থই প্রকাশ আছে। স্তু—বর্ণাতীত ও আশ্রমাতীত পরমেশ্বর বলা হইল।

"মহাপাপ হয়" নি—হর মহাপাপ। স্তু—মহাপাপ-হরণ-কর্ত্তা।

বিদ্যাসুন্দর।

সুন্দরের প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ, বুঝিনু আভাস। অনুকূল পতি যদি, হয় প্রতিকূল।
মালিনীর বাড়ী বুঝি, দিনে হয় রাস॥ ধৃষ্ট, শঠ দক্ষিণ, তাহার সমতুল॥

[ইহার টীকা]

পূর্ব্বে সুন্দর কর্ত্তৃক দিবা বিহারে অপমানিতা বিদ্যা তাহার প্রতিফল দিবার আশায়, সুড়ঙ্গপথ দিয়া গমন করিয়া নিদ্রিত সুন্দরের কপালে সিন্দুর চন্দন ও চক্ষুতে পানের পিক প্রদান করিয়া আপন গৃহে আসিয়া দর্পণে মুখ দর্শন করিতেছেন, এখানে সুন্দর স্ত্রী-স্পর্শে উন্মনা হইয়া বিদ্যার নিকটে আগমন করিবাতে বিদ্যা অগ্রে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন। "মালিনীর বাড়ী ইত্যাদি" এখানে ব্যঙ্গার্থ এই যে, হে প্রাণনাথ। তোমার এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ রাসলীলা হইতেও আশ্চর্য্য, কেননা দেখ শ্রীকৃষ্ণ লোকলজ্জা

ভয়ে গভীর রাত্রিকালে নিবিড় বন মধ্যে গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তুমি কোলাহলময় নিয়ত জনপূরিত মালিনী-মন্দিরে দিবসে বহু নায়িকার সহিত রাস করিয়া থাক, অতএব সাবাস সাবাস, তোমার লম্পটতা ভাবে আমি বলিহারি যাই।

"অনুকূল ইত্যাদি" প্রথমতঃ পতি সর্ব্বদা অনুকূল থাকিয়া পশ্চাৎ যদি প্রতিকূল হয়েন তবে তাহাকে ধৃষ্ট শঠ ও দক্ষিণ এই ত্রিবিধ নিকৃষ্ট নায়কের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

ধৃষ্ট।

যথা। কৃতাগা অপি নিঃশঙ্ক স্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্ট দোষেঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্ট নায়কঃ॥

অর্থাৎ অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জাহীন এবং দোষ দর্শন করাইলেও মিথ্যা কথন, অর্থাৎ যে বলে এ কার্য্য আমি করি নাই, তাহারি নাম ধৃষ্ট নায়ক। এস্থলে অন্য নারী সম্ভোগ জন্য অপরাধী হইয়াছ, তথাপি কিঞ্চিৎ শঙ্কা দেখিতে পাই না, এই কারণে তুমি ধৃষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হইলে ইতি ব্যঙ্গোক্তি।

শঠ।

যথা। একস্যামপি নায়িকায়াং বদ্ধভাবোঽপ্যন্যস্যাং গূঢ়ং বিপ্রিয় মাচরতি স শঠঃ।

অর্থাৎ এক নারীতে যাহার অতিশয় বদ্ধপ্রেম, আর অন্য নারীতে গোপনে প্রতিকূলাচরণ, তাহার নাম শঠ নায়ক। এস্থলে তোমার এপ্রকার শাঠ্য ব্যবহার দ্বারাই জানা গিয়াছে তুমি শঠ।

দক্ষিণ।

যথা। বহূনাং নায়িকানাস্তু নায়কো দক্ষিণো মতঃ।

অর্থাৎ বহু নায়িকার একজন যে নায়ক, তাহার নাম দক্ষিণ। এ নায়কের এক স্থানে প্রেমের স্থিরতা থাকে না, এই হেতু তুমিও প্রতিকূল নায়ক। মালিনীর বাটীতে রাসক্রীড়া করণ দ্বারাই তুমি যে দক্ষিণ নায়ক হইয়াছ তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু বহু নায়িকা ব্যতিরেকে কদাচ রাসক্রীড়া সম্পন্ন হয় না।

বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি।

আপন চিহ্নেতে কেন, হইলা খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা ॥১॥
ভেবে দেখ নিত্য নিত্য, বাসসজ্জা হও।
উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, একদিন নও ॥ ২ ॥
কখনো না হইল, করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা কেবা সমান তোমার ॥ ৩ ॥
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হোতে, বুঝি সাধ যায়।
নৈলে কেন বিনা দোষে খেদাও আমায় ॥৪॥

[ইহার টীকা]

"আপন চিহ্নেতে ইত্যাদি"

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্য সম্ভোগ চিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষা কষায়িতা॥

অন্য নারীর সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত হইয়া পতি নিকটে আগমন করিলে যে নারী তদ্দৃষ্টে ঈর্ষাবশতঃ ক্রোধযুক্ত হয় সেই নারীই খণ্ডিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ কহেন। এই লক্ষণে অন্য সম্ভোগ চিহ্নিত

এই শব্দ ব্যক্ত আছে, তথাপি তুমি পণ্ডিতা হইয়া এবং তাহার লক্ষণ জানিয়াও আপনার দন্তচিহ্ন দর্শন করিয়া কেন খণ্ডিতা হইতেছ ? তোমার এরূপ অনুচিত অবস্থা কেবল আমার দুরবস্থার কারণ শুদ্ধ দুর্ভাগ্য হেতু ঘটিয়াছে।

ইতি ধ্বনিঃ। কেবল আমার দুরবস্থার কারণ, তোমারো এরূপ হইবে, এ কথা কহিতেছেন।

"লাভে হৈতে ইত্যাদি"

বোধ হয় তোমাকে ইহার পর কলহান্তরিতা অবস্থার যে যাতনা তাহাও ভোগ করিতে হইবে। তথাহি।

চাটুকারমপি প্রাণনাথং দোষাদপাস্থ যা।
পশ্চাত্তাপ মবাপ্নোতি কলহান্তরিতাতু সা॥

ক্রোধ শান্তির কারণ যে পতি নানাবিধ প্রিয়, অথচ ছল বচন রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে আরোপিত দোষ দ্বারা দূরীকরণ করিয়া পশ্চাৎ তাপযুক্তা অর্থাৎ কেন তাহাকে তিরস্কার করিলাম, কেনই বা স্থানান্তর গমন করিতে বলিলাম, যে নারা এই প্রকার আপনার দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তাপযুক্তা হয়, সেই নারীর নাম কলহান্তরিতা॥ ১॥

অপর প্রত্যহ তুমি বাসসজ্জা হইয়া থাক, কিন্তু তাহার পর আমার অনাগমন কারণ উৎকন্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এই দুই কষ্টদায়িকা অবস্থা ভোগ তোমাকে করিতে হয় না, যেহেতু আমি তৎকালীন নিকটবর্ত্তী হই।

"বাসসজ্জা"

ভবেদ্বাসকসজ্জাসৌ সজ্জিতাঙ্গরতালয়া।
নিশ্চিত্যাগমনং ভর্ত্তু র্দ্বারেক্ষণপরায়ণা॥

স্বামির আগমন নিশ্চয় করিয়া যে নারী আপনার অঙ্গ ও রতিগৃহ সুসজ্জ করিয়া দ্বার অবলোকন করিয়া থাকে তাহার নাম বাসসজ্জা।

"উৎকন্ঠিতা"

সাস্যাদুৎকন্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচাভৃশং॥

শীঘ্র যাহার বাসস্থানে স্বামী আগমন না করেন, ফলতঃ যে সময়ে প্রত্যহ আগমন হয় তাহার অতিক্রম যদি হয়, পরে তাহার আগমন কেন হইল না, ইহার কারণ চিন্তা করত যে নারী অতিশয় শোকযুক্তা হয় তাহার নাম উৎকন্ঠিতা।

"বিপ্রলব্ধা"

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সা স্মৃতা॥

দূতী প্রেরণ করিলেও সময়ে যদি প্রিয় আগমন না করেন, তবে বিরহেতে যে নারী শোক করত দুঃখযুক্তা হয় তাহার নাম বিপ্রলব্ধা॥২॥

অপরঞ্চ, তোমাকে কখনো অভিসার করিতে হয় নাই।

"অভিসারিকা"

কান্তার্থিনীতু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা।

কান্তার্থিনী হইয়া যে নারী গৃহ হইতে সঙ্কেত স্থানে গমন করে তাহার নাম অভিসারিকা, ঐ অভিসারিকার যে কার্য্য, অর্থাৎ বেশভূষা করিয়া গৃহ হইতে স্বামির নিকট গমন করা, তাহা তোমাকে কোন দিন করিতে হয় নাই, যেহেতু আমিই প্রত্যহ আগমন করি, অতএব তোমার তুল্যা স্বাধীনভর্তৃকা নারী আর কে আছে?

"স্বাধীনভর্তৃকা"

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং নমুঞ্চতি।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা॥

যাহার প্রেমগুণেতে আকর্ষিত হইয়া স্বামী নিকট ত্যাগ করে না, এবং বিচিত্র শৃঙ্গার চেষ্টাতে আসক্তা যে নারী তাহার নাম স্বাধীনভর্তৃকা॥৩॥

কিন্তু ইহাতে আমার এক বোধ হইতেছে যে এক রস সর্ব্বদা ভাল লাগে না, এই হেতু নিরবধি মধুর রস পানানন্তর কাঞ্জিক রসাস্বাদনের ন্যায় প্রোষিতভর্তৃকা রসাস্বাদন করিতে বুঝি অভিলাষ হইয়া থাকিবে, নতুবা বিনা দোষে আমাকে দূর করিবার আর কোন প্রয়োজন দেখি না। ইতি ভাবঃ।

"প্রোষিতভর্তৃকা"

কুতশ্চিৎ কারণাদ্‌যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥

কোন কারণ বশতঃ যাহার স্বামী দূর দেশস্থ হয় তাহার অসঙ্গম জন্য দুঃখেতে কাতরা যে নারী তাহার নাম প্রোষিতভর্তৃকা।

রসমঞ্জরী গ্রন্থের ভূমিকা। "রসমঞ্জরী গ্রন্থারম্ভ।

।ত্রিপদী।

জয় জয় রাধা শ্যাম, নিত্য নব রসধাম,
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব সুলক্ষণধারী, সর্ব্ব রস বশকারী,
সব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে, রাগ রাগিণীর তানে,
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক'।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে, সদা রাস রসরঙ্গে,
ভারতের ভক্তি প্রদায়ক॥
রাঢ়ায় কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী,
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত,
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যার যশে হোয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ, ফুলের মুখটি দ্বিজ,
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী,
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ,
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি,
ছল ধরে পাছে খলজন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্টমত,
সারি দিবা এই নিবেদন॥"

আমরা এইস্থলে ভারতচন্দ্রের গুণ বর্ণনা আর কত করিব ? কোনমতেই লিখিয়া শেষ করিতে পারি না, যত লিখি ততই লেখনী নৃত্য করিতে থাকে, অদ্য যাহা প্রকাশ করিলাম. ইহা কেবল আদর্শ মাত্র। উক্ত গুণাকরের প্রণীত সমুদয় কবিতার টীকা করিয়া একত্রে এক পুস্তকে প্রকাশ করণের মানস করিয়াছি ; কিন্তু এতদ্দেশীয় কাব্যপ্রিয় মহাশয়েরা যদিস্যাৎ আমারদিগের পরিশ্রমের তুল্য মূল্য বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্য করেন, তবেই আমরা শ্রমসাকল্য সাফল্য জ্ঞানে এই বৃহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারি, নচেৎ কোন মতেই সাহস ও উৎসাহ জন্মিতে পারে না। আমরা নিশ্চিন্তরূপে নির্ণয় করিয়া দেখিলাম, যে ৪ চারি টাকা মূল্য নির্দ্দিষ্ট না করিলে শ্রমের সার্থকতা ও ব্যয়ের সাহায্য হওনের সম্ভাবনাভাব। অতএব এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে শীঘ্রই কর্ম্মারম্ভ করিতে পারি, এবং এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ভবিষ্যতে আর আর গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণে সাহসী হইতে পারিব।

এই মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যেরূপ ছন্দ প্রবন্ধের বাহুল্য দেখা যায়, অন্যান্য ভাষা রচিত পুস্তকে প্রায় তাদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার মধ্যে ভাষানুযায়ি পয়ার, মালঝাঁপ, বক্র-পয়ার, লঘুতোটক, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ চৌপদী, বক্র দীর্ঘ ও লঘু-ত্রিপদী অথবা পঞ্চপদী ও চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে যাহা রচনা হইয়াছে তাহা অতিশয় মনোহারি, তাহাতে কোন দোষস্পর্শ হয় নাই। সংস্কৃতানুযায়ি বর্ণবৃত্তি মধ্যে গণিত ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, পঞ্চচামর এবং মাত্রাবৃত্তি মধ্যে গণিত পজ্ঝটিকা ও চৌপাইয়া প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত রচনা হইয়াছে তাহা অত্যুত্তম, কিন্তু ঐ ছন্দে যে ভাষা রচনা হইয়াছে তাহার স্থানে স্থানে গুরু লঘুর ব্যত্যয় দেখা যায় ইহাতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি তাদৃশ দোষোল্লেখ করিতে পারি না, কারণ যে পর্য্যন্ত সাধ্য তাহাতে তিনি যত্নের ঘাটি করেন নাই, তিনি কি করিবেন, সংস্কৃতচ্ছন্দে প্রায় ভাষা রচনা তাদৃশরূপ উত্তম হয় না, তথাপি ভারত অন্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট করিয়াছেন ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে। এই পুস্তকে বর্ণে বর্ণে সমরূপ মিলনের যাদৃশ পারিপাট্য আছে পুস্তকান্তরে প্রায় তাদৃশ দৃশ্য হয় না, তবে বৃহদ্‌গ্রন্থ রচনা করিতে গেলেই দুই এক স্থানে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যভিচার ঘটেই ঘটে, ইহা দোষের মধ্যে গণিত নহে এবং গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ইদানীন্তন ব্যক্তিকৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে পাঠের দোষ দেখা যাইতেছে তাহা দর্শন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করা কেবল আপনার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সারমাত্র।

এই পুস্তকে তত্তৎ প্রসঙ্গানুসারে প্রায় নবরস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রাবল্যরূপেই বর্ণনা হইয়াছে, এবং বীররসেরো কিঞ্চিৎ প্রাবল্যমাত্র। অপর করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তি এই সপ্ত রসের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রধানরূপে গণ্য হইতে পারে না। এই স্থলে অন্য রসের কথাই নাই, সমস্ত গ্রন্থখানি অন্বেষণ করিয়া দুই এক স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করুণা রস যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গাধীনেই লিখিত হইয়াছে, শান্তিরস নাই বলিলেই হয়।

অপিচ নায়িকা বিশেষের অবস্থা বিশেষ, ও নায়ক প্রভেদ ও উদ্দীপন, আলম্বন, বিভাবন ও কোন কোন স্থানে ধ্বনি ও ব্যঙ্গ ইত্যাদিও সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল বিশেষ কারণ বশতঃ এই সকল বিষয়ে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিরচিত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ অন্যান্য ভাষা গ্রন্থ হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট অবশ্যই কহিতে হইবে।

এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্ট-

রূপেই প্রমাণ হইতেছে, যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষ-শূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম, এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্য্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।

প্রস্তাব সাঙ্গ করণ সময়ে পুনর্ব্বার একবার লেখনী ধারণ করিতে হইল, কারণ ভারতচন্দ্র রায় "সত্যপীরের ব্রতকথা" যাহা চৌপদীছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ভণিতা স্থলে লিখিত আছে "সনে রুদ্র চৌগুণা" ইহার অর্থ দুই প্রকারে নির্দ্দেশ হইতেছে, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক প্ররচিত হয় তৎকালে পুস্তক কারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই, এজন্য তাঁহার জন্মের সাল ধরিয়া সনে রুদ্র চৌগুণার অর্থ প্রথমেই বাঙ্গালা "১১৩৪" সাল নিরূপণ করিয়াছি অর্থাৎ রুদ্র শব্দে ১১ একাদশ, এই একাদশ পূর্ব্বভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে "অঙ্কস্য বামাগতিঃ" ক্রমে চৌ, গুণার, অর্থ "৩৪" নির্ণয় করিয়াছি। এরূপ না করিলে তিনি ১৫ বৎসর বয়সের কালে গ্রন্থ রচিয়াছিলেন তাহা কোনমতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ "সনে রুদ্র চৌগুণা" রুদ্র শব্দে একাদশ, সুতরাং শুভঙ্করের গণনাক্রমে এগারোকে চারিগুণ করিলে "চারি এগারং ৪৪" নিরূপিত হইতেছে, যুক্তি ও বিবেচনা মতে যদি ইহার অর্থ এরূপ অবধারিত হয়, তবে "৪৪" সনে ঐ পুস্তকের জন্ম হইয়াছে, সহজেই স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু "১১৪৪" কি "১৬৪৪" তাহার কিছুই নির্দ্দিষ্ট হইল না, যদি বাঙ্গালা সন ধরিয়া "১১৪৪" নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থ কর্ত্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৫ বৎসর নির্দ্দেশ করিতে হইবে, আর কহিতে হইবে, তিনি ঐ সময়েই পারস্য ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ৩০ বৎসর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাটী আগমন পূর্ব্বক বর্দ্ধমানে গিয়া মোক্তারি পদে অভিষিক্ত হয়েন। অপিচ তথায় কিছুদিন বিষয় কর্ম্ম ও কারাভোগ করণান্তর ৭।৮ সাত, আট, বৎসর উদাসীনের বেশে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "৪০" বৎসর বয়সে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির কৃপায় কৃষ্ণনগরাধীপের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! এই বর্ষেই রাজাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। এমত কিম্বদন্তী যে, রাজা, এবং রাজপণ্ডিতেরা এই রচনায় অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন। ফলে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাসের যোগ্য বটে! কারণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলকে নির্দ্দোষ না করিয়া আর প্রকাশ করিতে দেন নাই।

অপিচ। এই মহাব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর করিতে হয় আমরা সাধ্যমতে তাহার ত্রুটি করি নাই। যেপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া অদ্য প্রকটন করিলাম, ইহার অতীত যদি আর কোন বিষয় কাহারো নিকট থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিলে পরম উপকার স্বীকার করিব।

যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ, পর্ব্বত সম্বন্ধে রেণু, মহাকাশ সম্বন্ধে ঘটাকাশ, সূর্য্য সম্বন্ধে খদ্যোত, হস্তী সম্বন্ধে মশক।—এবং সিংহ সম্বন্ধে শৃগাল, সেইরূপ ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমি। অতএব এই মহাপুরুষের "জীবন চরিত" রচনা সূত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যা ও গুণাকরের আর আর গুণের বিষয়ে আমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, অনবধানতা, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি বশতঃ যদি তাহাতে কোনরূপ দোষ হইয়া থাকে তবে গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা এই দোষাকর প্রভাকর প্রকাশকরের প্রতি ক্রোধাকর না হইয়া ক্ষমাকর ও কৃপাকর হইবেন।

পরন্তু যে যে স্থানে অশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও বর্ণের দোষ হইয়াছে, অনুকম্পা পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

রামনিধি গুপ্তের জীবন চরিত।*

বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺বাবু রামনিধি গুপ্ত মহাশয়, যিনি নিধু বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ১১৪৮ অব্দে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপ্তা নামক গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল ৺রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে বর্গির হেঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত রামনিধি বাবুর পিতা ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য ৺লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ এই দুই সহোদর কলিকাতার কুমারটুলির বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত "চাঁপ্তা" গ্রামে পলায়ন করেন, তাঁহারা কিছুকাল তথায় অবস্থান করত বাঙ্গালা ১১৫৪ সালে কলিকাতায় পুনরাগমন পূর্ব্বক কুমারটুলির ভবনে পুনরায় অবস্থিতি করিলেন, এই স্থলেই রামনিধি বাবু বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইলেন এবং তাঁহার দৈবশক্তির বিলক্ষণ সুলক্ষণ সাধারণ সমাজে দৃষ্ট হইতে লাগিল,—অনেকের নিকটেই তিনি সমাদৃত ও প্রেমাস্পদ হইলেন। নিধুবাবুর দুই কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন, তাঁহার পিতা প্রথমা কন্যাকে পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি ৺শিবচন্দ্র কবিরাজ এবং দ্বিতীয়াকে কাঁচরাপাড়া নিবাসি ৺দাতারাম কবিরাজকে সম্প্রদান করত লোকান্তর গমন করেন।—রামনিধি বাবু ১১৬৮ সালে "সুখচর" নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। ১১৭৫ বর্ষে সেই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক সন্তান প্রসূত হয়, নবকুমারের মুখাবলোকন পূর্ব্বক বাবু বিস্তর উৎসাহ প্রকাশ করেন।

অনন্তর যে সময়ে এই বঙ্গ দেশে ইংরাজদিগের স্থির প্রভুত্ব হয় এবং যখন সাহেবেরা এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ পল্লীস্থ ৺দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয়ের সহিত চিরনছাপরায় কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন, তৎকালে জনাই গ্রাম-বাসি সুবিখ্যাত ৺জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাপরার কালেক্টর মেং মোন্টগুমরি সাহেবের কেরাণির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রামতনু পালিত তথায় কিছুদিন দেওয়ানী কর্ম্ম করত বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া এককালেই অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন পালিত বাবুর সহিত রামনিধি বাবু ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি এমত আর কেহই ছিলেন না, যিনি ঐ দেওয়ানী পদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র হয়েন। এই উপস্থিত ঘটনায় জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় উক্ত দেওয়ানী কর্ম্মের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইলেন, কিন্তু মনে মনে এমত বিবেচনা করিলেন যে নিধুবাবু এখানে বর্ত্তমান থাকাতে এ কর্ম্মটি তিনি কোনমতেই প্রাপ্ত হইতে পারেন না, একারণ শঠতা ও ছলনা পূর্ব্বক এক দিবস বাবুকে কহিলেন "আপনি কি ব্রহ্মহত্যা করিতে এখানে আসিয়াছেন?" ইহাতে বাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "সে কি মহাশয়! আমি ব্রহ্মহত্যা করিতে আসিয়াছি, এ কেমন কথা হইল? আমি গো, ব্রাহ্মণের সেবক ও রক্ষক, অতএব আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমার প্রতি এমত অন্যায় উক্তি কেন করেন?" তচ্ছ্রবণে মুখোপাধ্যায় কহিলেন "দেওয়ানী কর্ম্ম সাহেব আমাকে দিতে চাহেন, কিন্তু তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিলে এ কর্ম্ম তোমাকেই দিবেন, আমাকে কখনই দিবেন না।" ব্রাহ্মণের প্রতি গুপ্ত বাবুর স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এজন্য কোনরূপ আপত্তি না করিয়া ঐ পদে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিষিক্ত করণার্থ বিবিধ প্রকার যত্ন ও

* সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ১ শ্রাবণ, ১২৬১ সাল। ইং ১৫ জুলাই ১৮৫৪।

পোষকতাই করিলেন, এবং তিনি পদস্থ হইয়া যাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন তদ্বিষয়ে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ দিয়া বিশেষ সহায়তা করত তাঁহার কেরাণিগিরি কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেন।

ছাপরার কালেক্টরী কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিধুবাবু তৎকালে তথায় সঙ্গীত বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনেক যবন গায়ককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করত স্বাবকাশ সময়ে তাহার নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গীতবিদ্যা তৎপর যবনেরা প্রায় অত্যন্তই ক্রুর সহজে কাহাকেই যথার্থরূপ উপদেশ প্রদান করে না। যখন ঐ বিদ্যায় বাবুর কিঞ্চিৎ সংস্কার জন্মিল তখন শিক্ষা দান বিষয়ে শিক্ষকের কার্পণ্য জানিতে পারিয়া মিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিলেন "আমি তোমারদিগের জাতীয় যাবনিক গীত আর গান করিব না, আপনিই বঙ্গভাষায় হিন্দি গীতের অনুবাদ পূর্ব্বক রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গান করিব।" ফলে তাহার অব্যবহিত পরে তাহাই করিলেন, অর্থাৎ উক্ত মুসলমান গাথককে বিদায় দিয়া আপনিই রাগ রাগিণী, তাল মান, অনুসারে বাঙ্গালা গীত রচনা করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই নিধুবাবু ছাপরা জিলার মধ্যস্থিত "রতনপুরা" নামক গ্রামে গিয়া "ভিখনরাম" স্বামিজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ মহাশয় অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাধু ছিলেন, "জ্ঞানানন্দ" গোস্বামির ন্যায় উক্ত মহাপুরুষের অনেক অলৌকিক ক্রিয়া মানবমণ্ডলে ব্যক্ত আছে।—"জ্ঞানানন্দ" বামাচারী ছিলেন, "ভিখনরাম" দক্ষিণাচারী, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধপুরুষ কহিত। তিনি নিধুবাবুকে শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ী, ভক্ত, সচ্চরিত্র ও দয়ালু দৃষ্টে এই বর প্রদান করিলেন, যে "তুমি সুখী ও খ্যাত্যাপন্ন হও" কিয়দ্দিন পরেই ঐ মহাপুরুষের এই মহা আশীর্ব্বাদ সত্য ও সফল হইল। হিন্দুস্থানে "সরিমিয়া" নামক ব্যক্তি যেমন অতিশয় বিখ্যাত সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন, ইনি অত্যল্প দিবসের মধ্যেই বঙ্গদেশে অবিকল তদনুরূপ হইলেন।

এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রূপ আদেশ করিলেন যে "তোমরা চাকরি করিতে আসিয়াছ, অতএব উপার্জ্জনের পথ দৃষ্টি কর, এ সময়ে যে জমিদার তোমার দিগো যাহা দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাটীতে প্রেরণ কর। ইহাতে যদি তোমারদিগের উপর কোনরূপ আপদ বিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে রক্ষা করিব। ভয় কি, নির্ভয়ে উপার্জ্জন কর ইত্যাদি" এবম্ভূত অপরিমিত অনুমতি শুনিয়া রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।* ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন "বাবুজী আপনি যদি নিতান্তই কর্ম্ম না করেন, তবে আপনার প্রাপ্য ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন" বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। পরন্তু তাঁহার ছাপরা হইতে কলিকাতায় আগমন কালে দেওয়ানজী এই অনুরোধ করিলেন, যে, "আপনি উত্তম কবি, অতি সুগায়ক, এবং রাগসাগর বিশেষ, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি প্রতি বৎসর ৺সরস্বতী পূজার দিবসে মৎপ্রণীত বাগ্‌দেবীর বন্দনাটি গান করেন তবে আমি অপরিমিত প্রীতি প্রাপ্ত হই" গুপ্ত মহোদয় তদ্বাক্যে অঙ্গীকৃত হইয়া তদবধি প্রতি-বর্ষেই শ্রীপঞ্চমীর দিবসে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দিয়া দেওয়ানের কৃত এই গান করিতেন। যথা।

"জয় জয় বাগ্‌বাণী" ইত্যাদি।

এই গীতের সংপূর্ণাংশ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

---

*এই স্থলে এমত এক কিম্বদন্তী আছে, যে নিধুবাবু হিসাবের পুস্তকে স্ব রচিত গান লিখিয়াছিলেন, সাহেব তদৃষ্টে [illegible] কিঞ্চিৎ রোষপরবশ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

নিধুবাবু সহজেই সন্তোষচিত্ত ছিলেন, প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই, সর্ব্বদাই হাস্য পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষয় করিতেন। এমত কালে তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটী কৃতান্ত কুটীরে নীত হইল, এবং ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার সেই স্ত্রীও কালের গ্রাসে পতিতা হইলেন। এই স্ত্রী ও পুত্র বিয়োগে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, ইহাতে বিপুল বিলাপ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের আক্ষেপ নিবারণার্থ এই গীত রচনা করিয়াছিলেন। যথা।

রাগিণী কেদার। তাল জলদ্ তেতালা

মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কার দোষ দিব, নিলে কোন জন।
না বোলে কেমনে রব, বোলে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার গমনাগমন।১
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়,
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ ॥২
যদি তাহে থাকে ফল, লোয়েছ কোরেছ ভাল'
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি, করহ যতন ॥৩

তদন্তর ১১৯৭ সালে যোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, সে সংসারো অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করণে নিতান্তই অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন, দৈব নির্ব্বন্ধ, খণ্ডন হইবার নহে। নানা প্রকার অনুরোধ বশতঃ ১২০১ কিম্বা ২ হায়নে "বরিজহাটি, চণ্ডীতলা" গ্রামের হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের তৃতীয় কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন, এই সংসারে তাঁহার তিনটী পুত্র ও কয়েকটি কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র লোকান্তরিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় পুত্র বাবু জয়চন্দ্র গুপ্ত এবং তৃতীয় পুত্র বাবু সুখময় গুপ্ত, অধুনা নিধুবাবুর এই দুই বংশধর বংশ রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁরদিগের উভয়ের অনেকগুলীন পুত্র কন্যা জন্মিয়াছে।

গুরুচরণ কবিরাজ ও গুরুদাস কবিরাজ, নিধুবাবুর এই দুইজন ভাগিনেয় অতিশয় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, বাবু তাঁহারদিগ্যে প্রাণাধিক জ্ঞানে যথোচিত স্নেহ করিতেন, ইহাঁরা উভয়েই তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনাবস্থায় মায়িক দেহ পরিহার করাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তদবধি সাংসারিক সুখ সম্বন্ধে এককালেই আসক্তি-হীন হইলেন, কি ঐশ্বর্য্য, কি পরিজন, কাহারো প্রতি আর কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করিতেন না, গৃহে থাকিয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার কবিতে লাগিলেন।

ইনি উপকার ধর্ম্মকেই পরমধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারে ত্রুটি করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথা সম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন। আপনি সংপূর্ণরূপে সাহায্য করণে অক্ষম হইলে অন্যকে অনুরোধ করিতেন। এইরূপে স্বতঃ পরতঃ যে প্রকারে হউক লোকের উপকার করিতে পারিলেই সুখী হইতেন, একারণ তাঁহার প্রশংসাপুষ্পের সুবাস সর্ব্বত্রেই বিস্তৃত হইয়াছিল।

শোভাবাজারস্থ বটতলা নিবাসী ৺বাবু রামচন্দ্র মিত্র, যিনি এমিরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি

ছিলেন, এবং যাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত বাবু জয়চন্দ্র মিত্র, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বাটীর উত্তরাংশে বড় এক খানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সঙ্গীত বিষয়ের আমোদ করিতেন। ঐ স্থলে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন্ ধনি ও গুণিলোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বরে মুগ্ধ হইতেন।

বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষির দলের পক্ষি সকলেই ভদ্র সন্তান, ও বাবু এবং সৌখিন্ নামধারি সুখি ছিলেন। পাখির দলেরা নিধুবাবুকে কর্ত্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত। পক্ষিগণ গাঞ্জার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, কুটা বহিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন। যথা।

পক্ষির বুলি

"ভিযিণ্, কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্।"
"চুকু মুকু চুকু, চুক্ চুকুণ্।"
"কিচি মিচি কিচি, কিচিন্ কিন্।"
"কুকু, রামসালিকে, কু, কু, গঙ্গা বিসং।"

"ছোট বিলের পাখি মোরা, বড় বিলের কে।
উড়িতে না পেরে পাখি পোষ মেনেছে॥"
"কুকু, গাং সালিকে, কু, গঙ্গা বিসং"
ইত্যাদি।

এই সমস্ত দ্বিপদ পক্ষির আকাশ-ভেদি বুলি সকল দ্বিপদ পক্ষিরাই বুঝিতে পারিতেন, অন্যের বুঝিবার সাধ্য কি? এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষিদলে ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া একেবারে উপরি উপরি ১০০ এক শত ছিলিম্ গাঁজা খাইলেন, এই মাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে শেষ ছিলিম্টি টানিবার সময়ে একবার একটুখানি খুক্ খুক্ করিয়া কাসিয়াছিলেন, এই লঘু দোষে পক্ষিরাজ তাঁহার গুরুদণ্ড করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নাম "ছাতারে পাখী" রাখিলেন। ইহাতে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন বদনে বিস্তর বিনয় করিয়া কহিলেন "ধর্ম্মাবতার! এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র দোষেই কি আমাকে এত অপমান করা কর্ত্তব্য হয়।" এতদ্বাক্যে খগেশ্বর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া উত্তর করিলেন "ওরে মূর্খ! জানিস্ তো, এখন আমি আর কি করিতে পারি? হাকিম্ ফেরেতো হুকুম ফেরে না। ভাল তোর স্তবে আমি তুষ্ট হইলাম, কিন্তু "ছাতারে" নাম একেবারে রহিত করিতে পারিব না, অতএব তোর নাম "স্বর্ণ ছাতারে" রাখিলাম।"

পাখির দলের আর আর বিস্তর রহস্যজনক ইতিহাস আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করণের প্রয়োজন করে না।

পরন্তু নিধুবাবুর সংগীত বিদ্যার অনুরাগ ও নাম সম্ভ্রম সুন্দররূপে প্রকাশ হইলে বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান লোকেরা কলিকাতায় আগমন করত তাঁহার গান শুনিয়া সমূহ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইহাঁরা তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কখনই কাহারো নিকট গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন, তোষামদাদি উপাসনাকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি কহেন "বর্দ্ধমানাধিপতি মৃত মহাত্মা ৬তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এতন্নগরে শুভাগমনানন্তর কোন রূপ কৌশলক্রমে তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন।"

মুরশিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক প্রতি দিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত

মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গণা ছিল, ঐ বার-বিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িণী প্রিয়তমা বেশ্যা। কিন্তু অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীত বাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।

১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সময়ে বাঙালি মহাশয়দিগের মধ্যে আকড়াই গাহনার অত্যন্ত আমোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখ্ড়াই বিষয়ে অতিশয় প্রতিপন্ন ছিলেন। ঐ মহাশয় সংগীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখ্ড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে ও তৎসমকালে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ আর কয়েক ব্যক্তি এতন্নগরে ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে সজীব ছিলেন, তথাচ এই মহাশয়কে তাঁহারদিগের সকলের অপেক্ষা প্রধান কহিতে হইবেক, যেহেতু ইনি আপন ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করত অনেক নূতন সৃষ্টি করেন। সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগ রাগিণীতে যুক্ত করত নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন। ঐ কুলুইচন্দ্র সেন রামনিধি গুপ্তের নিকট সম্বন্ধায় মাতুল ছিলেন। আখ্ড়াই গীতের ইনি যে সকল নূতন প্রণালী করেন সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

১২১০ সালে যখন মহামান্য মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখ্ড়ায়ী আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস ঠাকুর ও নাসরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদাই আখ্ড়াই সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ছিল। কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখ্ড়াইদলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্র সন্তান এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটা নিবাসি ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতি হইলেন। আখ্ড়াই যুদ্ধের স্থিরতার নাম "বদী" ও পক্ষ প্রতিপক্ষের নাম "বাদী" এই উভয় দলে "বদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজায়ের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজনে গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে সখের আখ্ড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়িদিগের আখ্ড়ায়ের দল একবারে উঠিয়া গেল।

সখের আখ্ড়ায়ের এতদ্রূপ সূত্র সঞ্চার হইলে কিছুদিন পরে অনেকেই তদ্বিষয়ে অনুরাগি হইলেন। পাতুরেঘাটাস্থ মহামান্য ঠাকুরবাবুরা, যোড়াসাঁকো পল্লীস্থ সুবিখ্যাত সিংহবাবুরা, গরাণহাটা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ৺বাবু কৃষ্ণমোহন বসাখ, শোভাবাজারস্থ খ্যাত্যাপন্ন ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ এবং শ্যামপুকুর পল্লীবাসি ৺দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু, ইঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন পল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটা দল

করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারদিগের সকলেরি সহিত বাগবাজারের দলের দুই একবার করিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এমত শুনিতে পাই, সেই সমস্ত সময়ে বাগবাজারের পক্ষেই অধিক সংখ্যায় জয়লাভ হইয়াছে, কারণ এ পক্ষে সুর ও গীত বিষয়ে ৺রামনিধি গুপ্ত এবং গাহনা পক্ষে অদ্বিতীয় স্বরসিদ্ধ সুরজ্ঞ কোকিলকণ্ঠ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রভৃতি গায়ক, সুতরাং দুই দিক্ উত্তম হওয়াতেই বাগবাজারের জয়ের সম্ভাবনাই অধিক ছিল। কিন্তু ইহাঁরা নিতান্তই পরাজয় হয়েন ন'ই, এমত নহে, গাহনা বাজনার জয় পরাজয় "হাওয়ার" উপরেই নির্ভর করে। গীত, সুর ও গায়ক, এই তিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও এক এক দিন "হাওয়ার" দোষে জমাট্ হয় না, ফাকে ফাকে উড়িয়া যায়। যাঁহারা সকল বিষয়েই অপকৃষ্ট, দৈববশতঃ "হাওয়ার" গুণে তাঁহারা এমত "লগ্ন" করেন যে তচ্ছ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই সীমাশূন্য সন্তোষ-সাগরে মগ্ন হইতে থাকেন, বিশেষতঃ রাগ রাগিণীর খেলা ছেলেখেলা নহে, অতিশয় কঠিন। যে সময়ের যে রাগ, সেই সময়টী না হইলে সে রাগের রাগ থাকে না, ইহাতে সময়ের বৈলক্ষণ্য জন্য রাগের অনুরাগ না হইয়া সহজেই বিরাগ হইতে পারে। যাহা হউক, সকল পক্ষই পরস্পর জয়ি ও যশস্বি হইবার জন্য যথোযোগ্য যত্নের ক্রটি করেন নাই, সাধ্যমত সাধন করিয়াছেন, ইহাতে কোন কোন-বার বাগবাজারের দল পরাভব হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোনবারে সর্ব্বতোভাবেই পরাভব হয়েন নাই।

বাগবাজার বাসী সর্ব্বত্র বিখ্যাত শ্রীমান্ বাবু মোহনচাঁদ বসু প্রথমেই আখ্ড়াই গাহনার প্রধান গায়কের পদে ব্রতী হয়েন নাই, যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন জীল দিতেন। তাহার কতিপয় বৎসর পরেই তিনি প্রধানের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাঙ্গালির মধ্যে এই বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় বাঙ্গলা গাহনা বিষয়ে ইদানীং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিধুবাবু ইহাঁকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, যেহেতু তাঁহার কৃত কি "আখ্ড়াই" কি "টপ্পা" ইনি যখন যাহা গাহিতেন, তখন তাহাতেই মধুবৃষ্টি করিতেন। মোহন চাঁদের স্বর শ্রবণে আহা, আহা শব্দে অশ্রুপাত না করিয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। এই মহাশয় স্বয়ং হাফ আখড়ায়ের সৃষ্টি করত বঙ্গদেশস্থ সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন, এবং দাঁড়া কবির যে সকল সুর ও রথ, দোল এবং সংকীর্ত্তন প্রভৃতির যে যে সুর করিয়াছেন তাহাই পীযূষ পরিপূর্ণ। যদি বীণা যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণে লোকের অরুচি হয়—যদি কোকিল কুলের সুমধুর কুহু ধ্বনি শ্রবণে বিরক্তি জন্মে—যদি মধুকরের মধু মিশ্রিত ঝঙ্কার রব বিষ বোধ হয়, তথাচ মোহনচাঁদবাবুর সুর ও স্বর শুনিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কাহারো মনে বিরক্তি জন্মে নাই, বরং ক্রমে লালসার বৃদ্ধিই হইয়াছে। কি কলিকাতা, কি তন্নিকটস্থ গ্রাম, কি দিল্লী, কি লাহোর ইত্যাদি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে যে স্থানে বাঙ্গালি বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই স্থানেই বসুবাবুর গুণ ব্যাখ্যা হইতেছে ও নাম জাগরূক রহিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা তাঁহার প্রণীত সুর গাহিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেছেন। এই মহাশয় কন্দর্পের ন্যায় অতি সুপুরুষ ছিলেন, ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র, কারণ পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং এইক্ষণেও দেখিতেছেন। হায় কি দৈববিড়ম্বনা! রসের দোষে অধুনা তাঁহার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে ভাবভঙ্গি কিছুই নাই, যেন সে তিনি আর তিনিই নহেন। চারি পাঁচ বৎসর হইল জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রতিকূল হইয়া কখনো শয্যাগত, কখনো কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেছেন। এই মৃতবৎ অবস্থাতেও যিনি তাঁহার মুখে গান শুনিবেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিবেন। অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রার্থনা করি করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ আরোগ্য প্রদান করুন।

যদিও দৈবশক্তি দেবীর অনুগ্রহেই মোহনচাঁদ বাবুর এতদ্রূপ নাম সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি হইয়াছে, তথাচ ৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয়কেই তাঁহার সর্ব্ব বিষয়েরি মূলাধার কহিতে হইবেক; কেননা তাঁহারি দ্বারা শিক্ষা ও তাঁহারি দ্বারাই সংস্কার। লোকে অদ্যাবধি মোহনচাঁদ বাবুকে নিধুবাবুর "খাসভাণ্ডার" কহিয়া থাকে।

এই স্থলে কেহ এমত আপত্তি তুলিতে পারেন যে মোহনচাঁদ বাবুর পূর্ব্বে যোড়াসাকোস্থ বাবু রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং পাতুরেঘাটার বাবু রামলোচন বসাখ প্রভৃতি কয়েকবার "হাফ আখ্ড়াই" করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কথাই নহে, তাহাকে কখনই হাফ আখ্ড়াই বলা বলা যাইতে পারে না, কেননা তাঁহারা "পেসাদারি দাঁড়া কবির সুরে" গান করিয়া কেবল বসিয়া গাহিতেন। মোহনচাঁদ আখ্ড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ আখ্ড়ায়ের নূতন ধরণের সুর করিয়া যৎকালে বড়বাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রামসেবক মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শীতকালে এক শনিবারের রাত্রিতে গাহনা করিলেন, বোধহয় তৎকালে প্রশংসার শব্দে বাটীর থাম পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সে বারে যোড়াসাকো ও পাতুরেঘাটার সংযোজিত মহাশয়েরা সংপূর্ণরূপে পরাজয় হইয়া পরে সেই দৃষ্টান্তানুসারে সুর প্রস্তুত করণে শিক্ষিত হইলেন, তথাচ তাঁহারা অদ্যাবধি তদ্বৎ উৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আখ্ড়াই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর নাই, যাঁহারদিগের সুর ও গাহনা ভাল হইত, তাঁহারাই জয়-পতাকা প্রাপ্ত হইয়া ঢোল বাজিয়া আনন্দ পূর্ব্বক গমন করিতেন। উভয় পক্ষেই তিনটি করিয়া গীত গাহিতেন, প্রথমে এক একটী "ভবানী-বিষয়" পরে এক একটি "খেউড়" সর্ব্বশেষে এক একটি "প্রভাতী" সর্ব্বদাই দুই দলে যুদ্ধ হইত, কোন কোন বার তিন দলেও সংগ্রাম চলিয়াছে। ভবানী বিষয়ের মহড়ায় ২৬টী অক্ষরে একটী ত্রিপদী, চিতেনে ঐ রূপ একটী ত্রিপদী এবং পাড়ঙ্গে দুইটী ত্রিপদী। ইহাতেই কেবল সুর ও রাগ রাগিণীর পাণ্ডিত্য এবং বাদ্যের পরিপাট্য। সঙ্গতের বাদ্য "পিড়েবন্দি" "দোলন" "দৌড়" "সবদৌড়" এবং গান সমাপন সময়ে যে বাদ্য তাহার নাম "মোড়" কি "মহড়া" কি "চিতেন" ও কি "পাড়ঙ্গ" সকল গাহনার বাদ্য প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র, ত্রিপদীর একটি পদ যথা।

"নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা"।

এই কএকটী কথা গাহিতে গাহিতে যেমন রাগ রাগিণীর পরিবর্ত্তন অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গেই বাদ্যের পরিবর্তন হইয়া থাকে। সঙ্গত, যথা প্রথমে পিড়েবন্দি, পরে দোলন, তৎপরে দৌড় সর্ব্বশেষে সব-দৌড়। প্রথমে মহড়া গাহিয়া গায়কেরা একবার বিশ্রাম করেন, ঐ সময়ে সাজ বাজিয়া থাকে, সেই সাজ সাঙ্গ হইলে আবার চিতেন ধরেন, চিতেন সাঙ্গ হইলে আবার সাজ বাজে, তৎপরে পাড়ঙ্গ গাহিয়া গান সমাপন করেন।

ঠাকুরাণী বিষয়ে গাহনার নিয়ম ও সঙ্গতের নিয়ম যেরূপ, খেউড় ও প্রভাতির নিয়ম অবিকল সেইরূপ। এই সঙ্গত প্রকৃতই সঙ্গত, ইহাতে অসঙ্গত হওনের বিষয় কি? এই গীত ও বাদ্যের মিছিল অর্থাৎ প্রণালী অতি আশ্চর্য্য, একরূপ অদ্ভুত নূতন সৃষ্টি বলিলেই হয়, ইহাতে এরূপ সুকৌশল আছে যে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অদ্বিতীয় সংগীত তৎপর গায়ক ও বাদ্যকর মহাশয়েরা কোন ক্রমেই সহজে তাহার মত গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবং নিয়ত এক বৎসর শিক্ষা না করিলে কখনই সঙ্গত করিতে সমর্থ হইবেন না। অপিচ কোন্ কোন্ তালের সহযোগে আখ্ড়াই তালের রচনা হইয়াছে তাহাও আশু অনুধাবন করিতে পারিবেন না, শ্রবণ মাত্রেই নূতন প্রকার চমৎকার বোধ হইবে।

আখ্‌ড়াই খেউড় ও প্রভাতী গীতে কি মহড়া, কি চিতেন, কি পাড়ঙ্গ অর্থাৎ অন্তরা ইহার প্রত্যেকেতেই চতুর্দ্দশটি অক্ষর, অর্থাৎ একটি করিয়া "পয়ার"।

যথা,— খেউড়। মহড়া।

অনেক যতনে প্রেম, তোমার সহিতে। দেওরা ইত্যাদি।

যথা— প্রভাতী। মহড়া।

না হোতে সুখের শেষ, প্রভাত হইল। দেওরা ইত্যাদি।

যথা,— ভবানী বিষয়। মহড়া।

নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধে, সাকারা, তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী। করুণাময়ী ইত্যাদি।

আখ্‌ড়াই তিন গানের ভিন্ন ভিন্ন তিনখানি সাজ, সে সাজের ভিতর যে কত সাজ, তাহার কি ব্যাখ্যা করিব? যখন বাজে তখন বাজে লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? ফলে যৎকালে এক পক্ষের সাজ উত্তমরূপে বাজে, তৎকালে বিপক্ষদিগের হৃদয়ে বাজে ইহাতে সন্দেহ কি?

আখ্‌ড়াই বাজনার প্রধান যন্ত্র, "তানপুরা, বেহালা, মন্দিরে, ঢোল, মোচঙ্গ, খরতাল", সিটি ইত্যাদি, ইহার সঙ্গে, সপ্তসারা, জলতরঙ্গ, বীণা, বেণু, সেতার প্রভৃতি যত যোগ কর, ততই উত্তম, কিন্তু না করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। আখ্‌ড়াই ঢোল বাজানা যে প্রকার নূতন তাহার বেহালার গৎ সকলি সেই প্রকার নূতন, কোন কোন আখ্‌ড়াই সম্প্রদায় ২০।২১ খান পর্য্যন্ত যন্ত্র একত্র বাজাইয়াছেন।

আখ্‌ড়াই গাহনা সর্ব্বশেষে স্বর্গগত সুবিখ্যাত বস্তু গুণজ্ঞ ৺রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের ভবনে যতবার হইয়াছে, এত অধিক আর কোন খানেই হয় নাই। আমরা কোন প্রামাণ্য প্রাচীন পুরুষের প্রমুখাৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছি, সংগীত বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ কোন ইংরাজ উক্ত রাজ-নিকেতনে একবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক আখ্‌ড়াই শুনিয়া কি গাহনা কি বাজানা উভয় বিষয়েই অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন এবং গমন কালীন তিনি বিস্তর প্রশংসা করিয়া বিদায় লইলেন।

আখ্‌ড়াই গাহনা যে প্রকার বাহুল্য ব্যাপার তাহাতে কোন মতেই গীতের উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে পারে না, কারণ ১০।১২ জন গায়ক একত্র হইয়া ক্রমশঃ এক বৎসরকাল সুর ও তাহার মিছিল সমুদয় অভ্যাস করত গলার মিল করিয়া যখন দুই তিন গোপনীয় সভা করিয়া দেখেন যে সকল দিক্ সমান হইয়াছে, আর কোনরূপ অনৈক্য বা দোষ নাই, তখন পরস্পর সম্মত হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধের দিন স্থির করেন।

আখ্‌ড়াই সাজের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠই ঢোল, তাহার নীচেই বেহালা। পূর্ব্বে যত ব্যক্তি ঢোল বাজাইয়াছেন তন্মধ্যে বাগবাজার নিবাসি ৺রসিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের অপেক্ষা প্রধান আর কেহই হয়েন নাই, এবং উক্ত পল্লীস্থ ৺বাবু রাধানাথ সরকারের অপেক্ষা বেহালা বিদ্যায় কেহই নিপুণ ছিলেন না। গোস্বামীর ঢোল ও সরকার বাবুর বেহালা যিনি না শুনিয়াছেন, তাঁহার কর্ণই বৃথা।

গরাণহাটাস্থ বাবু কৃষ্ণমোহন বসাখ অনেকবার দল করিয়াছিলেন, তাঁহার দলে "গোবিন্দ" নামক একজন মালা সুর করিত, সে ব্যক্তি এ বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, এবং রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্ম সভায় ব্রহ্মসংগীত গান করিত। ঐ গোবিন্দ এইক্ষণে জীবিত নাই।

শোভাবাজারে একবার মাত্র দল হইয়াছিল, সেবারে ৺কালীশঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের বাটীতেই বাগবাজারের দলের সহিত সংগ্রাম হয়, তাহাতে সেতার বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী ৺মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গোবিন্দ মালার সহিত একত্র হইয়া শোভাবাজারের পক্ষে সুর প্রস্তুত করেন।

শ্যামপুকুরের মহাশয়েরা কেবল একটিবার দল করেন, তাহাতে তৎপক্ষে কাঁচরাপাড়া নিবাসী বৈদ্যবংশ্য শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ রায় মহাশয় সুর ও গীত প্রস্তুত করিয়া দেন, ইনি এ বিষয়ে ও সংগীত বিদ্যায় অতিশয় যোগ্য, কিন্তু ইহার আখ্‌ড়াই সুরের পদ্ধতি শিক্ষা বাগবাজার হইতেই হইয়াছে। আখ্‌ড়াই সম্পর্কীয় প্রায় তাবতেই গত হইয়াছেন, কেবল ঈশ্বরানুগ্রহে অধুনা এই মহাশয় এবং বাবু মোহনচাঁদ বসু মাত্র জীবিত আছেন।

৩০ বৎসর হইল আখ্‌ড়াই গাহনা রহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেকে অনেকবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১২৬০ সালের চরমকালে শ্যামপুকুরে নব্য বাবুরা কয়েক মাস চাগিয়া উঠিয়াছিলেন, শেষ ৬১ সালের পদার্পণেই শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন। অনেকের মনে এমত আশা জন্মিয়াছিল যে বহুকালের পর আখ্‌ড়াই শুনিব। তা না হওয়াতে "অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিতে হইল।

বাঙ্গালার মধ্যে আখ্‌ড়াই গাহনায় অনেক সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই ব্যাপারে একেবারে লোপ হইয়া গেল, আর তাহার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। কাল সহকারে মানুষের মনের অবস্থা যত পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন আমোদ প্রমোদের উচ্ছেদ হইতেছে।

আখড়ায়ের সৃষ্টি কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি আমরা স্থির রূপে ইহার নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। কিন্তু অনেকেই শেষে ৺কুলুইচন্দ্র সেন মহাশয়কে ইহার জন্মদাতারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে অপর এক প্রমাণ এই, বহুদিন হইল "কবিওয়ালা ৺ভোলা ময়রা এক লহর গায়" সেই লহরের একস্থানে এরূপ বর্ণনা ছিল "আখড়ায়ের সৃষ্টি কোল্লে কুলুইচন্দ্র সেন"—বঙ্গদেশের অপর স্থানের কথা দূরে থাকুক্ এই কলিকাতার অতি নিকটস্থ অনেকের কর্ণকুহরেই আখড়ায়ের গীত বাদ্য ধ্বনিত হয় নাই।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় এই আখড়ায়ের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার প্রণীত সংশোধিত পদ্ধতিই প্রচলিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল নিধুবাবু কৃষ্ণমোহন বসাক বাবুর সহিত মাহেশের স্নান-যাত্রার মেলা দেখিতে গিয়া অষ্টাহ নৌকার উপরেই বাস করেন, তাহার মধ্যে এক দিবসও সংগীতের আমোদ হয় নাই। কেবল বাবুর বাক্ কৌশল ও রসিকতাকেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় রসিক হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, তাঁহার মুখের পানে মুখ করিয়া "বাবু একটী গান কর" এমত কথা কহিতে কাহারো সাহস হইত না। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছেন।

এই মহাশয়ের মৃত্যুর ২০ কিম্বা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই কহিত "তিনি জীবিত নাই" এই সূত্রে পরস্পর কত বাজী রাখারাখি হইয়াছিল। এবং এই উপলক্ষে কেহ কেহ তাঁহারি নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মহাশয় কি অদ্যাপি সজীব আছেন?"

বটতলার আমোদের স্থান ভঙ্গ হইলে বাগবাজার নিবাসী ৺দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে ঐ বাগবাজারস্থ ৺রসিকচাঁদ গোস্বামীর ভবনে কিছুদিন বাবুর

বৈঠক হয়, সেই স্থানে আহ্লাদের ব্যাপার অতি বাহুল্যরূপেই হইয়াছিল, তথায় বসিয়া সময়ে সময়ে যে সকল টপ্পা ও অন্য গীত রচনা করিতেন তাহার ভাব ও রাগ সুর অতি মনোহর হইত। ৺রাজা রাজবল্লভের কালোয়াঁৎ "আবুবরস্ খাঁ" তচ্ছ্রবণে কহিয়াছিলেন, একাধারে এক ব্যক্তি হইতে এরূপ হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব, অতএব দৈবশক্তি ব্যতীত কখনই এমত সম্ভব না।

বাবু শারীরিক নিদান এমত বুঝিতেন, যে সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন সময়ে শয়ন করাতে একাল পর্য্যন্ত কখনো কোনরূপ রোগ ভোগ করেন নাই, তিনি যে প্রাচীন হইয়াছিলেন তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এবং বুদ্ধির ভ্রমও হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এক বৎসর কাল দুর্ব্বলতা জন্য গতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়াছিল, একারণ বাটীর বাহির হইয়া কুত্রাপি গমন করিতে পারেন নাই। এই এক বৎসরে যে যে মহাশয় দেখা করিতে আসিতেন তাঁহারদিগের সহিত হাস্য বদনে আলাপাদি করিয়া পরিশিষ্ট সময় "হস্তামল" কুবের ও তুলসীদাস কৃত গ্রন্থ অথবা ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতেন। রামনিধিবাবু ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এবম্ভূত সুখ সম্ভোগ করণান্তর ১২৪৫ সালে ২১ চৈত্র দিবসে পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবী তীরে নীরে জ্ঞানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত যোগ্যধামে যাত্রা করিলেন!

ঐ মৃত মহাত্মা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করত একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে যে ভূমিকা ও রাগ রাগিণীর বিষয় বিস্তার করিয়া লেখেন আমরা তদবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, এতৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

কি সধন কি অধন সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে "বাবু" শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন বাবু গেলেন ইত্যাদি। বাঙ্গালা গীতে রাগ সুরের ব্যাপারে ইনি যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে "সরিমিয়ার" অপেক্ষা ইহাঁকে কোন অংশেই ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে "সরির টপ্পা" তেমন বঙ্গদেশে "নিধুর টপ্পা" অনেকেই "নিধু" নিধু" কহেন, কিন্তু নিধু, শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু, কা গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি ? তাহা জ্ঞাত নহেন। যাহাহউক, আর বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না। নিধুবাবু যে প্রকার রাগ, সুর, এবং ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিতেন, মিলের প্রতি সে প্রকার দৃষ্টি করিতেন না। একারণ তাঁহার কোন কোন গান সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে প্রকার আর্দ্র করে, মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না। যথা "মান" "দিন" "মন" "প্রাণ" ছিল" "গেল" ইত্যাদি, ফলে কেবল ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পুরাতন প্রায় সমস্ত কবিদিগের প্রণীত কবিতায় এই প্রকার মিলের দোষ আছে, নিধুবাবুর এক এক খান সুর "খেয়ালের" অপেক্ষাও কৌশল কলাপ পরিপূরিত ও অতি মধুর। ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগভুক্ত করিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে যদিস্যাৎ মিলের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতেন তবে স্বোণার উপর সোহাগার অপেক্ষাও কতদূর পর্য্যন্ত উত্তম ও আশ্চর্য্য হইত তাহা কথনীয় নহে। এই বিষয় উল্লেখের আর আবশ্যক করে না, যিনি জগদীশ্বর, এই বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা করিয়াছেন, যখন তাঁহার রচনাই সংপূর্ণরূপে দোষ-শূন্য হয় নাই, তখন মানুষের রচনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না। যথা।

"গন্ধঃ সুবর্ণে ফলমিক্ষু দণ্ডে, বিদ্বান্ ধনাঢ্যো নচ দীর্ঘজীবী,
না কারি পুষ্পং খলু চন্দনেষু। ধাতুঃ পুরেস্মিন্ নচ বুদ্ধিদাতা।"

আহা!—জগদীশ্বর এমত সুবর্ণ সুবর্ণ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে গন্ধ প্রদান করেন নাই।—ইক্ষু, যাহার দণ্ড অতি অতি সুমধুর করিয়াছেন, সেই মধুলতাকে ফল প্রদান করেন নাই।—[১২] চন্দনবৃক্ষ যাহার কাষ্ঠকে অতিশয় সুরভি করিয়াছেন, তাহাকে ফুল প্রদান করেন নাই। আর বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ধনাঢ্য ও দীর্ঘজীবী করেন নাই, অতএব ইহাতে বিধাতার দোষ কি? কারণ তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করেন এমত ব্যক্তি কেহই তাঁহার নিকট ছিল না।

৺রামনিধি গুপ্ত মহাশয় স্বরচিত সংগীত সকল মুদ্রিত করিয়া যে পুস্তক প্রকটন করেন, তাহার ভূমিকা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ভূমিকা"

এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপে ব্যক্ত থাকাতে কোনমত প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময় ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্ব সাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে! এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আত্মীয় বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল। বঙ্গ ভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে, তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের পুস্তকের দৃষ্টান্ত মত কহা যাইতে পারে না, এবং এই গীত সকলে আলাপচারি-দ্বারা যে সকল তান্ বসিয়াছে, তাহা কোন হিন্দুস্থানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিয়া দেওয়া এমত নহে'; অথচ গান করণ মাত্রেই রাগ রাগিনীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে। সঙ্গীত বিদ্যার সমুদয় রাগ রাগিনী অতি বিস্তর। কালে কালে তাহার অনেক লোপ হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যাহা আছে তাহাও অনেকে জ্ঞাত নহে, যাহা হউক, এই পুস্তকে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্মত এবং সঙ্গীতে পণ্ডিতগণের কল্পিত নানা প্রকার রাগ রাগিনীতে গান সকল প্রকাশিত হইল, এতদ্ভিন্ন রাগদ্বয়ে এবং রাগিনীদ্বয়ে মিলাইয়া কতক গীত প্রকাশ করিলাম, আর নির্ঘণ্ট পত্রিকাতে ঐ রাগ এবং রাগিনীর সময় নিরূপণ করিয়া অকারাদি রীতি ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করিলাম; অনুমান করি যে ইহাতে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারিবেক।"

নির্ঘণ্ট পত্র।

রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ	রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ
আড়ানাবাহার।	দিবা দেড় প্রহরের পর	ইমন পুরিয়া।	চারি দণ্ড রাত্রের পর
আড়ানা।	দিবা দেড় প্রহরের পর	ইমন কল্যান।	সন্ধ্যার পর।
আশা ভৈরবী।	বেলা এক প্রহরের পর	ইমন ভূপালি।	সন্ধ্যার পর।
ইমন।	সন্ধ্যার পর।	ইমন ঝিঁজিট।	সন্ধ্যার পর

রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ	রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ
এলাইয়া।	প্রাতঃকালে।	দেও গান্ধার।	সূর্য্যোদয়ের পর।
এলাইয়া ঝিঁজিট।	প্রাতঃকালে।	ধনেশ্রী পূরিয়া।	বেলা আড়াই প্রহরের পর।
কালাংড়া।	উষাকালে।	ললিত।	প্রভাত সময়।
কালাংড়া খাম্বাজ।	দুই প্রহর রাত্রের পর।	ললিত ভৈরব।	প্রভাত সময়।
কাফি ঝিঁজিট।	বৈকালে।	ললিত বিভাস।	প্রভাত সময়।
কানড়া।	রাত্রি এক প্রহরে।	পরজ।	মধ্যরাত্রি।
কামদ।	একপ্রহর রাত্রির পর।	পরজ কালাংড়া।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
কামদ গৌড়।	রাত্রি এক প্রহরের পর।	পাহাড়ি ঝিঁজিট।	দিবারাত্রি।
কামদ খাম্বাজ।	রাত্রি এক প্রহরের পর।	পূরবি।	দিবার শেষ প্রহর।
কাফি।	বৈকালে।	বিভাস।	প্রভাত সময়।
কাফি কোকব।	প্রাতঃকালে।	বিভাস কল্যাণ।	এক প্রহর রাত্রি থাকিতে।
কাফি জয় জয়ন্তী।	এক প্রহর রাত্রি পর।	বাগেশ্বরী।	চারি দণ্ড রাত্রির পর।
কাফি পলাস।	বেলা তৃতীয় প্রহরের পর।	বাগেশ্বরী টোড়ি।	চারি দণ্ড রাত্রের পর।
কেদারা।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর।	বাগেশ্বরা আড়ানা।	চারি দণ্ড রাত্রের পর।
কেদারা কামদ।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর।	বাগেশ্বরী কানড়া।	চারি দণ্ড রাত্রের পর।
কেদারা খাম্বাজ।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর।	বাগেশ্বরী মোলতানী।	বেলা তিন প্রহরের পর।
খট।	প্রভাত সময়।	বাগেশ্বরী বাহার।	বেলা তিন প্রহরের পর।
খাম্বাজ বাহার।	বেলা দেড় প্রহরের পর।	বেহাগ।	রাত্রি দেড় প্রহরে।
খাম্বাজ।	সন্ধ্যার পর।	বিহঙ্গ বাহার।	রাত্রি দেড় প্রহরে।
গারা ঝিঁজিট।	সন্ধ্যার পর।	বেহাগ সরফরদা।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে।
গারা কাফি।	সন্ধ্যার পর।	বাহার।	দিবারাত্রি।
গুজরি টোড়ি।	বেলা এক প্রহরের পর।	বেলওয়াল ঝিঁজিটী।	বেলা এক প্রহরের সময়।
গৌড়।	দিবা রাত্রি।	বেহাগ ঝিঁজিট।	রাত্রি দুই প্রহরের পর।
গৌড় মোল্লার।	দিবা রাত্রি।	বারোঁয়া।	তাবৎ রাত্রি।
গৌরী।	সায়ং কাল।	ভৈরব রাগ।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে।
ছায়ানট।	চারি দণ্ড রাত্রের পর।	ভেটিয়ারি।	উষাকালে।
জয় জয়স্তি।	রাত্রি এক প্রহরের পর।	ভিমপলাসি বাহার	বেলা আড়াই প্রহর গতে।
জয়জ ঝিঁজিট।	উষাকাল।	ভূপালি ঝিঁজিট।	রাত্রি এক প্রহরের পর।
যোগিয়া ললিত।	প্রাতঃকালে।	ভূপালি কল্যাণ।	সন্ধ্যার পর।
যোগিয়া গান্ধার।	সূর্য্যোদয়ের পর।	মালকোষ রাগ।	দুই প্রহর রাত্রের পর।
ঝিঁজিট।	দিবারাত্রি।	মালকোষ ভৈরব।	তিন প্রহর রাত্রের পর।
টোড়ি।	বেলা এক প্রহরের পর।	মালকোষ বসন্ত।	সন্ধ্যার পর।
দরবারি টোড়ি।	দিবা দেড় প্রহরের পর।	মালকোষ বাহার।	রাত্রি দেড় প্রহরের পর।
দরবারি কানড়া।	দিবা দেড় প্রহরের পরে।	মিয়ার কানড়া।	বেলা দেড় প্রহরে।
দেশকার।	চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে।	মোলতানি।	বেলা আড়াই প্রহর গতে
দেও গিরী।	দিবার প্রথম প্রহর।	মোলতানি পলাস।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।

রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ	রাগ প্রকরণ	সময় নিরূপণ
মোলতানি বাহার।	বেলা আড়াই প্রহর গতে।	রামকেলি ললিত।	দিবা চারি দণ্ড মধ্যে

রাগ সাগর

লুম।	বেলা দুই প্রহরের পর।	সিন্ধু।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে।
লুম কাফি।	বেলা দুই প্রহর গতে।	সিন্ধু খাম্বাজ।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে।
শঙ্করাভরণ।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে।	সাহানা আড়ানা।	রাত্রি দেড় প্রহর গতে।
শুরট।	রাত্রি দুই প্রহর গতে।	সিন্ধু কাফী।	রাত্রি এক প্রহর গতে।
শোহিনী।	রাত্রি দুই প্রহর গতে।	সরফরদা কালাংড়া।	উষাকালে।
শোহিনী কানড়া।	রাত্রি এক প্রহর গতে।	সরফরদা।	সূর্য্যোদয়ের পর।
শ্যাম পূরবি।	সন্ধ্যার পর।	হিন্দোল রাগ।	রাত্রি এক প্রহর গতে।
শ্যাম।	রাত্রি এক প্রহর গতে।	হিন্দোল বেহাগ।	বসন্ত ঋতুর দিবা ও রাত্রি।
শোহিনী মালকোষ।	বসন্ত ঋতুর রাত্রি এক প্রহর গতে।	হামির।	রাত্রি চারি দণ্ড গতে।
		হামির খাম্বাজ।	রাত্রি চারি দণ্ড গতে"।
শোঘরাই বাহার।	দিবা এক প্রহর গতে।		

৺রামনিধি গুপ্তের বিরচিত সংগীত।

আড়ানা। তাল জলদ তেতালা।

মেঘান্তে শশধর, মানান্তে তোমার বদন।
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে, তব বিরসে মম মন॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুখি শ্রবণ,

পুলকিত প্রাণ।
মানেতে মৌন তুমি, থাকলো যখন, যেরূপ
জলয়ে প্রাণ, জানে প্রাণ, সেই প্রাণ॥ ১॥

ভূপালিকল্যাণ। তাল জলদ্ তেতালা।

মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের নাহি কোন গুণ।
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন। রসনা কহিতে চায়, শুনিতে শ্রবণ॥
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায় কহনে,
যদি কোন কথা কয়, উত্তর না করি তায়, উপজয়ে মান
নয়ন অন্তর হয় করিতে রোদন॥ ১॥

গৌড় মোল্লার। তাল জলদ্ তেতালা।

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে॥

ভেকে বাজাইছে ভেরী সমীরণ বীণধারী,
চাতকী আলাপে পিউ, মনের হরিষে ॥ ১ ॥

গৌড়। তাল জলদ্ তেতালা।

আমারে কি হোলো সই, ওলো ধর ধর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাসে, অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
পীরিতে মিলন সুখ, বিচ্ছেদে তেমনি দুখ,
সুখ আশ করি, এখন যে মরি, তনু হোলো জর জর ॥ ১ ॥

মোলতানী। তাল জলদ্ তেতালা।

নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল ॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিকল। ১।
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল ॥ ১ ॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন।
যেরূপ তাহারে আমি, করি লো যতন,
সতত চাতুরি সখি, করে সেই জন ॥
সে বরং ছিল ভাল, না ছিল মিলন,
মিলনে এই সে হোলো, সদা জ্বলাতন ॥ ১

হামির। তাল হরি।

তাহারে কি ভুলিতে পারি, যাহারে আমি সঁপিলাম মন।
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন সুধা, শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কতমত, নাহি দেখি তার মত, সেজন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন ॥ ১ ॥

পরজ। তাল জলদ্ তেতালা।

কেন লো প্রাণ, নয়নে, অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি, হৃদি কমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিতে মন, এখন তা নয়।
আজি ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ।
নিকট না হোতে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥ ১ ॥

ভৈরব রাগ। তাল জলদ্ তেতালা।
বিনয়ের বশ যদি, হইত যামিনী।
প্রভাত প্রমাদ তবে, সহে কি কামিনী॥
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমন রাখিব আর, শুন গুণমণি ॥১॥

কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।
মুকুরে আপন মুখ, সতত দেখনা ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি ॥১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।
মুকুরে আপন মুখ, হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণে দেখি।
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ, জানে হে তোমার আঁখি ॥১॥

ভৈরবী। তাল জলদ্ তেতলা।
যুগল খঞ্জন হেরি, বদন কমলে। প্রাণ।
ভূপতি না হোয়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারাইল,
লাভতো হইল ভাল, গেল বিনি মুলে ॥১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।
তোমার সাধনা করি, সাধ না পূরিল।
মনের যে সাধ, তাহা মনেতে রহিল॥
তোমা বিনা কোন জন, তুষিবে, আমার মন,
জানিয়া না কর তুমি, বিষম হইল ॥১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।
নয়ন কাতর কেন, তাহারে না দেখিলে।
চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে॥
নয়ন আপন মতে, মনেরে আনিলে।
বিনা দরশনে দুঃখ, হায় কি করিলে ॥১॥
কেমন নয়ন মোর, না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥২॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি হোলে রাজেন্দ্র, আমি তব দাসী
তোমার অধীন হোয়ে থাকি, ভালবাসি ॥
করি অনেক সাধন, এমন হোয়েছে মন,
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবা নিশি ॥১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

তুমি মোর সুখের কারণ, প্রেয়সি।
সদা উল্লসিত চিত হেরি মুখ শশী ॥
রাজেন্দ্র যদিলো আমি, রাজেন্দ্রাণী হোলে তুমি,
উভয় পীরিতে হয়, দাস কেহ দাসী ॥১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ ॥

কাজল নয়নে আর, দিও না কখন।
শরে কেবা নাহি বরে, বিষযোগ তাহে কেন ॥
তোমার কটাক্ষে কেহ, না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে শুন ॥
সুধা হলাহল সুরা, নয়নের তিন গুণ ॥১॥

কালাংড়া। তাল জলদ্ তেতালা।

বদন শরদ শশী, পাষাণ হৃদয়।
অমিয় সমান ভাষি, মৃদু হাসি তায় ॥
লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আসে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হরে লয়।১॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

সরোজ উপরে দেখ, শোভে কুমুদিনী।
তার পর মধুকর, মোহিত অমনি ॥
দিবাকর নিশাকর, তার মধ্যে শোভাকর,
অরুণ অধতে শশী, নিরখ অমনি ॥১॥

এলাইয়া। তাল জলদ্ তেতালা।

নিশি পোহাইয়ে, প্রাণনাথ, প্রভাতে আইলে। হে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে ॥
যে রূপে যামিনী গত, সে দুখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে ॥১॥
কামিনী সহিত তুমি, রতি পতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে ॥২॥

৺রামনিধি গুপ্ত * ॥ তথা আখড়া।

আমরা গত ১ শ্রাবণ দিবসীয় প্রভাকর পত্রে ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্ত উপলক্ষে আখ্‌ড়াই সংগীতের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। এবারে তদতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

সর্ব্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখ্‌ড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় ১৫০ দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে, কিন্তু তাঁহারা "ভবানী বিষয়" গাহিতেন না, কেবল "খেউড় ও প্রভাতী" গাহিতেন, সেই সকল গীতে "ননদী, এবং দেওরা" এই শব্দ উল্লেখ থাকিত, এবং রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহাতেই অত্যন্ত আমোদ হইত। তচ্ছ্রবণে শান্তিপুরের স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই মহাশয়দের সময়ে যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরে গান করিয়া তাহাকেই "আখ্‌ড়াই" নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের আখ্‌ড়াই গাহনার দৃষ্টান্ত ক্রমে চুঁচুড়া ও কলিকাতাস্থ সংগীত বিদ্যোৎসাহি জনেরা সুর ও বাদ্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলা করত অনেকাংশ পরিবর্ত্তন করিয়া আখ্‌ড়ায়ের আমোদে আমোদি হইলেন। ইহাঁরা প্রথমে "ভবানী বিষয়" পরে "খেউড়" তৎপরে "প্রভাতী" এই তিন সংগীতের সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইতর শব্দ পরিহার পূর্ব্বক অতি সরল সাধু ভাষায় গান সকল রচনা করিতে লাগিলেন। এই সমুদয় গীত ও সুর এবং বাদ্য শুনিয়া বিশিষ্ট লোক মাত্রেই সন্তুষ্ট ও সুখি হইতেন।

চুঁচুড়ার দলেরা বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া যুদ্ধ করিতেন, ইহাঁরা হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি ২২ খানা যন্ত্র বাজাইতেন, ইহাতে তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে "বাইসেরা" বলিতেন। ঐ সময়ে সখের আখ্‌ড়াই লড়াই কলিকাতাস্থ বড় বাজার নিবাসী৺কাশীনাথ বাবুর ফুল-বাগানেই হইত, অন্যত্র হইত না। তৎকালে কেবল আড়া তালে বাদ্য হইত, অপর তাল ব্যবহৃত ছিল না।

ঐ সময়ের কিছু পরে পেসাদারদিগের যে কয়েকটা দল স্থাপিত হয়, তাহার দিগের সেই সকল দলের গীতযুদ্ধ এতন্নগরস্থ হালসীর বাগানে নিয়মিতরূপে সর্ব্বদাই হইত। ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহারদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া অর্থ দান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন। উক্ত মহাশয়গণের মধ্যে গোঁড়ামি সূত্র পক্ষ প্রতিপক্ষে নিয়ত কথায় কথায় কতরূপ বিবাদ কলহ হইত।

পেসাদার দলের মধ্যে "বৈষ্ণব দাস" নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত গুণী ছিলেন, তিনি আড়াতাল হইতে এক অত্যাশ্চর্য্য নূতনরূপ করত দৌড়, সবদৌড়, দোলন, পিড়েবন্দি, ও মোড় প্রভৃতি অতি সুশ্রাব্য মনোহর মধুর বাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়া সকলকেই মোহিত করিলেন। সেই বাদ্য যিনি শ্রবণ করিলেন, তাঁহারি শ্রুতিপথে সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ বিষয়ে বৈষ্ণব দাসকে কত প্রশংসা করিতে হয় তাহা বাক্য দ্বারা বিস্তারিতরূপ ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম।

---

*সংবাদ প্রভাকর, বুধবার ১ ভাদ্র ১২৬১ সাল। ইং ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।

অনন্তর "রামজয় সেন" নামক একজন বৈদ্য বৈষ্ণবদাসের সৃজিত সেই সমস্ত বাদ্য এবং তালকে সংশোধন পূর্ব্বক আরো অধিক উত্তম করিয়া লইলেন। ইহাঁরি নিকট ৺রসিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয় বাদ্য শিক্ষা করত অত্যন্ত বিখ্যাত এবং যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ 'ন্যাটা বলাই" নামক একজন স্বর্ণবণিক আখ্‌ড়াই বাদ্যে অত্যন্ত নিপুণ হইয়াছিলেন, "নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য এবং রূপচাঁদ" এই তিনজন স্বর্ণবণিক ইহাঁর নিকট বাদ্য শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শি হইলেন।

যোড়াসাঁকোতে যে আখ্‌ড়াই দল হয়,৺দুর্গাপ্রসাদ বসু মহাশয় তাহার সুর ও গীত রচনা করিতেন, ইনি এ বিষয়ে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। এই দলে ন্যাটা বলাই ঢোল এবং হোগলকুঁড়ে নিবাসী ৺পার্ব্বতীচরণ বসু মহাশয় বেহালা বাজাইতেন। পার্ব্বতীবাবুর বেহালা শুনিয়াতাবতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, ইনি বাগবাজারস্থ ৺রাধানাথ সরকারের তুল্য প্রতিযোগী ছিলেন।

এই সময়ের পূর্ব্বে নিমতলার দত্তবাবু এবং রামবাগানের দত্ত বাবুদিগের আখ্‌ড়ায়ের দুই দল ছিল, ও আর আর অনেক মহাশয়েরা দল করিয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন।

বৈদ্যকুলোদ্ভব ৺কুলুইচন্দ্র সেন সুরের যে নূতন প্রণালী বদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিধুবাবু তাহা হইতে বিস্তর বাহুল্য করেন, এবং তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। সেই প্রণালীই অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

মৃত গোলাম আব্বস, যিনি অদ্বিতীয় বাদ্যকর ছিলেন, তিনি আখ্‌ড়াই বাদ্য শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইতেন, এবং কহিতেন "এ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি কিছুই বুঝিতে ও শিখিতে পারি না।"

আমরা গত মাসে লিখিয়াছিলাম "শ্যামপুকুরে একবার মাত্র আখ্‌ড়াই দল হইয়াছিল" অধুনা নিশ্চিত অবগত হইলাম, শ্যামপুকুরস্থ বাবুরা দুইবার দল করিয়াছিলেন।

আমরা গত মাসিক পত্রে আখ্‌ড়াই গীতের আদর্শ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং "খেউড় ও প্রভাতী" গীতের কথা যাহা উল্লেখ করি, তাহাতে ভ্রম হইয়াছিল, এবারে সেই ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক নিধুবাবুর প্রণীত তিনটী গান অবিকল নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

যথা। ভবানী বিষয়।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভকরি,
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী।১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধে সাকারা,
তত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী ॥২
প্রণতে প্রসন্নাভাব, ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী।৩
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভব বারি,
পদতরি দেহি গো তারিণী ॥৪

যথা। খেউড়।

সাধের পীরিতি সুখে, দুখ পাছে হয়।১
তুমি হে চঞ্চল অতি, সদা এই ভয় ॥২
গোপনে যতেক সুখ, প্রকাশে ততই অসুখ,
ননদী দেখিলে পরে প্রণয় কি রয়।৩

তথা। প্রভাতী

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন।১
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসাসন,
হলে কিও, বিধুমুখ, হেরি হে মলিন ॥২
এ সুখে অসুখ তবে, করে কি অরুণ।৩

গাহনা ও বাজনার পদ্ধতি এবং আর আর ব্যাপার গত ১ শ্রাবণের পত্রে যাহা লিখিয়াছি তাহাই নিশ্চিত জানিবেন, যে কয়েকটি মূল বিষয় আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারি নাই, এবারে বহু যত্নে, বহু শ্রমে ও বহু কষ্টে তাহাই সংগ্রহ করিয়া পত্রস্থ করিলাম, গত বারের সহিত সংযোগ করিয়া পাঠ করিলে সবিশেষ যথার্থ ব্যাপার জানিতে পারিবেন।

গত মাসের পত্রে "পাখির দলের" কথা যাহা লিখিয়াছিলাম, নীমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত ৺রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় সেই দলের কর্ত্তা হইয়া সকল ব্যয় নির্বাহ করিতেন। নিধুবাবু রাজার উপর রাজা মহারাজা ছিলেন, এক দিবস প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা ৺"গঙ্গানারায়ণ নস্কর" পক্ষির দল দেখিবার অভিপ্রায়ে তাহারদিগের"আটচালা" নামক বাসার দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ?" নস্কর কহিলেন আমার নাম "গঙ্গানারায়ণ নস্কর, আমি তোমাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি" পাখি বলিল, "আচ্ছা এই খানে বৈস, আমি সংবাদ করি, রাজার আজ্ঞা হইলে যাইতে পারিবে" রাজা কহিলেন "সে কি? এক জনে নস্কর। সে জন্তু না মানুষ। উত্তর।মানুষ। প্রশ্ন। হিন্দু, না, মুসলমান। উত্তর, হিন্দু, গলায় পৈতে আছে" রাজা কহিলেন "একজনে, নস্কর, সে আবার হিন্দু, সূত্র ধর, এ কেমন হইল" এতচ্ছ্রবণে একটা পাখি কহিল "দ্বিজরাজ। আমি এখনি কয়েকটা অক্ষরের কোটা অনুসন্ধান পূর্ব্বক নির্ণয় করিতেছি" এই বলিয়াই কুলজী পাঠ করিতে লাগিল। যথা।

কস্কর, খস্কর, গস্কর, ঘস্কর, ঙস্কর।
মহারাজ। কয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
চস্কর, ছস্কর, জস্কর, ঝস্কর, ঞস্কর।
চয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
টস্কর, টস্কর, ডস্কর, ঢস্কর ণস্কর।
টয়ের কোটায় পাওয়া গেল না।
তস্কর, থস্কর; দস্কর, ধস্কর, নস্কর।
মহারাজ! পাওয়া গিয়াছে
পাওয়া গিয়াছে॥ কোথায় যাবে?
পাওয়া গিয়াছে।
"তস্করের ঘরে নস্করের বাস।"

গঙ্গানারায়ণ নস্কর এই বাক্য শুনিয়া অম্বল চাকা ভোম্বলদাসের ন্যায় ফ্যা ফ্যা করিতে করিতে অমনি উঠে ছুটে প্রস্থান করিলেন। পাখির দল দৃষ্টি করা তাঁহার মাথার উপরে রহিল।

স্বর্গগত ৺মহারাজ গোপীমোহন দেব বাহাদুর পক্ষির দলের কৌতুক দেখিবার মানসে বিস্তর যত্ন করাতে পক্ষিগণ কহিল "আচ্ছা আমরা যাইব, রাজা খাচা পাঠাইয়া দিন" রাজা "পাল্কী" নামক খাঁচা পাঠাইয়া দিলেন, পাখিরা তাহাতে আরোহণ করত রাজভবনে উপস্থিত হইল, বিহঙ্গ ব্যূহের অন্তঃকরণে স্থিরতা ছিল যে অগ্রে নৃত্যগীত করিয়া পরে "আধার" লইবে। রাজা বাহাদুর তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্রেই আহার প্রস্তুত করিয়া দিলেন, ইহাতে সকলেই আহার করত ফুড্ডুৎ ফুড্ডুৎ শব্দ করিয়া একে একে খাঁচা অর্থাৎ পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন "কি গো, তোমারদিগের আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য গীত দেখিতে ও শুনিতে আমার এত যত্ন, তাহাতো কিছুই হইল না।" পাখি সকল উত্তর করিল "আমরা আধার পাইলে আর কি থাকিতে পারি? অমনি হজম করিতে হইবে, আপনি যদি আগে আধার না দিতেন, তবে সকল প্রকার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে পাইতেন।" এই বাক্য শুনিয়া রাজা অবাক্ হইয়া রহিলেন, পাখিরা ফুড্ডুৎ ফুড্ডুৎ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

প্রাচীন কবি *

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবি-দিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি, নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলেপথে ও জলপথে গমন পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক গীতটী জানেন, ইহা শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়ে হউক তাহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটী আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক কেবল আক্ষেপ করিতেছি। অধুনা এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের কোন সুখই সুখ বোধ হয় না—কিছুতেই মন স্থির হয় না—অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মত একটী গীত পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে যদি আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতাম তবে এতদিনে বোধ হয় আশার অর্দ্ধেক ফল লাভ হইত। এইক্ষণে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের সাক্ষাৎ হইতেছে, কারণ অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র-পাত্র বিষম ব্যাধির আধার হইল; দুই মাস কাল নিয়ত শয্যা সার করত পরিশেষ দুই মাস কেবল জলে জলে বহুস্থলে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই, রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাচ, এ প্রত্যাশায় বিরত হই নাই। সুপ্তির যথার্থ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে এমত বোধ হইয়াছে, যেন আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমরা সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা নাই, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাসতা হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকটস্থ হইতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, যেহেতু ধনের দ্বারা সুসিদ্ধ না হয় এমত কর্ম্ম প্রায় দেখা যায় না, অর্থ পাইলে লোভাকুল হইয়া অনেকেই আমারদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করণে যত্নশীল হইতে পারেন। কি করিব? সে পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না, আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি, আর যত দূর সাধ্য ততদূর করিব। কেহ যদি অস্মদাদির যন্ত্রালয়াদি সর্ব্বস্ব লইয়া পুরাতন সমুদয় কবিতা প্রদান করেন, আমরা তাহাতে সর্ব্বতোভাবেই সম্মত আছি, পরাঙ্মুখ না হইয়া এই দণ্ডেই উন্মুখ হইব। ইহার নিমিত্ত যখন অমূল্য মহারত্ন পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভরিয়াছি, তখন সামান্য অর্থে কি অধিক মায়া জন্মিতে পারে?

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে সেই সেই ধনির সেই সেই ধ্বনি শরৎ কালের মেঘ-ধ্বনিবৎ মিথ্যা হইল। ধনাঢ্য

*সংবাদপ্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইংরাজী ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪।

জনেরা যদিস্যাৎ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবে এত আক্ষেপ প্রকাশ কেন করিতে হইবে ? সকলেই ধনের কেনা, ধন পাইলে কে না যত্ন করিবেন ? ফলে এখনো সময় বহির্ভূত হয় নাই, ইহার পর আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সুফল সিদ্ধ করা এককালেই নিষ্ফল হইয়া উঠিবেক, কারণ প্রাচীন লোকের অভাব হইলে আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? তখন কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ধন বিতরণ করিলেও ফলোদয় হইবে না। একে তো প্রাচীন অনুরাগি লোক সকল পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইদানীং যে দুই একজন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারদেরও আর বড় অপেক্ষা নাই, তাঁহারা কেহ কেহ কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন, ইহার পর ঐ মহাশয়দিগের অভাব হইলে সংপূর্ণরূপেই তাহার অভাব হইয়া যাইবে। কেহই এসকল কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কেবল মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সে অভ্যাস বৃথা হইতেছে। অক্ষরবদ্ধ থাকিলে অন্বেষণ দ্বারা প্রাপণ পক্ষ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অভ্যাসকর্ত্তা স্বয়ং যতদিন জীবিত থাকেন তত দিন তাঁহার অভ্যাসে ফল দর্শে, পরে সমুদয় বিফল হইয়া যায়।

যদিও অর্থ ব্যয় ও শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সমুদয় সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই উত্তম, উত্তমের অল্পাংশই অধিক! ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমিরময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যখন সর্ব্বস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—আমরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া সাহসকে সহায় করত প্রবৃত্তি দেবীর চরণ শরণ লইয়াছি। এ বিষয়ে এরূপ চেষ্টা ও যত্ন না করিয়া যদি আর পাঁচ বৎসর কাল আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া বৃথা যাপন করি, তবে এদেশে ঐ সমস্ত কবিরদিগের প্রণীত কবিতা গুলীন্ প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইয়া আসিবে। নব্য জনেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। এক শত বৎসরের অধিককালের কথা প্রসঙ্গ করিতে চাহি না, ৪০।৫০ বর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশে কবিগণের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কবিতা রচনা হইয়াছে তাহার যথার্থ গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রকৃত একখানি পুস্তক প্রকটন করিতে হয়। অদ্য বাসরীয় পত্রে যে কয়েকটী গীত উদিত হইল ইহার কোন কোন গীতে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

স্থানাভাব জন্য অদ্য আমরা কেবল **নিতাইদাস বৈরাগী ও রাম বসুর গান** মাত্র প্রকাশ করিলাম, ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য কবিদিগের কবিতা পত্রস্থ করিব, তখন তাবতেই পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন।

কোন কোন গান অসংপূর্ণ প্রকাশ হওয়াতে দুঃখরূপ অনলে আমারদিগের অন্তকরণ অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে। যথা রাম বসুর কবিতা।

"যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে হইত নির্ব্বাণ্।
নহে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে বাঁচিত প্রাণ্॥"

হে পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করুণ, ইহার পর ঐ কবি কিরূপ বিচিত্র বাক্ কৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যক্ত থাকা সাধারণ শোকের ব্যাপার নহে! আহা! ঐ কথাগুলীন্ লুপ্ত হওয়াতে ভাবগ্রাহি পাঠকের মন কেমন চঞ্চল হইতেছে! মধুকর প্রফুল্লপঙ্কজ-মধুপানে—চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত নীর-পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—ভুজঙ্গ

সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে ভূপতি স্বীয় প্রিয় সিংহাসনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং কৃপণ আপন ধনে বঞ্চিত হইলে যাদৃশ দুঃখিত না হয়, আমরা উত্তম উত্তম কবিতার অপ্রাপ্য অসংপূর্ণ পূর্ণ করণে বঞ্চিত হওয়াতে তদপেক্ষা সহস্র গুণে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই অভাব বিমোচন করিয়া দেন, তবেই স্বান্তকে শান্ত করিতে পারিব, নচেৎ তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না।

যৎকালে আমরা মনে মনে সংকল্প করিয়া এই মহাব্রতে ব্রতি হই, তৎকালে কৃতকার্য্য হওন পক্ষে কিছু মাত্রই ভরসা ছিল না, কিন্তু এই ক্ষণে বাঞ্ছাফলপ্রদ করুণাময় করুণ কটাক্ষ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সেই আশায় সুসার করিতেছেন। অতিশয় অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনার যোটনা হইতেছে। যাঁহার সহিত কস্মিন্‌কালে সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি হঠাৎ আসিয়া আপনিই দয়া বিতরণ করিতেছেন।—যাহার দ্বারা এ বিষয়ের আশা পূর্ণ হওনের অসম্ভাবনা জ্ঞান করিয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে।—দেশ বিদেশীয় অনেকেই অনুকূলভাবে আমারদিগের সহিত সমান উৎসুক হইয়া শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা সমান অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে যত উৎসাহি লোকের সংখ্যার আধিক্য হইবে ততই আমরা চরিতার্থ হইতে থাকিব। এই কার্য্য কখনই এক জনের সাধ্যাধীন নহে। ইহাতে বহুজনে সমভাবে অনুরত হইলে অনায়াসে বিড়ম্বনার পক্ষে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনাই হইতে পারে।—যাহাতে দশের মনোযোগ, তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? অতএব আমরা অত্যন্ত কাতর লইয়া বারম্বার বিপুল বিনয়ে ব্যক্তি করিতেছি, সকলে এই মহোৎসাহে কুৎসা না করিয়া যত্ন রত্ন অবলম্বন করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব।

কেহ যেন এমত বিবেচনা না করেন, যে, এইরূপ উপকার দ্বারা কেবল আমারদিগোই উপকৃত করিবেন। আমরা উপকারের কামনায় কদাচ এই শুভসূত্রের সঞ্চার করি নাই! ইহাতে আমরা যেরূপ উপকৃত হইব, তাঁহারা বরং ততোধিক উপকৃত হইয়া অধীনস্থ সমস্ত লোককে উপকার গুণে বদ্ধ করিবেন। এবং চন্দ্রাদিত্যের স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেশের প্রধান হিতৈষি বন্ধুরূপে পরিগণ্য হইবেন। এই সকল কবিতা প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বতন মৃত কবি মহাশয়েরা কীর্ত্তির সহিত পৃথ্বীতলে পুনর্ব্বার সজীব হইবেন! দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরব পুষ্পের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইবে। আধুনিক অহঙ্কারি অনিপুণ কবিদিগের গর্ব্ব পর্ব্বত চূড়া সহিত অধোভাগে নিপতিত হইবেক! যাঁহারা কবিতা প্ররচনা পথের পথিক হইয়াছেন তাঁহারা সহজেই কার্য সিদ্ধির উপায় পথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্ব্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কি রূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দুই একটা ইতর কবিতা শুনিয়া শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিরা থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেননা তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগি হইবেন।—সংপ্রতি আমরা প্রীতিচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্ব দেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন। স্থির ভাবে অবলোকন করিয়া মনের যত্নে মর্ম্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখি হইবেন। দেশস্থ প্রাচীন কবি কদম্ব কবিতা দ্বারা কত দূর পর্য্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা

প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন।—ইহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শব্দের কি লালিত্য! কি তাৎপর্য্য! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কোন পক্ষেই অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না। ইহারা যখন যে রসের কবিতা রচিয়াছেন, তখন সেই রসকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে যৎকালে রস-বিশেষের পুরাতন কবিতা পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয়, যে, সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরীলীলা দ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে।

আমরা অদ্য কেবল দুইজন কবির কবিতা পত্রস্থ করিলাম, এই সমস্ত হইতে বাছনী পূর্ব্বক নায়ক নায়িকার উক্তি ভেদের দুই একটি গান গান করিয়া অথবা পাঠ করিয়া দেখুন, এখনি বোধ হইবে, যেন স্ত্রী পুরুষ কিম্বা সহচরীগণ পরস্পর একত্র হইয়া আমারদিগের সাক্ষাতেই নানা ভঙ্গিমায় নানা কৌশলে নানা ভাবে নানা রসে কথোপকথন করিতেছেন। বিশেষতঃ রামবসু যেমন সরল শব্দে অতি সহজে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তেমন কেহই পারেন নাই, কিন্তু অপরাপর মহাশয়দিগ্যে কোন অংশেই ন্যূন বলিতে পারি না, তবে কোন কোন বিষয়ে কোন কোন পক্ষে কিঞ্চিৎ তারতম্য মাত্র!

আমরা গত কালের গত ব্যাপার যত অন্বেষণ করিতেছি ততই সুখি হইতেছি, কত কাণ্ড পুস্তক রচিলে গত কাণ্ড শেষ হইয়া উঠে তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অধুনা দুই শত বৎসরের পূর্ব্বকার কথা উত্থাপন করণে বিরত হইলাম। ১৪০ বা ১৫০ বর্ষ গত হইল "গোঁজলা গুঁই" নামক এক ব্যক্তি "পেসাদারি" দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তৎকালে "টিকেরার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। "লালুনন্দলাল, রঘু, ও রামজী" এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত "গোঁজলা গুঁই" প্রভৃতির সংগীত শিষ্য ছিলেন। রঘুর নিবাস ফরাসডাঙ্গায়, তিনি তন্তুবায় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, গান ও সুর করিতে ভাল পারিতেন। লালুনন্দলাল ও রামজীর বিবরণ অদ্যাপি জানিতে পারি নাই, এই তিন জন পুরাতন কবিওয়ালা, ইহাঁরদিগের সময়ে "কাড়ার" বাদ্যে সঙ্গত হইত। হরুঠাকুর প্রভৃতির সময়ে "যোড়খাই" তৎপরে "ঢোলের" সঙ্গত আরম্ভ হইল।

হরুঠাকুর রঘুর শিষ্য, ভবানে বেনে রামজীর শিষ্য এবং নিতে বৈষ্ণব লালু নন্দলালের শিষ্য। ইহারা গাহনা সমাপন সময়ে আপনাপন "ওস্তাদ্" অর্থাৎ গুরুর নামে ভণিতা দিতেন। যে কালে লালু নন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সে কালে "কৃষ্ণ" নামক এক জন চর্ম্মকার, যাহাকে সাধারণে "কেষ্টা মুচী" বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড় বড় "ওস্তাদি" দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। ঐ মুচি হরুঠাকুরকে অনেকবার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার গীতের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, দেশটা ভ্রমণ করিয়া শেষটা কেবল একটা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা।

মহড়া।

"হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে। ভাল প্রেম্ করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি, শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে।

চিতেন।

শ্যাম্ সেজেছ হে বেশ্, ওহে হৃষীকেশ্, রাখালের বেশ্ এখন্ কোথা লুকালে॥
মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে, গোপো গোপীকূলে, গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে॥"
ইহার অপরাংশ প্রাপ্ত হই নাই। এ গানের বয়স ৭০ বর্ষ হইবে।

আহা!—যখন এত শুচি।—সংগীত সুধায় এত রুচি তখন ইহাকে "মুচি" বলিয়া কে সম্বোধন করিবে? এই স্থলে দেখুন,—এতদ্ভিন্ন "নিমে শুঁড়ি" একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি, শুঁড়ি, মুচি হাড়ি, এতদ্রূপ সং কবি, সে দেশের ভদ্র লোকেরা আরো কত উত্তম হইবেন।

নিতাই দাসের "ওস্তাদ" লালু নন্দলালের কৃত একটী গান সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম, সকলে দেখুন। যথা।

মহড়া।

"গোলো এই সুখো লাভো পীরিতে। চির দিন্ গেল কাঁদিতে॥

চিতেন।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল্।
ডুবেছি না ডুব্ দিয়ে দেখি পাতলো কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো, তরণি লাগিলো ভাসিতে।

অন্তরা।

ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে, শরণে লইলাম্ যার।
তবু তার্ মন্ পাওয়া সখি, আমারে হোলো ভার্॥
না পূরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে॥"

এই গানের বয়স ৮০ আশী বৎসরের ন্যূন নহে। এ রচনাকে প্রশংসাই করিতে হইবে।

১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এদিক্ নহে বরং অধিক হইবে, "গোঁজলা গুঁই" যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন, কোন বিশেষ বন্ধুর করুণায় তাহার দুইটী গীতের কিয়দংশ লাভ করত সাধারণের গোচরার্থ প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকটন করিলাম। যথা।

"এসো এসো চাঁদবদনি! এ রসে নিরসো কোরোনা ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ, তুমি আমার তায় রতনমণি।১
তোমাতে আমাতে একই কায়া, আমি দেহ প্রাণ্
তুমিলো ছায়া, আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, মনে মনে ভেবে দেখ আপনি"॥২

তথা। "প্রাণ্ তোরে হেরিয়ে, দুখো দূরে গেলো মোর্।
বিরহ অনলো, হইলো শীতলো, জড়ালো প্রাণো চকোর॥"

ইহার প্রথম গানটী কি চমৎকার!—বেদান্ত সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্ত সূচক শব্দ বিন্যাস দ্বারা মনের ধ্বান্ত মোচন করিয়াছে। হায়রে, গুঁই, তুই, কি মানুষ ছিলিরে! মহাশূন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার, তাহার নাম "গোজ্লা" আঁজ্লার দ্বারা কি এই গোজ্লার নিরূপণ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবনের জন্য বদ্ধ রহিলাম।

এই সময়ে অগ্রে চিতেন ধরিয়া গাহনার প্রথা ছিল না। টপ্পার নিয়মানুসারে প্রথমে মহড়া ধরিয়া পরে পরে চিতেন ও অন্তরা গাহিত।

৺রাম বসু*

বঙ্গদেশীয় যে সকল মহাশয় বঙ্গভাষায় উত্তম রূপ কবিতা রচনা করত সাধারণের প্রিয় ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও যশস্বী হইয়াছেন, আমরা তাঁহারদিগের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত বিরচিত কবিতা সমুদয় সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করণার্থ অতিশয় যত্নশীল হইয়াছি। এবং এ বিষয় সুসিদ্ধ জন্য মানসিক পরিশ্রম সহযোগে কায়িক ক্লেশে শরীর পতন ও যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করণেও প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু এই অভিপ্রেত পরিপূর্ণ হওয়া বড় সহজে ব্যাপার নহে। ইহা "শব সাধনের" কার্য্য অপেক্ষাও গুরুতর। কারণ সমুদয়াংশ শুদ্ধরূপে একত্র সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত হইয়াছে, প্রাচীন ব্যক্তিরা তাবতেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনদিগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন কবি কদম্বের কীর্ত্তিও পৃথ্বী পরিত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা এই ক্ষণকার প্রাচীন, তাঁহারা পরম্পরা যাহা অবগত আছেন তাহাও অনেক গোলযোগে মিশ্রিত, যেহেতু সকলে সকল গানের সকল ভাগ জ্ঞাত নহেন, যিনি যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তিনিও তাহার এক এক অংশ বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা সংপ্রতি এতদ্রূপ দুইশত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক দিবস এ বিষয়ের প্রস্তাব করাতে পরস্পর সকলে কবিওয়ালাদিগের কবিতা গাহিতে ও মুখে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রায় কাহারো মুখ হইতে সংপূর্ণ একটী গান নির্গত হইল না। তবে দুই একজনের নিকট দুই একটী গীতের আদি অন্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল। পূর্ব্বতন লোকেরা পূর্ব্বে কবিতা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না, এবং তৎকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণের প্রথাও ছিল না। কাযেই ক্রমে তাহার লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, আমরা যখন এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি, তখন যতদূর সাধ্য ততদূর পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব; ইহাতে সর্ব্বতোভাবে সংপূর্ণ না হয়, অসংপূর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই ভাল।

৺"রাম বসু" যিনি কবিওয়ালাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি অতি ভদ্র কুলোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ, তাঁহার নাম "রাম মোহন বসু" কলিকাতার পশ্চিম পারস্থ শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাবতেই তাঁহাকে "রাম বোস্" বলিয়া জানিতেন, যথা "রাম বোসের দল", "রাম বোসের গান" ইত্যাদি। এই রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকো নিবাসী মান্যবর ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে তাঁহার পিসার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, ইনি "জন্ম কবি" ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন, যখন পাঠশালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কবিওয়ালা ভবানে বেনে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া বিস্তর উপাসনা করত তাঁহার নিকট হইতে গান সকল গ্রহণ করিত। ঐ সময়ে বসুর বয়স ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই, সেই সমস্ত গান গাহিয়া ঐ ভবানে বেনে অত্যন্ত প্রতিপত্তি করিয়াছিল।

---

*সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ১ আশ্বিন ১২৬১ সাল। ইং ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪।

এই মহাশয় ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ অভ্যাস করিয়া প্রথমে কোরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কবিতা কল্পে অতিশয় আমোদ জন্মিবার বিষয়কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, একারণ আশু সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাতে যতই তাহার অনুরাগের আধিক্য হইল, ততই দৈবশক্তির কৃপা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবম্প্রকারে রাম বসুর কবিত্ব কুসুমের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে বড় বড় "কবিওয়ালা" মাত্রেই তাঁহার অনুগত হইতে লাগিল। প্রথমে তিনি অনুরোধ-পরবশ হইয়া বিনা বেতনে গান বিতরণ করিতেন। পরে সংসারের প্রয়োজন কিম্বা অনটন বা প্রবৃত্তি অথবা লোভ দেবের আবির্ভাব বশতঃ মূল্য লইয়া গান সমস্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে তিনি ভবানে বেনেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার, সর্ব্বশেষে ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতাবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল করিয়া বসেন। সেই দল "রাম বসুর দল" নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৩৫ কিম্বা ৩৬ সালে রামবসু লোকান্তরিত হয়েন, ইনি ৪২ বেয়াল্লিশ বৎসরের অধিক কাল এই জগতীপুরে জীবত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে উক্ত কবি প্রচুর প্রকার সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক সমূহ সম্মান সহযোগে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মুরশিদাবাদস্থ ৺রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ভবনে ৺দুর্গা পূজার সময় গান করিয়া তথা হইতে পীড়িত হইয়া আসেন, সেই সাংঘাতিক রোগেই অনিত্য শরীর পরিত্যাগ করিলেন।

কলিকাতার নিজ্ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক "নল দময়ন্তী" যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা। "কেনে গো, সজনী আমার উড়ু উড়ু করে মন।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি আকিঞ্চন॥"

তথা। "নল্ নল্ নল, বলিস্ কি, তা বল।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল, কি সেই, কুলমজানে কামানল্॥"

রাম বসু "ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ" "বিরহ" "খেউড়" "লহর" "সপ্তমী" "শ্যামা বিষয়ের রণ বর্ণন" ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয় গান উত্তম রচিতেন! তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনারহিত, এই দুই গানেই তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন। তিনি সমস্ত গানই ভালরূপে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এক একটা "লহর" ও শ্লেষোক্ত "খেউড়" অতি সুন্দর, সর্ব্বমনোরঞ্জক, রহস্য পরিপূরিত।

যথা। "তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্
নয় কাজের কাজী, ঠাটের বাজী ভাইরে, যেমন্ ঢাকের পিঠে বামা থাকে,
বাজে নাকো একটি দিন॥" ইত্যাদি।

এই গানের সমুদয় প্রকাশের প্রয়োজন করে না। ইহার সমুদয় শুনিলে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।

আমি গুরুতর রোগে এক মাস শয্যাতে ছিলাম, উত্থান শক্তি ছিল না, অদ্যপি অত্যন্ত পীড়িত আছি, কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলপথে ভ্রমণ করিতেছি, এজন্য ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত

এবারে বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না। যদি জগদীশ্বর অনকূল হইয়া আশু আরোগ্য করেন, তবে অবিলম্বে মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে ত্রুটি কখনই করিব না।

যেমন সংস্কৃত কবিতায় "কালিদাস", বাঙ্গালা কবিতায় "রামপ্রসাদ" ও "ভারতচন্দ্র" সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় "রামবসু", যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধন লাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে "রাম বসুর গীত" আমরা পশ্চাদ্ভাগে উক্ত বসুর প্রণীত যে সকল গান প্রকাশ করিলাম যদিও তাহার কোন কোন গানের কোন কোন অংশের অভাব হইয়াছে, তথাচ তৎপাঠেই পাঠকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অধুনা আমরা যদি এরূপ প্রকটন না করি তবে ভবিষ্যতে এককালেই লোপ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য যখন যাহা প্রাপ্ত হইব, তখনি তাহা প্রকাশ করিব। ইহার অপ্রকাশিত বিষয়ের যে যে ভাগ যে যে মহাশয় অবগত আছেন, তাঁহারা অনুকম্পা পুরঃসর তত্তাবৎ লিখিয়া পাঠাইলে ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারিবেক।

যদিও প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেই এই সকল গীত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণকার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারো কর্ণে অদ্যাপি ধ্বনিত হয় নাই। এতৎ প্রকাশে তাঁহারদিগের কত উপকার হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।

যথা গীত। সপ্তমী। মহড়া।

তবে নাকি উমার্ তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ্। ওহে, শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে॥
এসে বল্তে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, উমা সব্ শুনেছে।
তোমায় দেখ্তে পাষাণী, আপনি ঈশানী, আসতে চেয়েছে॥
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে, আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

চিতেন।

তারা হারা হোয়ে নয়নের, তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা, মা বোলে॥
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে, যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

অন্তরা।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি। জাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতোনা হে সাধ্, হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥

চিতেন।

আশা বাক্যে আমার পাপপ্রাণ্, রহে বল কত দিন্।
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারি হীন, যেন মীন॥

যারে প্রাণ্ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আস্তেতো যেতে হয়।
যেন মাহীনা কন্যা, তিন্ দিনের জন্যে এলোহে হিমালয়॥
মুখে করি হা হা রব, ছিলেম্ যেন শব হে, গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে।

[এই সপ্তমী নিজ দলে গাহেন। পাঠকগণ মধুকর হইয়া এই গীত পদ্মের মধু পান করুন।]

সপ্তমী। মহড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে, রাজরাজেশ্বর, হোয়েছেন্ জামাই॥
শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর এখন্ নাই॥
যারে পাগল্ পাগল্ বোলে, বিবাহের কালে, সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন্ সেই পাগলের সব, অতুল বিভব, কুবের ভাণ্ডারী তার॥
এখন্ শ্মশানে মশানে, বেড়ায়্না মেনে, আনন্দ কাননে জুড়াবার ঠাঁই।

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিবো পরিবার॥
এখন্ যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ্, গঞ্জনা দূরে গেলো।
আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ, ব্যগ্রা হয়ে দাঁড়ালো॥
বলে তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল, দুখিনীরো দুখো ভাব্তে হবে নাই।

অন্তরা।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোতো মনে।
ভিখারির ভাগ্যে, পোড়েছেন দুর্গে, তার ভাগ্যে এমন্ হবে কে জানে॥
দুহিতার সুখো শুনিলে গিরি, যে সুখো হয় আমার।
আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে আর॥
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর্।
যেন করে স্বর্গ পাই, অম্নি ধেয়ে যাই, আনন্দে হোয়ে বিভোর্॥
শুনে আনন্দময়ীর, আনন্দ সংবাদ, আনন্দে আপনি আপ্না ভুলে যাই॥

অন্তরা।

এই খেদ হয়, সকল্ লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয়॥

চিতেন।

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ্, কত দিন কত কথা।
সে কথা, আছে শেল্ সম মম হৃদয়ে গাঁথা॥
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক্, সোণারো কার্ত্তিক্, ধূলায় পোড়ে লুটাতো॥

গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই।
[এই সপ্তমী চন্দ্রবৎ, পাঠকগণ চকোরবৎ হউন।]

সপ্তমী। মহড়া।

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা, ভিখারি হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল্, কি আছে সম্বল্, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে॥
শুনিয়া জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে॥
তুমি ইন্দুবদনি, কুরঙ্গ নয়নি, কনক বরণি তারা।
জানি জামাতার গুণ্, কপালে আগুন্, শিরে জঠা বাকোল পরা॥
আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে।

চিতেন।

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র রাণী করুণা বচনে কয়।
উমা মা আমার, স্বর্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়॥
মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবে নিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারিনে যে, দেখে আসি॥
আমি জীবন্মৃত হোয়ে আশাপথ চেয়ে, তোমায়্ না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে।

অন্তরা।

মরি ছি ছি ছি, একি কবার কথা, শুনে লাজে মরে যাই।
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন্ গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই॥
মাখে অঙ্গেতে ছাই।

চিতেন।

তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে খেদে ফাটে বুক্, তোমার এত দুখ্, সে দুখো ঘুচাতে নারো॥

[এই গীতের অন্তরার চিতেন ও মিল না পাওয়াতে অন্তঃকরণ অশেষ আক্ষেপ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।]

সপ্তমী। মহড়া।

গিরি, গা তুলহে, মা এলেন্ হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল জয়্ জয়্ দুর্গা জয়্॥
কন্যাপুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য, করা নয়।
আঁচল ধোরে তারা।
বলে'ছি মা, কি মা, মাগো। ওমা, মা বাপের কি এম্নি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী, প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।

চিতেন।

গতঃনিশিযোগে, আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার, হারা তারা ধন॥

দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
বলো মা কই, মা কই, মা কই, আমার, দেও দেখা দুখিনীরে॥
অমনি দুবাহু পশারি, উমা কোলে করি, আনন্দেতে আমি আমি নয়।

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার সমুদয়াংশ না পাওয়াতে অত্যন্ত খেদিত হইয়াছি।]

যদিও অনেকে অতি উত্তম উত্তম সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে নীলু ঠাকুরের দল সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় যশস্বী ছিল, কিন্তু রাম বসু সময়ে সময়ে যে দুই একটি সখীসংবাদ করিয়াছেন, তাহার তুল্য নাই ও মূল্যও নাই। অপিচ উক্ত বসুর বিরচিত সখীসংবাদ গাহিয়াই প্রথমে নীলু ঠাকুরের উচ্চ গৌরব হইয়াছিল।

"জলে কি জলে, কি দোলে, দেখগো সখী, কী হেলেগো হিল্লোলতে" ইত্যাদি।

নীলু ঠাকুর এই গানে বিশেষ বিখ্যাত হয়েন, কিন্তু এ গান রামবসুর রচিত। এতদ্ভিন্ন প্রথমে তিনি উক্ত ঠাকুরকে অনেক ভাল ভাল সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় গান প্রদান করিয়াছিলেন।

পত্র বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আমরা অধিক উদ্ধৃত না করিয়া নিম্নস্থ কয়েকটি সখীসংবাদ প্রকটন করিলাম; এতদৃষ্টে তাবতেই তাঁহার এ বিষয়ে কবিত্বশক্তির প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

সখীসংবাদ। মহড়া।

মান্ কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই দেখ্‌তে পাই,
সজল আঁখি জলধর বরণে। অতএব অভিমান্, মনে করিনে॥
আমি কৃষ্ণ প্রাণা রাধা। কৃষ্ণ প্রেম্ ডোরে প্রাণ্ বাধা
হেরি ঐ কালো রূপ্ সদা॥
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেম্ ধারা দুনয়নে॥

চিতেন।

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, করি মান্।
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যাম্‌কে হের্‌বনা আর সখী। বোলে চক্ষু মুদে থাকি॥
সে রূপ অন্তরেতে দেখি॥
কৃতাঞ্জলি, বনমালি, বনে স্থান্ দিও রাই চরণে॥

[এই গীতের পদ না পাওয়াতে আমরা পদশূন্য হইয়াছি। কি বিপদ! এমত সুপদ-সূচক পদ আমারদিগের নিকট বিপদ হইল।]

উক্ত সুকবি মহাশয় যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহার এক কিম্বা দুই মাস পূর্ব্বে নিম্ন প্রকাশিত সখী সংবাদ প্ররচন করেন।

যথা। মহড়া।

শ্যাম কাল্ মাঁন্ কোরে গ্যাছে, কেমন আছে, দূতী দেখে আয়।
কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হোয়ে খণ্ডিতে মরি হরিপ্রেমের দায়॥

ছলে আমার মন ছলেছে ॥
আগে বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে। চোখে দেখেগো। কয়্‌ কি, না কয় কথা ডেকে ॥
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়, অপ্রণয়, অম্‌নি সেধোগো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায়।

চিতেন।

সাধ কোরে কোরেছিলাম দুর্জ্জয়মান, শ্যামের তায় হোলো অপমান।
শ্যামকে সাধ্‌লেম্‌ না, ফিরে চাইলেম না, কথা কইলাম্‌ না রেখে মান্‌ ॥
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে। রাগে রাগে গো। পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে।
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব ভাব্‌, আবার এ, কি অপূর্ব্ব ভাব্‌,
পাছে রাগে শ্যাম্‌ রাধা আদর ভুলে যায় ॥

অন্তরা!

যার মানের মানে আমায় মানে। সে না মানে। তবে কি কর্ব্বে এ মানে ॥
মাধবের কত মান না হয় তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

চিতেন।

কৃষ্ণ বিরহে তনু জ্বলে। জ্বলে জ্বলে গো। জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ॥…
[ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় গীত না পাইবায় অত্যন্ত অসুখী হইলাম।]
মৃত্যুর পূর্ব্বকার রচিত বিরহ।

মহড়া।

ভাব দেখে করি অনুভাব্‌, ভাব্‌ বুঝি ফুরালো।
দিনের দিন্‌, রসহীন্‌, হোলে প্রাণ, আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো ॥…
তোমায় লোকে কয়, রসময়। মিথ্যা নয়, সে রস্‌ পরের কাছে হয়।
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয় ॥ তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি,
হয় শিরে সংক্রান্তি, যেন শান্তি শতকেতে পাঠ এগুলো ॥

চিতেন।

সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়।
তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান, বিরস্‌ বদন কেন হয় ॥
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে।
ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে। চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে ॥
এখন্‌ সদাই বদন বাঁকা, হোলে পর দেখা, সে সব্‌ শশিমুখের হাসি কমনে গেলো ॥

অন্তরা। চিতেন।

নাই তোমার এখন, সে সুহাস্য, সুদৃশ্য, সুবচন ॥
কথা হয়, যেন কে কারে কি কয়, প্রাণ সদাই অন্য মন্‌ ॥
তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ্‌। ও প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান্‌ ॥
কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ ॥
আমি হাজা প্রজা বোলে, জ্বলে জ্বালালে, আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো ॥

ঐ গীতের দ্বিতীয় গানের মহড়া।

প্রাণ বাঁধাতে কি করে প্রাণ মন্ বাঁধায় মজালে।
আমার প্রাণ, এক সমাণ, আছে প্রাণ।
তুমি রাগ্ কোরে পীরিতে ভাগ্ বসালে॥

[তাঁহার শেষ সময়ে এই দুই ভাবের গীত ভাবের শেষ হইয়াছে। ইহাতে ভাব, রস, প্রেম, কৌশল, কবিত্ব, পাণ্ডিত্য কোন বিষয়েরি অভাব নাই। ইহার সমুদয় না পাওয়াতে দুঃখ হৃদয় রাজ্য একেকালে অধিকার করিল।]

মহড়া।

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে। আমি দেশে যাই মনো দেও ফিরায়ে॥

চিতেন।

মধুর প্রয়াসে আমি, আইলাম তব স্থানে।
নলিনী কেন মগ্না হোলে মানে॥
আশা না পূরায়ে দিলে মধু। কেতকী কলঙ্ক কর স্থধু॥
মিছে দ্বন্দ্ব কোরে, জ্বলাও হে আমারে, নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে।

(রাম বসু অতি অল্প বয়সে এই গান রচনা করেন, নীলু ঠাকুর এই গীত গাহিয়াছিলেন। ইহার সমুদয় ও পাল্‌টা পাওয়া যায় নাই।)

মহড়া।

তোরে ভালবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম আমার দুকুল মজালি।
দুমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি॥
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি তাই বলি। আমি সাধে কি বিষাদে রোয়েছি।
কোরে না বুঝে লোভ, শেষ, পেয়ে ক্ষোভ, বলি কাকে, চোখে দেখে, ঠকেছি॥
যেমন মৎস্য মাংসভোগী, হয়েছিল জম্বুকী, তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি।

চিতেন।

পীরিতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥ আমি তুরি জন্যে হলেম্ পরের বশ।
আগে মান খোয়ালেম্, কুল মজালেম্, দেশ্ বিদেশে অপমান আর অপযশ॥
আগে দেখ্‌য়ে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি।

(এই গীত নিজ দলে গাহনা করেন। ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা পাওয়া যায় নাই।)

মহড়া।

পতি বিনে সই, সতীর মান্ কই, আর থাকে।
হায় আমি যেন হলেম সতী, বিপক্ষ তায় রতি পতি,
নারী হোয়ে কি কর্ব্ব তার, শিব্ ডরাতেন যাকে॥

আমার হোলো যার মানে মান্,
সে কই মান্ রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আইগো আই।
অন্য দিনের কথা দূরে থাক্,
সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই॥
হোলেম্ পতির পরিত্যেজ্যে,
থাক্‌তে দেয়না রাজ্যে সই,
আবার রাজারমসিল কালো কোকিল ডাকে॥

চিতেন।

পতি পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়॥
হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যা, কাযে ত্যাজ্যা সই,
লোকের যেমন নদী চড়ার সনন্দ॥
আমায় তাচ্ছীল্য দেখে তার,
দয়া হবে বল কার,
আমার পতি দত্ত জ্বালা, জুড়াবে কে॥

অন্তরা।

হায় আমার এ কথা, অকথ্য,
সত্যবাদী পতি আমার।
আসি আশা দিয়ে, গেল মন ছোলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার॥

চিতেন।

ফুলে বন্দি হোয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই॥
কত হবগো রমণী হোয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী॥
আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননের কুসুম্ যেমন সই.
ফুটে আবার শুখায়ে রয় কাননে॥
আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরু সৈন্য বেড়া চারিদিকে।
[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার পাল্‌টার অন্বেষণে অনেক যত্ন করিলাম। এই গান সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

তুমি কার প্রাণ। হানো কার পানে নয়ন বাণ।
তোমার নূতন যে প্রিয়তম,
হয়নি তার কোন ব্যতিক্রম,
কেন পরের দেহে থেকে বধ পরের প্রাণ।
[কোন মহাশয় এই গীতের সমুদয় প্রেরণ করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

মহড়া।

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে কোরে
প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হলেম্ তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন অনল নির্ব্বাণ॥
হেরি চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ্।
কথা শুনে প্রাণ জুড়াবে দেখায় দণ্ডবৎ॥
[এই গীতটী অতি চমৎকার। ইহার সমুদয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি।]

মহড়া।

আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।
আমি যে পর ভজিলাম্ সখি, পরসুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী, সে পরে পর ভেবেছে॥
অতঃপরে না জানি কি কপালে আছে।
যার লাগি ঘরে হলেম পর। সে ভাবিল পর।
পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর॥
পরমভাজন, ছিল যেজন, পরোক্ষে সে হাসিছে॥

চিতেন।

না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্‌লাম একবার।
সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে,
মন ছিল আমার॥
সে পর বিধির সংঘটন। পরম ভাজন।
তৎপরে তৎপরে ভেবে, পরে দিলাম্ মন॥
আবার তারে, অন্য পরে, পর কোরে রেখেছে।
[ইহার অন্তরা পাওয়া যায় নাই। নিজ দলে গাহনা করেন।]

মহড়া।

ওরে পীরিৎ তোর জ্বালা, তবে ঘুচাতে পারি।
তেজে সুখসাধ, লোক পরিবাদ,
যদি পরের মরণে আপ্‌নি না মরি।
ত্যেজে খল, এ সব ছল চাতুরী।
তোরে ভেবে পরের মত পর।

সোয়ে দুখ্, বেঁধে বুক,
একবার দেখ্‌ব হোয়ে স্বতন্তর ॥
হোয়ে আত্মসুখে সুখী, আত্ম কুশল দেখি,
পর উপকারো জন্মে না করি ॥

চিতেন।

তব অদর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে।
পথে দেখা হোলে যদি আর,
সখা বোলে না ডাকে ॥
যদি ভুলি পরদত্ত সুখ্।
নয়নে, হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ্ ॥
যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো,
আপ্‌নার যৌবনো, আপনি সম্বরি ॥

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন,
আপনারে ভেবে আপনা।
মনে প্রাণে এক ঐক্যতা কোরে,
দূরে তেজি পরের ভাবনা ॥

চিতেন।

পরকাতরা কেমন কুস্বভাব,
পরের দায়ে বাঁধা যাই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়,
তারি পিছু পিছু ধাই ॥
জানি প্রাণের অরি তুই রে প্রাণ।
দুখে দই, তবু সই, কথা কই, রেখে সম্মান ॥
তুই তো পলাস্ আমায় ফেলে,
আমি তোরে ভুলে,
উল্‌টে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি ॥
[এই গীত নিজ দলে গাহনা করেন।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ও পীরিৎ তুই আমার মনে থেকে ছেড়ে যা।
হবে নিবৃত্তি, এ সব প্রবৃত্তি,
আপনার্ মন হবে আপনি সোজা ॥
[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

প্রাণ বোলোনা প্রাণ। ছি ছি হাস্‌বে লোকে,
আমার পাকে হবে শেষে অপমান ॥
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ ॥
আমায় কোরে অন্তরের্ অন্তর,
যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
যে জন্ স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা ॥
ত্যেজ্য ধনের বাড়ায় সম্মান,
কর পূজ্য ধনের অপমান।

যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল তার সুখ।
আমার কেন, বোলে প্রাণ, বাড়াও দ্বিগুণ দুখ॥

চিতেন।

ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, গিয়েছে সে দিন।
এখন হোলেম প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফল হীন ॥
চোখের দেখা মুখের আলাপন,
হোলো সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান।
[এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিল। ইহার রচনা ও ভাব অতি সুন্দর।]

মহড়া।

আমি প্রেম কোরে কি এত জ্বালা সই।
কেউ বলে না ভাল, কলঙ্কিনী বই ॥
আমি তো কখনো কারো মন্দকারী নই—
তবে কেন বলেগো লোকে,
কুলকলঙ্কিনী এলো ঐ

চিতেন।

যে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্ছন।
প্রাণ জুড়াব কোথা, স্থান নাহি এমন ॥
ঘরে পরে করে গঞ্জনা, আমি মরমেতে মরে রই
[এই গীত মোহন সরকার গাহেন। ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় গীত পাওয়া যায় নাই।]

বিরহ। মহড়া।

পোড়া প্রেম কোরে কি,
পোড়ায় আমার জন্মটা গেলো।
যত দিন হোয়েছে মিলন্

এক দিন নাই তার্ কান্না বারণ,
পোড়া শিবের দশা যেমন তাই আমারে
হোলো ॥

চিতেন।

পোড়া প্রেমে মোজে হলো কি দশা আমার।
কর্ম্ম ভোগের যেমন্ কপাল্ আমার,
এমন্ খুঁজে মেলা ভার ॥
অস্থি ভাজা ভাজা হলো প্রেমের দায়
ভেবে তোর গুণাগুণ, মনের আগুন,
জল্‌ছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায় ॥
হোলে আমার সঙ্গে দেখা, সদাই মুখ বাঁকা,
তুইতো আর আর লোকের কাছে থাকিস্
ভালো।
[এই গীতের সমুদয় পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

কও বসন্ত রাজা।
তোমার কোথায় সে প্রবাসী প্রজা।
একা গেলে একা এলে,
দুখিনীর কি কোরে এলে,
তোমায় কি সে পাঠ্যে দিলে,
আমায়্ করতে ভাজা ভাজা।
আন্‌লে তারে, যে যার ধারেহে,
সব্ যেতো বোঝা সোজা ॥
তুমি নারীর বেদন জান না। ঋতুরাজ হে,
কেন তারে সঙ্গে কোরে আন্‌লে না ॥
কর অবলার উপরে বল্, ভাল খল্
দিলে পুরুষের বদলে নারীর সাজা।

চিতেন।

গ্রীষ্মে, বরিষে, আশার আশ্বাসে, প্রাণ রহেছে।
তার পর শরদ শিশির, বিরহিণীর প্রাণে
সয়েছে ॥
আমার প্রাণোকান্ত না আসায়। ঋতুরাজ হে।
তুমি হোলে শীতান্ত কৃতান্ত প্রায় ॥
যে জন ধারে তোমার রাজকর, দেশান্তর,
তারে আস্তে তো পাল্লে না কোরে সোজা।

অন্তরা।

আছি বিরহ বাসরে, নাথেরে ভেবে অন্তরে,
শর শয্যায় করিয়া শয়ন্।
সংগ্রামে পাণ্ডবের হাতে ভীষ্মদেবের দশা
যেমন ॥

চিতেন।

দেখ্‌লে না সে চক্ষে, যত বিপক্ষে, প্রাণ
জলালে।
দেখ বনের পক্ষ, সে বিপক্ষ, বসন্ত কালে ॥
তুমি উল্‌টা বিচারে করো না। ঋতুরাজ হে,
রাজাতে কি ছাজা শুকো ধরে না ॥
কোরে তোমার এ রাজ্যেতে বাস,
সর্ব্বনাশ হোলো দুখিনীর ভাগ্যেতে দুকূল
হাজা।
[এই গীত নিজ দলে গাহেন। এতচ্ছ্রবণে
সকলেই ক্ষুব্ধ হয়েন। ইহার পাল্‌টা গানের
মহড়া পশ্চাতে লিখিত হইল।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ঘর্ আমার নাই ঘরে।
মদন্ কর দিব কি তোমার করে ॥
ভূমিশূন্য রাজা তুমি, পতি শূন্য সতী আমি,
আমার স্বামী গৃহ শূন্য, কাল কাটালেন্ পরে
পরে।
সর সর, পঞ্চশর হে, ডর্ করিনে ও ডরে ॥
আমার জীবন শূন্য এ জীবন।
ঋতুরাজহে, শূন্য গৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ ॥

ঐ গীতের তৃতীয় মহড়া।

সব জ্বালা জুড়ালো।
আমার প্রবাসী নিবাসে এলো।
তুমি পেলে তোমার প্রজা,
আমি পেলেম্ আমার রাজা,
এখন তুমি মদন রাজা,
কার কাছে কর লবে বলো।
[শেষোক্ত দুই গানের সমুদয় যিনি প্রদান
করিবেন, তিনি পরম বন্ধুতার কর্ম্ম করিবেন।]

[মোহন সরকারের মৃত্যুর পর ঠাকুরদাস সিংহ সেই দলের অধ্যক্ষ হইয়া এই গীত এবং ইহার নিম্নভাগের প্রকাশিত গীত এই দুই গীত গাহিয়া অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েন। ইহাতেই তাঁহার নাম প্রকাশ হয়। রামবসুর কৃত সকল বিরহের মধ্যে এই দুই বিরহ অনেকেরি মনোরঞ্জক হইয়াছিল।]

বিরহ। মহড়া।

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে,
এই কি সেই আসি।
সুখের আশে, দুখে ভাসে,
বঁধু তোমারো প্রাণ প্রেয়সী।
বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপসী।
সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময়।
আশা দিয়ে আমারে, যাওয়া উচিত নয়॥
আসাপথ চেয়ে আমি, নয়নো নীরে ভাসী।

চিতেন।

এসো এসো এসো দেখি, প্রাণ একি,
দেখি চমৎকার।
অপরূপ আগমন, হইল তোমার॥
শশি সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন॥
আমারে বঞ্চনা কোরো, কোথা পোহালে নিশি।

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে, মনাগুনে,
আমি জ্বল্‌ব বই আর বল্‌ব কি॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন্ আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুখ, তোমায় বলিনে॥
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদলে,
ফলবে কি

চিতেন।

আমায় বোলে, আমারে ছোলে
প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্ধি হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে।
বিরল পেয়ে তুমি তার মধু খেয়েছ।
আপ্‌নি এখন্ রসহীন্ হোয়ে এসেছ।
বিরস্ মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী।
তুমি ছিলে যখন্ আত্মবশে রসে জুড়াতে।
পর হোয়ে আর কি এখন্ পর ভুলাতে॥

চিতেন।

আমার যা হবার হলো,
প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেম্‌নি হয়েছ।
সন্ধিযোগে যে শশির স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥
সারা নিশি, সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদমুখ দেখি।

[পাঠক মহাশয়েরা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই গীতে সমূহ সন্তোষ লাভ করিবেন, কারণ ইহাতে বিশেষ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে]

মহড়া।

এমন্ ভাব রাখা ভাব্ কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথা হে, যে ভাবে ভুলালে॥
ভাব দেখি নবভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর,
এখন তার অভাবে ভাবালে॥

চিতেন।

স্বভাবে অভাব আজ দেখিহে তোমার।
একি ভাবের দেখা, কও সখা, আবার॥
অনুরোধ প্রবোধিতে মন,
ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

অন্তরা।

মরি মরি, তোমার ভাবে ঝুরি,
জান কত ছল। মুখে বঁধু, যেন মধু,
হৃদে হলাহল॥

চিতেন।

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন্ সে পাপ।
মন্ ভেঙ্গেছে, আছে, লোক্ দেখা আলাপ॥

দেখে আঁখি হইত সুখী,
তাকি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে।
[এই গীত মোহন সরকার গাহেন]

মহড়া।

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে।
তারো মৃতপতি, কেন বাঁচালে॥
বিরহিণীর দুখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা।
আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা, সেঅদেখা, শত্রুবুঝাব কি বোলে

চিতেন।

অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।
একবার মনে করি, ভয়ে ভজ্ব মৃত্যুঞ্জয়।
আবার ভাবি তায় কি হবে।
রতিতো পতি বাঁচাবে॥
একবার মদন, হোয়ে নিধন,
নারীর গুণে জীবন পেলে।

অন্তরা।

মরি কি তার গুণের পতি।
কি গুণে বাঁচালে রতি।
অসতীরে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি॥
[মোহন সরকারের দলে এই গান গায়।
ইহার পদের চিতেন পাওয়া যায় নাই।]
পাল্টা গীত নিম্নভাগে প্রকাশ হইল।

মহড়া।

রতি কি, তারো নিজ পতি, করেনা দমন।
পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন্॥
নির্ব্বিবেকী নারী সে কেমন্।
আমরা নিজপতি জনে।
চাইতে না দিই কারো পানে॥
সে কেমনে, পতিধনে,
পরে সোঁপে ধরে জীবন।

চিতনে।

বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহী যুবতীর অঙ্গ দহে অনঙ্গ॥
যত কোকিলে কুহরে। তত হানে পঞ্চশরে॥
অবলারে, প্রাণে মারে, শরে করে দাহন।

অন্তরা।

রতি যদি পতিব্রতা।
সে কোথা তার পতি কোথা।
তবে কেন, পঞ্চবাণ,ফেরগো আমাদের হেথা।
[ইহারো অন্তরার চিতেন পাওয়া যায় নাই

মহড়া।

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হলো।
বিধি ঘটালে, উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো॥
উপায়, এখন্ কি করি বলো।
তুমি এ পথে এলে।
করে কুরব কুচক্রি সকলে।
দিনান্তর দিতে দেখা বুঝি সখা,
তাহা ঘুচিলো।

চিতেন।

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানাজানি কাণাকানি, করে রিপুগণ॥
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে, তা, কে জানে॥
না পেলেম প্রাণ জুড়াইতে,
লাভে হোতে, দুকুলো গেলো।

অন্তরা।

সরমে, মরি মরমে, লোক্ যদি হাসে।
তোমার লজ্জায়, আমারলজ্জায় বাঁচিব কিসে॥

চিতেন।

দুজনে গোপনে, যদি অন্য কথা কয়।
অমনি চমুকে উঠে, অভাগীর হৃদয়॥
ফুটিতে না পারি হায়।
যেন বোবার স্বপ্ন সম প্রায়॥
মনাগুনো মনে জ্বলে,
নয়ন্ জলে, হোয়ো প্রবলো॥
[এই গীত অগ্রে প্রকাশ করত ইহার পাল্টা
নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এতৎপাঠে তাবতেই
সুখি হইবেন।]

[ঠাকুরদাস সিংহ এই দুই গীত গাহেন।]

উক্ত গীতের পাল্‌টা। মহড়া।

এই কোরো প্রেম, গোপনে রেখো।
কেহ না জানে, তুমি আমি বই,
কথা প্রকাশ কোরোনাকো॥
দেখো প্রাণ্, অতি সাবধানে থেকো।
তোমায় আমায় ঐক্যতা।
কেউ শুনে যেন এ কথা॥
পথে দেখা, হলে সখা,
নয়ন্ ঠেরে সঙ্কেতে ডেকো।

চিতেন।

পীরিতের আশা, আমার নিরাশা বা হয়।
কুলনারী, সদাই করি, কলঙ্কেরি ভয়॥
যৌবন করেছি দান।
তার দক্ষিণা দিলাম্ কুলমান॥
না হই যেন অপমানী,
গুণমণি, দেখোহে দেখো।

অবলা, আমি সরলা, তায়্ কুলবতী।
প্রেমের আশে পাছে, শেষে বলে অসতী॥

চিতেন।

মনের মিলনে, মনে থাক্‌ব দুজনা।
তুমি কেবা, আমি কেবা, চেনা যাবে না॥
ঘন চাতকিনী প্রায়।
প্রেম্ সমানে থাক্‌বে দুজনায়॥
মেঘে যেমন শশী ঢাকা,
তেম্‌নি সখা, লুকায়ে থেকো।

[অতি সুন্দর অতি সুন্দর।]

মহড়া।

এত দিনে সই,
প্রাণ্‌নাথের আমার, মানভঙ্গ হয়েছে।
কদিন কথা ছিল না, ডাকলে দেখা দিত না,
সে আজ হাসিমুখে আসি বোলে গিয়েছে॥
ছিল যে সন্দ, সে স্বব্ দ্বন্দ্ব, ঘুচেছে॥
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।
কোন্ ছল পেয়ে প্রাণ্, কর্ব্বে যে মান্,
বাঁকাবাঁকির দফা রফা কোরেছি।
গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতো মনে তার,
এখন সে দোষে নির্দ্দোষী বিধি কোরেছে।

চিতেন।

ভালবাসি বোলে, ছলে কৌশলে
প্রাণ্ নাথের হোতো মান।
নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে,
সাধ্‌তে যেতো প্রাণ॥
যারে তিলেক, না দেখ্‌লে মরি।
তারে একলা রেখে, একলা থেকে,
ত্রিরাত্রি কি প্রাণো ধরিতে পারি॥
যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই,
সে আজ্ আপন সাধে এসে সেধে গিয়েছে।

অন্তরা।

আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়,
কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর।
নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই,
জ্বোলে মোর্ব্ব নিরন্তর।

[এই গীতের অন্তরার চিতেন ও পাল্‌টা গানের জন্য বিস্তর লোকের উপাসনা করা গিয়াছে, কোনখানেই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহার দ্বিতীয় বিরহ অতি উত্তম হইয়াছিল, রামবসু এই যোড়া গান নিজ দলে গাহিয়া তাবতের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।]

মহড়া।

যাক্‌রে প্রাণ,
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীৎ মন্ত্রণায়,
সাধের পীরিৎ ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল॥
দেখা শুনো পুন হবে হে, তার আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্যেরে হাস্য কৌতুকে।
পথে দেখা হোলো, যাব অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ।
ধোরে ভালবাসা ভাব্, হোলো ভাল লাভ্,
সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল।

চিতেন

পীরিতেরো সাধ ঘুচালে, দুখে জ্বলালে জীবন।
না জানি কারণো, কও কেন,
ভাংলো তোমার মন।

যা হোক্ ভাল ভালবাসিলে
খেয়ে আমার্ মাথা,
পরের কথায় পীরিত ভেঙ্গে পালালে ॥
কোরে আমার উপর রাগ, রাখ্‌লে যার সোহাগ
এখন্ তার আদরে তোমার আদর বাড়িল।

অন্তরা।

তোমার পীরিতি কি রীতি, হোলহে যেমন্,
হংসী মূষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পলায় ॥

চিতেন।

বিধিমতে আমায় মজালে, সুখে জলালে হৃদয়।
বুঝে দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয় ॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান্।
বল ভালবাসি,
সেটা কেবল দৈত্তোর হাসি, হাস প্রাণ।
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান, পেলেম্ ভাল জ্ঞান
এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল।
[এই গান নিজ দলে গাহেন।]

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সেতো আশাপথ নাহি চায় ॥
কি দিয়েগো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার ॥
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হোলে কাল, এ যৌবন কাল ॥
কালপূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তার আসায় আশার।

[এই গীত মোহন সরকার গাহেন। যিনি শুনিয়াছেন তাহাঁরি কর্ণে সুধা প্রবেশ করিয়াছে, ভাবে তাঁহার মন মোহিত হইয়াছে। তিনিই রসে গলিয়াছেন, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বিরহ কেহ কখনই শুনেন নাই, যিনি ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা গান দিতে পারিবেন, যাবজ্জীবন বিনা বেতনে তাঁহার নিকটে বিক্রীত রহিব।]

মহড়া।

আমার পতিকে বোলো, দেশের ভূপতি বসন্ত।
যদি সে রৈল দেশান্তর, কে দিবে রাজার কর,
হবে কি কোকিল রবে প্রাণান্ত ॥
সেতো জানেনা, ঋতুবসন্ত কেমন দুরন্ত।
অঙ্গ দে কর, বলে দে কর।
বলি সর, ওরে পঞ্চশর,
আমারদের ঘরেতে নাই ঘর ॥
মদন যে করে করের তরে, এমন্ আর কে করে,
ওরে সাধে কি কোরেছে শিব শাঁপান্ত।

চিতেন।

ভার্য্যে রেখে মদনরাজ্যে সই,
কান্ত গেল দেশান্তর।
সজনি, দিবা রজনী, বিরহে দহে কলেবর ॥
যেমন আমার কপাল পোড়া।
তেমনি সই, হর কোপে ঐ,
অনঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ পোড়া ॥
মদন সেই পোড়ার ভয়েতে পুরুষকে ধরেনা সই
এসে কামিনীর কাছে হোলো কৃতান্ত।
[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার দুই গান যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়াছেন। আক্ষেপ এই যে সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

যৌবন যক্ষের ধন, বিপক্ষে লোতে চায়।
আমায় সঁপিয়ে মদনে, সে রইল সেখানে,
এখানে সতী মরে পতির দায় ॥

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায়গো সে,
তারে বলি বলি, আর বলা হোল না ॥
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্ তাকে।
নিলজ্জ্যা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।

সখি ধিক্ থাক্ আমারে,
ধিক্ সে বিধাতারে, নারী জনম যেন করেনা

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল,
তাহে কালবসন্ত এলো।
এ সময়ে প্রাণনাথ, প্রবাসে গেলো॥
যখন হাসি হাসি, সে, আসি বলে।
সে হাসি, দেখিয়ে ভাসি নয়ন জলে॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরোনা।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি।
অনাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি॥
একি সখি হোলো বিপরীৎ,
রেখে লজ্জার সম্মান।
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ॥
(এই গীত ঠাকুরদাস সিংহ গাহেন। গান অতি চমৎকার, দুই অন্তরায় পরিপূর্ণ; আমরা সমুদয় প্রাপ্ত হই নাই। ইহার পাল্‌টা প্রস্তুত হয় নাই।)

মহড়া।

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ,
কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশিমুখে, কান্নাও আছে চোকে,
বচনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে॥
কোরে মান্, প্রেমের দুই পক্ষ সমান্ জানালে।
আমার এ পক্ষে, না কোরে বিপক্ষতা।
এক চক্ষে নিদ্রা যাও, আর চক্ষে জেগে রও,
সাপক্ষে দুই পক্ষে শীলতা॥
তোমার মানেতে নাই কৌশল,
না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়ন জলে।

চিতেন।

মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে,
প্রাণ তা ভেঙ্গে বল্লে না।
আকার ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
বুঝ্‌লাম্ যেমন মন্ত্রণা॥
আমায় নিগ্রহ করবে নাকি নির্দ্ধার্য্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কল্লে প্রাণ,
আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য॥
ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে,
আধো চাঁদ ঢেকেছে প্রাণ অঞ্চলে।

অন্তরা।

তোমায় কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান,
আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখ্‌লে সে মান্,
মলেও রাগ যায় না প্রাণ,
অথচ আমার পানে সুদৃষ্টি॥
আজ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।
[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার অপরাংশ ও পাল্‌টার সমুদয় ভাগ অতি উৎকৃষ্ট।]

ঐ গীতের পাল্‌টা গানের মহড়া।

তোমার মানের উপরে মান,
কোরে আজ্ মান বাড়াব।
আমায় আজ্ যেমন্ কাঁদালে,
পায়্ ধোরে সাধালে,
আমি আজ্ তেম্‌নি কোরে কাঁদাব॥
[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। যিনি অনুগ্রহ করিয়া পরিপূর্ণ দুইটি গীত প্রদান করিবেন তিনি আমারদিগের মহোপকারী বন্ধু হইবেন।]

মহড়া।

হায়রে পীরিত তোর, গুণের বালাই নে মরি।
যখন্ যারে পাও,
তার কি সুখো দুখো সব্ ঘুচাও॥
তুলো সিংহাসনে, কর পথের ভিখারী।
তোমার তরে সদা ঝুরেছে, কি পুরুষ কি নারী॥
একবার যার্ সঙ্গে যার পীরিৎ হয়।
সে তার্ নয়ন্ তারা, আর কিছুই কিছু নয়॥
ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলো তার সেই, চরণে ধরি।

চিতেন।

কি ক্ষণে এপ্রেমে লাগ লো প্রেম,

আমি জন্মে ভুলতে পারিনে।
দুখ·ভোগ, অনুযোগ, তবু না দেখ্‌লেতো
বাঁচিনে।
কেমন্ কোরে রেখেছিস্ আমায়।
তারে না দেখ্‌লে প্রাণ, আর কোথাও ন
জুড়ায়॥
মন্ স্বর্গপথে যেতে, বর্গ মানে না।
কেবল চতুর্ব্বর্গ ফল সেই চাঁদবদন হেরি॥

অন্তরা।

হায়, প্রেমের প্রেম, মনে উদয় হোলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেক না হেরে বিরহ বিকার,
পলকে পলকে, প্রলয় দেখি॥

[এই গীত নিজে গাহেন। ইহার পাল্‌টা ও সমুদয়াংশ পাওয়া যায় নাই, যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি প্রদান করিলে মহোপকার স্বীকার করিব।]

মহড়া।

তোরা বল্ দেখি সই
পুরুষের মান্ যায় কেমন কোরে।
আর মান সমাধান, কল্লে পায় ধোরে যে সই।
আমি নারী হোয়ে কোন্ মুখে
তায় সাধব পায়ে ধোরে॥

চিতেন।

ভেবে ছিলাম্ মনে, মোজে মানে,
আপনার মান বাড়াই।
তাহে একদিগে মান্ রাখ্‌তেগে সই,
দুদিগ্‌ বা হারাই॥
যখন্ মান্ কোরে, মানিনী হোয়ে,
রইগো মনের দুখে।
কতবার, তখন্ প্রাণনাথ আমার মানের দায়ে,
ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ্ দিয়ে মান্ রাখে॥
কতবার, তখন্ প্রাণনাথ আমার মানের দায়ে,
ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ্ দিয়ে মান্ রাখে॥
এখন্ আমার মান্, ভেঙ্গে দিয়ে,
উল্‌টে মান্ কল্লে সই, এবার তার মানের মান্
থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে॥

[নিজ দলে এই গীত গাহেন। ইহার সমুদয়াংশ ও পাল্‌টা পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

যার ধন তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ্ সখি।
হোয়েপরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষা দিতে,
যেমন অনলে পোড়ালে রাম্ জানকী॥
যে কণ্টক্ আমার পাড়ার লোক্,
এমন আর কোথাও না দেখি।
আমার অঙ্গেকাল্ সঙ্গে কাল,
তায় কাল্ এ বসন্ত কাল,
হোলো তিন্‌কালে নারী সারা চারা কি॥

চিতেন।

পেয়েছি পতিদত্ত নিধি, তায় বিবাদি, বিপক্ষ
ছজন।
মন্মথ, না হয় মন্মত, সদাই সে আকুল করে
মন॥
হোলো এইতো সুখ সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্ম্ম হীন, স্বপতি পরাধীন,
যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায়॥
এই উভয় শঙ্কটে সই, দুই দিকে সারা হই,
পতি ভাব্‌লেনা সতীর দশা হবে কি॥

[এই গীত নিজ দলে গাহেন। ইহার সকলাংশ ও পাল্‌টা যদি কেহ পাঠাইয়া দেন, তবে তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

মহড়া।

সখি বল্‌ব কি এদুখিনীর, কত জ্বালা বারমাস।
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হয়েছে যেন সীতের বনবাস।

[এই গীত ও ইহার দ্বিতীয় গান অতি চমৎকার হইয়াছিল। আমরা একটি মহড়া ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। নিজ দলে গাহেন।]

মহড়া।

তোমার প্রেম হোতে প্রাণ,
বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।
পীরিৎ হোলো আর ফুরালো,

চোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার হৃদয়ে বসেছে॥

[নিজ দলে গাহেন। এই মহড়া ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই।]

মহড়া।

ছিলে প্রাণ যে দেশে,
সে দেশে কি, বসন্ত আছে।
যত এদেশের কোকিলে,
আমায় স্থির হোতে না দিলে,
সেখানে কি তেমনি কোরে
ডাক্‌তো তোমার কাছে॥

[ইহার আর কিছুই পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

কার দোষ দিব কপালেরি দোষ আমার।
যেমন্ প্রাণনাথ, প্রাণে দেয় আঘাৎ,
তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।
কে আছে সপক্ষরে, বিরহী জনার॥
করে অনঙ্গ, যে রঙ্গ, প্রকাশিতে লজ্জা পাই।
অঙ্গে কর্ দিয়ে, কর্ সাধে গো সদাই॥
ভয়ে পুরুষে না ধরে, নারীবধ করে সই,
এমন্ মেয়েমুখো রাজার রাজ্যে নমস্কার॥

চিতেন।

সময়েরি গুণে সখিরে, করে হীন জনে অপমান।
কোথাগে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি, হেন স্থান॥
একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কালগুণে কাল্ বসন্ত উদয়॥
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যু বধের উদ্যোগ এবার॥

অন্তরা।

সই আমি যার, সে আমার ভেবে,
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয় পবন,
সে আমার কাল হোলো॥
তবে মরণ্ ভালো।

চিতেন।

প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন,
গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার।
হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল্।
আছি পথ্ চেয়ে রথ্ হোয়েছে অচল।
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো সই,
কালা কোকিলের রবে প্রাণে বাঁচা ভার॥

[স্বয়ং দল করিয়া প্রথমেই এই গান এবং পশ্চাদ্ভাগস্থ ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গান রচনা করেন। এমত উক্ত গান প্রায় শুনা যায় না।]

উক্ত গীতের পাল্‌টা।

যাক্ প্রাণ্ প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে পতিনিন্দে হয়।
আমি মরি, সহচরি, করিনে সে ভয়॥
দেখ আমি মোলে
কত শত নারী মিল্‌বে তার।
সখি সে বিনে, কে, আছে গো আমার।
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে,
কে দুষিবে তারে সই,
আমার পূজ্যধন বইতো তেজ্য ধন নয়॥

চিতেন।

গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্ কুল্,
তাহে নই আকুল।
লোয়েছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকূল,
যদি কুল কুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়।
অকূলের তরি, কূল্ পাব পুনরায়॥
এখন্ ব্যাকুলো হোয়ে কি, দুকুলো হারাব সই
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥

[কি মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, এরূপ সতী স্ত্রী উক্তি গীত কখনই শুনা যায় নাই, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরি নিকট নির্ভয়ে গান করা যায়।]

তেসরা পাল্‌টা। মহড়া।

এই খেদ্ তারে দেখে মর্‌তে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে, একবার্ ফিরে গেল না॥

চিতেন।

জীবনো থা কিতে প্রাণনাথ,
যদি নাহি এলো নিবাসে।
লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে ॥
আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
সৃজিলাম সই, কই হোলো সুখফল ॥
তরু সমূলে শুখালো, শেষে এই হোলো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না।
[এই শেষোক্ত দুই গানের সমুদয় না পাওয়াতে যাবজ্জীবনের জন্য অন্তঃকরণে ক্ষোভ রহিল।]

মহড়া।

কাল বসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্ব সৌরভ।
যে ধন্ দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ,
তায় বা করে গো আঘাৎ।
কত সই গো সই মুহুর্মুহু কুহু রব ॥

চিতেন।

শিশির নিশির যন্ত্রণা,
সই এ হোতে ছিলোতো ভালো।
বসন্ত, হয়ে কৃতান্ত, বিরহী বধিতে এলো ॥
মনের কথা কই এমন্ কে আছে।
দেশের রাজা যিনি, নারী বধেন্ তিনি,
তবে আর দাঁড়াব কার্ কাছে ॥
আসি সপ্তরথি মেলে, আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব।
[এই গীত নিজ দলে গাহেন। সমুদয় পাওয়া যায় নাই।]

মহড়া।

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলোনা বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে ॥
সে যে গিয়েছে দূর দেশ।
আছি কি মরেছি, করেনা উদ্দেশ ॥
পতি হোয়ে সঁপে গেল, মদন দুরন্তে।

চিতেন।

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে, প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥
সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ ॥
জানেনা কি কমল্ কলি, ফুটিবে মাসান্তে।

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো নাকি তার দয়া, রমণী রতনে ॥

চিতেন।

কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক্ তারে দিলেন দান,
দেখিয়া সুলোক ॥ করে করে কোরে সমর্পণ।
তারে বোল্লেন্ সুখে, কোরোহে পালন ॥
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন কৃতান্তে।
[এই গীত মোহন সরকার গাহেন।]

মহড়া।

কও দেখি প্রেম্ কোরে প্রেমির মান থাকে কিসে।
তুমিতো প্রেমে পণ্ডিত,
কত প্রেম কোরেছ এই বয়সে ॥

চিতেন।

বাসনা করেছি মনেহে, করিব পীরিৎ।
অপমানের ভয়ে প্রাণ, সদা সশঙ্কিৎ ॥
সাধে পাছে রটে, পরিবাদ্।
ডুবিবে অবলার কুল, এ বড় প্রমাদ্।
হোয়ে প্রেমাধিনী, অপমানী না হই যেন শেষে।
[ঠাকুরদাস সিংহ এই গীত গাহেন।]

৺রাম বসু *

[দুই]

[গত ১ আশ্বিনের প্রকাশিত পত্রের শেষ।]

আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে ৺রামমোহন বসুর জীবন বৃত্তান্ত প্রকটন করত কতিপয় কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তৎপাঠে অনেকেই প্রীত হইয়াছেন, এবারে আবার তদতিরিক্ত অনেক গুণীন গান সঙ্কলন পূর্ব্বক অতি যত্নে পত্রস্থ করিলাম, বোধ করি, অনুরাগ সহযোগে ইহাতে নয়নান্তপাত করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা সকলে অধিক সুখানুভব করিবেন, এতন্মধ্যে এক একটি গান এ প্রকার চমৎকার আছে, যাহার গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যাইতে পারে না। যে পর্যন্ত রাম বসুর মৃত্যু হইয়াছে, সে পর্যন্ত কবিওয়ালাদিগের কবিতা শুনিয়া আর কেহই সুখি হয়েন না, তাহার অভাবে এককালেই এ বিষয়ের অভাব হইয়াছে বলিতে হইবেক। কোকিলের কুহুরব নিবারণ হইয়া এইক্ষণে কেবল ভেকের ধ্বনি হইতেছে, অতএব এখন এই কুরবে অধীর না হইয়া বধির হওয়াই কর্ত্তব্য হয়। নেত্র-সুখকর মনোহর ফুল্লারবিন্দ-মকরন্দ পান করিয়া আনন্দ লাভ করিলে আর কি রসহীন কণ্টকময়-কেতকী কুসুমে আসক্তি জন্মে ?—নীরদ নির্গত নীরানন্দ পরিহার-পূর্ব্বক নিরানন্দকর লবণনীরধির নীরে কি আনন্দ জন্মিতে পারে ?—সুবর্ণ-সুবর্ণ-দর্শক অপক্ক আম্ররূপ-বৎ তাম্রদৃষ্টে কি নয়নের তৃপ্তি জন্মাইতে পারে ? যাহা হউক, কীর্ত্তিকুশল মহাত্মাগণের কীর্ত্তিকলাপ পৃথ্বীময় ব্যক্ত হইলেই অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর আমারদিগের এই সঙ্কলিত কল্পে কল্পের ঘটনা না করিয়া অল্পে অল্পে প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে থাকুন।

অনেক গীতের অনেকাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ইহার নিমিত্ত আমরা বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি, এবং অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াছি, তথাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সুধা পানে ক্ষুধা নিবারণ না হইলে যেমন অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আক্ষেপ জন্মে, তদ্রূপ এতদ্বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য আমারদিগের মনের সকল অভিপ্রায় বিপুল বিলাপেই বিলুপ্ত হইতেছে। কি করি, সাধ্যের অতীত কিছুই হইতে পারে না। যতদূর সাধ্য তাহা করিলাম, অথচ সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিতে পারিলাম না। যে যে মহাশয় যাহা যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলে সংপূর্ণরূপ না হউক অনেকাংশেই মানস পরিপূর্ণ হওনের সম্ভাবনা বটে। কি পরিতাপ! দেশীয় লোকেরা ইহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, এই স্বাদে স্বাদিত নহেন, যিনি কিছু কিছু জানেন, তিনি মনে করেন, তাহা লিখিয়া পাঠাইলে বুঝি তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া আমারদিগের রাজ্য লাভ হইবে। আমরা কিছু লাভের প্রত্যাশায় লোভের অধীন হইয়া এ বিষয় প্রকাশার্থ ব্যাকুল হই নাই, কেবল পূর্ব্বতন সুকবি কদম্বের কীর্ত্তিকলাপ প্রকটন করিয়া দেশের হিত সাধন জন্য এতদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছি, কারণ এতদ্দ্বারা আধুনিক নব্য ভব্য সভ্য জনেরা কাব্য ঘটিত প্রাচীন ব্যাপার যতই জ্ঞাত হইবেন, ততই সুখি হইতে পারিবেন, এবং গীতের রচনা দৃষ্টে ভাব, রস, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া অনেক উপর প্রাপ্ত হইবেন, শিক্ষার্থিগণ রসজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া রচনা প্রণালী পক্ষে পরম পারদর্শি হইবেন।

আমরা রামবসুর গীত সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই রাসু নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নীলঠাকুর, নিতাইদাস বৈরাগী প্রভৃতি প্রাচীন বিখ্যাত কবিওয়ালা দিগের জীবন-চরিত সম্বলিত উত্তম

*সংবাদপ্রভাকর, সোমবার ১ কার্তিক ১২৬১ সাল। ইং ১৬ অক্টোবর ১৮৫৪।—স

উত্তম কবিতা সকল, ও কীর্ত্তনওয়ালাদিগের কীর্ত্তন, যাত্রা ও ঢপওয়ালাদিগের "ধুয়া" "পদ" ও তুক্কা সমুদয় নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতেছি। ক্রমে ক্রমে তাহা পত্রস্থ করিয়া সাধারণের সুবিদিত করিব।

আমরা যে সকল কবিতা প্রকাশ করিতেছি, সুর সম্বলিত তাহার গাহনা শুনিলে অন্তঃকরণে আশু যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, মুখে পাঠ করিলে তত সুখোদয় হইতে পারে না। ইহার ফলে কবির কবিত্ব ও বিদ্যার কি অন্যথা হইতে পারে? ঐ সমস্ত কবিতার সুর অদ্যাপি অনেকেই জ্ঞাত আছেন, তাহা বড় কঠিন নহে, সহজেই শিক্ষা হইতে পারে, যৎকিঞ্চিৎ যত্ন করিলে অনায়াসেই সুরজ্ঞ-জনের নিকট হইতে অভ্যাস করিতে পারিবেন।

"হাফ্ আখড়াই" "দাঁড়া সখের কবি" ও "পেসাদারি" কবিতার গাহনার প্রণালী এক প্রকার। কিছু মাত্রই প্রভেদ নাই। প্রথমে "চিতেন" পরে "মহড়া" সর্ব্বশেষে "অন্তরা" গাহিতে হয়, কিন্তু লিখন কালে অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, শেষে অন্তরা লিখিতে হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা অবিদিত আছেন, তাঁহারদিগের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে, পাঠ কালীন্, প্রথমে "চিতেন" পরে "মহড়া" তৎপরে "অন্তরা" পাঠ করিবেন, এবং সুর করিয়া গাহিতে হইলেও উক্তনিয়ম অবলম্বন করিবেন।

আমরা প্রথম-বারে যে সকল গান মুদ্রিত করিয়াছিলাম, তাহার যে যে অংশ অসংপূর্ণ ছিল, এবারে সেই সকল গানের অনেকাংশই পরিপূর্ণ হইয়াছে। বোধ করি এবারে যাহা অসংপূর্ণ রহিল, ভবিষ্যতে তাহা সংপূর্ণ হইবে, কিন্তু সংপূর্ণভাবে সংপূর্ণ হইবে এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, তবে প্রকৃষ্ট ব্যাপারের যতদূর হয় ততদূরকেই মহোপকারের ঘটনা বলিয়া রটনা করিতে হইবেক।

কবির দলের কবিতা সকল "পয়ার ত্রিপদী, চৌপদী" ইত্যাদি কোন গ্রন্থের ছন্দে বর্দ্ধিত নহে। শুদ্ধ সুরের উপরেই নির্ভর করে। সুরানুযায়ি শব্দ বসিয়া থাকে, ইহাতে কথার ন্যূনাধিক হইলে কোন মতেই দোষ হইতে পারে না। কারণ সুরের অনুরোধে শব্দ সংযোগ করিতে হয়, এজন্য আমরা সুরানুগত উচ্চারণ ভেদে পদ সকল লিপিবদ্ধ করিলাম।

যথা।

কখনো, তখনো, বরনো, নীলো, কমলো, গমন্, ধর্, মান্, কর্, বল্,
হাস্, বাস্, ধরো, করো ইত্যাদি।

অতএব পাঠক মহাশয়েরা এরূপ লেখাকে অশুদ্ধ জ্ঞান করিবেন না।

বঙ্গ দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং জন্মাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, উড়িষ্যা রাজ্যে অথবা অপর কোন স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা এ রসের বিশেষ রসজ্ঞ হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার দিগের কর্ণ-কুহরে এবিষয়ের ধ্বনি কখনই ধ্বনিত হয় নাই; সুতরাং অপরিচিত বিষয়ে পরিচিত হওনে উপদেশের অপেক্ষা করে। যে কোন ব্যাপার হউক, তাহার প্রথা ও প্রণালী পরিজ্ঞাত না হইলে তৎপ্রতি কখনই প্রীতি জন্মিতে পারে না। প্রগাঢ়রূপ প্রযত্ন পুরঃসর চিত্তকে তন্মধ্যে বিনষ্ট করত স্থির ভাবে যত তাহার মর্ম্মানুধাবন করিবেন, ততই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

অধুনা দূরস্থ মহাশয়দিগের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশস্থ সমস্ত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এ ব্যাপার প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহেন, ২৫ বা ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, অধুনা যখন তাহাই লোপ পাইয়া আসিতেছে, তখন বহুকালের প্রাচীন বিষয়ের প্রসঙ্গ

করাই বিফল হইতেছে। আহা! পূর্ব্বতন কবিগণ কি সকল আশ্চর্য্য কবিতাই রচনা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় অপ্রকাশ থাকাতে কি বিলাপের ব্যাপার হইয়াছে! এইক্ষণে সংগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করা মহাবীর হনুমানের মহানাটক উদ্ধার করণের অপেক্ষাও কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি, ইহা কোন রূপেই এক ব্যক্তির সাধ্যাধীন নহে, নরলোকে বাস করিয়া পরলোকে গমন করিতে না হইলে এক দিনের সাহস করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেও হওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার-ন্যায় পরমায়ু, কুবেরের ন্যায় ধন, ভীমের ন্যায় বল, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্যা, এবং কর্ণের ন্যায় দানশক্তি, এই কয়েকটীর একত্র সংযোগ হইলে কি হয় বলিতে পারি না, ফলে তাহা হইলেও সুসিদ্ধি কল্পে সন্দেহ হইতেছে, কেননা যাঁহারদিগের দ্বারা সংগ্রহ করিব এমত ব্যক্তির প্রায় অভাব হইয়াছে, যাহা হউক, যখন প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন জীবন ও উত্থানশক্তি সত্বে কখনই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিব না, যত দূর সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারি তাহাই করিব।

গত মাসিক পত্রে…এক গান প্রকাশ করা হয়। যথা,

"ওলো সুধাংশু মুখি প্রাণ্,
কি নূতন্ মান্ দেখালে॥
তোমার হাসি শশিমুখে, কান্নাও আছে চোকে,
বচনে মান রেখে প্রাণ্ জুড়ালে॥"

[ইহার পাল্টা গীতের কিয়দংশ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকটন করিতেছি, সকলে দৃষ্টি করুন।]

মহড়া।

তোমার মানের উপরে মান,
কোরে আজ্ মান বাড়াবো।
আমায় কাল্ যেমন কাঁদালে,
পায়্ ধোরে সাধালে,
আমি আজ্ তেম্নি কোরে কাঁদাবো।

চিতেন।

প্রাণ যে কোরেছ নিদারুণ্ মান,
সাধ্তে গেল আমার প্রাণ।,
কোন দুষি নই, তবু সকল সই,
প্রেম্ সম্বন্ধে মান্যমান॥
কেমন কোরেছ পীরিতে পদানত।
সঁপিলাম ধন প্রাণ্, তবু মন পাইনে প্রাণ্
অপমান প্রাণে সব কত॥
কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন কপাল মন্দ,
গোবিন্দ জুড়ান তো প্রাণ্ জুড়াবো॥

[এই গানের সকলাংশ না পাওয়াতে যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।]

গত ১লা আশ্বিনের পত্রে লিখিত হয়। যথা।

"সখি, বল্ব কি, এ দুখিনীর এ জ্বালা বারমাস
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে
হয়েছে যেন সীতের বনবাস॥"

[অনেক চেষ্টা করিয়া ইহার প্রায় সমুদয় ও দ্বিতীয় গানের কিয়দংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।]

যথা। মহড়া।

সখি বল্ব কি এ দুখিনীর এ জ্বালা বারোমাস
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হোয়েছে যেন সীতের বনবাস॥
যদি কই, তবেই সই, সর্ব্বনাশ।…

চিতেন।

ভাল্ শুভক্ষণে, তাতে আমাতে,
এক্ রজনী দেখা সই।
তারপর্ আমিই বা কে, সেই বা কে,
কর্ম্মে পাওয়া গেল কই॥
কেমন হোয়েছে দৃষ্টি পোড়া সার।
চক্ষে দেখতে পাই, দুঃখে মোরে যাই,
করে না সাপক্ষ ব্যাভার॥

আমি লজ্জা খেয়ে যদি, করি সাধাসাধি,
উল্‌টে সে করে আমায় উপহাস ॥

অন্তরা।

সই। আগে ছিলাম্ সুখে নব বালিকে,
এখন সে কলিকে ফুট্‌লো।
মধুবতী হেরে বঁধু বিগুণ,
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে উঠ্‌লো ॥

চিতেন।

পূর্ণ ষোলকলা, ষোড়শী বালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।
কৃষ্ণপক্ষে যেন দিনের দিন,
হোচ্ছে কলানিধি ক্ষয় ॥

আমার এ ধনের সম্ভোগী যেজন্।
কল্লে না রক্ষে, সঁপে বিপক্ষে, আগুলে বেড়ায় পরের ধন্ ॥
রেখে এক্‌লা অবলারে, বিরহ বাসরে, করে সে পরের সঙ্গে সহবাস ॥

[গত ১ আশ্বিনে এই গীতের কেবল মহড়া মাত্র সংগ্রহ হইয়াছিল, অদ্য চিতেনের সমুদয় মহড়ার কিয়দংশ ও অন্তরা এবং অন্তরার চিতেনের সমস্ত কথা, ও দ্বিতীয় গীতের চিতেন মহড়া সংগ্রহ করত প্রকটন করিলাম, এতৎপাঠে তাবতেই পুলোকিত হইবেন, এই দুই গীতের যে অংশ গুপ্ত রহিল, বোধ করি বন্ধুগণের গুপ্ত সাহায্যে ভবিষ্যতে তাহা গুপ্ত রহিবে না।]

ঐ গীতের পাল্‌টা।

মহড়া ॥

প্রাণনাথেরে প্রাণসখি তোম্‌রা কেউ বুঝাও ॥
আমি বল্লে তো শুন্‌বেনা স্বভাব দোষ ছাড়বেনা,
বোলবোনা কোথা যেও না যেও।
যৌবন যায়্, একবার্ তায় শুনাও ॥
কেমন্ পোড়েছি বিষ্-নয়নে তার্।
ফুট্‌ল এ মুকুল, হয় না অনুকূল,
ভ্রান্তে কি মাসান্তে একবার ॥
থাক্তে বর্ত্তমানে পতি, সতীর এ দুর্গতি,
পারতো সকল জ্বালা ঘুচাও।

চিতেন।

বুঝলাম মনে মনে, কোকিলের গানে,
ডুব্‌লাম কলঙ্কে এবার।
তেজ্‌লাম সকল সুখো ভোজে যায়,
মোজলাম্ বিচ্ছেদে তাহার ॥
আমি সাধে কি সাধিনে গো তায়।
দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়,
সে যেন চোখের মাথা খায় ॥
হোলো কি গুণে পরের বশ্,
ছেড়ে সে ঘরের রস্,
গোপনে দুটো কথা সুধাও।

[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।]

মহড়া।

মান্ যদি না রাখ প্রেমে মিথ্যা মজাবে।
কুলবালা, এ অবলা,
শেষে ভেবে কি প্রাণ্ যাবে।…

চিতেন।

পীরিতে মজাতে সখা, দেওহে দেখা,
দিনে শতবার।
কোরো প্রাণোপণ্, দিয়ে মন্,
মন যোগাচ্ছে আমার ॥
জানি পুরুষ পাষাণ অতি নিদয়।
প্রাণ রমণী আমি করি কত ভয় ॥
আমার এ প্রাণ্, তোমায় দিলে প্রাণ,
শেষে আমারো কি হবে ॥
[ইহার আর কিছুই পাই নাই।]

মহড়া।

যে কোরেছে যাহারো সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ॥
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার।
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষগুণ, না করে বিচার ॥

চিতেন ॥

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন, কোরেছে হরণ ॥

মান অপমান দেখ না,
দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার।

অন্তরা।

ওরে প্রাণরে। গরিমা নাহি প্রেমের দেহে।
প্রেমের অধীনে হোলে সকলি সহে॥

চিতেন।

গুরুজন গঞ্জনা দেও, না হয় দুখি।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি॥
দিনান্তরে দেখা না হোলে,
মন প্রাণ দহে দোঁহাকার॥
[এই গীত মোহন সরকার গান।]

মহড়া

আমার প্রেম্ ভেঙ্গে প্রাণ, কার প্রেমে মেতেছ।
এমন্ রসিকা নারী কোথা পেয়েছ॥
বদন তুলে কথা কও হেসে।
প্রাণ বুঝি আভাসে।
তুমি ভালবাস কি, সে ভালবাসে॥
তুমি যেমন্ সে কি তেমন, দুই সুজনে মিলেছ॥
[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

[গত আশ্বিনের প্রথম দিবসীয় পত্রের স্তম্ভের প্রকাশিত।]

"গিরি গা তুল হে, মা এলেন্ হিমালয়।" এই সপ্তমীর পদ পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, অধুনা সংগ্রহ পূর্ব্বক চিতেন ও মহড়া সম্বলিত অবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

ওহে, গিরি গা তুলহে, মা এলেন্ হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়॥
কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য,
করা নয়।
আঁচল ধোরে তোরা। বলে ছি মা,
কি মা, মাগো, ও,মা, মা বাপের কি এম্নি ধারা॥
গিরি তুমি যে অগতি,
বুঝনা পার্ব্বতী প্রসূতিয় অখ্যাতি জগন্ময়॥

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন্।
এলোহে, সেই আমার, হারা তারা ধন্॥
দাঁড়ায়ে দুয়ারে। বলে মা কই, মা কই,
মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে॥
অমন্নি দুবাহু পশারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি আমি নয়॥

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা।
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে।
তিলেক্ না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই,
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে॥

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না,
দেখে দারুণ্, পাষাণ্।
আমার লোক গঞ্জনায় যায় প্রাণ্॥
তোমার তো নাই স্নেহ।
এক্‌বার ধর ধর, কোলে কর,
পবিত্র হোক পাষাণ্ দেহ॥
আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন্ দিন্ বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

[গত ১ আশ্বিনের পত্রে প্রকাশ হয়।] যথা,
"যার ধন তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ সখি।"
[এবারে এই গীতের চিতেন মহড়া সংপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম; অন্তরা না পাওয়াতে দুঃখ রাখিবার স্থান পাইলাম না।]

মহড়া।

যার ধন্ তারে দিলে প্রাণ্ বাঁচে প্রাণ্ সখি।
হোয়ে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষে দিতে
যেমন অনলে পোড়ালে রাম্ জানকী॥
যে কণ্টক্, আমার পাড়ার লোক্,
কবে কে, কবে কলঙ্কী।
আসার আশায় প্রাণ্ রেখে এত কাল।
মানেনা কালাকাল্, যৌবনের যৌবন্ কাল
আজ আমার অকালেতে সকাল্॥
আমার অঙ্গে কাল্ সঙ্গে কাল্,
তায় কাল্ সঙ্গে কাল্,

তায় কাল্ এ বসন্ত কাল্,
হোলো তিন্ কালে নারী সারা চারা কি ॥
চিতেন।
পেয়েছি পতিদত্ত নিধি,
তায় বিবাদি বিপক্ষ ছজন।
মন্মথ না হয় মন্মত, সদাই আকুল করে মন ॥
হোলো এইতো সুখ্, সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্ম্মহীন, স্বপতি পরাধীন,
যুবতী কার কাছে প্রাণ্ জুড়ায় ॥
এই উভয় শঙ্কটে সই, তুই দিগে সারা হই,
পতি ভাব্লেনা সতীর দশা হবে কি ॥

[ইহার চিতেন ও মহড়ায় মন যে রূপ মুগ্ধ হইয়াছে, অন্তরা পাইলে না জানি আরো কতই হইত। আমরা অন্ত বাসরীয় প্রভাকরে ৺রাম বসুর প্রণীত যে সকল কবিতার অসংপূর্ণ অংশ প্রকাশ করিলাম, যে কোন মহাশয় কৃপা করিয়া সেই সকল কবিতা পূর্ণ করিয়া দিবেন, এবং আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রাপ্ত হই নাই তাহা প্রেরণ করিবেন, আমরা কস্মিন্ কালে তাঁহার দিগের উপকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না, সুতরাং চির-কালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা জালে জড়িত রহিব।]

মহড়া।

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল্ হোলো জগতে॥
করে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চ বাণেতে।
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান। নাহি জুড়ায় প্রাণ।
হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ ॥
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন্ যার,
এখন্ সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে।

চিতেন।

পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধ্বজ, বিরহি রাজ্যে রাজন।
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন ॥
ভ্রমর্ কোকিলাদি পঞ্চশর। রাজা পঞ্চশর।
অঙ্গে হানে পঞ্চশর ॥
তাহে উনপঞ্চাশত, মলয় মারুত সই,
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে।

অন্তরা।

সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুল ঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।
পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যায়,
তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥

চিতেন।

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান।
তার চিতা সম জ্বলিছে সখি,
পঞ্চম দুখেতে প্রাণ ॥
যদি দ্বিপঞ্চ দিগেতে চাই।
পঞ্চ রিপু পাই। পঞ্চ সহকারি নাই ॥
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চতপাতে।

অন্তরা।

সই পঞ্চ পাণ্ডবেরা খাণ্ডব কানন,
জ্বালায়ে ছিল যেমন্।
তেমতি এ দেহে জ্বলাছে সখি
বসন্তের চর পঞ্চ জন ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে,
করিতে চাহি ভক্ষণ।
তাহে প্রতিবাদি, হয়গো আসি,
প্রতিবাসি পঞ্চ জন্ ॥
বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে। প্রাণে সয়েছে।
এ পঞ্চ কদিন্ আছে ॥
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহেনা,
সই এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে।

[এই গানের পাল্টা অপ্রাপ্য হইয়াছে। ইহার দোষ গুণ আমরা কিছু ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি না, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ পূর্ব্বক ভাবার্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন।]

গত ১ আশ্বিনের পত্রের···লিখিত হয়।
"আগে, প্রেম্ না হোতে কলঙ্ক হোলো॥"

[পূর্ব্বে এই গান সংপূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই, এবারে অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়াছি, একারণ পাঠক ও গায়কগণের সুযোগার্থ শুদ্ধ রূপে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।] যথা।

মহড়া।

আগে প্রেম্ না হোতে কলঙ্ক হোলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো॥
উপায় এখন্ কি করি বলো॥
তুমি এ পথে এলে।
করে কুরব, কুচক্রি সকলে॥
দিনান্তরে দিতেদেখা, বুঝি সখা, তাহা ঘুচিলো।

চিতন।

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানাজানি কাণাকাণি, করে রিপুগণ
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে॥
না পেলেম্ প্রাণ্ জুড়াইতে,
লাভে হোতে, দুকুলো গেলো।

কোরে সাধ্, এত পরিবাদ, সয়্ কি অবলার্।
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর্॥
না করিতে চুরি, লোকে চোর্ বলে আমায়।
মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা, প্রকাশ করা দায়॥
মনে মনাগুণ দয়।
যেন বোবের স্বপন সম হয়॥
গুমুরে গুমুরে বঁধু, হৃদের মধু, হৃদে শুখালো।

[অতি চমৎকার! এমত আশ্চর্য্য রচনা প্রায় দেখা যায় না। কবিওয়ালার মধ্যে এবম্ভূত সুন্দর গীত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ইহার তৃতীয় গানের কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বশেষে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

আজ্ শুন্লাম সই,
প্রাণনাথের প্রাণনাথ্ আছে একজন্।
সময়ের দোষে, হোলো কর্ত্রীহোয়ে কর্ত্তা সে,
এখন্ সেই ফাঁদে পড়েছেন্ আমার সাধের ধন্॥
সদা তারি, আজ্ঞাকারি, প্রাণনাথ এখন্।
সে যে সিংহবেশে সর্ব্বনাশী।
কল্লে গ্রাস, প্রাণনাথ্কে যেমন,
রাহুতে গ্রাসে শশী।
নূতন কুমুদ পেয়ে সুখে আমোদ করেন্ তিনি,
আমার প্রাণচকোরের হোলো হুতাশে মরণ॥

চিতেন।

আমি জানি আমার প্রাণনাথ্
আমারি বশীভূতো।
এখন্ কেমন্ কেমন্ দেখি সই,
আগে জানিনে এতো॥
যখন্ নূতন পীরিৎ আমার সনে।
এ পথে, বঁধু আস্তো যেতো,
চেতনা কারো পানে॥
এখন্ সে পথ্ পেয়ে সখা, এপথ গ্যাছেন্ ভুলে,
আমি মাসান্তে ঘরে পাইনে দরশন॥

[ইহার অন্তরা ও দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এজন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি।]

মহড়া।

শুনি, নাম বসন্ত, তার আকার কেমন্।
তারে দেখ্লে পরে সই, মনের বেদনা কই,
মনে মনে এসে কেন, করে মন্ হরণ॥
যার জ্বালাতে জ্বলি তার, পাইনে দরশন।
অদর্শনে অবলার দহিছে পরাণ্।
নাজানি কি প্রমাদ ঘটে, দেখ্লে সে বয়ান॥
কি দুরন্ত, কি বসন্ত সই, অশান্ত কোরেছে,
আমায় বিনে আলাপন॥

চিতেন।

বসৎ করি রাজ্যে যার,
জন্মে তাব দেখা পেলেম্ না
ভূপতি সতির। দুঃখ ভাব্লে না॥

কার করেতে যোগাই কর্ ভাবি নিরন্তর।
সদা স্মর হেনে শর করে জরজর॥
সেনাপতি সঙ্গে ফেরে তার,
দুরন্ত কৃতান্ত সম অনঙ্গ মদন॥

অন্তরা।

সখি যার প্রতাপে, অঙ্গ কাঁপে,
মনে কত ভয়।
এলো এলো, দেখা হোলো, এম্নি জ্ঞান হয়॥

চিতেন।

ছিল যে রাবণসুতো, ইন্দ্রজিতো,
ছিল যারো নাম।
লুকায়ে সখি, করিত সংগ্রাম॥
সেই মত কি ঋতুরাজ শিখেছে সন্ধান্।
মায়ামেঘে কায়া ঢেকে, হৃদে হানে বাণ্॥
লুকি যুদ্ধ কোরে কেন সে,
বিরহিণী নারীর প্রাণো করে বিমোচন।

[এই গীতটি যেমন উৎকৃষ্ট ও শ্রুতি সুখকর, ইহার পাল্‌টাও সেই প্রকার উত্তম, কিন্তু অনেক যত্ন করিয়া তাহা সংগ্রহ করণে অক্ষম হইলাম। এজন্য আমরা নৌকাপথে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া বহুজনের উপাসনা করিয়াছি, যে মহাশয় জ্ঞাত আছেন কোন ক্রমেই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সংযোগ হইল না, তিনিই যদি কিঞ্চিৎ দয়া পূর্ব্বক শ্রম করিয়া লিখিয়া পাঠান, তবেই মানস সুসিদ্ধ হইতে পারে নচেৎ যাবজ্জীবনের জন্য মনের দুঃখ মনেই রহিবে।]

গত ১ আশ্বিনের প্রভাকরে প্রকাশ হয়। যথা।

"যাক্‌রে প্রাণ্।
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীৎ মন্ত্রণায়,
সাধের পীরিৎ ভেঙ্গে তুমি আছো তো ভাল।"

[অনেক কষ্টে এই গীতের পাল্‌টা গান সংগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।]

মহড়া

বাঁচ্‌লাম প্রাণ্। বিচ্ছেদ কোরে
ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়॥
আগে ভেবেছিলাম পীরিৎ, ভাংলে যাবে প্রাণ,
এখন্ বাঞ্ছা করি যেন নিত্তি এম্‌নি হয়।
একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে,
তার আতঙ্ক কি রয়॥
যখন আখণ্ড ছিল পীরিৎ।
ও আতঙ্ক হোতো ভঙ্গ হোলে
হব ও সুখে বঞ্চিত্॥
দেখ ভাঙ্গা শঙ্কা যার, ভেঙ্গে গ্যাছে তার,
আমি এক্ আঁচড়ে পেলেম প্রেমের পরিচয়।

চিতেন।

যে অনলে আমায় পোড়ালে
তুমি কি তায় পুড়্‌বে না।
যার দোষে প্রেমো যাক্ ভেঙ্গে,
তাতো গড়ে না॥
প্রেমের ধাঁধা থাকে যত দিন।
বাঁধা থাক্তে হবে সমভাবে হোয়ে
অধীনের অধীন।
সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব,
আমার কোমল প্রাণে এখন্ সকল জ্বালা সয়॥

অন্তরা।

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্কে আছি,
আর তো ভোগায় ভুল্‌ব না।
না এলে তুমি, এখন আর আমি,
পায়ে ধোরে সাধ্‌ব না॥

চিতেন

আভাঙ্গা পীরিতের যত ভয়,
ভাংলে তত থাকে না।
অলি দেখে কলির ত্রাস্ ধরে,
ফুট্‌লে ছাড়ে না॥
এখন্ নই আমি সে কলিকে।
সকল দেখে শিখে, হোয়েছি হে প্রেমে
বড় ব্যাপিকে॥

পারি সাঁতারে সাগর্, পার্ হোতে নাগর্,
কাণ্ডারী যদি হে মনের মত হয়।
[এই গীতটি সর্ব্বাংশেই সুন্দর।]

মহড়া।

ঘরের ধন্ ফেলে প্রাণ্,
পরের ধন্‌কে আগুলে বেড়াও।
নাহি জান ঘর্‌বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীরে কোরে নিরাশা, অসতীর আশা পূরাও॥
রাজ্য পেয়ে ভার্য্যের প্রতি, কর্ম্মেতে লুকাও।
যেমন্ প্রাণ হে সত্যবাদী।
আমি তেমনি কর্ম্মনাশা নদী।
ছুঁলে পরে কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি॥
আমি সতী হোয়ে করি পতির মান্যমান্,
তুমি অন্য ফুলে গিয়ে জীবন জুড়াও।

চিতেন।

দৈব যোগে যদি এপথে,
প্রাণ্ করেছ আজ্ অধিষ্ঠান্।
গেল দুখ্, হোলো সুখ,
দুটো দুখের কথা বলি প্রাণ্॥
তোমার মন্ হোলো বার্ বাগে।
গেল চিরকাল ঐ পোড়ারোগে।
আমার সঙ্গে দেখা দৈব যোগাযোগে॥
কথা কচ্ছ হে আমার সনে,
মন্ আছে সেখানে, মনে কর সখা,
পাখা পেলে উড়ে যাও।

[ঐ দিবসের পত্রে প্রকাশ পায়।] যথা।
"হায়রে পীরিতি তোর্ গুণের
বালাই নে মরি।"
পূর্ব্বে এই গান অসংপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছিল
অধুনা সমুদয়াংশ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

হায়রে পীরিতি তোর্ গুণের বালাই নে মরি।
যখন্ যারে পাও, তার সুখো দুখো সব্ ঘুচাও,
তুল সিংহাসনে কঁর পথের ভিকারী॥
তোমার তরে সদা ঝোরে হে,
কি পুরুষ, কি নারী।
এক্‌বার যার সঙ্গে যার পীরিৎ হয়।
সে তার নয়ন্ তারা, আর কিছুই কিছু নয়॥
ভাবি জন্মে যারো মুখো না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি॥

চিতেন।

কি ক্ষণে এ প্রেমে লাগ্‌লো প্রেম,
আমি জন্মে ভুল্‌তে পারিনে।
দুখো ভোগ্ অনুযোগ্,
তবু না দেখলে তো বাঁচিনে॥
কেমন্ কোরে রেখেছিস্ আমায়।
তারে না দেখ্‌লে প্রাণ,
আর কোথাও না জুড়ায়॥
মন স্বর্গ পথে যেতে বর্গ মানে না,
আমি চতুর্ব্বর্গ ফল্ সেই চাঁদবদন হেরি॥

হায়, প্রেমের প্রেম্ মনে উদয় হোলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেকো না হেরে, বিরহ বিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি।

চিতেন।

প্রেম-সুধা পানো, যে করে,
তারো নাহি থাকে কোন খেদ্।
সপক্ষ, বিপক্ষ, প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ্॥
নাই উঠ্‌তে বস্‌তে শক্তি যার।
শুনে প্রেমের্ কথা, যায় সাত্ সমুদ্র পার॥
প্রেমে বোবার কথা শুনে কানায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি॥
[অনেক অন্বেষণ করিয়া ইহার দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হইলাম না।]

রাম বসু প্রথমে নীলু ঠাকুরকে যে সকল সখীসংবাদ প্রদান করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবেই উত্তম, তচ্ছ্রবণে মোহিতনা হইয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই, আমরা কোন কোন ব্যক্তি নিকট হইতে তাহার কয়েকটী গীত বহু যত্নে সংগ্রহ করত প্রকটন করিতেছি,

পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অশেষানন্দ লাভ করিবেন।] যথা।

মহড়া
ওহে, এ কালো, উজ্জ্বলো,
বরণো তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে॥
যে বলে, সে বলে, বলুকো কালো।
আমার নয়নে লেগেছে ভালো॥
বামা হলে শ্যামা বলিতেম্ তোমায়,
পূজিতাম জবা বিল্বদলে॥

চিতেন।
আরাতো আছে হে, অনেকো কালো,
এ কালো নহে তেমন্।
জগতের্ মনোরঞ্জন্॥
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা।
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা॥
জনমের মত ঐ কালোচরণে,
বিকায়েছি, যে বিনিমূলে॥

অন্তরা।
ওহে শ্যাম্, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এইতো জ্ঞান ছিলো।
সে কালোর কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো॥

চিতেন।
এখন বুঝিলাম্ কালোরো বাড়া,
সুন্দরো নাহিকো আর।
কালো রূপ্ জগতের সার॥
ত্রিলোকে এমন্ আর্, নাহিকো হেরি।
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি॥
কালোরূপ আলো করেছে সদা,
মোহিতো হয়েছে সকলে॥

অন্তরা।
একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার্ কালো বরণ।
আরো কালো আছে, জলো কালিন্দীর,
কালো তো তমালো বন্॥

চিতেন।
আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ্,
ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল্। কালোতো নীলকমল্॥
সে কালোর কালত্ব দেখেছ সবে।
প্রেমোদয়, অশ্রু, কারে না ভেবে॥
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবন মণ্ডলে॥
[হে ভাবকগণ! এই কবিতা-চাঁদের সুধা পান করিয়া সমুদয় ক্ষোভ ক্ষুধা নিবারণ কর।]

মহড়া।
জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির্ নির্ণয় যে করিতে॥
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি,
নির্ম্মলো যমুনা জলেতে।

চিতেন।
নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি, আজ্ একি দেখ দেখি॥
জলে কি এমনো, দেখেছ কখনো,
বল দেখি ওগো ললিতে॥

অন্তরা।
সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,
হেরি জলো মাঝেতে।
প্রস্ফুটিত তমালো, বৃক্ষ যার কালো,
ঐ ছায়া কি ইথে॥

চিতেন।
আরো সখি কালোচাঁদ্ কি আছে!
গগনে মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে।
বল দেখি সখি, কালোচাঁদ কি,
উদয় হয় বসেতে।

ঐ গীতের পাল্টা গানের কিয়দংশ।

মহড়া।
ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণো দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ্ ছাঁদ্, আছে দীপ্ত হোয়ে॥

যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,
তাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

চিতেন।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।
রূপ, কি অপরূপ, রসকূপ, আমারি সই॥
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,
কালো রূপ, নয়নে হেরিয়ে।

[রাম বসুর কৃপায় নীলু ঠাকুর এই দুই গীতের নাম বিখ্যাত করেন। যদি চাঁদের সুধায় মিষ্টতা না থাকে তথাচ ইহার মিষ্টতার হানি কিছুতেই হইতে পারে না!]

মহড়া।

ওগো কৃষ্ণ কথা কবে যদি, ধীরে ধীরে কও,
কেউ যেন না শোনে।
ও নামে বিপক্ষ বহু আছে এখানে॥
কহিতে বাসনা থাকে,
বোলো আমার কাণে কাণে।

চিতেন।

আলস্যক্রমেতে, ভ্রমেতে, করি কৃষ্ণ রব,।
ও নামেতে খড়্গহস্ত, আমার প্রতি সব,॥
হিরণ্য কশিপু রাজ্য, হয়েছে এই বৃন্দাবনে।

[নীলু ঠাকুর এই সকল সখী সংবাদে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, রাম বসু আপনার নবানুরাগের সময়ে উক্ত ঠাকুরকে সকল নবানুরাগের কৃষ্ণ বিষয় প্রদান করিয়াছিলেন। এ গানের অপরাংশ ও পাল্‌টা সংগ্রহ করণে অক্ষম হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম।]

মহড়া।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা।
আমি কালো ভালবাসি বোলে
আমায় ভাল কেউ বাসেনা।
আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা।
নাই কোন সম্পদো আমার,
কেবল দিবে নিশি ঐ ভাবনা॥

চিতেন।

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগী, হোলেম্ কালাচাঁদ
রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ্॥
আমারে যে আমার বলে শ্যাম,
এমন দুখের দোষের কেউ মেলে না।

[হায়! জগদীশ্বর এমত লোকের প্রাণ হরণ করিলেন। এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

মথুরার বিকিতে যেতেগো বড়াই।
ভালো আর্ কি পথো নাই॥
জানতো এ পথের দানী, লম্পটো কানাই।
যারে ডরাই তাই ঘটে।
আনিলে তারি নিকটে॥
আপন্ জোরে যৌবন লোটে, না মানে দোহাই।

চিতেন।

কি করিলে, কি করিলে, আনিলে কোথায়!
দাঁড়ায়ে কে গো, কদম্ব তলায়॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ছাঁদে।
না জানি কি বাদ্ সাধে॥
মরি যারো পরিবাদে, ঘটে পাছে তাই॥

[রাম বসুর কৃত এই সখীসংবাদ মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন, ইহার অন্তরা ও পাল্‌টা গান সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এই গীতের বয়স ৫০ বৎসরের অধিক হইবে।]

মহড়া।

কেন আজ্ কেঁদে গেল বংশিধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের্ কালাচাঁদকে কি বোলছে ব্রজ-কিশোরী॥

চিতেন।

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম্ রাই,
সুধাই গো তোমায়॥
মণিহারা ফণি প্রায়, মাধব তোমার।
প্রিয় দাসী বোলে বদন্ তুলে,
চাইলেনা একবার॥
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখো, ফাটে বুকো, আমরি মরি॥

[অনেকেই কহেন এই গীত রাম বসু প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু এই গান তিনি নিজ দলে গান করেন, কি দল করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন দলে দিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান হইতেছে তাঁহার দল করণের পূর্ব্বে এই গীতটী হয়, নীলু ঠাকুর, নয় ঠাকুর দাস সিংহ গাহিয়াছিলেন।]

[গত ১ আশ্বিনের পত্রে প্রকাশ হয়। "শ্যাম কাল্ মান্ কোরে গ্যাছে, কেমন আছে, দূতি দেখে আয়।" এই গীতের সমুদায়ংশ ও পাল্টার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধরূপে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।]

মহড়া।

শ্যাম কাল্ মান কোরে গ্যাছে,
কেমন আছে দূতি দেখে আয়।
কোরে আমারে বঞ্চিতে,
গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হোয়ে খণ্ডিতে মরি হরি প্রেমের দায়॥
ছলে আমার মন ছলেছে।
আগে বুঝ্‌বে মন্ থেকে দূরে।
চোখে দেখেগো।
কয় কি, না কয়্ কথা ডেকে॥
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয়,
অপ্রণয়, অম্‌নি সেধোগো ধোরে ছুটি
রাঙ্গা পায়॥

চিতেন।

সাধ্ কোরে কোরেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হোলো অপমান।
শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম্ না,
কথা কইলেম্ না রেখে মান্॥
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে। রাগে রাগে গো।
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে॥
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব রাগ,
আবার এ কি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম্ রাধার আদর ভুলে যায়॥

অন্তরা।

যার মানের মানে আমায় মানে। সে না মানে৷
তবে কি কর্ব্বে এ মানে॥
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ্,
মানিনী হয়েছি যার মানে॥

চিতেন।

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান।
রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের্ মান, অপমান॥
এখন মানান্তে প্রাণো জ্বলে। জ্বলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে॥
আমার সেই কালো জলধর,
হলো আজ্ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়।

ইহার পাল্টা গানের কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

কর্ত্তে রাধার মানো রক্ষে, উভয় পক্ষে,
যেন মানো রয়।
কোরে এ পক্ষে পক্ষপাত্,
যে পক্ষে যাক্ রাধানাথ,
জানি প্রেম্ পক্ষে শ্যাম্ আমার বিপক্ষ নয়॥...
শ্যামের আদর মাখা অঙ্গ। সে ত্রিভঙ্গ গো।
আদর বাড়ায় মান তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ॥
আমরা যখন যে মান করি,
আছে তায় পায় ধরাধরি,
সখি আজ্ কিছু রাধার আদর নূতন নয়॥

চিতেন।

সাধে কি সাধ্‌তে বলি মাধবে,
সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ।
এমন হয়গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সয়, অপমান॥
সখি আমার মান গেল গেলো।
জানা গেলোগো,
বংশিধারির মান থাকে তা হোলেই ভালো॥...

[রাম বসু এই দুই গীত প্রস্তুত করিয়া এক মাস পরেই প্রাণত্যাগ করেন। এ গীত সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট, ইহার সমুদয় প্রাপ্ত হইলে সুখের পরিসীমা থাকিবেক না॥]

মহড়া।

এত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি,
এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণো গুণো স্বরে কেনো,
অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে পুঞ্জে।
কৃষ্ণ বই, কে আর্ বসতে পারে সই,
শ্রীরাধার রাস কুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত।
আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে এ কেন ও রস ভুঞ্জে।

চিতেন।

বসন্ত আসিতে গোপিকার,
কেন প্রাণ্ জুড়ালো।
জ্ঞান হয়, ঋতু নয়, দয়াময় মাধব এলো॥
দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ।
মনোরো আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে,
ডাকিতেছে সই॥
আরো কমলিনীর কমল্, চরণে ধোরে,
সুখে গানো করে অলিপুঞ্জে।

[নিজ দলে এই গান গান, ইহার অন্তরা ও পাল্টা প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

আছে খৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে
শ্যাম্ কি ধারো কিছু তার।
হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালি কোরেছিলে কোন্ রাজার॥
প্রেমধার্ ধার তুমি কার।
খতে লেখা রয়েছে ও শ্রীহরি।
খাতকৃত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।
মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুনি কই,
তোমা বই, ঢেরাসই আর্ হবে কার॥

চিতেন।

···ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে।
দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন্ রমণীর কাছে।···

মহড়া।

দেখ্‌বে কেমন্ সুন্দরী কুবুজা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা, সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥

মহড়া।

রাধার মান্ তরঙ্গে কি রঙ্গ।
কমল্ ভাসে, কুমুদ হাসে,
প্রমোদ রসে ডুবেছে শ্যাম্ ত্রিভঙ্গ।

মহড়া।

ভঙ্গি বাঁকা যার্, সেই কি বাঁকা শ্যামে পায়।
আমরা সোজা মন্ পেয়ে সই,
কৃষ্ণের মন পেলেম কই,
মিল্লো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায়॥

[পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ উক্ত কয়েকটি সখী-সম্বাদের সমুদয় ভাগ প্রেরণ করিলে আমরা পরম বাধ্যতা স্বীকার করিব।

মহড়া।

প্রাণ্‌রে প্রাণ। এমন পীরিৎ থাকায়্ না থাকা।
তোমার পরের কাছে পরম সুখ্,
পথে যেতে হাস্য মুখ্,
আমার সঙ্গে দেখা হোলো বদনো বাঁকা।
দায়ে পোড়ে প্রাণ্ নাথ হে, দিওছ দেখা॥
দেখা হোলো সখা বোলে, আদরে ডাকি।
তুমি বল ভাল্‌তো জ্বালা, এ পাপ আবার কি॥
পথে দেখে, নয়ন্ ঢেকে, পলাও ছুটে,
যেন পিঠে, বেঁধেছে পাখা॥

[এই গানের চিতেন ও অন্তরা পাইলাম না, ইহাতে যে দুঃখ তাহা লিখিয়া কি জানাইব। ইহার পাল্টা গানের কেবল মহড়াটি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

এ ভাবের ভাব্ রবে কতদিন।
তুমি প্রাণাপণে মনে যোগাওনা,

পরিত্যাগো করনা,
আমি যেন হোয়ে আছি জালে গাথা মীন ॥

[এই গানের আদ্যন্ত রচনার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারি না। বাল্যকালে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তখন এত গৌরব জানিতে পারি নাই, একারণ স্মরণ না রাখাতে এইক্ষণে আক্ষেপের অধীন হইতে হইল।]

[পূর্ব্বে নিম্নস্থ গীতেরর সমুদয় পাই নাই, এবারে সংপূর্ণ পাইয়া পুনর্ব্বার পত্রস্থ করিলাম।]

মহড়া।

ভাব্ দেখে করি অনুভাব্,
ভাব বুঝি ফুরালো।
দিনের দিন, রসহীন, হোলে প্রাণ,
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকালো ॥
একি ভাব্, গ্যাছে পূর্ব্বের সে সব ভাব্,
অভাবে ভাব মিশালো।
তোমায় লোকে কয়, রসময়।
মিথ্যা নয়, সে রস্ পরের কাছে হয় ॥
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।
তোমার আমার কাছে ভ্রান্তি,
হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তি শতকেতে পাঠ এগুলো ॥

চিতেন।

সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রণয়,
নূতন নয় পরিচয়।
তবে প্রাণ, হোলে রসের অনুষ্ঠান,
বিরস বদন কেন হয় ॥
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে।
ওরে প্রাণ, তোমার অযাচক ভিক্ষে ॥
চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে।
এখন সদাই বদন বাঁকা, হোলে পর দেখা,
সে সব্ শশীমুখের হাসি কম্‌নে গেলো।

প্রাণ যে মনে ভুলালো এ মনো আমার,
কই আর সে মন, কেমন কেমন দেখ্‌তে পাই,
কোন্ পথে হারালে মন, ওরে প্রাণ,
আমিও সেই পথে যাই ॥
নাই তোমার এখন সে সুহাস্য, সুদৃশ্য, সুবচন।
কথা কয়, যেন কে কারে কি কয়,
প্রাণ সদাই অন্য মন ॥
তুমি রসিক নও, তা নও প্রাণ্।
ওরে প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান ॥
কোন রাজ্যে ধান, কোন রাজ্যে বাণ ॥
আমি হাজা প্রজা বোলে জ্বলে জ্বলালে,
আমার সুখের সময় তোমার রস শুখালো।

মহড়া।

তারে বেলেগো সখি, সে যেন,
এ পথে এসেনা।
পোড়া লোকে মন দুষে দেয় গঞ্জনা ॥...

চিতেন।

আকিঞ্চনসূতে, গলেতে গেঁথে,
পোরেছিলাম প্রেমো হার।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলোগো তাতে,
বিড়ম্বনা বিধাতার ॥
সখি সে কোথা, আমি কোথা।
না জেনে, না শুনে, লোকে কয়্ নানা কথা ॥
আমি পীরিতি করিতাম্ প্রাণে প্রাণ সঁপিতাম,
তা বুঝি কপালে হোলো না ॥

[এই গীতটী কোন্ দলে গাহনা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইহার অপরাপর অংশ ও পাল্‌টা অতি বিচিত্র! বসুজ যত কবিতা রচনা করেন তাহার মধ্যে এই সাটের গান মধ্যমরূপে গণ্য হইতে পারে।]

মহড়া।

প্রাণ্‌রে প্রাণ্।
নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ বাণ ॥
বুঝি মানের অভিপ্রায়্, মানচণ্ডীর তলায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে নর বলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ,
প্রাণ্‌ঘাতকী সন্ধান ॥
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ।

রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে খড়্গহস্ত হোয়েছ ॥
ধোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল্,
কর ছুতো লতায় কথায় কথায় অপমান।
চিতেন।
তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান,
যখন কোরেছ বাড়াবাড়ি।
তখনি জেনেছি,
আজ হোতে প্রেম ছাড়া ছাড়ি ॥
তোমার ভালবাসা এতো নয়।
আমার প্রাণ্ জ্বলাবে, দেশ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশয় ॥
আমি সর্ব্বত্যাগী হই, তোমার বাঞ্ছা ঐ,
তাইতো কোরেছো আজ্ এমন সর্ব্বনেশে মান

[এই গানের অন্তরা পাইলাম না। পাল্‌টা গীতের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।]

ঐ গানের পাল্‌টা মহড়া।
এই খেদ্ হয়।
তবু বল পুরুষ্ ভাল-মানুষ নয় ॥
যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী, ত্যজেছিলেন প্রাণ,
তখন মৃতদেহ গলায়, গেঁথে রাখ্‌লেন মৃত্যুঞ্জয়।
চিতেন।
কথায়্ কথায়্ কোরে অভিমান,
তিলে কোরে বোসো তাল্।
ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল ॥
যদি পুরুষ পাতকী হবে। তবে পাণ্ডবেরা,
নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ॥
দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধোরেছিলেন ব্রজে রাধার পদদ্বয়।

[ইহার অপরাংশ কেহ প্রদান করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

সখী-সম্বাদ।
মহড়া।
কে হে সে জন। নারী দ্বারে করিছে রোদন ॥
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন।
আমরি মরি। কিরূপের মাধুরী ॥
সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন ॥
চিতেন।
দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়।
দ্বারের সংবাদ কিছু, নিবেদিই তোমায় ॥
দুখিনীর আকার্। রমণী কোথাকার্ ॥
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন।

[নীলু ঠাকুর এই সখী-সম্বাদ গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।
আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম ভয় ॥…
চিতেন।…
অন্তরা।…
নারী মিল্‌তে যেমন,
ভুল্‌তে তেমন দুই দিগে তৎপর্।
মজয়ে সেরে, চায়না ফিরে, আপনি হয় অন্তর ॥
চিতেন।
উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন।
নারী বারি, দুই জনারি, নীচ্ পথে গমন ॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী তপন তেজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়।
[ইহার অপরাংশ ও প্রথম গীত পাইলাম না॥]

মহড়া।
দেখি দেখি তোর্ খেদে, বাঁচে কিনা,
বাঁচে প্রাণ্।
তুইতো যা এখন, ফিরে দিয়ে মন,
তোরে সাধ্‌তে যাইতো তখন করিস্ অপমান্ ॥
[এটি পাল্‌টা গান। ইহার প্রথম ও এই গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।
এক্‌বার বিচ্ছেদ কোরব প্রাণ্,
তোমার মন বুঝব হে।
তোমার মন্ যদি খাঁটি হয়, বিচ্ছেদ জ্বালা
সোয়ে রয়, তবে দুটি মন্ এক্‌টি
কোরে থাকবহে।

চিতেন।

*   *   *   *   *

অন্তরা।

ওহে প্রাণনাথ হে। বিচ্ছেদের পর্
মিলন হোলে পর, সে প্রেমে বাড়ে সুখোদয়।
গ্রহণান্তে যেন্ শশির কিরণ্,
সুবর্ণ দাহনে সুবর্ণ হয়॥

[এই গীতের সাট যিনি প্রদান করিবেন, আমরা তাঁহার নিকট চিরবিক্রীত হইব।]

মহড়া

তবে। কি হবে সজনি নাথো
মান্ কোরে গেলো।
প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ, আবার দ্বিগুণ্
জ্বালায় জ্বলতে হোলো……

চিতেন।

বিধিমতে প্রাণোনাথেরে, করিলাম্ বারণ।
কোরোনা কোরোনা, বঁধু প্রবাসে গমন॥
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ্।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত।
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধ্‌লাম তারে,
তবু না রহিলো॥

[বসুজ এই সাট মোহন সরকারকে প্রস্তুত করিয়া দেন,—ইহার আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।]

মহড়া।

এমন্ প্রেম্ কোরে এক্‌দিন,
চিরদিন্ কে বিচ্ছেদের বোঝা ববে।
জানি যত সরল্ ভাব্, তোমার
প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ্, ওরে প্রাণ, কুটিল
স্বভাব্ গুণে অভাব্ গুণে অভাব্ ঘটাবে॥···

চিতেন।

দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি,
ক্ষান্ত আছি পীরিতে।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ্,
বিচ্ছেদের সঙ্গেতে॥
মনে ঐক্য আছে, বাক্য গ্যাছে মিটে।
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়,
যাইনে তারো নিকটে॥
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস,
মিছে ধোরে বেঁধে পীরিৎ ঘটাবে॥

মহড়া।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যাগো,
রাই কেন এমন হোলো।
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে আছে কি মোলো॥

ইহার পাল্‌টা গীতের মহড়া।

ডুবে শ্যাম্‌সাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে।
ধরাধরি কোরে তোলো, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো
হরি ধ্বনি, শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে॥

[এই কয়েকটি গীতের সংপূর্ণ পাইলে পূর্ণানন্দে পূরিত হইব।]

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কিসেই প্রেমের বশে প্রেম্-রসে তুষতে প্রাণ॥

ইহার পাল্‌টা মহড়া।

কেবল কই কথা লোক লজ্জাতে।
আমার যৌবন ধন, গিয়েছে যখন,
সখা তুমিও গিয়েছ আমার সেই পথে॥

[এই দুইটি গীতের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।]

মহড়া।

কোকিলে কর এই উপকার্।
যাও নাথেরো নিকটে একোবার্॥
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুরো নাগরো আছে যথায়্।
পঞ্চস্বরে গানো শুনাওগে তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী,
অবশ্য মনে হইবে তার॥

চিতেন।

বিরহি জনারো, অন্তরে হানো, কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার পৌরুষ পিকবর্।
একলা অবলা আমি বালা।
আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা॥
তাহারে তেমতি পারহে জ্বলাতে,
প্রশংসা তবে করি তোমার॥

অন্তরা।

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথো,
কোকিলে বুঝি নাই সেদেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত,
বসন্ত সময় নিবাসে।

চিতেন।

কিম্বা কোকিল্ আছে, নাই তারো,
সুস্বর তব সমান্।
কুরবে বুঝি হান্তে পাবেনা বাণ্॥
অতএব বিনতি করি এখন।
কোকিলে তথায়ে কর গমন॥
তোমার এরবে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে প্রাণ্ আমার॥

[অতুল্য, অমূল্য এই কবি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালে জন্ম লইয়া তাঁহার সহিত একত্র হইতে পারিলে মনের সকল ক্ষোভ নিবারণ হইতে পারিত।]

ঐ গীতের পাল্‌টা।

মহড়া।

সে যেন, এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা॥···

চিতেন।

শশির কিরণে প্রাণো জ্বলে,
জলেতে নাহি জুড়ায়্।
বিষ প্রায়, যদি চন্দন্ মাখি গায়॥
শেল্ সম হোলো, কোকিলের গান্।
মলয় মারুত অগ্নি সমান্॥
এ দেশের্ এ বিচার্, শুনিলে নাথের্ আর,
পুন পদার্পণ হবে না।

[রাম বসুর কৃত এই গান নীলু ঠাকুর কি মোহন সরকার, দুই জনের একজন গাহিয়াছিলেন। এই সাটের গান কয়েকটি যিনি প্রদান করিবেন আমরা তাহার উপকার কখনই বিস্মৃত হইব না।]

"যৌবন জনমের মত যায়"

[ইহার অন্তরা ও প্রথম এবং দ্বিতীয় গান সংগ্রহ করিয়া যথারীতি ক্রমে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া। ১ সংখ্যা।

বসন্তেরে সুধাও, ও সখি।
আমার্ নাথেরো মঙ্গল কি॥
নিবাসে নিদয় নাথো, আসিবেনা কি॥
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ।
দিনে শতবার গণি দিন্॥
আসারো আশয়ে আছি, আশাপথো নিরখি॥

চিতেন।

প্রাণোনাথো যে দেশে আমার্, করিছে বিহার্
এ ঋতুরাজার্ তথা অধিকার্॥
তার শুভ সংবাদ যত।
সকলি তা জানে বসন্ত॥
সুমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হব সুখি॥

অন্তরা।

হায়। কাল আসিব বোলে
নাথো করেছে গমন।
ভাগ্য গুণে যদি,
হোলো সে মিথ্যাবাদী চারা কি এখন॥

চিতেন।

সে যদি, ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে।
আমি কেমনে, ভুলিব তারে।
পতি, গতি, মুক্তি অবলার।
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার॥
তাহারো কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি।

ঐ গীতের পাল্‌টা। ২ সংখ্যা

মহড়া।

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন।
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্ছন॥

হর কোপো যার তনু হয়েছে দাহন।
সে দহিছে বিনে, প্রাণনাথ্।
কর হীনে করে করাঘাত্॥
এ সব লাঞ্ছনা হোতে, বরঞ্চ ভালো মরণ্

চিতেন।

প্রাণনাথো বিদেশে গমন, করিল যখন।
পিছে পিছে তার্, গ্যাছে আমার মন॥
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ্।
বসন্তে হোতেছে অপমান।
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছিগো জ্বালাতন।

ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল্ আসিবে তৎকাল্।
কালে হোলো কাল্, এ যৌবন কাল্॥
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তারো আসারো আশায়।

অন্তরা।

হায়। ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায়॥

উক্ত গীতের তৃতীয় সংখ্যা।

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়্।
সে তো আসা পথো নাহি চায়্॥
কি দিয়ে গো প্রাণ্ সখি, রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর।

অন্তরা।

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয়্, শশিকলা ক্ষয়্।
শুক্লপক্ষে হয়, পুন পূর্ণোদয়্॥
যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটিকল্পে পুন নাহি হয়॥
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত গমন প্রায়।

[এই তিনটি গান যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তিনিই যথার্থরূপে রাম বসুর কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, প্রেমিকতা, রসিকতা ও মাদকতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, ইহার তুলনা নাই, কি পরিতাপ! এমত মহাপুরুষের জীবিতাবস্থায় জগদীশ্বর আমারদিগ্যে বয়স্থ করেন নাই। তৎকালে আমরা অজ্ঞান বালক ছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যদি তিনি সজীব থাকিতেন, তবে আমরা যত্ন পূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কত সুখি হইতাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়।]

মহড়া।

এই বড় ভয়, আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়্, না পাই প্রেমধন,
শেষে হাসবে শত্রুগণে॥
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে॥
প্রেম সুধা আস্বাদন।
সদা করিতে চাহে পোড়া মন॥
নাহি জেনে মন্ত্র নাথো,
দিব হাতো, ফণির্ বদনে॥

অথবা

বিচ্ছেদ কণ্টক আছে, ফুটে পাছে,
কমল্ চরণে॥

চিতেন।

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আশে, মোজে শেষে, কুল বা হারাই॥
একে তরুণো তরি।
তায়্ তুমি হে নব কাণ্ডারী॥
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো,
দেখো যেন ডুবে মরি নে॥

[চমৎকার, চমৎকার। অন্তরা পাইলাম না।]

৺রাম বসু*

[তিন]

গত ১ কার্ত্তিকের প্রকাশিত বিষয়ের শেষ।

আমরা রামবসুর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ পূর্ব্বক গত ১ আশ্বিন ও ১ কার্ত্তিকের প্রভাকরে তাঁহার প্রণীত কতকগুলীন সংপূর্ণ ও কতকগুলীন অসংপূর্ণ গীত পত্রস্থ করত সর্ব্ব সাধারণের সুগোচর করিয়াছি। ইহাতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দ প্রচার করিয়াছেন ; এবং তন্মধ্যে কোন কোন মহাশয় অনুগ্রহ পুরঃসর কোন কোন অসংপূর্ণ গান সংপূর্ণ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ হইয়া আসিতেছে। আমরা প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে এক প্রকার ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে সাধারণের সাহায্য পাইয়া ক্রমেই সাহসের উন্নতি হইতেছে ; বোধ করি, ছয় মাসের মধ্যে ইহাঁর কৃত শেষাবস্থার প্রায় সমুদয় গান সংগ্রহ হইতে পারিব। প্রথমাবস্থার সমুচয় গীত একত্র করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে, কারণ একেতো বহুকাল গত, তাহাতে আবার তিনি এক সময়ে একজনকে কৃপা করেন নাই, কখনো "ভবানে বেনে" কখনো "নীলু ঠাকুর" কখনো "মোহন সরকার" এবং কখনো কখনো অপরাপর কবিওয়ালাদিগ্যে কবিতা দিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা এই কল্পে ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করি না ; ইহার নিমিত্ত এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। আমারদিগের শব-সাধনের ন্যায় সাধনা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দৃষ্টে কারুণিক ঈশ্বর আপনিই করুণা বিতরণ করিতেছেন। প্রতিদিন দুই একটা করিয়া পুরাতন গীত কোথা হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব ? কবিতা রসের রসিক মহাশয়েরা যদিস্যাৎ তাচ্ছীল্য না করিয়া এই ভাবে সমানরূপ যত্ন করিয়া যথাসাধ্য আনুকূল্য করেন, তবে অনায়াসেই শ্রম সাফল্য সাফল্য করত অমূল্য অতুল্য কৈবল্য সুখবৎ সুখ লাভ করিতে পারিব। এই স্থলে প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, পূর্ব্বে বারদ্বয় যে সমস্ত গান উদিত হইয়াছে এবং অদ্য যে কয়েকটা প্রকাশ হইল, সকলে স্থিররূপে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমারদিগের পরিশ্রমের বিশেষ সার্থকতা হইবেক। অপিচ এ পর্য্যন্ত যে সকল গান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন।

মহড়া।

কে তুমি তা বলো।
এলে প্রেম্ বাজারে, যৌবন ভরে,
হোয়ে ঢলো ঢলো।...

চিতেন।

শশিমুখি, তোমায় দেখি, মৃগনয়নি।
কোরে পদার্পণ, পরের মন, হরো ইঙ্গিতে ধনি॥
প্রিয়ে চেয়ে চিতো হরিলে আমার্,
ঢেকে বদনে অঞ্চলো।

[রাম বসু এই গীতের কর্ত্তা, গাহনার কর্ত্তা মোহন সরকার। এই সরকার বস্তুত বসুতে অস্থ সার্থক করিয়াছিলেন।]

সখী সংবাদ। মহড়া।

এমন ভাবিক্ নাবিক্ দেখি নাই
নাহোতে পার, যমুনার,
মাজখানে বা কূল্ হারাই॥
কি হবে মনে মনে ভাবি তাই।
একি জ্বালা কালা কর্ণধার॥
হোলো প্রাণ্ বাঁচানো ভার॥
কাঁপে তরঙ্গে অঙ্গ, ও করে রঙ্গ.
আমায় বলে ধর রাই॥

চিতেন।

তুলে তরণির্ উপর্,
নটবর, করে কত ছল্।

*সংবাদ প্রভাকর, বুধবার ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ নবেম্বর ১৮৫৪।

বলে দেখিছ কি, রাই, যমুনা প্রবল ॥
তুমি পোরেছ রাই নীল্‌বসন।
মেঘ্‌ ভেবে বাড়ে পবন ॥
বলে তরঙ্গের মাঝে, উলঙ্গ হোতে,
একি লজ্জা আই গো আই।

অন্তরা

*   *   *   *   *

চিতেন।

তরি করে টলোমল্‌,
উঠে জল্‌, হেরে হারাই জ্ঞান।
এ সময়্‌ বলে সই, কই পশরা দান ॥
আমি ভেবে হোয়েছি আকুল্‌।
অকূলে বুঝি যায় কূল্‌ ॥
পেয়ে ঘোর সঙ্কটে যৌবন লোটে,
না মানে কংসের দোহাই।

[৪০ বৎসর অতীত হইল রাম বসুর কৃত এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন। এ গীতে অত্যাশ্চর্য্য রচনা কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কিয়দংশ ও দ্বিতীয় গান প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যাম্‌সাগরে, কালো নীরে,...
কিশোরী ডুবিলো ॥

চিতেন।

জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী,
দিলে কালো জলে ঝাঁপ।
পরিতাপ ঘুচাতে, পেলেন মনস্তাপ্‌ ॥
কিসে হবে পরিত্রাণ্‌।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান ॥
কুলবতী হোয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো।

[পূর্ব্বোক্ত গীতের অপেক্ষা এই গীতের বয়স অধিক হইবে। অতি চমৎকার রচনা। ইহার অপরাংশ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

লোয়ে দুগ্ধ দধি, পশরাতে, সাজায়ে সকল্‌।
ভাব্‌তেছি তাই সখি ॥
যাব কি না যাব আজ্‌, মথুরার বিকি।
বসেছে নূতনো দানী, নন্দেরো নন্দনো নাকি।

চিতেন।

বড়ায়েরো মুখে একি, গো সখি, শুনি পরমাদ্‌।
ঘুচিলো আমাদের্‌ সবো, বিকিকিনি সাদ্‌ ॥
যে শুনি দানিরো কথা,
গিয়ে কুলো হারাবো কি ॥

অন্তরা।

নিতি নিতি, বিকি কিনি, করি দধি সর্‌।
গোপজাতি ধর্ম্ম এই, ইহাতে দিই রাজকর্‌ ॥

চিতেন।

এ বড় বিষমো হোলো, বসিলো,
দানী এ পথে।
কি দানো তাহারে সখি, হবে গো দিতে ॥
শুনেছি রসিকো দানী,
না জানি সে চায়ো বা কি ॥

[৫০ বৎসর গত হইল রাম বসু এই গান প্রস্তুত করিয়া নীলু ঠাকুরকে প্রদান করেন। ইহার পাল্‌টা পাইলাম না।]

মহড়া।

জলে জলে কে গো সখি।
অপরূপো রূপো দেখি ॥
ঢেউ দিওনা কেউ এজলে, বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী ॥

চিতেন।

*   *   *   *   *

অন্তরা।

বিশেষ্‌ বুঝিতে নারি, নারী বইতো নই।
ওগো প্রানো সই ॥
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই।

চিতেন।

কতশত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে ॥
আবার্‌ ভাবি সে, যে, শশি কুমুদোবান্ধব্‌,
হৃদয়ো কমলো কেন, তাদেখে হবে সুখী।

[এই গানের অপরাংশ ও দ্বিতীয় পাইলাম না, ইহাতে আক্ষেপ প্রকাশ কত

করিব? এমত চমৎকার রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বসুজ প্রণীত এই গীতের সাট্ গান করিয়া নীলু ঠাকুর অনেক সদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মোহিত করিয়াছিলেন। কথিত কবি যৎকালে উক্ত কবিতা রচনা করেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ঊর্দ্ধ সংখ্যা বিংশতি বৎসর হইবে।]

মহড়া।

হোয়েছি তোমার বাঁশীর দাসী,
তাই আসি বনে।
কুলবধূ, বধবঁধূ, সমধুর তানে॥
মুরারী স্বয়ং গায়কো। মুরারী উত্তর্ সাধকো॥
না মানে কুলোকীলকো, গুরুভয় না গণে॥

চিতেন।

রাধা রাধা রাধা বোলে, বাঁশি করে রব।
বাঁশি আমার নাশিলেকো, সতীত্ব সৌরভ॥
অমনি অরণ্যে আনে। মুরলী কি মন্ত্র জানে॥
অঞ্জনা কোরেছি মনে, গুরুরো গঞ্জনো।

[এই সাটের সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না। নীলু ঠাকুর এই গীত গাহিয়াছিলেন। এই গীতের কর্ত্তা কোন্ ব্যক্তি, সে বিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে, কেহ কেহ কহেন, "রাম বসু ইহার কর্ত্তা" এবং কেহ কেহ কহেন "রাম সুন্দর রায় ইহার জন্মদাতা" ফলে আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, উভয়েই প্রায় তুল্য কবি ছিলেন, কবিতা কল্পে উভয়েরি অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন ব্যক্তি রাম বসুর বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত রামসুন্দর রায় কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন, কলিকাতার ডিঙ্গেডাঙ্গায় বাস করিতেন। ইনি নীলু ঠাকুরের দলে শ্লেষোক্তি খেউড় করিয়া হরু ঠাকুরকে নতমুখ করেন, তাহাতে অতি চমৎকার রসিকতা ও পাণ্ডিত্য ও কৌতুক প্রকাশ হইয়াছে। কেহ পাঠ করিলে শুনিতে শুনিতে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইনি অতি উত্তম উত্তম সখী সংবাদ ও বিরহ এবং ভবানী বিষয় রচনা করিয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে সাধ্যের ত্রুটি করিব না। শুনিতে পাই, ইহার কৃত খেউড় গান সর্ব্বাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও বিখ্যাত।]

যথা।

"সেই হরি কি তোর্ হরু ঠাকুর।
ভোলা ঠাটের দেব্তা পাটে
রেখে করিস্ ভূর॥"

ইত্যাদি। তথা রাম বসুর উপর এক খেস্বা রচনা করেন।

যথা।

"আক্ড়া সাজায়েছে ভালো,
মাকড়া রামু বাউল্।
দিয়ে এড়ুয়া বেঁকি নূপুর পায়,
ভেড়ুয়া যেন নেচে যায়, মেড়ুয়াবাদির মত
ওটার মাথা ভরা কোঁক্ড়া চুল॥" ইত্যাদি।

বিরহ। মহড়া।

নব যৌবন জ্বালায়, মলেম্ গো সহচরি।
নাথো নিবাসে এলো না কি করি॥

চিতেন।

বয়সো প্রথমে, সপ্তমে অষ্টমে,
বালিকা ছিলাম্ যখন॥
তখনো বলিতাম্ সজনি,
ভালো মদনো সেই কেমন॥
এখন প্রাণোনাথো বিহনে।
জানিলাম সজনি, দহে বটে মদনে॥
হোলো কলিকা কদম্ব, এ কুচো ডাড়িম্ব,
দিনে দিনে দ্বিগুণো ভারি।

অন্তরা।

যদি অনলো, হোতো প্রবলো,
জলে করিতাম্ নির্ব্বাণ্।
নৈলে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিতো এ অঙ্গ,
মন্ত্রেতে বাঁচিতো প্রাণ॥

চিতেন।···

* * * * *

[রাম বসুর এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন, ইহার আর কিছুই পাইলাম না। আহা, কি পরিতাপ! এত দুঃখে রত্নময় পর্ব্বতের মধ্যস্থ হইয়াও চূড়া দেখিতে দেখিতে পাইলাম না।]

মহড়া

বঁধু কার কখন্ মন রাখ্‌বে।
তোমার এক্ জ্বালা নয় দুদিক্ রাখা,
বল প্রাণ্ কিসে প্রাণ্ বাঁচবে॥
সমভাবে কেমন রবে।
সবে তোমার একো মন্।
তায় কোরেছ প্রেমাধিনী, দুঠেঁয়ে দুজন॥
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ
হাসাবে কায়্ কাঁদাবে॥

চিতেন।

একোভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ্
সে ভাব্ তোমার নাই॥
পেয়েছ যে নূতন নারী, মনো তারি, ঠাঁই॥
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ্।
প্রাণ্ তোমার প্রমাদ্ হবে,
সে করিবে ক্রোধ্॥
দ্বেষাদ্বেষি দ্বন্দ কোরে কি, দেশান্তরী করিবে॥

[মোহন সরকারের মৃত্যুর পরে বসুজ ঠাকুরদাস সিংহকে এই গীত প্রদান করেন, ইহার সমুদয় সাট পাইলাম না।]

মহড়া।

নাথো আজ্ আমার পীরিতের ব্রত উজ্জাপন্।
আনো বিচ্ছেদের কোরে আবাহন।
দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হয়ো পাপো মন্।
অঘটো ঘটনা ঘটে, কোরে যাই আজ্ বিসর্জ্জন

চিতেন।

আমি প্রেমব্রত করেছিলাম্ যারো কামনায়।
কর্ম্ম দোষে সখাহে, না পেলেমো তায়॥
খণ্ডব্রতী হইহে যদি, হাসিবেহে শত্রুগণ॥

[ইহার অপরাংশ অপ্রাপ্য হইয়াছে বসুর এই গান মোহন সরকার গাহিলে কবিওয়ালা বলাই দাস বৈরাগী অথবা অপর কেহ তৎক্ষণাৎ আসরে ইহার অত্যাশ্চর্য্য উত্তর করিয়াছিলেন।] যথা।

মহড়া।

"হবে অপযশো সার।
কোরো না প্রেম্ উজ্জাপনো আর্॥
যে করে প্রেম্ উজ্জাপনো নানা বিঘ্ন তার্।
যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলিলে আগুন।
হবে প্রাণ্ যন্ত্রণা দ্বিগুণ্॥
রতিপতির্ হুমের ধূমে, প্রাণে বাঁচা ভার্॥

চিতেন।

অনুরাগে, তনুত্যাগে, তাই দেখি তোমার
বল প্রাণ্, এ মন্ত্রণা কাহার্॥
প্রেম যোগে কল্লে অসংযোগ।
নাহি তার্, স্বর্গে সুখোভোগ॥
আমারে মজাবে মিছে, হাসাবে সংসার॥

মহড়া।

আগে মন ভেঙ্গে শেষ্ যতন।
আর কি এ প্রেম, গড়ে॥···

চিতেন।

প্রাণ্ দেখো একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফলো পায়, কোরে তায় কত যতন॥
তুমি খল স্বভাবী, প্রেম্‌তরুরো,
মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে॥

[অতি সুন্দর। বসুর কৃপায় এই গান মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন ইহার সমুদয়াংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

এই অবলার্ মান থাকে কিসে,
প্রাণ্ তাতো বুঝ না।
তুমি জাননা সোহাগ্, কথায় কথায় কর রাগ।
পীরিৎ ভাংতে শিখেছিলে গোড়্‌তে জাননা।···

চিতেন।

কামিনী কলহ, নির্ব্বাহ,
পুরুষ্ যদি রসিক্ হয়।
ধৈর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে,
যে আনে, যে জানে প্রণয়্॥

তুমি আপনি প্রাণ্ হোলে অধৈর্য্য।
বোলে কর্ব্ব কি আর্, কপাল আমার,
তুমি যে হোয়েছ আমার অত্যেজ্য॥
তোমার হৃদয় মাঝে রাখি, তবু সখী নই,
দিলে ঘরে আগুন শুনে পরের মন্ত্রণা॥
[রাম বসু এই গীত নিজ দলে গাহিয়াছেন। ইহার অপরাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পাল্টা গানের চিতেন মহড়া প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

যথা দ্বিতীয় গানের মহড়া।

পরের মন্ত্রণায়,
বাদ্ কোরে প্রেমের্ সাধ্ কেন ঘুচালে।
ছিলো নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা,
কেন সে প্রবৃত্তিপথে কণ্টকো দিলে॥
সেধে আপন কায্, কেবল্ আমারে মজালে।
পীরিৎ ভাংলে কি, বঁধু এম্নি হয়।
এখন ডাকলে সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥
তোমায় এ পথো ভুলায়ে, সে পথে নেগেল যে,
এমন বশীকরণ্ বিদ্যা সে কোথা পেলে।

চিতেন।

এ সুখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি,
বল কিসে হোলো প্রাণ্।
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ্॥
যখন নবভাব ছিলো সে এক মন।
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলে যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন॥
কোন্ কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ,
তারো মায়ামেঘের আড়ে কায়া লুকালে।
[অতি উৎকৃষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

ওগো প্রাণ সখি আমার্ মনের খেদ্
আর্ ঘুচলো না।
এলে বসন্ত, থাকে প্রবাসে কান্ত,
আবার্ কান্ত এলে বসন্ত থাকে না॥

মহড়া।

অনেকেতো প্রেম্ করে,
আমার্ কেন এমন হয়।
বিনি যন্ত্রণায়, যদি দুদিন যায়।
যেন তিন দিনের্ দিন একটা ঘটেছে প্রলয়।
[উপরোক্ত দুই মহড়ার অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]
[১ কার্ত্তিকের প্রভাকরে ৯ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে প্রকাশ হয়।]

যথা।

"দেখ্‌ব কেমন সুন্দরী কুব্জা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,
নূতন যে রাণী হয়েছে বাঁকা কি সোজা।"
[ইহার অপরাংশ না পাইয়া বহু যত্নে দ্বিতীয় গান সংগ্রহ করত প্রকাশ করিলাম।]

যথা। মহড়া।

সময় গুণে এই দশা হোয়েছে।
ছিলো দাসী যে, হোলো রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর্ এখন কপাল্ ভেঙ্গেছে॥
সরমে মরমে মরি, কব কার্ কাছে।
যে জন আঁখির আড়্ হোতো না।
তারে দেখতে এসে, এত লাঞ্ছনা॥
আমরা পথে বোসে কাঁদি আজ
এমন কত কান্না তোদের্ রাজা কেঁদেছে।

চিতেন।

কপাল্ মন্দ দ্বারিহে, কৃষ্ণের্ নিন্দে করা নয়্।
দশা যখন বিগুণ্ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়্॥
রাধার্ চরণে যার্ লেখা নাম্।
এখন্ তোদের পায়ে, ধরালে সে শ্যাম্॥
ভাবতে বলগে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান্ কতবার্ ভিক্ষে লয়েছে।

অন্তরা।

কথা কইতে গেলে, নয়ন্ জলে,
অঙ্গ ভেসে যায়্।
রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিতেছে দরজায়॥

এমন্ নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের্ শ্রীমতী যে নয়।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়॥
আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি।
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি॥
মনে কর্ত্তে বল্ তোদের রাজাকে,
বুঝি আপ্‌নার সে দীনতা ভুলে গিয়েছে।

[১ আশ্বিনের পত্রে প্রকাশ হয়। "পোড়া প্রেম্ কোরে তোর্ পোড়ায় আমার জন্মটা গেলো।" এই গানের অপর কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

পোড়া প্রেম্ কোরে তোর্
পোড়ায় আমার্ জন্মটা গেলো।
যত দিন হোয়েছে মিলন্,
একদিন্ নাই তার কান্না বারণ্,
পোড়া শিবের দশা যেমন,
তাই আমার হোলো।
ভেবে ভেবে হৃদের মধু হৃদে শুখালো।
আর্ তো দৃষ্টিপোড়ায় পুড়্‌তে পারিনে।
স্বোণার বর্ণ ছিলো, কালী হোলো,
চোকের মাথা খেয়ে চেয়ে দেখিস্‌নে॥
অনল নেবালে নিবেনা, সদাই উঠে জ্বলিয়ে,
বুঝি, তোমার হোতে প্রেমের্ সাধ্ ফুরালো॥

চিতেন।

অনেকেতো অনেক পীরিৎ করে,
এমন্ দশা বলো কার্।
কর্ম্মভোগের যেমন্ কপাল্ আমার্
এমন্ খুঁজে মেলা ভার॥
অস্থি ভাজা ভাজা হোলো প্রেমের দায়্।
ভেবে তোর্ গুণাগুণ, মনের আগুন্,
জ্বল্‌ছে যেন রাবণেরি চিতা প্রায়॥
কেবল্ ঘরে দিলে দেখা, করিস মুখ বাঁকা,
গিয়ে আর্ আর্ লোকের কাছে থাকিস্ ভালো।

[এই গান নিজ দলে গাহিয়াছিলেন। ইহার অপরাংশ ও পাল্‌টা প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

নাথো, কোন্ গুণে মন্ চায় তব্ তোমাকে।
ঝোরে প্রাণ্ আমার দুনয়ান্,
এক্‌তিলো না দেখে॥

চিতেন।

তুমি শরীর্ বেদন্ জাননা লম্পট আপনি।
প্রীতি ডোরে, বন্ধি কোরে, বধ্ কর রমণী॥
হানো দারুণো বিচ্ছেদে শেলো,
যুবতীরো বুকে।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ, আমি অবলা, বুঝিতে না পারি।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥

চিতেন।

আমি সরল ভাবে তোমায় প্রাণ,
রাখ্‌বো কেমন্ করে।
তুমি যে দেবে দুখ্ আমায়,
জানবো কি প্রকারে॥
পোড়া পীরিতি করিয়ে আমার্, জন্ম গেল দুখে।

[মোহন সরকার এই গান গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমারো এদেশে, অনেকে আছে,
তারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী॥
কেবল্ মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি॥
অরসিক্ গ্রাহকে এ রস চায়্।
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়্॥
পশরা নামাতে এসে অনেকে,
আগে দুই বাহু পশারি॥

চিতেন

মদনো রাজারো, প্রেমেরো বাজারে,
এলে প্রেম লাভো হয়্।
রসিকে রমণী, এলেম্, আমি, সেই আশয়্॥
আগে কে জানে সই এ বিবরণ্।
কপট মহাজন্ হেথা এমন্॥

নূতন ব্যবসায় রমণী পেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী।

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা,
ভার হয়, আপনায় সহিতে।
যৌবন রসেরো, ভারো অতি ভারো,
নারী নারি আরো বহিতে॥

চিতেন।

গোপেতে গোরসো, লয়ে দেশো দেশো,
ভ্রমণো করে যেমন্।
এত নয়, তাদৃশ গছাবার ধন্॥
রসিকো, গ্রাহকো যদ্যপি পাই।
বিরলে বিক্রয়ো করি তাঁর ঠাঁই॥
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে,
কেনা হব আমি তাহারি।

[হায় রাম বসু! জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিলেন না! এই গীতের পাল্টা যখন পাইব তখন কি আহ্লাদ হইবে ?]

মহড়া।

বল কার্ অনুরোধে ছিলে প্রাণ,
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি সেই প্রেমের বশে প্রেমোরসে তুষ্‌তেপ্রাণ॥
রাখিতেহে অধীনীর সম্মান্।
অভিমানী হোতেম্ হে তোমায়।
প্রাণোনাথ, কার্ সোহাগে অনুরাগে
ধর্ত্তে আমার্ পায়॥
তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কিসে গেলো গেলো সে সম্মান।

চিতেন।

আবাহনো কোরে প্রেম, দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন্ হোক্, হোয়েছে,
আমার কপালে ছিলহে যেমন্॥
রঙ্গরসে ছিলেম্ এত দিন্।
প্রাণোনাথ, প্রেমের পথে,
দুজনাতে কে কারো অধীন॥
শেষে যদি করিবে এমন্,
কেন আগে বাড়াইলে মান্॥

অন্তরা।

ওরে প্রাণরে, কথা কবার্ নয়,
কইতে ফাটে হিয়ে।
পূজ্য ছিলেম্, তেজ্য, হোলেম্, যৌবনো গিয়ে॥

চিতেন।

দৈব দেখা প্রাণোনাথ, হোতো হে পথে।
আপ্‌না আপ্‌নি ভুলিতে,
হাতে আকাশের চন্দ্র পাইতে॥
এখ্‌নতো সেই পথের দেখা হয়।
প্রাণোনাথ, লজ্জাতে মুখ ঢাকো
যেন ঠেকেছো কি দায়।
প্রেমো গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান॥

[গত ১ কার্ত্তিকের পত্রে এই গানের কেবল মহড়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। অদ্য সমুদয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরদাস সিংহ গাহিয়াছিলেন। এই গানের দ্বারা রাম বসু চিরস্মরণীয় হইতেছেন।]

রাম বসু*

[চার]

গত আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে আমরা রাম বসুর প্রণীত অনেক গুলীন সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ কবিতা প্রকাশ করিয়াছি, তৎপাঠে সন্তুষ্ট না হইয়াছেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই; ফলে ইহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ জন্মিবার কারণ কিছুই

* সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুআরি, ১৮৫৫ সাল।

দেখিতে পাই না, কারণ অমৃত ভোজনে কাহার রসনা তৃপ্ত না হয়? কাহার অরুচি জন্মিয়া থাকে? রাম বসুর গীত সুধাপূর্ণ, অমৃত হইতেও অমৃত। যেমন ঘৃত ভোজনে ক্রমশই রসনার বাসনার আধিক্য হইতে থাকে—যেমন সুগন্ধি কুসুমের আঘ্রাণ গ্রহণে নাসিকারন্ধ্র আমোদে পূর্ণ হইতেই থাকে—যেমন কলরবের কুহু কুহু কলরব কল্পনায় শ্রবণের শ্রবণ সুখের উন্নতি হইতেই থাকে—যেমন সুখদ সুরভি সাময়িক সুশীতল মৃদুল প্রাতঃসমীরণ স্পর্শে গাত্র পাত্র পুলকে পরিপূরিত হইতেই থাকে—যেমন মনোহর মূর্ত্তিধারি তিমিরারি তরুণ অরুণের চারু প্রভাতে প্রভাতে নেত্র নীরজের প্রফুল্লতাই প্রকাশ পাইতে থাকে, সেই রূপ এই মৃত কবির অমৃত পূরিত কবিতাকদম্ব কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে, পাঠ করিতে, স্বরে গান করিতে, শ্রবণে শ্রবণ করিতে কোন কালেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, ক্রমেই আসক্তি প্রশক্তির প্রাচূর্য্য হইতেই থাকে। এপ্রযুক্ত উক্ত বিষয় সংগ্রহ নিমিত্ত নিয়ত নিযুক্ত হইয়া কত ক্লেশের ভুক্তভোগি হইলাম তাহা উক্ত করিবার নহে। জগদীশ্বর আর কত দিনে এই আশা-পাপ হইতে মুক্ত করিবেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এই শ্রমকে শ্রম বলিয়াই জ্ঞান হয় না—লোকের উপাসনাকে উপাসনাই বোধ হয় না—কেহ অমর্য্যাদা করিলে তাহাতে ক্রোধ হয় না। যিনি এই প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করেন, তাঁহার উপকার ঋণ কিছুতেই শোধ হয় না। যাঁহার নিকট যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হই, তাঁহার স্থানে বিনা বেতনে যাবজ্জীবনের জন্য বিক্রীত হইয়া থাকি। যাহা হউক, অত্য এই সূত্রে অধিক লেখনের প্রয়োজন করে না, তাহাতে কেবল বিষয়ের বাহুল্য করাই হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সমস্ত অসংপূর্ণ গান প্রকাশ করিয়াছি তাহার কোন কোন গানের সংপূর্ণাংশ এবং তদতিরিক্ত অপর কয়েকটি গীত অতি যত্নে সংগ্রহ করিয়া নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অবলোকন করুন।

মহড়া।

হর নইহে আমি যুবতী।
কেন জলাতে এলে রতিপতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদ লাবণ্য, হোয়েছ বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

চিতেন।

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,
আজ্ অনঙ্গ একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বারেবার॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেননা, পুরুষো প্রকৃতি॥

অন্তরা।

হায়, শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরি হওনা আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা,
নহে নহে এতো জটাভার॥

চিতেন।

কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীল রতন
অরুণো হোলো নয়ন,
কোরে পতি বিরহে রোদন॥
এ অঙ্গ আমারো, ধুলায়ে ধূষরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥

[এই গীত ভবানে বেণে গাহিয়াছিল, রাম বসু যখন প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ না হইতে পারে। দেখুন, এতদ্রূপ বাল্যাবস্থার গান কত দূর পর্যন্ত উত্তম হইয়াছে।]

মহড়া।

কোকিলে কি সময়ো পেলে॥
তুমি এত দিন কোথা ছিলে।
কাল্ গুণে কাল্, তুমিও হোলে॥
একেতো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী॥
হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে।

[এই গানের আর কিছুই প্রাপ্ত হই নাই, ইহার দ্বিতীয় গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।]

মহড়া।

রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর হিতকারী নয়॥

চিতেন।

পাণ্ডব খাণ্ডব বন, দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষি তাতে, হইল দাহন॥
কোকিলে মরিত যদি তায়।
তবে কি কুরবে প্রাণো যায়॥
বিরহিণী বধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয়॥

[কি পরিতাপ! এই উৎকৃষ্ট গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

তুমি হও মহাজন্ অবলার॥
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেম ধন
আমার যৌবন্ হবে জামিন্ দার।
পীরিতেরি খাতক্ আমি হবতে তোমার॥
পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন্ বাঁধা থাকিবে আমার্,
প্রাণ্ যত দিন্ রয়॥
স্বদে সুখো ভুঞ্জ চিরদিন্,
মোলে এধারে হবে উদ্ধার॥

চিতেন।

এসেছি পীরিতের দেশে প্রাণ্,
প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি, প্রাণো, যপে প্রাণ্ জুড়াই॥
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বঞ্চিতো কোরোনা বঁধু, কিঞ্চিতো আমায়॥
আপনার্ কোরে, লও আমারে,
প্রেম নিধি দিয়ে ধার।

[আশ্চর্য্য।]

মহড়া।

এক্‌বার আয়্ উমা, তোমারে মা,
করিগো কোলে॥
বিধুমুখে ওগো জননি, ডাকা জননী বোলে।
তুমিতো ভাবনা মা বোলে॥
তোমা বিনে যে দুখো গেছে।
সে সব কথা, কব উমা, তোমারো কাছে।
বর্ষাবধি, পরে যদি, অঙ্গনে দেখা দিলে।

চিতেন।

মেনকা কহিছে উহা তোমা বিহনে।
অন্ধকারো ছিলো সবো, গিরি ভবনে॥
ঘুচিল তিমির নিশাচয়।
উমা মা আসি, পূর্ণশশী, হইলে উদয়॥
অঞ্চলে অঞ্চলের নিধি, বিধি আনি মিলালো।

[ইহার অন্তরা পাই নাই। অতি উত্তম।]

মহড়া

পূর্ব্বাপর নারীর মত অবিশ্বাসী কে আছে।
নিজে বিপক্ষেরে দিয়ে পতির মৃত্যুবাণ,
দেখো মন্দোদরী সতী পতি বোধেছে॥
নারীর্ হাতে সঁপে ধন প্রাণ্,
প্রাণ্ যেতে বোসেছে।
আমি সাধ্ কোরে কি করি খেদ্।
নারী মন্ত্রণাতে, দিতে পারে,
ভাই ভেয়ে কোরে বিচ্ছেদ্॥
ধোরে তিলোত্তমা নারী মোহিনীর বেশ্,
দেখো সিন্ধু উপসিন্ধু প্রাণে মেরেছে॥

চিতেন।

ঘৃণাগ্রেতে যদি করি দোষ্
তিলে কোরে বোসো তাল।
না জানি কারণো কও প্রিয়ে,
কেমন্ পুরুষের কপাল্॥
তুমি আত্ম ছিদ্র লুকায়ে।
পেলে পরের ছিদ্র, পাড়ায় পাড়ায়্
বেড়াও ঢেঁড়্রা ফিরায়ে॥
নারীর নাই কিছু মমতা, দারুণ বিধাতা,
কেবল্ পুরুষে বধিতে যৌবন্ দিয়েছে॥

অন্তরা।

যদি অবলা অবলা, বল তবে প্রাণ্,
সবলা কে আছে আর।

বলে চতুর্গুণ, ছলে অষ্টগুণ,
ভাবের্ অন্ত পাওয়া ভার ॥

চিতেন।

কামিনী কোমল কে কহেরে প্রাণ,
হৃদয় অতি কঠিন্।
এক ঐক্যে, এক বাক্যে,
এক পক্ষে, থাকে না এক দিন্ ॥
যেমন্ সসর্পে গৃহেতে বাস্।
হোলে দুষ্টা ভার্য্যা, বেড়ায় গর্জ্জে,
খেলে খেলে এম্নি ত্রাস্ ॥
ধনি তা নিলেরে প্রাণ্, বোধে পতির প্রাণ্,
দেখো রাজ্‌কুমারী সতী কোটাল ভোজেছে।

[চমৎকার, চমৎকার]

মহড়া।

গেল তিন্ দিনে প্রেম্, চিরদিনে,
বিচ্ছেদ গেলোনা।
রসাভাবে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে,
পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হোলোনা ॥…
হোলো তিন দিনে ছাড়াছাড়ি।
পোড়া বিচ্ছেদের্ কি, হয়োগো সখি,
অবলারি সঙ্গেতে এত আড়ি ॥…

চিতেন।

আমার কপালে অল্প ভোগ্,
প্রেমের কল্পযোগ্, করা ভার্।
ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ,
কেবল কর্ম্ম ভোগ্ হোলো সার্ ॥
কেমন্ হাবাতে কপাল্ আমার।
প্রেমের উদ্যোগী যে, সম্ভোগী সে,
হোয়েছিল দুটিবার্ কি এক্‌টিবার ॥
আমার্ অকলঙ্ক চাঁদে, কলঙ্কেরি দাগ,
বিচ্ছেদ্ এক্‌বারতো সেটা মনে ভাব্‌লেনা ॥

[কি আশ্চর্য্য রচনা! আহা! ইহার অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না, এই গানের পাল্‌টার অসংপূর্ণ কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।]

মহড়া।

বোলো প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদকে তার,
ডেকে নেযেতে।
থাকে আরো ধার্ আমি শুধে আস্‌বো তার্,
এত তসিল করে কেন মসিল বরাতে ॥
বাজে আসি আসি এমন্ বিনয় ভিক্ষা
মাগাতে।…
দিয়ে উদোর ঘাড়ে তুলে, বুদোর ঘাড়ের মোট্,
আমায় ফেলে গেল ফাঁকের শাঁকের করাতে।
দিয়ে মনের বনে, আগুণ, প্রাণ জ্বলালে সে,
তবু পাল্লে না বিচ্ছেদের বাসা পোড়াতে ॥…
আপ্‌নি শাসন্ না কোরে এই,
যৌবনের তালুক,
আমি তারে কি বোলেছি পত্তনি দিতে।

[কি আক্ষেপ! এতদ্রূপ! অত্যুৎকৃষ্ট গীতের আদি অন্ত প্রাপ্ত হইলাম না। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিতে পারেন তবে তাঁহার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।]

মহড়া।

হায় বিধাতা, এই ছিল কি আমার কপালে।
একি প্রেম্ ঘটনা, কি লাঞ্ছনা,
ভেকের বাসা কমলে ॥…

চিতেন।

আমি জন্মে জানিনে প্রেম যাতনা,
মনে পড়ে না।
সই তুমি মজালে তোমার, ধর্ম্মে সবেনা ॥
স্বর্ণ পিঞ্জর আছে সজনি,
কেন বায়স এনে বসালে।

[এই গীতের সমুদয় পাইলে কি সুখের বিষয় হইত! বোধ করি কোন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন।]

ওহে বাঁকা বংশিধারি।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা,
কুবুজা নারী ॥
বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী।

রাধা সে সরলা রমণী।
তুমি নিজে বাঁকা আপনি ॥
মথুরা নাগরী পেয়ে, হরি ফিরিছ চক্র করি।

[ইহার আর কিছুই পাই পাই, ভবানে বেণে এই গীত গাহিয়াছিল। তৎকালে কবির বয়স ১৫।১৬ বর্ষের অধিক নহে।]

মহড়া

নটবর কেগো সে সখি।
তার্ নাম্ জানিনে কালোবরণ,
ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি ॥
যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
হাসি হাসি, বাজায় বাঁশি,
বাঁশির দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন।

ভুবন মোহন ভঙ্গি অতি চমৎকার।
সে যে মন্মথ মন্মথরূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার ॥
চাইলে সে চাঁদ্ বদন্ পানে,
শরীর্ প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে,
এক্‌বার্ হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ॥

[এই গীতটি উক্ত গীতের সমবয়স্ক। ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

নৈলে কিছুই নয়।
বটে সুখোনিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয় ॥
সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়।
উভয়ে উত্তম্, পরিশ্রম্, যদি করে।
তবে যতনে এধনে রাখিতে পারে ॥
সুখের সুখি, দুখের দুখি,
দোঁহে দোঁহার হোয়ে রয় ॥

[ইহার অপরাংশ পাইলাম না। এই গান নীলু ঠাকুর গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর্ মধুর্ আলাপন ॥
কত দিনো প্রাণো তুমি, হোয়েছ এমন।
প্রিয়বাক্যে প্রেয়সী বলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায় ॥
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন, সুধা বরিষণ ॥ ঐ ঐ

মহড়া।

সখি প্রেম কোরে অনেকের এই দশা হয়।
শুধু তুমি আমি বোলে নয় ॥...

চিতেন।

যা বলিলে প্রাণ সই, সকলি স্বরূপ।
মজেছি পীরিতে, তেজিবে কি রূপ ॥
দেখো দেখো সজনি, থেকো সাবধান।
রেখো আপনি, আপনারো মান ॥
দুখে কর সুখো জ্ঞানো, ভেবনা সংশয় ॥ ঐ ঐ

মহড়া।

আগে মন্ ভেঙ্গে শেষ যতন্ ॥
আর্ কি এ প্রেম্ গড়ে।
সেধোনা এখনো প্রাণো, কেবল্ রাগ্ বাড়ে ॥
মিছে জ্বলাও কেন,
তোমার গুণো বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে ॥

চিতেন।

প্রাণ যদি এক বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফল পায়, কোরে তায় কত যতন ॥
তুমি খল্ স্বভাবি প্রেম্ তরুরো,
মূল ফেলেছে আগে ছিঁড়ে ॥

[এই গীত মোহন সরকার গাহিয়াছিলেন।]

মহড়া।

যা ভাবো তা নয়।
মনের সাধ্ গেলে কি, বল দেখি,
অনুরোধে প্রেম কি রয় ॥
মিছে আর্ কোরোনা বিনয়।
বিনে ঐক্যে, বিনয়্ বাক্যে প্রাণ্,
বল্ পর কি আপনার হয় ॥

চিতেন।

মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ।
মন ভুল্‌বেনা,
আর খুল্‌বেনা সেই বিচ্ছেদের বাণ।

দাগা পেয়ে ভোগায় ভুলে আর্ বল
নিত্তি কে যাতনা সয়।

অন্তরা।

জাগা ঘরে যায় চুরি, এমন তো ভেবনা প্রাণ।
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে হোয়েছি সাবধান ॥

চিতেন।

কুতর্কে লওয়াবে কি আর্ সতর্কে আছি।
হব খলের বশ, এখন নাই সে রস,
নিজ মনকে বেঁধেছি ॥
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি, এখন,
তত্ত্ব কর নগর্ ময় ॥
[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর ॥

মহড়া।

দেশ চলালেম্ প্রেম্ কোরে সই,
প্রাণ্ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ্ বিষে, লোকের রিষে,
আমি দুই জ্বালাতে জল্‌তেছি ॥···

চিতেন।

না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে
একে হোলো আর।
আমি প্রাণ্ জুড়াতে গেলেম্,
শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার ॥
একে নবভাব্ অনুরাগ পড়ে মনে।
প্রাণ্ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে।
চোরেরো রমণী যেমন্ সই,
তেমনি মর্ম্মে মোরে আছি ॥

[উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ্ একোবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হানেগো তায় বিচ্ছেদ্ বাণ,
যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে,
মনে পড়ে তার ॥
রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার ॥
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুদ্ধতো ভঙ্গ ॥

তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে রবেনা সে আর ॥

চিতেন।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবনকালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার ॥
ওহে বিচ্ছেদ্ তোমার বিচ্ছেদ্ দায়,
নাথো না জানে।
অন্য নারীর প্রেমোসুখে, আছে সেখানে।
তারে জ্বলাতে পারনা, আমায় দেও যাতনা,
ছিছি, অবলা বধিলে নাহি পৌরুষো তোমার ॥

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে বিনতি।
কামিনীরো প্রাণো রেখে, রাখো সুখ্যাতি ॥

চিতেন।

হোয়ে আমার অন্তরের্ অন্তর্,
নাথের্ অন্তরেতে যাও।
প্রণয়্ কোরে অপ্রণয়্, প্রণয়গে ঘটাও ॥
বিচ্ছেদ ব্যথার বাধা কিছু তায়,
দিও বিশেষ। নারীর প্রাণে কত ব্যথা,
জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থুলে ভুল,
ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কূল রক্ষা কর কুলজ্বার ॥

[অত্যাশ্চর্য্য।]

মহড়া।

ওহে প্রাণোনাথো,
পীরিৎ হোলো বিচ্ছেদের প্রজা।
শুনেছি প্রেমনগরে, বিচ্ছেদ রাজস্ব করে,
রসিকেরে প্রাণে মারে সেই দুরন্ত রাজা ॥
প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা ॥
প্রেমের্ দেশে প্রাণ্‌নাথোহে, বিচ্ছেদ্ ভূপতি।
তার আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি,
কেমন্ কোরে কর্ব্ব পীরিতি ॥

চিতেন।

তুমি নিত্য নিত্য বল,
আমায় প্রেমো করিতে।

মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়,
প্রাণ্‌রে, তোমায় প্রাণ্ দিতে।
নূতন প্রেম বাজার, বিচ্ছেদ রাজার, অধিকার।
নবীনা যুবতী, করিলে পীরিতি,
বিচ্ছেদ তো করে লবে আমার॥
শেষে আমাকে পাবেনা, হবেহে লাঞ্ছনা,
কেবল্ কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা॥
[উত্তম, উত্তম। আর কিছুই পাইলাম না॥]

মহড়া।

প্রেমের কথা, যেথা সেথা,
কারো কাছে বোলোনা।
আছি ভাল দুজনায়, অনেকে বিবাদি তায়,
জাননা যে পরের ভাল,
পরে দেখ্‌তে পারে না॥
[কি দুঃখ! এমত উৎকৃষ্ট কবিতার সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না]

মহড়া।

এবার্ আমি পণ কোরেছি,
মন্‌কে পীরিৎ ছাড়াবো॥
ঘুচ্‌লো আশাপথ, এমন ভণ্ড প্রেমে দণ্ডবৎ,
বরণ্ বিচ্ছেদেরে প্রাণ্ নিয়ে জুড়াবো॥ ঐ ঐ

মহড়া।

আহা মরি কিবে ভালবাসো আমারে।
বল্‌তে তোমার গুণ্ লোহায় লাগে ঘুণ,
জলে আগুণ জ্বলে আবার পাষাণ বিদরে॥ ঐঐ

মহড়া।

ছেড়েছি পীরিতের আশা,
পীরিৎ তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও।
যার্ সঙ্গেতে, এসেছিলে আমার অঙ্গেতে,
সে গেল আর্ তুমি কেন,
দুখিনীর মুখ্ দেখ্‌তে চাও।……

চিতেন।

তাইতে বলি পীরিৎ আমি ছেড়ে যাও তুমি॥
এক্ষণে, তোমারি সনে,
থাক্‌বো কেমনে আমি॥
তুমি পীরিৎ আত্ম সুখে সুখী।
অনাথিনী, বিরহিণীর,
কাছে তোমার কার্য্য কি॥
তুমি পর, আমি পর, সেও তো পর,
পর্ মজানে পীরিৎ তুমি,
মিছে আর অঙ্গ জলাও॥
[সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

দ্বারী এক্‌বার্ বল্ তোদের,
কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।
গোপিনী, কৃষ্ণ তাপে তাপিনী,
তোমায় দেখ্‌বে বোলে আছে বোসে
রাজপথে॥
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে॥
তোদের রাজা নাকি দয়াময়।
দুখিনীর্ দুখ্ দেখ্‌লে,
দেখ্‌বো কেমন দয়া হয়॥
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে॥

চিতেন।

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা,
রাজ্ দ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয়॥
মনে অন্য অভিলাষো নাই।
রাখাল্ রাজার বেশ, কেমন্ শোভা দেখে যাই
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি করি ধরি করেতে॥

অন্তরা।

তাই এত তোয়্ বিনয় কোরে বলি।
বড় তাপিত্ হোয়ে এসেছি দ্বারী।
তাই এত তোয়, বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালোবরণ ফণী,
আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি॥

চিতেন।

বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার,
আর্‌তো না দেখি উপায়।

মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী,
তাইরে এলেম্ মথুরায় ॥
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয় ।
রাজার দৃষ্টি মাত্রেই, সে বিষো নির্ব্বিষো হয় ॥
কৃষ্ণ প্রেমের বিষে, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ বিষে,
ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধো নাই জুড়াতে ॥

[সর্ব্বাংশেই সুন্দর]

মহড়া ।

যদি বেঁচে থাকি, ওগো সখি
শঠের সঙ্গে আর পীরিৎ কোর্ব্ব না ।
না কোরে প্রেম ছিলাম্ ভালো,
কোরে একি জ্বালা হোলো,
লজ্জা সরম সকল গেলো, কেউ ভাল বলে না
পীরিতের বাজারে সই, আর যাব না ।
মিছে ছল্ কোরে বোলে কিবে ফল ।
মনের মিলন্ ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো,
হংসমুখে পীরিৎ যেন দুগ্ধ জল ॥···

চিতেন ।

পীরিতে জীবন জুড়াতে,
সখি পরের হাতে সঁপেছিলাম্ প্রাণ ।
আমার কুল্ গেলো, কলঙ্ক হোলো
ঘরে পরে সবাই করে অপমান ॥
পীরিৎ সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ ।
যেমন্ খলের মিলন জলের লিখন,
সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক ॥
দেখে কুতর্ক কুব্যবহার, সতর্কে আছি এবার,
পরের্ পরকীয় রসে ভুল্‌বনা ॥

[সমুদয় পাইলাম না । সর্ব্বতোভাবেই উত্তম ।]

মহড়া ।

কও দেখি হে নূতন্ নাগর,
একি নূতন্ ভাব রাখা ।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
ছ মাসে ন মাসে তোমার পাইনেকো দেখা ॥
এমন্ নূতন্ ভাব্, কে তোমায় শিখালে সখা ॥
কেবল্ পর মজাতে জানো ।

থাকো আপন্ সুখে, পরের দুখে,
দুখী হওনা কখনো ॥
তোমার তাদৃশী পীরিতি, দেখি ওরে প্রাণ,
যেমন্ খলের পীরিৎ বলে জলের রেখা ॥

চিতেন ।

নূতন প্রেমে আমায় মজালে,
কোরে নূতন আকিঞ্চন ॥
নূতন্ ভাব্ ধোরে নূতন্ স্বভাব,
হোরে নিলে মন ॥
নূতন প্রেম বাড়াবার্ লেগে ।
এসে নিত্তি সখা, দিতে দেখা,
নূতন্ নূতন্ সোহাগে ॥
এখন্ কোথা রৈলো তোমার সে সব নূতন্-ভাব, পেলে ছুতো লতা কর বদনো বাঁকা ।

অন্তরা ।

প্রাণ্ এত যদি ছিল মনে,
তবে কেনে, মজালে আমায় ॥
আমি অবলা, কুলেরো বালা,
এত জ্বালা কি সহ্য যায় ॥

চিতেন ।

শীলতা, শমতা, কোথা ওরে প্রাণ্,
কোথা নূতন আলাপন ।
নূতন ছল, এমন্ নূতন্ কৌশল,
কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন ॥···

[আর পাইলাম না ।]

মহড়া ।

তোমার, বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে
প্রাণ্ জুড়াব প্রাণ ।
শুনে রুষ্ট বচন, হোলেম্ তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল নির্ব্বাণ ॥···
বিষকৃমি, সম আমি,
করি বিষ্ খেয়ে অমৃত জ্ঞান ॥

চিতেন ।

গেল গেল পীরিৎ গেল প্রাণ্,
ভাল বাঁচিল জীবন ।

দরশন, পরশন, ঘুচ্‌লো প্রাণ্‌ এখন।
হোলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ।
কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবত্‌॥
পাষাণ্‌ হোয়ে, থাক্‌বো সোয়ে,
পার যত কর অপমান॥

[আহা! এমত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গীত আর না কি শুনা গিয়াছে। কি আক্ষেপ! ইহার আর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

এভাবের্‌ ভাব্‌ রবে কত দিন।
প্রাণ্‌ যতনে মন্‌ যোগাও না, পরিত্যাগো কর না, আমি যেন হোয়ে আছি
জালে গাঁথা মীন॥…

চিতেন।

যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ্‌,
সে ভাব দেখিনে।
তোমার অভাব দেখে, স্বভাব দোষ,
আমি ভুল্‌তে পারিনে॥
দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি।
তুমি বল ভাল্‌তো জ্বালা, এপাপ্‌ আবার কি॥
আপন্‌ বোলে, সাধ্‌তে গেলে
তুমি ভাবো ভিন্‌॥

[আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণ্‌নাথ,
বদন্‌ ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,'
কিছু থাকো থাকো বোলে ধরে রাখ্‌বো না।
আমি কোন দুঃখের কথা, তোমায় বলব না।
তুমি যাতে ভালো থাকো সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ্‌ আমারি গেলো॥
সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায়্‌ দুঃখ দিওনা॥

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণ্‌নাথ
হোলো এপথে আগমন।
কও কথা, এক্‌বার কও কথা,
তোলো এ বিধু বদন
পীরিৎ ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায়্‌ লজ্জা কি,
এমন্‌ তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেকের্‌ দেখি॥
আমার্‌ কপালে নাই সুখ্‌,
বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর্‌ সেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

[ইহার আর কিছুই পাইলাম না। অতি উত্তম]

মহড়া।

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথাহে হরি।
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি॥
এনে বনে কলো হরি, কে জানে বধিবে হরি,
হরি, ভয়্‌ কি মনে করি, মরি বোলে হরি হরি

চিতেন।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস।
বনমালী, বনকেলি, করিলে নিরাশ॥
না জানি কি অপরাধে,
তেজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখো সাধে,
গেলে হে বিষাদো করি।

[এই গান ভবানে বেণে গাহিয়াছিল, অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

জলে জলে কে, গো, সখি। অপরূপো রূপে-দেখি॥
দেখো সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়।
মায়াকোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল॥
তীরের্‌ ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
স্থকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
ওগো ললিতে।
না দেখি এমনো রূপো, বারি মাঝেতে॥

চিতেন।

আজু সখি একি রূপো নিরখিলাম্ হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকি॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে, নারি নারী বই তো নই,
ওগো প্রাণসই।
নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই॥

চিতেন।

কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে।
শশি কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে॥
আবার্ ভাবি সে যে শশী কুমুদ বান্ধব,
হৃদয় কমলো কেন তা দেখে হবে সুখী॥

মহড়া।

প্রেম্ তরুতে সই, চারুটি ফল্ ফলে।
শুন ফলের্ নাম্, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম্,
সময়ে এক্ বিন্দু দিলে, সুখসিন্ধু উথলে॥

[আর কিছুই পাইলাম না। ইহার মূল দেখিয়াই যখন মোহিত হইয়াছি, তখন ফুল ও ফল পাইলে আরো কি সুখের হইত তাহা বিবেচনা করুন।]

মহড়া।

কর্ব্বে উত্তম্ পীরিৎ প্রাণরে
সে প্রেম্ কি সামান্যেতে হয়।
তুমি নবীনা যুবতী, পীরিতে নূতনোব্রতী,
পীরিৎ হবে কি মন্ তোমার তেমন্ নয়॥
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখো ভগীরথ্ মোক্ষ প্রেমের আশাতে।
কোরে মন্ত্র সাধন, কিম্বা শরীর পতন,
আনিলেন্ গঙ্গা ভারতে॥
দেখো প্রহ্লাদের্ যন্ত্রণা,
হরি নাম তবু ছাড়্লে না,
তার্ তাইতে হোলো শেষে সুখোদয়॥

চিতেন।

শ্রীহরি প্রেমেতে,
মোক্ষ আশাতে ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগি।
দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে,
সদাশিব্ হোয়েছেন্ যোগী।
তোমার্ মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই।
এক্বার চাও পীরিৎকে আবার্ চাও বিচ্ছেদকে,
দ্বিধা মন কর রসময়ই॥
যে জন্ পীরিতে রত হয়,
প্রেম্ ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখো প্রেমের্ দায়ে শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

[ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

তোমার প্রেম্ গেছে তবু প্রাণের প্রাণ্
মান্ রেখে কথা কই।
কত পুরুষ্ তুমি পাবে,
সবাই তোমার মন্ যোগাবে,
আমার প্রাণ্ কে জুড়াবে, প্রাণ্ তুমি বই॥
গেছে বস্, তবু আছি তোমার বশ,
ভগ্নভাবে মগ্ন রই॥···

চিতেন।

কল্পতরু যদি কৃপণ্ হয়, তবু রয় মহত্ব।
কত জন্ সুখো ফলো প্রয়াসে,
পোড়ে থাকে নিয়ত॥
তোমার তেম্নি ভাব্ হোয়েছে।
ওরে প্রাণ্রে, আর কি সাধ্ আছে॥
কেবল লুব্ধ আশায়, প্রাণ পোড়ে আছে॥
প্রিয়ে সাধিলে মনের সাধ্,
আর এখন চারা কি,
তব এখন দত্তহারী যদি মনো ফিরে লই॥

[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

ঘরে ঘর্ করা ভার হোলো সখি,
আর্ তো বাঁচিনে।
একে মদন্ সর্ব্বনেশে,
নারীর প্রাণ্ জলায় গো এসে,
পতি হোলো কন্যারেশে,
চায়্ না সতীর পানে॥
ইচ্ছা হয়, তেজে লোকালয়, বাস্ করি বনে॥

মদন্ শর্ হানে সই যত,
সে যে কর দিতে নয় রত।
কেবল্ ঘর্ আগুলে পড়ে থাকে,
পাণ্ডু রাজার মত ॥…

চিতেন।

বসন্তে থাকিতে পতি সতীর হয় প্রমাদ।
ভাল আমার্ বেনে, ভাগ্য গুণে,
হয়েছে সই, হরিয়ে বিষাদ ॥
কোথা সঙ্গদোষে পড়ে,
রতিরঙ্গ আলাপ ছেড়ে।
আমার প্রাণ্পতি এসেছে এবার্,
শান্তিশতক পোড়ে ॥
নাথের্ রঙ্গ দেখে আমার অঙ্গ জলে সই,
সদা দাহন করে আমায় অনঙ্গবাণে ॥

[এই প্রকৃষ্ট গীতের অন্তরা পাইলাম না, ও মহড়ার…মূল পাইলাম না।]

মহড়া।

ঋতুরাজ্ নিলাজ ভূপতি।
যে ধারে কর, দেশান্তর, রৈল সে,
তার দায়ে বধে সতী ॥…

চিতেন।

অন্যায় দেশে রেখে সই গেছে প্রাণনাথ।
সে পেলে কি ধন, এখানে মদন,
দেয়্ তার্ স্ত্রীধনে আঘাত ॥…
অশান্ত বসন্ত রাজা, প্রাণনাথ পলাতক্ প্রজা,
না ধরে সে নিষ্ঠুরেরে আমায় দেয় দুর্গতি।

[এই গীতটি অতি সুন্দর। ইহার সমুদয় ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না। ভরসা করি, এ রসের উৎসাহি মহাশয়েরা আমারদিগের এই মনের আক্ষেপ নিবারণ করিবেন।]

মহড়া।

প্রাণ তুমি এ-পথে আর এসোনা ॥
শুধু দেখা, দিবে ব্যথা, সেতো তা,
মনেতে বুঝ্বে না।
তুমি যার, এখন তার, পূরাও বাসনা ॥
তোমা হোতে সুখো যা হবার।
প্রাণ্ তা হোয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥
দেখা হোলে, মরি জ্বোলে, এ দেখা দিও-না।

চিতেন।

আগে তোমায় দেখ্লে সখা,
হতো পরম আহ্লাদ।
এখন্ তোমায় দেখ্লে ঘটে হবিষে বিষাদ ॥
এসো বোসো বলা হোলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে, আমার্, পাকেকরিবে লাঞ্ছনা।

অন্তরা।

তা বলা নয়, উচিত নয়, না এলে এখন।
নূতন রঙ্গিনী তোমার, করিবে ভৎসন ॥

চিতেন।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে।
অনাদর, নাহি কোরো, সেই নূতন্ পীরিতে ॥
নবরসে সে, যে, রঙ্গিনী।
প্রাণ্ হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী ॥
আমায় যেমন্ জল্য়েছিল তারে জ্বালা দিওনা।

[অতি উত্তম।]

মহড়া।

এসো নূতন্ প্রেম্ করি,
প্রাণ্ বাঁধা রেখে প্রাণ।
রাখ্বো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেমডোরে,
প্রেমের্ প্রহরী থাক্বে আমার দুনয়ান্ ॥
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান,
হও প্রাণের প্রাণ ॥
হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখ্বো অন্তরে,
প্রাণ্ বোলে ডাকলেও আনন্দ ॥
যাতে মন্ দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই,
যেন কেউ কারে হান্তে নারে বিচ্ছেদ্ বাণ ॥

চিতেন।

না হোতে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা,
না হয় সুখোদয়।
বিনে ঐকেতে, হাসে যত বিপক্ষে,
দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয় ॥…

যেন এবার আর তা না হয়,
এক্ ভাবে ভাব রয়,
শেষেতে দেশে না অপমান।

[অতি চমৎকার। কি পরিতাপ ! এই সাটের সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

মান্ ভিক্ষে দেও আমারে প্রিয়ে এখন্।
ধনি আজ্‌কের মত মান্, করি সমাধান্.
একবার্ বদন তুলে কর বিবাদ ভঞ্জন॥

[ইহার সমুদয় ও প্রথম গানটি প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

যৌবনরথে কে তুমি রে প্রাণ্,
পীরিৎ শূন্য যুবতী।
রূপে থমকে থমকে, চপলা চমকে,
কেন পাগল্ কোরে বেড়াও পুরুষ জাতি
প্রেমিকেরো প্রতি তুমি, কর ডাকাতি।
কুচগিরি উচ্চ পেয়ে মদন করে কেলি।
কোথা আছে করিকুম্ভ প্রাণ,
ডাড়িম্ব কি কদম্ব কলি॥

হেরো মুখে মনোহর, লজ্জা পায় শরদ্ শশধর,
কেন কমল্ বনে নাহি ভ্রমরের গতি।

[অতি উৎকৃষ্ট। ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

সেই তুমি, আমিও সেই॥
প্রেম্ পেল কোথায়।
ইহার কি অভিপ্রায়॥
কোনরূপে ত্রুটি দেখিতে না পাই,
দেখা হোলে তোষো কথায়।

চিতেন।

তখন্ হোতে এখন্ অধিক আদর,
দেখি প্রিয়ে তুমি কর আমার।
অদ্যাপি আমারো, দোষো করি গুণো গাও,
শুনি যথা তথায়॥

[ইহার আর কিছু পাইলাম না। বহু-কালের গান। অদ্য রাম বসুর গীত এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ইহাতে অসংপূর্ণ কবিতা অনেকগুলীন রহিল। এ রসের রসজ্ঞ মহাশয়েরা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করত সংপূর্ণ করিয়া দিবেন।]

৺নিত্যানন্দদাস বৈরাগী*

কবিওয়ালার মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী অত্যন্ত বিখ্যাত ও সর্ব্বপ্রিয় ছিলেন। ইহাঁকে সাধারণে "নিতে বৈষ্ণব" বলিত, নিতাইদাস ঈশ্বরানুকম্পায় এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কণ্ঠবিগলিত সুস্বর শুনিয়া সকলেই মোহিত হইতেন। গীত এবং গাহনা দ্বারা ইনি বহু জনের মন হরণ করিয়াছিলেন।—গাহনা বিষয়ে ইহার যদ্রূপ ক্ষমতা ছিল, কবিতা রচনা পক্ষে তদ্রূপ ছিল না, তথাচ সময়ে সময়ে প্রয়োজন মতে স্বয়ং গান প্রস্তুত করিতেন। কলকাতায় সিমুলা নিবাসী ৺গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর নামক একজন ব্রাহ্মণ কবিতা সকল প্ররচন পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রদান করিতেন। তাঁহারদিগের প্রণীত গীতের দ্বারা নিতাইদাস সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেন। গৌর কবিরাজ বিরহ ও খেউড় গান যেমন উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিতেন, অন্য গান তত উত্তম করিয়া রচিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহাও অনেকাংশ উৎকৃষ্ট হইত। উক্ত কবিরাজ নিত্যানন্দ ভিন্ন অপরাপর অনেক দলে গানের সাহয্যে করিতেন, "লোকে যুগী" নামে বিখ্যাত লক্ষ্মীকান্ত কবিওয়ালাকে ও নীলু ঠাকুরকে সর্ব্বদাই গান দিতেন, শ্রোতৃগণ অতিশয় যত্নযোগে সেই সকল গান শ্রবণ করত বিশেষ গৌরব প্রকাশ করিতেন। নিত্যানন্দ যে সমস্ত বিরহ ও খেউড় গাহিয়া যশস্বী হয়েন তাহার অধিকাংশই ইনি রচনা করিয়া দেন।

নবাই ঠাকুরের নিবাস কোথায় তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, ফলে রচনা পক্ষে সবাই নবাই ঠাকুরের অনুরাগ করিয়া থাকেন। ইনি সকল প্রকার গান নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তন্মধ্যে সখীসংবাদ সর্ব্বাপেক্ষাই উত্তম হইত, এবং আসরে উত্তর কাটিতে ভাল পারিতেন।

নিতাইদাস বাঙ্গালা ১১৫৮ সালে চুচুঁড়ার দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্ততি অর্থাৎ ৭০ বৎসরের অধিক কাল এই জাতীপুরে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইহাঁর একমাত্র স্ত্রী এবং "জগচ্চন্দ্র, রামচাঁদ ও প্রেমচাঁদ" নামে তিন পুত্র ছিল, পিতার মরণান্তে ঐ তিন সহোদর পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিন দল করত গাহনা দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এইক্ষণে তাহারা কেহই সজীব নাই, একে একে তাবতেই মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছে। সংপ্রতি ঐ বংশধর কেহই নাই।

নিতাইদাস যদিও কোন শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই, তথাচ সভ্যতা ও বক্তৃতা গুণে কেহই তাঁহাকে অশাস্ত্রিক জ্ঞান করিতে পারিত না, কারণ বাক্‌পটুতা ভাল ছিল, এবং নিজে যে যে কবিতা রচিতেন তাহা নিতান্ত মন্দ হইত না। বিশেষতঃ অপরের আনুকূল্যে যে সকল কবিতা গান করিতেন, প্রায় সকলেই তৎসমুদয় তাঁহার কৃত বলিয়াই জানিত। সেই গীতাবলীর শব্দ পারিপাট্য ও বিশুদ্ধ ভাব জন্য পণ্ডিতেরাও নিতাইকে পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

ইহাঁর দলে গোরাচাঁদ ঠাকুর ও নীলুঘোষ, এই দুইজন গায়ক প্রায় তাহার তুল্যই ছিল। ধনিলোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে "বায়না" দিতেন। ইহাঁর সহিত "ভবানে বেনের" সংগীত যুদ্ধই ভাল হইত। যথা।

কথা। "নিতে ভবানের লড়াই"

এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নীতে ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত, যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্য ভেদ করিয়া

* সংবাদপ্রভাকর, বুধবার ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ নভেম্বর ১৮৫৪।

প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য অনেক দল ছিল, কিন্তু হরুঠাকুর নিতাইদাস, এবং ভবানী বণিক, এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষাই প্রধানরূপে গণ্য ছিল।

এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না, কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দুরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের পরিসীমা থাকিত না। যেন হতসর্ব্বস্ব হইলেন, এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত, কতস্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি ও কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্য পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে "নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ইহার গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোঁড়ারা ঢলঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল, যে, ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং ইতর জনেরা খেউড় গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন স্থানে ইনি সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া আসর অত্যন্ত জমাট্ করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কহিল "হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, ফ্যার্ ঋদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়্ গা" নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।

এই নিতাই দাস ১২২৮ সালে কাসিমবাজারের রাজভবনে দুর্গাপূজার সময়ে গাহনা করত প্রত্যাগত হইয়া সাংঘাতিক রোগে তনুত্যাগ করিলেন। ইনি কবিতা গাহিয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সৎকর্ম্ম করিয়া সদ্ব্যয় দ্বারা সেই ধনের সার্থকতা করিতেন, বাবাজী চুঁচুঁড়ায় এক "আখড়া" ও বাটীতে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানুযায়ি "দোল" "রাস" ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপ যথা নিয়মে করিতেন, অনেক লোককে নিত্য আহার দিতেন, অতিথি সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, তাঁহার বাটীতে অতিথি আসিয়া কখনই বিমুখ হয় নাই। অধুনা জীবিত থাকিলে এতদিনে তাঁহার বয়স ১০৩ বৎসর হইত, যেহেতু ১১৫৮ সালে জন্ম লইয়া নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ ভোগ করত ১২২৮ সালে, নিত্যানন্দ-ধামে নিত্যানন্দে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ৩৩ বৎরের অধিক নহে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্ট ভোগ করিয়া বহু স্থান হইতে বহুলোকের উপাসনা পূর্ব্বক নিতাইদাস বাবাজীর দলের কয়েকটী সংপূর্ণ ও অসংপূর্ণ গীত সংগ্রহ করত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, সকলে মনোযোগ সহযোগে এতৎপ্রতি নয়ন নিক্ষেপ করুন। এই সমস্ত অসংপূর্ণ গান যিনি সংপূর্ণ করিয়া দিবেন এবং ইহার অতীত অপরাপর কবিতা প্রদান করিবেন, আমরা তাঁহাকে পরম হিতকারী কারুণিক বন্ধু বলিয়া চিরকাল রসনাযন্ত্রে তাঁহার সুখ্যাতি ঘোষণা করিতে থাকিব। অপিচ এই স্থলে এইমাত্র আক্ষেপ রহিল যে প্রত্যেক কবিতার প্ররচকদিগের নাম পৃথক পৃথক করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কারণ কোন্ গান কাহার কৃত তাহার নির্ণয় হইল না, কিন্তু কোন কোন প্রাচীন লোকে কহেন, নিতাই যে সকল ভাল ভাল বিরহ গাহিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই গৌর কবিরাজের কৃত।

মহড়া।

সই কি কোরেছ হায়।
তোমারো সরলো পরাণো সঁপেছ কারে।
চেননা উহারে প্রাণো সখিরে ॥
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,
ঐ শঠ জনো পীরিতি কোরে।

চিতেন।

নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণসখি,
পোড়েছ যে দেখি বিষম ফেরে।
হৃদয়ো মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান,
পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে ॥
তুমিলো যেমনো, রমণী ভাজনো,
তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে।
ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে।

মহড়া।

রাধারো বঁধু তুমি হে,
আমি চিনেছি, তোমায় শ্যামরায়।
রাজার বেশ্ ধরেছ হে মথুরায় ॥
রাখালেরো বেশো লুকায়েছ
বঁধু, বাঁকা নয়ন্ লুকাবে কোথায়।

চিতেন।

এত অন্বেষণ করিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেম্ কিশোরী, ওহে বংশিধারি,
প্রতারণা কোরোনা আমায় ॥

এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি,
বার্ দিলে গজপরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপো ঠামো, শ্যামো,
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে ॥
[ইহার আর কিছুই না পাওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে।]

মহড়া।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে।

চিতেন।

বৃক্ষডালে বসি, পক্ষি অগণিতো,
জড়বতো, কোন কারণে।
যমুনারো জলে, বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥

অন্তরা।

একি একি সখি, একিগো নিরখি,
দেখ দেখি সবো, গোধনে।
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ো তৃণো,
আছে যেন হীন চেতনে ॥

চিতেন।

হায়, কিসেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি প্রেমো উপজিলো,
সলিলো বহিছে নয়নে ॥
আরো একো দিনো,
শ্যামেরো ঐ বাঁশী বেজেছিল কাননে।
কুল্যে লাজো ভয়ো, হরিলে তাহাতে,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে ॥
[যদি সহস্র বদন হইত, তবে এই গীতের যথার্থ গুণ বর্ণনা করিতে পারিতাম।]

মহড়া।

আমার মনো নাহি সরে তায়।
তুমি প্রেম করিবারে বলিছ আমায় ॥
শুন সজনি, বলি তোমায়।
ইহা জেনে শুনে, ফণির বদনে,
কর দেয় কে কোথায় ॥

চিতেন।

বারে বারে পীরিতে সই,
বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার।
ইহাতে যত সুখো সম্পদো,
নাই অবিদিতো আমার ॥
সুধারো কারণে, বল কোনোখানে,
কে কোথা গরলো খায়।
[উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

পীরিতি নগরে বিষমো সখি,
মনোচোরেরো যে ভয়।
বসতি ইহাতে দায়॥
নয়নে নয়নে সন্ধানো,
মনো অমনি হরিয়ে লয়।

চিতেন।

সন্ধানো করিয়ে মনোচোর্ ভ্রমিছে নগরময়।
কুলেরো বাহিরো হওনা,
থেকো সাবধানে লো সদয়॥

মহড়া।

হেরি প্রাণ্‌রে তব মুখো কমলে, নয়নো খঞ্জন্।
ওলো হবে দুখো নিবারণ॥
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতি,
বুঝি ভূপতি হব এখন।

চিতেন।

কমলোপরেতে খঞ্জন,
যদি দেখে কোনো জন্।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্যলাভ,
ওলো এইতো বেদের বচন্॥

অন্তরা।

হায়, ইহার কারণে, যাত্রাকালেতে শুন
ওলো সুন্দরি।
বামে শব শিবে কুম্ভ, দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি॥

চিতেন।

তারি ফলো বুঝি আমারে আসি,
ফলিলো এখন্।
ছত্রধারী হব তোমারো হৃদয়ে,
পাব হৃদি সিংহাসন্।
[চমৎকার, চমৎকার!]

মহড়া।

যে কালে সলিলে বটপত্রে ভাসেন শ্রীপতি।
তখন কোথায় ছিলেন শ্রীমতী॥
ইহার তত্ত্ব কথা কহ সম্প্রতি, ও দূতি।
রাধা ছাড়া হরি নয়, সবে কয়।
সই আমার ঐ সন্দ হয়॥
জানি রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা,
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি।

চিতেন।

তুমি চতুরা গোপী মধ্যে, বৃন্দে সজনি।
সবিশেষ, আমায় কও দেখি শুনি॥
মহা প্রলয় যে দিন, সে কালনী।
শ্যাম সঙ্গ রাই কেন বিহীন॥
জানি শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম,
প্রধানা রাই প্রকৃতি।

[ইহার অন্তরা ও দ্বিতীয় গান না পাওয়াতে অতিশয় কাতর হইলাম।]

মহড়া।

কহ দেখি সখি রাধারে কেন,
মা, রাধা কেউ বলে না।
শ্রীমতী বটে সজনি, প্রকৃতিরূপে প্রধানা॥
যদি ভাবি মনে, মা বলি বদনে জড়তা হয়
রসনা।

চিতেন।

যে সীতে সে রাধা, ব্রহ্মরূপিণী,
একই জানি দুজনা।
জগতো মণ্ডলে, সীতারে সকলে,
মা বোলে করে সাধনা॥
[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

পরাণো থাকিতে প্রেয়সি,
তোমারে কি তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি॥
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো
ইহারো কারণো, বুঝিতে নারি।

চিতেন।

ছলো ছলো করে নয়নো,
দেখে প্রাণো ধরিতে নারি।
কি দুখো ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখো মলিনো করি॥
আহা কি পরিতাপ! ইহার অপরাংশ পাইলাম না।

মহড়া।

পীরিতে সই, এমন্ বিবাগী হই,
ভাবি তারো মুখো নিরখিব না।
এ মুখো তারে দেখাব না॥
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না।
পুনো হোলে দরশনো, করয়ে কি গুণো,
তখনো সে মনো থাকে না॥

চিতেন।

সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে,
হইল বিধিরো ঘটনা।
অন্তরো সদা উদাসী, দিবানিশি ঐ ভাবনা॥
সখি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,
কালী হোলো দেহ দেখনা।

[সুন্দর, সুন্দর।]

মহড়া।

প্রেম ভাঙ্গে কি হোলো।
যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ্,
যারে লোকে প্রেমিক বলে॥
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পীরিতি,
জীবনে মরে পীরিতি গেলে।

চিতেন।

প্রেমরসে যেই জনো হয়ো রসিকো।
নিরবধি ধরে সে, যে, মিলনো সুখো॥
স্বপনে না জানে কারে বিচ্ছেদো বলে।

অন্তরা।

প্রাণ্, সতীরো পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চিরোদিনো সমভাবে যায়ো সুখেতে॥

চিতেন।

আশ্চর্য্য মিলনো হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদো কাহারো নাম, না শুনে কাণে॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে।

[অতি মনোহর।]

মহড়া।

ধিক্ ধিক্, ধিক্, আমারে ললিতে গো,
ধন্য কুব্‌জায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়॥
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়।

চিতেন।

এতদিন অবধি আম্‌রা কোরে আরাধন।
হইলাম বঞ্চিতো, সে হরির চরণ॥
গৃহে বোসে, অনায়াসে, অতুলো চরণো পায়।

[আহা, এ গীতের সমুদয় না পাওয়াতে কি অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইল।]

মহড়া।

ওরে প্রাণরে। কহ কুমুদিনী পদ্মিনী
কোথা আমার।
এ সরোবরে, না হেরে তারে,
আমি সবো হেরি শূন্যাকার॥
আমায়্ কে দেবে মধু দান।
কার মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ॥
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে
চারিদিগে অন্ধকার।

চিতেন।

পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম, তারো মনো
রাখিতে॥
বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে।
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে॥
কি হোলো, কি হোলো, কমল্ কোথা গেলো,
তারে কি পাব না আর।

[এই গীতের প্রশংসা কত করিব বলিতে পারি না।]

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখলে।
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামেরো লীলে॥
দ্বারিকা হইতে আসিয়ে শ্রীহরি,
দ্রৌপদীরো লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই,
যে জনো গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে,
আরো মায়াতে ব্রহ্মারো মনো ভুলালে॥

[আহা! আহা! এমত গানের সমুদয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

রাই এসো তোমারো, রাজা করি নিধুবনেতে।
বহু দিনের এই সাধো আছে মনেতে॥
দোহাই রাধারো, বোলে শ্যাম নাগরো,
ফিরিবে নগরেতে।
[ইহার অপর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

সখি ঐ মনোচোরো মোরো, মনো লোয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণ্ সখি ধরিব উহায়॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।

চিতেন।

চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন্
নয়নে নিদিলি, মোরো দিলেগো কেমন্॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম্, কি হোলো আমায়।

[কি মনোহর, কি শ্রুতি-সুখকর আহা! এই গীতটী সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া।

তুমি কার্ প্রাণ, মম মনো হরিলে এসে।
মৃগনয়নি, নয়নোবাণো হানো অনাসে॥
জর জর জর, কোরে কলেবর,
বাঁধিলে ধনি প্রেমো ফাঁসে।

চিতেন।

তোমারে হেরিয়ে আমারো মনেরো
তিমিরো বিনাশে।
স্বরূপে বলনা, ও শশি বদনা,
ছিলে কার্ হৃদয় বাসে॥

[ইহার অপরাংশ পাইলাম না, ইহাতে মনের আক্ষেপ মনেই রহিল।]

মহড়া।

পুরুষো নিদয়ো সজনি কি জাননা।
সমাদরে রাখেনা॥
আমি যারে ভাবি আপনো,
সে আমারে ভাবেনা।

চিতেন।

যে দুখো যুবতী জনার,
সেকি তাহা জ্ঞাত নয়।
জানিতো যদ্যপি, আসিতো নিশ্চয়॥
ধনলোভে আছে ভুলে,
প্রিয়ে বোলে তোষে না।

অন্তরা।

আপনি শ্রীরামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ্।
উদ্ধারিয়ে সীতে অনলে করে দাহন্॥

চিতেন।

অযোধ্যা নগরে গিয়ে রাজা হোলেন শেষেতে
বনবাসে দিলেন্ পুনো সে সীতে॥
নারীর পঞ্চমাস গর্ভকালে কিছু দয়া হোলোনা

অন্তরা।

নল নরপতি তার্, দময়ন্তী ভার্য্যা লোয়ে।
প্রবেশিল বনে, দুইজনে, একত্র হোয়ে॥

চিতেন

অর্দ্ধেকো বসনো পোরে, নিদ্রাগত যুবতী।
বসনো ছিঁড়িয়ে যায় নৃপতি॥
কাননেতে, রেখে যেতে,
তিলেকো ভাবিলে না।
[উত্তম।]

মহড়া।

কমলিনি কুঞ্জে কি কর,
তোমার নবপ্রেম ভাঙ্গিলো।
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো॥
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ,
ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো।

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ্ হইলো।

কংসেরো প্রেরিতে, অক্রূর খুড়া রথে,
রাম কৃষ্ণ হোরে লইলো।
[ইহার আর আর অংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

প্রাণ, আমি তোমারি। নিতান্ত জেনো সুন্দরি॥
তুমি যত কর অপমান্, অঙ্গেতে ভূষণো করি।

চিতেন।

* * *

অন্তরা।

প্রাণ, তুমি কাদম্বিনী, মনেতে মানি,
আমিতো চাতকী।
অন্য মত মোরো, নাহিকো মনেতে,
বিচারিয়ে দেখ দেখি।

চিতেন।

পিপাসাতে পীড়িতো হোয়ে,
যদি তেজি এ জীবন্।
তথাপি অন্য নীরো না করি ভক্ষণ॥
ঊর্দ্ধকণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদম্বিনি দেহ বারি।
[কি মনোহর! এই সাটের সংপূর্ণ পাইলে
কি সুখের ব্যাপার হইত।]

মহড়া।

হরি ব্রহ্মাণ্ড দেখালে বদনে।
কৃষ্ণ কি-গো জানে॥
বালকো হোয়ে গোকুলে, মৃত্তিকা ভোজন ছলে,
মায়া করে মায়েরো সনে।

চিতেন।

যশোদা কহিছে ওগো রোহিনি।
কেমনো বালকো কৃষ্ণ, কিছু না জানি॥
শকট ভঞ্জন সে দিনো করিলে চরণে।
[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া

প্রেয়সি তোমার্ প্রেমধার
আমি শুধিলে কি তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি॥
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো,
পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন।

মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,
লইলাম্ প্রেমো করজো করি।
সে ধারো উদ্ধারো হইবে কেমনে,
লাভে মূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি॥
[আহা! আহা! এই গানের সংপূর্ণ পাইলে
মন কি প্রফুল্ল হইত।]

মহড়া।

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে॥...

চিতেন।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো কখনো নাহি হয় বজ্রাঘাত।
অস্থির নলিনী প্রাণে সহে কেমনে।

অন্তরা।

হায়, যে দিগে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়্।
পবনেতে বাদো সাধে, বসিতে না পায়।

চিতেন।

হায়্, গুণ্ গুণ্ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির্ দুটি নয়নে॥
অলিরো দুর্গতি দেখি, হাসে তপনে।
[উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

গমনো সময়েতে,
কেন কেঁদে গেল মুরারি।
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী॥
জনমেরো মত রাধারে কাঁদালে সই,
বুঝি ব্রজে আসিবেনা হরি।

চিতেন।

হরি কি আসিবে ব্রজে আর্, মনে সন্দেহ করি।
যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি,
পুনো আসিতো বংশিধারী॥

অন্তরা।

হায়। দুটি করে ধরি, যখনো আমায়্,
যাই যাই বঁধু কয়।

তখনো শ্যামেরো কমলো বদনো,
নয়ন্, জলে ভেসে যায় ॥

চিতেন।

এতই মমতা শ্যামেরো, যাইতে মধুপুরী।
সজলো নয়নে, উঠিলেনো রথে,
বিধুমুখো মলিনো করি ॥
[উত্তম।]

মহড়া।

ব্রজে মাধবো এলোনা। কি হবে বলনা।
কিক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,
প্রাণ থাকিতে মিলনো হোলো না।

চিতেন।

হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে,
মিছে করি দিন্ গণনা।
এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত বসন্ত উদয়ো
দেখনা।

অন্তরা।

আঁখিজলে, তরুমূলে, সিঞ্চিলাম্ হাম্ ব্রজাঙ্গনা।
চিরো দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো,
আশাতরু তো ফলিলোনা ॥
[ইহার অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

ব্রজে কি সুখে রোয়েছে। কি দশা ঘটেছে ॥
সে শ্যামসুন্দরো বিহনে দেখনা ওগো রাই,
বনের পশু পক্ষি আদি ঝুরিছে

চিতেন।

হায়! সহজে শ্রীমতী তোমার
কোমল অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো,
পাষাণো বিদারো হতেছে ॥

অন্তরা।

হায়। ভ্রমরার দশা দেখ,
এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধুলায়ে ধুসরো, হোয়ে কলেবরো,
ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে ॥

চিতেন।

হায়।। সখি কোকিলেরা না করে গানো,
অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহেতে দেখনা প্যারী,
খেদে কুহুরব ভুলেছে ॥
[উত্তম, উত্তম।]

মহড়া।

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন্ হরি।
তোমায়, দয়া কোরে ওগো কিশোরি ॥
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরী।
কেন গো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা, বাজাইছে বাঁশরী ॥

চিতেন।

বিধাতা সাজালেন্ শ্যামে অতি চমৎকার।
বারো একো সাধো ছিল শ্রীমতী রাধার ॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী।

অন্তরা।

হায়। কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হইলো, বঁধুরে পাইয়ে ॥

চিতেন।

কোকিলে পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্।
কমলে বসিয়ে অলি, করে মধুপান্ ॥
আনন্দে মগনা হোয়ে, নৃত্য করে ময়ূরা।
[অতি সুন্দর।]

মহড়া।

সখি এই বুঝি সেই রাধার, মনোচোর,
নটবর বংশীধারী।
তেজে সেই বৃন্দাবন্, শ্যাম্ এলেন্ এখন্ মধুপুরী।
আমা সবা পানে, কটাক্ষে চেয়ে,
কোরে নিলে চিতো চুরি ॥

চিতেন

মথুরা নাগরী, কহিছে সবে,
কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রুরো সহিতে, কে এলো রথে,
কালো রূপে আলো করি।

অন্তরা।

শ্রবণে যেমন্ শুনেছিলাম্ সই,
দেখিলাম আজ্ নয়নে।
আঁখি মনেরো বিবাদো আমার্,
ঘুচে গেল এত দিনে।

চিতেন।

এত গুণোরূপো, না হোলে সখি,
গুণোময়ো হয় কি হরি।
এমনো মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি ॥
[অতি উত্তম।]

মহড়া।

আমার কুচ্ছ হোলে কি, লজ্জা সে পাবে না।
একি পতির্ ব্যাভার সই, ভেবেছে তাহার্,
আমি কেউ নই, মিছে ফুলে বন্ধি কোরে,
সে গেল আমারে, আমি তারে পেলেম না ॥···

চিতেন।

প্রবাসেতে গিয়ে পুরুষের রাজ্য লাভ যদি হয়।
সে সবো সম্পদো তেজিয়ে, এসে বসন্ত সময় ॥
আমি তাই ভাবি প্রাণ্ সখি।
সে এমন্ ইন্দ্রত্ব পেয়েছে কি ॥
বিরহে দাহনে, মদনেরা বাণে,
মনো কি চঞ্চলো হোয়ো না।
[মন্দ নহে।]

মহড়া।

কাল্ নিশিতে দেখিছি স্বপনে।
বুঝি প্রাণনাথ্ এসেছেন, শ্রীবৃন্দাবনে ॥

চিতেন।

···নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্যগত,
চৈতন্য ছিলনা প্রায়।
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে,
জাগালে বঁধু আমায় ॥
মৃদু মৃদু হাসে, বসি বাম পাশে,
তন্ত শ্রীঅঙ্গ আলাপনে।
[এই গীতের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য গূঢ়ত্ব আছে, "চৈতন্য ছিলনা প্রায়" ইহাতে স্বপ্নাবস্থায় যথার্থ লক্ষণ বর্ণনা হইয়াছে।]

মহড়া।

নয়নো সন্ধানে নয়নে মজালে।
রূপে মন্ ভুলালে ॥
তুমি প্রাণো যে আমায় কিনিলে বিনিমূলে।

চিতেন।

প্রাণ্ যে দশ ইন্দ্রিয়, মম শরীরে,
তোমারে হেরে বিভোর্।
রসিকে রমণী তুমি রসের সাগর্ ॥
রস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে।
[ইহার অন্তরা পাইলাম না।]

মহড়া।

কেন সজনি মোরো মরণো নাহিকো হয়।
সুখোকালে সুখো ঋতু, দুখো দেও অতিশয় ॥
তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহ রয় ॥

চিতেন।

যারো অনুগত প্রাণো,
সে গেল, তেজে আমায়।
তারো সতে, সেই পথে,
প্রাণো কেন নাহি যায় ॥

অন্তরা।

মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে।
দুখো বোধো নাহি হয়ো, শব অঙ্গ দাহনে ॥

চিতেন।

সজীব শরীরো এ, যে, বিরহে অনলে দয়।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয় ॥
[রচনা উত্তম বটে।]

মহড়া।

মনো জলে মানো অনলে,
আমি জলি তারো সনে ॥
এ পীরিতি মিলনে।
তুয়া দেখে আমি দুখী কি অদুখী,
বিধুমুখী ইহা বুঝ না কেনে।

চিতেন।

অভিমানো দূরে, না তেজিলে প্রাণো,
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ে, লক্ষণো, হোতেছে এখনো,
দুই জনো পাছে মরি পরাণে॥

অন্তরা।

হায়, কাননে অনলো লাগিলে যেমন,
কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জলাতন্।
তোমারো পীরিতে দিবসো শর্ব্বরী,
ততোধিকো আমি হোতেছি দাহন্॥

চিতেন।

ওলো এ দায়ে যে জনো, করে পলায়নো,
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে॥
আমিলো সুন্দরি, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমার ঐ মমতা গুণে

[অতি চমৎকার, চমৎকার!]

মহড়া।

আমার্ মনো চাহে যারে,
তাহারো রূপো নিরখিতে ভালবাসি॥
যেবা যার, প্রাণো প্রেয়সী।
নয়নো চকরো, পিয়ে সুধা যারো,
সেই জনো তারো, শরদ-শশী॥

চিতেন।

তব বিধু মুখো হেরিয়ে আমার,
ঘুচিলো মনেরো তিমিরো রাশি।
যে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখোসিন্ধু নীরে অমনি ভাসি॥

অন্তরা।

হায়, কালো কলেবরো, দেখিতে ভ্রমরো,
তাহে ষটপদো, কুৎসিতো অতি।
এ তিনো ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীরো মনো তাহারো প্রতি॥

চিতেন।

কমলিনী মনে ভাবে নিরন্তরো,
নাহিকো সুন্দরো অলি সাদৃশি।
দিবসেতে হেরে, সাধো নাহি পূরে,
মানসেতে হেরে, হইলে নিশি॥

[আহা, এই গীতে কি বিচিত্র ভাব ও কবিত্ব প্রকাশ হইয়াছে।]

দুই*

গত ১ অগ্রহায়ণের প্রভাকরে আমরা নিত্যানন্দ দাসের জীবন বৃত্তান্ত ও কতকগুলীন গান প্রকাশ করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অদ্যকার পত্রে পূর্ব্ব প্রকাশিত কতিপয় অসংপূর্ণ গীতের সংপূর্ণাংশ ও অপর কয়েকটি গীত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, অবলোকন করুন।

মহড়া।

একা নহে প্যারী, তোমার শ্রীহরি,
অনেকেরি, তুমি জেনো।
জগতো সংসারে তারো, সকলি যে আপনো॥
জগন্নাথো নাম, কোরেছেন্ ধারণো,
হরি জগতেরো প্রাণো।

চিতেন।

যে ভকতি করে, সে পায় কৃষ্ণেরে,
কৃষ্ণ ভক্তেরা অধীনো।
নিতান্ত তোমারো, প্রেম বশো হরি,
ভেবনা তুমি কখনো॥

অন্তরা।

নন্দালয়ে দেখ, নন্দ যশোদারো,
অতিশয় প্রেমে বশো।
যমুনারো তীরে, গোধন চারণো,
আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশো॥

চিতেন।

ভ্রাতৃভাবে দেখ, বলরাম সনে,
হয়েছে প্রেমো ঘটনো।
শ্রীদামো সুদাম, বসুদাম সনে,
রাখাল ভাবে মিলনো॥

[ভাল!]

---

* সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর

মহড়া।

কমলিনী নিকুঞ্জে কি কর।
তোমার নবপ্রেম ভাঙ্গিলো॥
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো।
মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ,
নন্দের ভেরী বাজিলো॥

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো
মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে
অক্রূর আইলো॥

অন্তরা।

যে শ্যামচাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে।
সে শ্যামসুন্দর, মথুরা নগরে যাবে, প্রভাতে॥

চিতেন।

সেই বংশীধারী, যাবেগো প্যারী,
ত্যজে গোকুলো।
নিধুবনে রাধা রাধা বোলে,
কে বাঁশী বাজাবে বলো॥

[পূর্ব্বে এই গানের কেবল চিতেন প্রকাশ হইয়াছিল, এবারে অন্তরা প্রকটিত হইল।]

মহড়া।

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই।
লোকে দত্তহারী কবে সই।

চিতেন।

ভাব বোলে ভালবাসি যায়,
প্রাণো সঁপি তায়।
সে কি মন্দ হোলে তারে, মন্দ বলা যায়॥
এত তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যজ্য আমার॥
সখ্যতা কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই।

[আহা কি দুঃখ এই গীতের সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে॥

দ্বারিকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রোপদীর লজ্জা নিবারিলে।

চিতেন।

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই,
যে জনো গিরি ধরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে,
আরো মায়াতে ব্রহ্মার মন্ ভুলালে॥

অন্তরা।

হায় দেখ প্রাণসখি, যোগিজন যারে,
সদা করে ধ্যান্।
যাহারো বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান
যার ধেণু রবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।
যারে দরশন করিতে হর পার্ব্বতী
আসিতেন এই গোকুলে॥

অন্তরা।

হায়। ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,
কর দেখি তাহা প্রণিধান।
যাহার গুণে পশু পক্ষির ঝুরিত দুটি নয়ান॥

চিতেন।

সীতা উদ্ধারিতে যে জন,
জলেতে ভাসালে শিলে।
যার পদরেণু পরশে দেখো,
অহল্যা মানবী দেহ পেলে॥

অন্তরা।

হায়। সবে বলে দয়াময়,
পঞ্চপাণ্ডবের সখা শ্রীহরি।
প্রেমের বন্ধনে হোলেন্,
বলিরাজার দ্বারেতে দ্বারী॥

চিতেন।

হিরণ্য বধিতে যে জন নৃসিংহ রূপ ধরিলে।
প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি,
স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে॥

অন্তরা।

হায়। ত্রিপুরারি যার নাম,
জপে অবিশ্রাম, দিবারজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি।

চিতেন।

শমন দমন হয় যার নামে, রামজীদাসে বলে।
মৈত্রভাবে যে জন কোরেছিল কোলে,
গুহক চণ্ডালে।
[এবারে এই গীতটি সংপূর্ণ প্রকাশ হইল।]

মহড়া।

যেতে হোলো মুরারি বৃন্দাবন।
শ্যাম তোমার ব্রজ বালকগণ॥
তোমারে না দেখে, অস্থির ক্ষণেকে,
ক্ষণে হয় অচেতন।

চিতেন।

কহিছে দৈবকী, প্রিয় বচনে,
শুনরে প্রাণ গোপাল।
শুনেছি বৃন্দাবনে, তব সব রাখাল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়ে,
ভূতলে পড়িয়ে সকলে করে রোদন॥

অন্তরা।

সে ব্রজনগরে, নন্দনে ঘরে, কাতরা নন্দরাণী।
নবনী করে, ডাকে উচ্চস্বরে কোথারে নীলমণি॥

চিতেন।

ঘরে ঘরে ফেরে, তোমার তরে,
কখনো গোষ্ঠেতে ধায়।
ভ্রমেতে পথে পথে, ডাকিছে কৃষ্ণ আয়॥
শিরে করাঘাত করে, যমুনা নীরে,
তেজিতে যায় জীবন।
[আহা কি মধুর।]

মহড়া।

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথাহে আমার॥
ওহে ব্রজ হরি মরে রাধা প্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ একবার।

চিতেন।

দীনবন্ধু দুখোভঞ্জনে,
অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলেহে, হেন নিদারুণো॥

কুলাইতে পারো, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো,
রাধার ভার কি হোলো এত ভার।
[আহা! এই গীতের আর কিছু পাইলাম না]

মহড়া।

কোথারে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেলো।
নবীন কালে দেহে ছিলে,
প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হোয়ে হারা, হোয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের হোলো।

চিতেন।

নবীন বয়সে, রঙ্গরসে,
দিনে দেখা হোতো শতবার।
নীরস নলিনী বোলে এখন
ভ্রমর চায়না ফিরে একবার॥
আগে প্রাণ হোলো,
তার পরে হোলো যৌবন ঘটনা।
বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল,
প্রাণ তো গেল না॥
আমি কি ছিলেম, কি হোলেম,
আরো বা কি হই, অনুতাপে তনু শুখালো।
[অতি আশ্চর্য্য। অতি আশ্চর্য্য। কি পরিতাপ! ইহার আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্ররায়। হেরনা ও বয়ান।
রেখো সখি, দুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলো মান।

চিতেন।

নব ঘন শ্যাম রূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান॥
মোজনা রূপসি, শশি দেখে রূপবান।
[চমৎকার। চমৎকার।]

মহড়া।

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মান।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভালোবাসো প্রাণ॥

মনে তোমায় একবারো,
নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান ॥

চিতেন।

তুমি বল প্রেয়সি আমি, তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস, নাহি কোন দিন।
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ ॥
[অতি উত্তম। ইহার সকল পাই নাই।]

মহড়া।

ঐ কালো রূপে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো বাঁকা না হোলে ॥
হরি তোমার আশ্চর্য্য লীলে ॥
যারো কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায়, করে আরাধন।
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য হোতে,
এই ব্রজমণ্ডলে।

চিতেন।

কত রূপে হোলে তুমি, কত অবতার।
না জানি তোমার লীলা অতি চমৎকার ॥
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার।
করিলে হে মনো চুরি যত অবলার ॥
মোহন বাঁশীর গানে, বৃন্দাবনে,
ব্রজাঙ্গনা মজালে।

[বিচিত্র। বিচিত্র।]

মহড়া।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল শ্রীবৃন্দাবনে,
হরি দরশনে।
একাকী মাধব সেখানে।
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ॥
মনেরো তিমিরো যাবে মনো মিলনে।

চিতেন।

সাজগো সাজগো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকোলতা, আরো ললিতে ॥
রঙ্গদেবী সুদেবীগো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সব করহ গমন ॥
রাধা বোলে বাজে বাঁশী শুনে শ্রবণে।
[আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার।
শুনরে কোকিলে শুন শুন,
বলি শুন মিনতি আমার ॥
হরি হারা হোয়ে আছো মৌনে বসিয়ে,
মধুর্ রবো শুনি যে আর।

চিতেন।

এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রোয়েছ কেন ওরে কোকিলো ॥
হরি গুণো গানো পিক কররে এখন্,
শুনে প্রাণো জুড়াক শ্রীরাধার।
[আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

তুমি হে ব্রহ্ম সনাতন। অপার মহিমা জনার্দ্দন
শুনহে শ্রীমধুসূদন ॥
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়ে মুরারি,
ধোরে ছিলে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

চিতেন।

কতরূপে কত লীলে করেছ,
ওহে দেবকী নন্দন।
গোলোকো তেজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে,
প্রকাশো করিলে বৃন্দাবন ॥

অন্তরা।

হায়, শিশুকালে শকটো ভঞ্জন
কোরেছিল শ্যামরায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদরো মাঝে,
দেখাইলে যশোদায় ॥

চিতেন।

আরো এক দিনো, কুঞ্জ কাননে,
লোয়ে ব্রজ গোপীগণ।
মহারাসো কোরে, অন্তর্ধান হোয়ে,
হোলে চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥

অন্তরা।

হায়, কাঞ্চন হোলো কাষ্ঠেরে তরি,
শুনেছি পুরাণেতে।
অহল্যা পাষাণী মানবী হোলো পদরেণু হইতে ॥

চিতেন।

দ্রৌপদীরে যখন্ বিবস্ত্রা করে,
দুষ্টমতি দুঃশাসন।
বস্ত্রধারী হোয়ে, বস্ত্র দান দিয়ে,
কোরেছিলে লজ্জা নিবারণ ॥

অন্তরা।

হায় শুনেছি তুমি পাণ্ডব সখা,
বনমালী কালিয়ে।
রহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী,
প্রেমে বশো হইয়ে ॥

চিতেন।

হিরণ্যকশিপু করিলে বধ নৃসিংহ
রূপো মোহন।
প্রহ্লাদ ভক্তেরো কারণে দিলে
স্ফটিকেরি স্তম্ভ দরশন ॥
[অতি সুন্দর। এই গীতের পাল্‌টা অথচ
দ্বিতীয় নিম্নভাগে প্রকটিত হইল]

মহড়া।

তোমারি প্রেম কারণে।
আমি অবতার ব্রজ ভবনে ॥
রাই বুঝিয়ে দেখ মনে।
রাধা রাধা বলি, বাজায়ে মুরলী,
গোচারণ করি বিপিনে ॥

চিতেন।

বংশীধারী কহে কিশোরি,
এত বিনয় কর কেনে।
রাধে বিনোদিনি, জানতো আপনি,
যত লীলা করি যেখানে ॥

অন্তরা।

হায়, অযোধ্যায় দশরথ গৃহেতে,
রাম রূপে অবতার।
জনক দুহিতা,
তুমি হে সীতা গৃহিণী ছিলে আমার ॥

চিতেন।

জটাধারী হোয়ে, তোমারে লোয়ে,
ভ্রমিলাম কাননে।
বন্ধন করিয়ে সাগরবারি,
বোধেছি লঙ্কার রাবণে ॥

অন্তরা।

হায়, দেখনা ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ,
আসিয়ে বৃন্দাবনে।
প্রেমে কত জনা, করে আরাধনা,
চাহিনে কারোপানে ॥

চিতেন।

নিকুঞ্জ কাননে করি মহারাস,
প্যারি তোমারি সনে ॥
পরশুরামরূপে নিক্ষেত্রি করি,
জানে তিন্ ভুবনে।

মহড়া।

ওহে নারায়ণো, আমারে কখনো,
বোলোনা জানকী হোতে।
সে জনমের বহু দুখো আছে মনেতে ॥
দুর্জ্জয় রাবণো, করিয়ে হরণো,
রাখিলো অশোকো বনেতে।

চিতেন।

কহিছে রুক্মিণী ওহে চক্রপাণি,
আসিছে পবনো সুতে।
রামরূপে শ্যাম দেহ দরশনো,
আমিতো হবনা সীতে ॥

[এই গীতটি অতি সুমধুর করুণা রসে পরিপূরিত। ইহার সমুদয়াংশ যিনি প্রদান করিবেন তাঁহার নিকট অত্যন্ত উপকৃত হইব।]

প্রাচীন কবি *

বঙ্গভাষা ভূষিত প্রাচীন কবিতা ও পুরাতন কবিদিগের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়া সাধারণের সুগোচর করণার্থ আমরা প্রতিজ্ঞাপথের পথিক হইয়া যে প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি তাহার সাক্ষী কেবল এক পরমেশ্বর মাত্র। ইহার সুফল সিদ্ধির নিমিত্ত সময়াসময়, স্থানাস্থান, ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া মনুষ্যের যেরূপ উপাসনা করিতেছি এরূপে পরম পিতা পরম পুরুষের উপাসনা করিলে বোধ করি এত দিনে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করা যাইত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মানুষের উপাসনা করিয়াছি কি মানুষের উপাসনা করি নাই, ইহার স্থিরতা কিছুই করিতে পারিলাম না, কারণ যাহারদিগের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এবং যাঁহারদিগের দ্বারা অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাঁহারাই বারম্বার মুখে আশা প্রদান করিয়া পরিশেষ কার্য্য ঘটিত ব্যবহারের প্রবঞ্চনা করিতেছেন, কি করি, উপায়াভাব। আমারদিগের ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা হইয়াছে, তাহার অধিক আর কি করিতে পারি—ইহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে মনের আক্ষেপ মনেই রাখিয়া প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি নীরে নিক্ষেপ করিব।

এই ব্যাপারে যিনি আমারদিগের মনের স্বরূপাভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই জানিতেছেন, ইহা কতদূর পর্য্যন্ত হিতকর ও মহৎ কার্য্য। দুঃখের কথা লিখিতে হইলে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়, আমরা এ বিষয়ে যেরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছি, মা বাপ মরিলে লোকে ইহার অপেক্ষা কি অধিক দায়গ্রস্ত হইতে পারেন, বেদের টোল নাড়ার ন্যায় দপ্তর বগলে করিয়া দ্বার দ্বার টোটো করিতে বাকি রাখি নাই। যাঁহারা কবি বিশেষের অধিক বা অল্প কবিতা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারদিগের পাত্র বিশেষে পায়ে ধরিয়াছি, হাতে ধরিয়াছি, কত বিনয় করিয়াছি—স্বয়ং গিয়াছি, লোক পাঠাইয়াছি, পত্র লিখিয়াছি,—পরের দ্বারা অনুরোধ করিয়াছি যাহা করিবার তাহা করিয়াছি ও যাহা না করিবার তাহাও করিয়াছি। অবশেষে দেশে জলাঞ্জলি দিয়া জলে ভাসিয়াছি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি,—আহার নিদ্রার সুখে বর্জ্জিত হইয়াছি, প্রাণের প্রতি প্রত্যাশা ছাড়িয়াছি। কোথা আছি, কি করিতেছি এবং কোথায় বা যাইতেছি, তাহারো নিরূপণ নাই। আহা!—আমারদিগের এবম্প্রকার ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা, কাতরতা ও একাগ্রতা দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহারদিগের মনে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না! তাঁহারা কি অন্তঃকরণকে পাষাণবৎ কঠিন করিয়াছেন?—তাঁহারা কি ভ্রমেও এই অনুষ্ঠানকে সদনুষ্ঠান বলিয়া গণনা করিবেন না?

হায় কি পরিতাপ!—কি চমৎকার! যাঁহারা প্রথমেই প্রচুররূপে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া প্রধান পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন—এবং যে যে মহাশয়ের ভরসায় আমরা ভরসা করিয়াছিলাম, অধুনা তাঁহারদিগের সেই ভরসা "দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরির" ন্যায় পেটের ছুরি হইয়া বসিল, গাছের উপর তুলিয়া দিয়া অনায়াসেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, কি উপায়ে এই উৎসাহের কুৎসা ভঞ্জন হয় তাহা এককালেই বিস্মৃত হইয়াছেন। হা বিধাতঃ! যাঁহারদিগের ধনের সাক্ষি, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, জোড়া, ঘোড়া, জমিদারী ও কোম্পানীর কাগজ, কোন বিষয়কেই তাহারদিগের মনের সাক্ষী দেখিতে পাই না, শুদ্ধ সাক্ষিগোপালের ন্যায় খাড়া থাকিয়া সম্পদের সাক্ষি জারি করিতেছেন। অপিচ ইহাঁরা কেহ কেহ যেমন সত্যবাদি, তাহার সাক্ষি,

---

* সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।

"সত্যবাদির সাক্ষিগোপাল" অর্থাৎ তাঁহাকে যেরূপ জানিতে পারিয়া মানিতে হয়, ইহারদিগেরো সেইরূপ জানিতে পারিয়া মানিতে হয়। আপনার বিষয়ের বিষয়ে যদ্রূপ, দেশের বিষয়ে তদ্রূপ হইবার বিষয় কি? হা জগদীশ্বর! তুমি আর কতদিনে এই দেশের প্রতি প্রীতি করিয়া বাঙ্গালির বুদ্ধি ও খোট্টার বল এবং ধনির ধন ও উৎসাহির মন, এই উভয়ের একত্র সংযোগ করিবে? ইহার দুই খানা না হউক, একখানা হইলেও রক্ষা পাই। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের এবম্ভূত অদ্ভুত ব্যবহার না হইলে সকল বিষয়েই দেশের এপ্রকার দুরবস্থা কেন হইবে? আমরা অচ্ছেদ্য অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এত অপমান সহ্য করিব? ভিন্ন জাতীয় লোকের নিকট এতই বা উপহাস্য কেন হইব? পূর্ব্বতন গৌরব পুষ্পের সৌরভের এমন হ্রাসতা কেনই হইবে?

যাহা হউক, স্থানাভাব ও সময়ের স্বল্পতা বশতঃ অদ্য আমরা এ বিষয়ে প্রস্তাবের প্রাচুর্য্য করণের প্রার্থনা করি না, যখন প্রতিজ্ঞারথে আরোহণপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার বিঘ্ন পাইয়াও এ পর্য্যন্ত ভগ্নোদ্যম হই নাই, তখন বাঞ্ছা-কল্পদ বিশ্বেশ্বর অবশ্যই বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। অতি সহজে ও শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইত, না হয় অতি ক্লেশে ও বিলম্বে হইল। আমি সজীব থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমাধা করিতে না পারি, নাই পারিলাম, ইহার পর যিনি এই আসনে আরূঢ় হইবেন, তিনিই করিবেন। তবে স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের স্বার্থকতা জ্ঞান করিতাম, তাহাই না করিলাম, যতদূর করিতে পারি তাহাতেই সুখী হইব।

বহুকাল যত্ন করিয়া অতি কষ্টে সংগ্রহ পূর্ব্বক হরু ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত ও কতকগুলীন গান অদ্যকার প্রভাকরে প্রকাশ করিলাম, পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইবেন।

প্রাচীন কবি *

এতদ্দেশীয় প্রাচীন কবিকদম্বের জীবন বৃত্তান্ত ও কবিতাকলাপ প্রকাশার্থ আমরা এ পর্য্যন্ত ক্রমশই উৎসাহ-রথে আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপথে ভ্রমণ করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে আর কতদিন এইরূপ অবস্থায় অবস্থান করিব তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ফলে যে পর্য্যন্ত দেহের সহিত জীবনের সম্বন্ধ থাকিবে বোধ করি সেই পর্য্যন্তই এই ব্রত পালন করিতে হইবেক, ইহার মধ্যে উদ্‌যাপন হয় এমত সম্ভাবনা দেখিতে পাই না; তবে জীবনের উদযাপনেই উদযাপন বটে, কারণ ব্যাপার অত্যন্ত বৃহৎ, পরমায়ুঃ অতি অল্প, কি প্রকারে এই অল্প সময়ের মধ্যে কল্প সমাধা হইতে পারে? তবে যে পর্য্যন্ত হয় তাহাই যথেষ্ট, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিব। আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্য্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্ব্বে ৺রামপ্রসাদ সেন, ৺রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবু, ৺রাম বসু, ৺নিতাইদাস বৈরাগী ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ, ৺হরু ঠাকুর, ৺অজু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই,

* সংবাদ প্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫।

কৃষ্ণ মুচী ও লালুনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় মৃত কবিকে কীর্ত্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অদ্য আবার ৺রামু নৃসিংহ ও ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে জীবিত করিলাম, অদ্যাবধি ইঁহারা এই বিশ্ববিপিনে অমর হইয়া বিচরণ করিবেন। প্রভাকরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই সকলে ইঁহারদিগ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। পরন্তু এতদ্রূপ যত্নযোগে প্রতিমাসেই দুই এক ব্যক্তির প্রাণদান করিব। কীর্ত্তিকুশল জনেরা পৃথ্বী হইতে অবসৃত হয়েন না ; যতদিন তাঁহারদের কীর্ত্তি থাকে, ততদিন তাঁহারা সজীব থাকেন ; ফলে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনা ও দৈবঘটনা দ্বারা আর আর প্রকার কীর্ত্তি সকল অনায়াসেই নাশের গ্রাসে পতিত হইতে পারে, কিন্তু কবিগণের কবিতা-কীর্ত্তি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে, যত দিন বিচিত্র গগন ক্ষেত্র মধ্যে নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র সূর্য্য স্ব স্ব ভাবে স্বভাবের শোভা বিস্তার করিতে থাকিবেন, ততদিন কাব্য-কর্ত্তারা মনুষ্যসমাজে বিরাজমান থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ কি।

যিনি (পিতামহ) তিনি চিরকালই পিতামহ নামে পরিচিত রহিয়াছেন। এই সংসারে কত পিতামহ, ও কত পৌত্র হইতেছে ও লয় পাইতেছে, কিন্তু আদি কবি পিতামহ (যিনি) তিনি তিনিই আছেন। মনুমণ্ডলে (মনু) মনু রূপেই বিহার করিতেছেন। মনুর মনু জন্ম নাশ হয় নাই, মনুর তনু লয় পায় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অষ্টাবক্র,—বেদব্যাস, শুক, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবি মহাত্মারা কেহই ইহলোক পরিত্যাগ করেন নাই। তাবতেই জ্ঞান পূরিত গ্রন্থরূপ কলেবর ধারণ করিয়া উপদেশ দ্বারা আমাদিগ্যে কৃতার্থ করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির ন্যায় তাঁহারদিগের সৃষ্টি সকল দৃষ্টিপথের তুষ্টিকর হইয়াছে। শুদ্ধ এই মহাশয়েরাই জীবিত আছেন এমত নহে। ইহাঁরা কত কত মৃত সম্রাট, কত কত মৃত রাজমন্ত্রি, কত কত মৃত মহাযোদ্ধা, কত কত মৃত সদ্‌গুণান্বিত ব্যক্তি, কত কত মৃত রাজধানী, কত কত মৃত দ্বীপ উপদ্বীপ,—কত কত মৃত নদী, নদ, কত কত পর্ব্বত ও কত কত মৃত বন উপবনকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নিরূপণ হয় না। অধুনা যাহারদের চিহ্নমাত্রও নাই তাহারা বিলক্ষণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া কবির বর্ণনাপথে অস্মদাদির নয়ন নিকটেই নৃত্য করিতেছে। তাহার-দিগের তাবৎকেই যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। সেই সমস্ত রাজা, সেই সমস্ত রাজমন্ত্রি, সেই সমস্ত যোদ্ধা, সেই সমস্ত সুধীর, সেই সমস্ত গহন, উপবন, দ্বীপ উপদ্বীপ, ও নদী নদাদি সকলি আমারদিগের সম্পাদকীয় আসনের অগ্রেই যেন রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেহই অদৃশ্য···নের নহে। অতএব এই স্থলে লেখনী পরিত্যাগ করনের পূর্ব্বেই একবার পূর্ব্বতন কবি মহাশয়-দিগের চরণে প্রণিপাত করিলাম।

ইহাঁরদিগের তুলনায় প্রাচীন বাঙ্গালি কবি মহোদয়েরা যদিও সমুদ্র সম্বন্ধে গোষ্পদ ও চন্দ্র সম্বন্ধে খদ্যোতবৎ, তথাঁচ সর্ব্বতোভাবেই আমারদিগের পূজ্য বটেন। এই ব্যক্তি-ব্যূহের অসাধারণ ক্ষমতার অসাধারণ প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। যাহা হউক,—কবির প্রণীত কবিতা সকল গোপন থাকা কি দুঃখের বিষয়! এই বিষয় যত প্রকাশ হইবে, ততই দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ততই অনুশীলনের আধিক্য হইবে। ততই সভ্যতা ও সুখের সঞ্চালন হইবেক,—রত্ন গোময় মধ্যে গুপ্ত থাকিলে কেহই জানিতে পারে না, সুতরাং সে রত্নের যত্নের সূত্র কি রূপে হইতে পারে। অতএব দেশস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, সকলে আমারদিগের সহিত সমান অনুরাগি হইয়া এতদ্বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করুন।

আমরা যে সকল গীত প্রকাশ করিতেছি, তাহার লেখার দোষ কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না। কারণ গানের সুর যে রূপ তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। নচেৎ কোন মতেই

গাহনা করা যাইতে পারে না। পয়ার, ত্রিপদীর, যেরূপ নিয়ম, গীতের নিয়ম তদ্রূপ নহে। সুরানুযায়ি উচ্চারণ এবং উচ্চারণানুযায়ি লিখন। গীতের অগ্রে মহড়া, পরে চিতেন, সর্ব্বশেষ অন্তরা লিখিতে হয়। কিন্তু পড়িবার কি গাহিবার কালে প্রথমে চিতেন, পরে মহড়া, তৎপরেই অন্তরা ধরিতে হইবে। গত কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে আমরা বিস্তারিত-রূপে তদ্বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, সেই পত্র দৃষ্টি করিলেই ইহার সমুদয় নিয়ম ও প্রণালী জানিতে পারিবেন। এইক্ষণে পুনর্ব্বার লেখা বাহুল্য মাত্র, পুরাতন গ্রাহক মহাশয়েরা সমস্তই জ্ঞাত আছেন, তাঁহারদিগের নিমিত্ত কিছুই লিখিতে হইবে না, কেবল নূতন গ্রাহকগণের নিমিত্ত সঙ্কেত মাত্র করিলাম।

রাসু নৃসিংহ*

রাসু নৃসিংহ নামক দুই সহোদর ফরাসডাঙ্গার নিকট এক গ্রামে বাস করিতেন, ইহারা কায়স্থ কুলোদ্ভব, পূর্ব্বতন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁরদিগের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখি হইতেন। রাসু নৃসিংহের দল হরু ঠাকুরের দলের বরং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইবে, কিন্তু শেসে কখনই নহে। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন তদ্বিশেষ আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, কারণ তৎকালের মনুষ্য অদ্যাপি প্রায় কেহই জীবিত নাই। অতি প্রাচীন যে দুই এক মহাশয় সজীব আছেন তাঁহারা কেহই নির্দ্দিষ্ট করিয়া করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, যিনিই হউন, রাসুই হউন আর নৃসিংহই হউন, দুই জনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বসাধারণে "রাসু নরসিংহ, রাসু নরসিংহ" এই নাম উল্লেখ করিত, এবং এই নামেই দল বিখ্যাত ছিল। ইহাঁরা সখীসংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। অতিশয় শ্রুতি সুখকর, ও সর্ব্ব বিষয়েই যশের যোগ্য।

প্রায় ৫০ বৎসর হইল ইহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই সময়ের পূর্ব্বেই ইহারদিগের সুখ্যাতি সৌরভে এদেশ আমোদিত হইয়াছিল। অনেকেই তত্তৎ সংগীত সুধাশ্রবণে শ্রবণের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। আমরা কত কষ্টে, কত ক্লেশে, কত যত্নে, কত চেষ্টায় ও কত শ্রমে কত স্থানে ভ্রমণ ও কত লোকের উপাসনা করত এত দিনের পর তাহার কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ পূর্ব্বক সংকল্পের সার্থকতা করিয়াছি, প্রতিজ্ঞাকে চরিতার্থ করিয়াছি। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব এমত সম্ভাবনাই ছিল না, কেবল জগদীশ্বরের অনুকম্পায় মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যদিও অত্যল্প মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাচ অস্মৎ পক্ষে ইহাতেই আশার অতীত ফল লাভ হইয়াছে, কারণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হইল তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ ঐ কয়েকটি কবিতা অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক এতৎ প্রতি নয়নাস্তপাত করিলে যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখি হইতে পারিবেন।

---

* সংবাদ প্রভাকর, শনিবার, ১লা মাঘ, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৪।

মহড়া।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে,
কুঁজিরে পূজিলে কি গুণ॥

চিতেন।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে।

অন্তরা।

শ্যাম রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি,
কি সুখে হোয়েছ নাগরো॥

চিতেন।

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছো যাহারো কারণে।
ওহে লক্ষ কুবুজারো,
রূপেরো ভাণ্ডারো শ্রীমতী রাধারো চরণে

অন্তরা।

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কী কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধর বংশীবদনো॥

চিতেন।

শ্যাম যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এবড় বেদনো, তেজিয়ে সেধনো,
অধনে রেখেছ যতনে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

চিতেন।

শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধা কৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন্ কুঁজী কৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে।

অন্তরা।

শ্যাম, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ মাণিকো, হোরে নিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো, রহিলো॥

চিতেন।

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরেরো জলো, জগতো ব্যাপিলো,
সাগরো শুখালো তপনে॥

[অতি চমৎকার! কি সুন্দর রচনা! এতদ্রূপ প্রেম ভক্তি ও করুণা পরিপূরিত শ্লেষোক্তি কবিতা প্রায় শ্রবণ করা যায় নাই।]

মহড়া।

প্রাণোনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,
নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।

চিতেন।

পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো,
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দুরো ভালেতে॥

অন্তরা।

হায়, মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠ দেশো নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপাম,
জগতে রয়েছে ঘোষণা॥

চিতেন।

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্ক সাগরো মথিতে॥
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন্ নিশানো,
আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥

হায়, সে যেমন ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,
গলে অস্থি মালা ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে॥

চিতেন।

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,
এসেছেন্ মন্ তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,
রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥

অন্তরা।

হায়, ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,
একচক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণো যুগলে॥

চিতেন।

ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,
কপালে কঙ্কণো আখাতে॥

[আহা! আহা! কবিওয়ালাদিগের কবিতার মধ্যে এবম্ভূত শ্লেষ ঘটিত সরস রূপক রচনা প্রায় কখনই শ্রবণ পথের পথিক হয় নাই। এই গীতটির মূল্য নাই, তুল্য নাই। এ বিষয়ে কি বাক্যে কবির সুখ্যাতি করিব, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল। ইহার দ্বিতীয় গান নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।]

মহড়া।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেওনা।
মানা করি, কলহ আর বাড়াওনা॥
বিষাদের বাতি জেলেছেন, শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিওনা।

চিতেন।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকনা।
কত নারীর্ সঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁওনা॥

শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,
তথাচ সে সবো পাসরি।
এবারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বসেছেন্ কিশোরী॥

চিতেন।

জিনি মেরুগিরি, মান ভরে ভারি,
মরিবার ভয় করে না।
যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,
মনে করি রাধা পাবেনা।

অন্তরা।

শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
মোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে॥

চিতেন।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিলনা।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা।

শ্যাম্, সরমে কি করে, বলিহে তোমারে,
শ্রীমতী রাধায় কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি॥

চিতেন।

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটী ছোঁবে না।

তুলিয়ে সে মাটী, দিবে ছড়া ঝাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কট্‌কেনা ॥
[অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।]

মহড়া।

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয় ॥
সুহৃৎ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো,
কলঙ্ক ভাজনো হোতে হয়।

চিতেন।

এমনো পীরিতি করি,
যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আরো পার্থিকো ॥
শ্রীনন্দ নন্দনো, দুখ ভঞ্জনো
সদা রাখি মনো তাঁরি পায়।

অন্তরা

অমিয় ত্যজে, গরলে মোজে,
উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে,
মরণো হোতে অধিকো ॥

চিতেন।

হৃদয়ো মন্দিরো মাঝে, রসরাসে বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে ॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়।

অন্তরা।

মনেরে কোরে চাতক পাখি, রাখিব বিশেষে
জলং দেহি দেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে ॥

চিতেন।

ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে।
সেই রূপাজলে, মনো ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো ॥

চিতেন।

হৃদে আছে শতদলো, সে কমলো ফুটিবে।
প্রেম পীযূষো ঘটিবে ॥
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায়।

অন্তরা।

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা দেখিয়ে ভকিতে ॥
ত্যজিয়ে এ সুধারসো, কেন বিষো ভখিবো।
কলুষো কূপে ডুবিবো ॥
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেইজনো,
পেয়ে প্রেমধনো সে হারায়।

[এই গীতের ব্যাখ্যা কি করিব ? পাঠ করিতে করিতে প্রেমপুলকে পরিপূরিত হইতে হয়। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলেরি, নিকট প্রফুল্লবদনে সংগীত করা যায়। পাঠক ও শ্রোতৃ উভয়েই তুল্য রূপে আমোদিত হইতে থাকেন।]

মহড়া।

যেন প্রাণ, অরসিক সহ, মিলন নাহিক হয়।
তুমি আরো অন্য তাপ, দিও শত শত,
যত তব মনে লয় ॥

[আহা ! কি কি পরিতাপ ! এই গীতের অপর কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না। এই মহড়াটি ভাব ও রসে পরিপূর্ণ, ইহাতে কবির বিশেষ কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

শ্যাম্, তুমি যত রসিক, রসে পারক,
শ্রীমতী তা জানে।
ভারি ভুরি কোরনা, বঁধু এখানে।
গিয়েছে সে কালো, জানিছে সকলো,
কুবুজা মিলেছে কপাল গুণে ॥

চিতেন।

নন্দঘোষের বাড়ী, ধূলায় গড়াগড়ি,
কড়া দুই ননির কারণে।

এবে রাতারাতি, শিরে দণ্ড ছাতি,
শৃগাল ভূপতি, হোয়েছো বনে ॥···

[এই গীতের অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না, একারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। যেহেতু ইহার পরিশেষের রচনা অতি উত্তম।]

মহড়া।

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গ ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥

চিতেন।

প্রাণ, তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো,
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা, নিজ জনারে ॥

অন্তরা।

প্রাণ, আরো এক শুনো, বচনে তোমার,
দাঁড়ালেম কূলের বাহিরে ॥
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে,
ভাসালে এজনে, ছলনা করে ॥

চিতেন।

তোমার চরিত্র, পথিকো যেমতো,
হোয়ে শ্রান্তি যুক্ত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চাহে ফিরে ॥

[অতি উৎকৃষ্ট।]

মহড়া।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেম ধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে, মূড়াব মাথা।

চিতেন।

আমি রসিকের স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো প্রেমবারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥

অন্তরা।

হায়, কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে ॥

চিতেন।

কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণ পদ পেলে মাধবীলতা।

[উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট।]

৺হরু ঠাকুর *

৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, যিনি হরুঠাকুর নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মহানগর কলিকাতার সিমুলা নিবাসী ৺কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ির পুত্র। যৎকালে ইঁহার যজ্ঞোপবিত হয়, তৎকালেই ইনি দৈবশক্তি দেবীর কল্যাণে কবিতা রচনা করণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে যত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের আধিক্য হইতে লাগিল, ততই উত্তর উত্তর শক্তির উন্নতি হইল। হরু ঠাকুরের পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাড়ি প্রতিবাসিদিগের মধ্যে বিশেষ এক জন গণ্য ও মান্য ছিলেন না। কিন্তু সৎকর্ম্ম করিয়া সদাচার দ্বারা সামান্যরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন।

*সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১ পৌষ ১২৬১ সাল। ইং ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪।

হরু ঠাকুর স্বীয় ক্ষমতা ও গুণের প্রভাবে স্বয়ং খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করত সর্ব্বপ্রিয় ও মান্য হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সম্ভ্রম ও গৌরবের কথা অধিক কি উল্লেখ করিব, তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আপনার সংগীতে গুরু, রঘু প্রভৃতি কবিকদম্বের উচ্চ নাম প্রচ্ছন্ন করত আপামর সাধারণ সর্ব্ব সমাজে পূজ্য হইয়া ঠাকুর শব্দে বাচ্য হইলেন।

এই ঠাকুরটী ৭৫ বৎসরের অধিক কাল ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারেন নাই। এবং যে সময় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন অন্ত দিবস হইতে সেই সময়ের গণনা করিলে বোধ করি ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ না হইবে, বরং কয়েক বৎসর ন্যূন হইতে পারে।

ইনি সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কিছুই অভ্যাস করেন নাই, অথচ বুদ্ধির কৌশলে এরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিতেন, যে, সেই বাহ্য ব্যাপার দৃষ্টে তাবতেই তাঁকে উক্ত উভয় বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রধান প্রধান অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহাকে অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে গ্রাহ্য করিতেন। এবং তিনি অনেকানেক স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তুল্যরূপে গাড়ু ঘড়া প্রভৃতি বিদায় লইয়াছেন।

হরু অতিশয় সুগায়ক ছিলেন। কবিতা সকল যেমন উত্তম রূপে রচনা করিতেন, সেই রূপ আবার তৎ সমুদয় অতি সুমধুর সুরে ও যথা যোগ্য রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত করত সংগীত দ্বারা লোকের চিত্ত হরণ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ বিগলিত সুধা স্বরে তাবতেই মোহিত হইয়াছেন।

ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন ৮।১০ আট দশ বৎসর তখন সখের দলে জিল দিতেন। এবং কবিতার দুই একটি পদ পূরণ করিতেন। পরে যৎকালে ১৫।১৬ পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়স হইল তৎকালে সখের দলের উপর স্বয়ং প্রাধান্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বরচিত সুর ও গান দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং যে সময়ে যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন। আর মধ্যে মধ্যে বিনা বেতনে রঘুর দলে গাহনা করিতেন। কিন্তু কবিতা কল্পে তাঁহাকে বড় অধিক কাল রঘুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ অনুকম্পায় তিনি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই গুরুর নিকট এমত গুরু হইলেন যে, গুরু হইয়াও রঘু তাঁহার নিকট লঘু হইল। কিন্তু হরু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সজ্জন ছিলেন, এ জন্য গুরুর গুরুত্ব রক্ষা করিয়া নিজ লঘুত্ব প্রচারে ত্রুটি করেন নাই। অর্থাৎ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আপন নাম গোপন রাখিয়া সর্ব্ব শেষে "রঘুর" নামে ভণিতা দিয়াছেন। আমরা অন্তবাসরীয় প্রভাকরে এই মহাশয়ের প্রণীত যে কয়েকটি গানের সংপূর্ণাংশ প্রকাশ করিলাম যিনি তৎপ্রতি নয়নান্তপাত করিবেন, তিনি তাহাতে রঘুর নামের ভণিতা দেখিতে পাইবেন।

হরু ঠাকুর কখনই কোন রূপ বিষয় কর্ম্ম করেন নাই, বাল্যকালে কেবল আমোদ প্রমোদ, পরে সংগীত ব্যবসায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সমস্ত সময় সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে "সৌখীন" ছিলেন, কাহারো স্থানে কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই। শেষে নানা গতিকে অভাব বশতঃ ধনের নেসায় পেসায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহামান্য মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক ইহাঁর "সৌখীনত্ব" রূপ সতীত্ব সংহার হয়। অর্থাৎ মহারাজের অধিক অনুরোধ ও আশ্বাস বাক্য এবং দানের বশ হইয়া ইনি ধনাগম তৃষা কৃশা করিতে পারিলেন না।

কোন পর্ব্বাহ রজনীতে হরু ঠাকুর পেসাদারি দলে সখ্ করিয়া সংযুক্ত হইয়া উক্ত নৃপতির নিকেতনে গাহনা করত সর্ব্বতোভাবেই রাজার মন প্রফুল্ল করিয়াছিলেন, রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয়

আনন্দ-পরবশ হইয়া ঠাকুরকে পারিতোষিক অর্থাৎ বক্‌সিস স্বরূপ এক যোড়া সাল প্রদান করেন। হরু তাহাতে অপমান ও লজ্জা বোধ করত অভিমানে ম্লান ও ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সাল ঢুলির মস্তকে অর্পণ করিলেন। মহারাজ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত অথচ কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া "ঐ গায়ককে এখানে নিয়ে আয়" পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ উল্লেখ করাতে ঠাকুর অতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত ত্রাসিত ও কম্পিত কলেবর হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া ক্রোধ ভাব পরিহার পূর্ব্বক সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হরু আত্ম বিবরণ জ্ঞাত করিলে মহামতি শোভাবাজারপতি অতি সন্তোষচিত্তে তাঁহার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক নিজ নামে দল করিতে উপরোধ করিলেন, হরু সেই অনুমতির অধীন ও লোভাধীন হইয়া কাযে কাযে সমাজের মাঝে লাজের মাথায় বাজের আঘাত করত রাজের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। গোষ্ঠীপতি নৃপতি দলপতির আদেশে দল করিয়া দল পতি হইলে সেই ধ্বনি যে ধনির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল তিনিই তাঁহাকে যত্নযোগে আহ্বান করত আপন বাটীতে গাহনার নিমিত্ত অর্থ দিয়া বাধিত করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে ক্রমে ধনাঢ্যদিগের আগার মাত্রেই তাঁহার দলের বায়না হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে রাজবাটী ভিন্ন অন্যত্র বায়না লইতে পারিতেন না।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর হরু ঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি ইহাঁর গান ভিন্ন অন্যের গান প্রায় শুনিতেন না। প্রকৃত এক জন গোঁড়া ছিলেন বলিলেই হয়। আপনার মনোগত ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া সেই সেই ভাবে গান সকল রচনা করিতে অনুরোধ করিতেন, ঐ সমুদয় পুরুষোক্তি গান শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে মহিষীগণের উপর ইঙ্গিত থাকিত!

হরু ঠাকুরের এই এক খানা প্রধান ক্ষমতা ও শক্তি ছিল যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে যে কোন কথা প্রশ্ন স্বরূপ প্রদান করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পদ বা সেই কথাটি উপলক্ষ করিয়া তাহাতে পাঁচ সাত অন্তরা গান প্রস্তুত করিতেন।

যথা। প্রশ্ন। "পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।"
পূরণ। "পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে॥"
ইত্যাদি

তথা। "তোমার আশাতে এ চারিজন।"
পূরণ। "তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোরে মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন।
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
দরশো, পরশো, শুনিতে সুভাষো
করিতেছে আরাধন।" ইত্যাদি।

প্রায় এই প্রকারেই অধিকাংশ গীত পূরণ করিতেন। সিমুলিয়ার ঠঁঠনে নিবাসী ৺রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি প্রশ্ন প্রদান করিতেন। সেই সকল প্রশ্ন পূরিত গানের অধিকাংশই আমরা অদ্য প্রকটন করিলাম। হরু উক্ত ঘোষ মহোদয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজভবনে এবং উক্ত ঘোষের গৃহে যত অধিকবার সংগীত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এত অধিক কাল আর কোন খানেই করেন নাই।

কি "ভবানী বিষয়" কি "সখী সংবাদ" কি "বিরহ" কি "খেউড়" কি "লহর" হরু সকল প্রকার গান রচনা করণেই নিপুণ ছিলেন। কিন্তু "ভবানী বিষয়" তাদৃশ উত্তম হইত না, হরুর সখীসংবাদ ও বিরহের পরিচয় পশ্চাদ্ভাগেই প্রকাশ হইল, সুতরাং বাহুল্য করিয়া

লিখিবার প্রয়োজন করে না। ইনি খেউড় এবং লহর গানের বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষাই বিখ্যাত ছিলেন, যখন যাহা রচনা করিতেন তখন তাহাই অতি আশ্চর্য্য হইত, তাহাতে কত বিদ্যা, কত গুণপনা এবং কত শব্দ ও ভাবের কৌশল প্রকাশ করিতেন তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত, একারণ তাহা কোন প্রকারেই প্রকাশ করা বিধেয় নহে। যখন তাহার নাম করিতে হইলেই রাম বলিয়া ঘাম নির্গত করিতে হয়, ভূত প্রেত প্রভৃতি কর্ণে হস্ত দিয়া কোথায় প্রস্থান করে, তখন আমরা কি প্রকারে তাহা পত্রস্থ করিতে পারি। পূর্ব্বকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন। ইহার বাহুল্য ব্যাখ্যা আর কি করিব? রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের হরুঠাকুরের লহর এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের শান্তিপুর নিবাসি লোচন খড়্কির "কৃত এতকাল কি কোরে মলেম্, আইবড়ো কপালে বিয়ে হোলোনা রে" ইত্যাদি কবিতা দ্বারা অনেকেই অবগত আছেন।

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর যৎকালে "নগর কীর্ত্তন" করেন তৎকালে হরু ঠাকুর এই নাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যথা।

"হরিবোল্ বলিয়ে প্রাণো যাবে।
আমার্ এমন্ দিন্ কি হবে॥
অন্তিম সময়ে বন্ধুগণে,
আমার শ্রবণে হরিনাম্ শুনাবে।
পুরাণে শুনেছি করুণাময়ো,
হরি আমায়্ কি করুণা করিবে॥" ইত্যাদি।

তথা।

"হরি নাম লইতে অলসো কোরোনা,
রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে, কি,
ঢেউ দেখে লা ডুবাবে॥" ইত্যাদি।

এই দুইটী নাম কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করণ-মাত্রেই অশ্রু পতন ও লোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরো হৃদয় আর্দ্র হয়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরি অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়; সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করত মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ হরণ চরণ স্মরণ করিতে থাকেন। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় এই নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন, ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করনে অশক্ত হইলাম।

ভবানে বেনে ও নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে জিল দিত। পরে দোহার অর্থাৎ গায়কের পদে নিযুক্ত হয়। এইরূপে কিছুদিন গত করিয়া সকলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্ব স্ব নামে দল স্থাপন করিলেন। তৎকালে হরু সকলকেই গীত ও সুর প্রদান করিতেন। অতি অল্প দিবস পরেই ভবানে বেনে রামজির অনুগত হইয়া তাহারি নিকট গীত লইতে আরম্ভ করিল, সর্ব্বশেষে রাম বসুর আশ্রিত হইয়া সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিল।

হরু ভোলা ময়রাকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন, এজন্য নীলুর পক্ষপাত করিয়া তাহাকেই ভাল ভাল গান ও ভাল ভাল সুর গুলীন প্রদান করিতেন। এবং ভোলা জয়ী

হইলে অত্যন্ত তুষ্ট হইতেন, একারণ নীলু তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের শরণ লইলেন, এবং তাঁহারদিগের প্রদত্ত অস্ত্রের বলে হরু গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সমস্ত গীত যুদ্ধে অনেক রহস্য হইয়াছিল। আমরা সময় ক্রমে তদ্বিস্তারিত উল্লেখ করিতে কখনই ত্রুটি করিব না।

এক রাত্রি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে নীলু ও ভবানে প্রভৃতির দল হরু ঠাকুরের উপর কয়েকটি শ্লেষোক্তি ছেড়ের খেম্‌সা গান গাহিয়া আসর অত্যন্ত সরগরম করিয়া তুলিল, তৎ শ্রবণে সকলের মুখ হইতে খল খল শব্দে হাস্য নির্গত হইতে লাগিল, এবং সকলেই ভাবিলেন হরু ঠাকুর ইহার উত্তর করিতে পারিবেন না। পরে হরু উঠিয়া যখন তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন, তখন সেই সমস্ত ব্যক্তি তদপেক্ষা শতগুণে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯০ বৎসর বয়স্ক কোন প্রাচীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ সেই উত্তর গীতের কেবলমাত্র মহড়াটি শ্রবণ করিয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। যথা।

"মহারাজ, এখন্ যে যা ইচ্ছে করুন্। কেউ মারুন্ বা দশকোষি পাল্লা,
সব এই মুগুরের গড়া। দরিয়া টোপ্‌কে পড়ুন।"
এখন যে যা ইচ্ছে করুন্।

ঐ গানের সমুদয় শুনিতে পাইলে পাঠকগণ বিশিষ্টরূপেই তুষ্ট হইতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ যত দিবস জীবিত ছিলেন, তত দিবস হরু ঠাকুর আপন দল রক্ষা করিয়া আপনিই গান গাহিতেন। পরে যে দিবস উক্ত মহাত্মা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন, সেই দিবসেই ইনি এককালীন শপথ পূর্ব্বক দল ও গাহনা পরিত্যাগ করিলেন। দল স্থাপিত রাখিয়া তাঁহাকে গাহাইবার নিমিত্ত কত ভাগ্যধর ব্যক্তি কত প্রকার লোভ দেখাইয়াছিলেন তিনি কিছুকেই সেই লোভের বশীভূত হয়েন নাই। মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিস্তর অনুরোধ করেন, তাহাতে সম্মত না হইয়া এই উত্তর করিলেন যে "মহাশয়ের পিতার নিকট আমি লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না"। এই বাক্যে তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

হরু ঠাকুর এক বিবাহ করেন, সেই বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বহু দিবস হইল সেই পুত্রটি লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার এক বিধবা স্ত্রী এপর্য্যন্ত জীবিতা আছেন, হরুর দুই কন্যা কয়েকটী সন্তান সন্ততি প্রসব করেন। অধুনা তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন। কিন্তু কিরূপ অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন আমরা তদ্বিশেষ বলিতে পারিলাম না। দৌহিত্র সন্তানেরা তাঁহার বাটী ও বিষয়াদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ফলে সে বাটীতে তাঁহারদিগের কাহাকেই আর দেখিতে পাই না। ইহাতে বোধ হয় বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

হরু ঠাকুরের গানের নিমিত্ত আমরা কত যত্ন, কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম করিয়াছি, এবং কত স্থানে ভ্রমণ করিয়া কত লোকের উপাসনা করিয়াছি ও এ পর্য্যন্ত করিতেছি তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলে যে উপকারের কার্য্য না হয়, আমারদিগের কেবল কায়িক ক্লেশ ও মানসিক অনুরাগের দ্বারা সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। যে যে মহাশয় অপার অনুগ্রহ বিস্তার পূর্ব্বক এ বিষয়ে যথোচিত আনুকূল্য করিতেছেন—তাঁহারা অস্মদাদিকে জন্মের মত ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন, আমরা এ উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তাঁহারদিগের তুষ্টি জন্মাইতে পারি এমত কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাই না।

এ সমস্ত গানে মিলের ও শব্দের যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে তাহা কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না, কেবল ভাব অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে এরূপ যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ শুদ্ধ দৈবশক্তির বলে অশিক্ষিত জনের দ্বারা এমত উত্তম রচনা হওয়াতে কে না শ্লাঘার ব্যাপার বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন। অদ্য এই অবধি শেষ করিয়া নিম্নভাগে গানগুলীন প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

আর রাধার অভিমান কে সবে,
বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে॥
আমি যে সেই গৌরবিণী, তারি গৌরবে।

চিতেন।

যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃত দেহে সখি আমার, আসিত জীবন॥
এখনো এ পাপ প্রাণ, রবে কি রবে।

অন্তরা।

শ্যামের গুণের কথা, শুন প্রাণ সই।
ছলক্রমে এক দিনো অভিমানী হই॥

চিতেন।

সে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো,
ধরি যোগির বেশ॥
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে।

[এই গীতের বয়স ৭০ বৎসরের ন্যূন নহে, বরং অধিক হইবে। সেই সময়ের এই রচনাকে অতি উৎকৃষ্টই কহিতে হইবে। আহা! "এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে" এই পদের পরিপাট্য শব্দ কৌশল ও মধুরতার বিষয় কি ব্যাখ্যা করিব? পরিতাপ এই, ইহার অপরাংশ ও দ্বিতীয় প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

ও সখিরে,
কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।
মনেতে করিতে এ বিধু বয়ানো,
সখি এ যে পাপো প্রাণে, ধৈরয না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বলনা॥

চিতেন।

সই হেরি ধারাপথো, থাকয়ে যেমতো,
তৃষিতো চাতকো জনা।
আমি সেইমত হোয়ে, আছি পথো চেয়ে,
মানসে করি সে রূপো ভাবনা॥

হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী,
কেন চক্রপানি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,
রহিল না জানি কারণো॥

চিতেন।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হোতেছে স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি পাই যাতনা॥

অন্তরা।

সই রবি কিরণেরো প্রায় হিমকরো,
এ তনু আমারো দহিছে।
শিখি পিক রবো, অঙ্গে মোরো সবো,
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

চিতেন।

সই করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো,
করিলেকো প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভকি সেও ভালো,
কি ফলো বিফলে কাল্ যাপনা॥

অন্তরা।

সই দেখ নিজ করে, প্রাণোপণো কোরে,
গাঁথিলাম এ কুসুমহার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥

চিতেন।
সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখো চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম্ অন্বেষণে, পাঠালাম মনে,
তারো সঙ্গে কেন প্রাণো গেলনা॥

[অতি সুন্দর, এই গীত সুর করিয়া গাহিলে সকলেরি মন মোহিত হয়।]

মহড়া।
কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার॥
ইথে যে উচিত তোমার।
করহে মুরারি, অধীনী তোমারি,
সকলি তোমার লাগে ভার॥

চিতেন।
আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো,
পুন করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি,
যে দুখো হোলো সে অবলার॥

ওহে শ্যাম্, ভাব দেখি একোবার্,
গোকুলেরো সে নীলে।
কিরূপো ব্যাভারো, হোতো নিরন্তরো,
সকলি বিস্মরিলে॥

চিতেন।
হোতেম যখন্ মানিনী,
আপনি করিতে যে ব্যবহার্।
সে সবো এখনো, হইল স্বপনো,
স্মরণার্থে রয়েছে আমার॥

ব্রজনাথ্। এক্ষণে, ব্রজ ভূমেরো,
হোয়েছে হে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে বিশেষো,
কি কহিব সহসা॥

চিতেন।
আগমন কালে মাধবো, আসিবো,
কোয়ে ছিলে এই সার।
কেবল্ মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা,
নতুবা যে সকলি আঁধার্॥

কেবল্ এই হেতু প্রাণো আছে,
গোপিকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারি, বাধা বনমালি,
জাগিতেছে অন্তরে॥

চিতেন।
দিবানিশি এই ধ্যানো, বাহ্যজ্ঞানো,
হারা হোয়ে অনিবার।
কখনো চেতনো, পেয়ে ডাকি প্রাণোকৃষ্ণ
কোথায়, দুঃখে কর পার॥

আর কি, হবেহে এমন দিন্,
পুন যাবে ব্রজেতে।
আর কি হে হরি, হইবে কাণ্ডারি,
যমুনা পার হোতে॥

চিতেন।
আর কি কদম্বতলে, কৌশলে,
লবে দান পশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো,
সকল ব্রজবাসি জনার॥

[চমৎকার, চমৎকার।]

মহড়া।
কি হবে। কোথা গেলে হরি,
অনাথো করি, তেজিয়ে পথো মাঝে।
তব বিরহে, হৃদয়ো, বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে,
হরি মরি প্রাণে যে॥

চিতেন।
হায়, এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি,
লইতে চাহিলে হে যে।
আবার্ কিবে ভাবান্তরে, অদেখা আমারে,
হোলে কি মনে বুঝে॥

অন্তরা।

হায়! ওহে তরুগণো, মোরো শ্যামধনো,
দেখেছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি,
এই খানে হোয়েছি হারা॥
[কি আক্ষেপ! এই গীতের অপরাংশ প্রাপ্ত হইলাম না।]

মহড়া।

কদম্বতলে কেগো, বংশী বাজায়।
এত দিনো আসি যমুনা জলে,
আমি এমনো মোহনো,
মুরতি কখনো, দেখিনি এসে হেথায়॥

চিতেন।

অঙ্গে অগৌর চন্দনো চর্চ্চিতো, বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

অন্তরা।

সই, সজল নবজলদ বরণো,
ধরি নটবরো বেশ্।
চরণো উপরে থুয়েছে চরনো,
এই কি রসিকো শেষ্॥

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ্, নখরেরো ছটায়।
আমার হেন লয় মনো, জীবনো যৌবনো,
সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥

অন্তরা।

হায়। অনুপম রূপো মাধুরী সখি,
হেরিলাম্ কি ক্ষণে। প্রাণো নিলে হোরে,
ঈষতো হেসে, বঙ্কিমো নয়নে

চিতেন।

মন্দ মধুরো মৃচকি হাসি, চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো,
মন্ মজিলো হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই, অলকা আঁবৃত বদনো, তাহে মৃগমদো
তিলকা মনোহরে সাজো, নাসাগ্রে গজো
মুকুতার ঝলকো॥

চিতেন

বিম্বঅধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।
কিবে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো,
রূপে ভুবন ভুলায়॥

অন্তরা।

সই, বেষ্টিত ব্রজ বালকো সবে,
কি শোভা আমরি হায়।
গগনেতে তারাগণো মাঝে, চাঁদ যেন শোভা
পায়॥

সই, কেনবা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায়॥
[আহা, আহা! কি সুমধুর প্রথম অবস্থার এই গান।]

মহড়া।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম।
শ্যামেরো পীরিতো, গরলো মিশ্রিতো,
কারো মুখে যদি শুনিতেম্॥
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষো ভকিতেম্।

চিতেন।

যখন মদনমোহন আসি,
রাধা রাধা বোলে বাজাতো বাঁশী,
যদি মন্ তায় না দিতেম্।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়ে সে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম॥

হইয়ে মানিনী, যতেকো গোপিনী,
বিরহ জ্বালাতে জ্বলিতেম্।
সই, ষড়জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন,
জানিলে কি তায়,
এ কোমল প্রাণ সমর্পণো করিতেম্।

চিতেন।

আগে গুরুজনো, বুঝালে যখনো,
তা যদি গ্রহণো করিতেম্।
রিপুগণো বশে, রহিতো অনাসে,
মনেরো হরিষে থাকিতেম্॥
[অতি আশ্চর্য্য! সর্ব্বাংশেই সুন্দর।]

মহড়া।

হরি ব্রজনারী চেননা এখন। রাধার প্রণোধন॥
প্রভাসো তীর্থে দরশন।
পাইয়ে কৃষ্ণেরে, অভিমানো ভরে,
কহে করে ধোরে গোপীগণ॥

চিতেন।

নাহি পীতধটি মুরলী, গোচারণের সে ভূষণ।
এবে যদুপতি, হয়েছো ভূপতি,
দ্বারকা পতি, স্বোণারো ভবন॥

অন্তরা।

যদুনাথ। আরো কেন দুখিনীগণে স্মরণো হবে।
গিয়েছে সে সবো, ব্রজেরো ভাবো,
মজেছ গৃহ ভাবে॥

চিতেন।

রুক্মিনী আদি রাজসুতা, বশতা,
সবে সেবে ও চরণ।
রাধা কুরূপিনী, গোপের রমণী,
বনবাসিনী কি লাগে মন॥

অন্তরা।

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব, সে সুখো বিলাস।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো,
পূরাতেছ অভিলাষ॥

চিতেন।

সত্যভামার মানো রাখিলে,
রোপিলে, পারিজাতেরো কানন।
তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয় সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন॥

অন্তরা।

তোমারে, অকিঞ্চন জন নাথো, কৃষ্ণ জগজনে কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো, ও পদে আশ্রয় লয়॥

চিতেন।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে, যখন শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না লবে শরণে,
দুখে গেলে প্রাণো দুখিজন॥

অন্তরা।

শুনহে, বহুকালান্তরে, প্রাণবঁধু পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে হরি তোমা বিনে,
আর নাহিকো সখা॥
সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত, রঘুনাথ,
করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকা সমাজে,
ব্রজরাজো নন্দেরো নন্দন॥
[এই গানে কি আশ্চর্য্য প্রেম পূরিত করুণা প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে। বলনা কিবাদ সাধিলে।
নবীনো পীরিতো, না হইতে নাথো,
অঙ্কুরে আঘাতো করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো,
কে আনিলো রথো গোকুলে। অক্রুরো সহিতে।
তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুনহে মাধবো,
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥

চিতেন।

শ্যাম্ নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে।
কি সে হলেম্ দুষি, তা তোমায় জিজ্ঞাসি
কি দোষে এ দাসী তেজিলে॥

[আহা! এই গানের সমুদয় পাইলাম না। অতি মনোহর।]

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী,
ব্রজনারী কোথা রেখে যাও
জীবনো উপায় বোলে দেও॥
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও॥

চিতেন।

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধো না করি,
থাক হরি যথা সুখো পাও।
একবার্ সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও॥...

[কি দুঃখ! এই গীতটি সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া।

পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো।
সখি কও শুভ সমাচার।
জীবনো জুড়াও রাধার॥
মথুরা নগরে, মাধবেরো,
দেখে এলে কি রূপ ব্যবহার॥

চিতেন

না হেরে নবীনো, জলধরো রূপো,
আকুলো চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান॥
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো,
হরি বিনে সকলি আঁধার॥

অন্তরা।

হায়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,
মধুপুরো সুখো বিলাসী।
স্বরূপে কহনা, সেখানে রাজার,
কে রাজ মহিষী।

[এ গানের যে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই মন অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে।]

মহড়া।

ঐ আসিছে কিশোরি তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।
সুখে বাঞ্চল না্জানি কোথা, কারো সহিতে॥
বঁধু ঘুমে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধরো শ্যাম চাঁদেরো,
বঁধুর এলায়েছে পীতবাসো,
নারে তুলে পরিতে॥

চিতেন।

যাহারো লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত,
ওই সই সেই প্রাণোনাথ্॥
প্রভাতে অরুণো সহ্ উদয় আসি;॥
বঁধুর হোয়েছে অরুণো আঁখি নিশি জাগরণেতে

[এই মনোহর গীতটির সমুদয় না পাওয়াতে চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে।]

ঐ গানের দ্বিতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া।

নিজ দাসের দোষো ক্ষমা কর, ওগো কিশোরি।
পীতবাসো গলে দিয়ে বলে বংশীধারী॥
যদি হোয়ে থাকে অপরাধো চরণে ধরি॥

চিতেন।

পোহাইলেম্ সঙ্কটে রজনী দুখেতে।
কহিব কার সাক্ষাতে॥
বরং তুমি শুভলে জিজ্ঞাসা কর,
আমি ভ্রমিলামো বনে বনে, হারাইয়ে বাসরী॥

[কি বিচিত্র! কি বিচিত্র!]

ঐ গীতের তৃতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া!

ওহে চাতুরী করিয়ে হরি ভুলাও আমায়।
ওহে চতুরেরো শিরোমণি, শ্যাম রস রায়॥
বনে অধরের অঞ্জনো তোমার লাগিল
কোথায়॥
চিকুরেরো চিহ্ন হেরি হৃদয়ে তোমার,
তোমার কক্ষেতে কঙ্কণো চিহ্ন,
ওই যে হে দেখা যায়॥

[যদিও ইহার সমুদয় পাই নাই, তথাচ এতৎ পাঠে তাবতেই কবির কবিত্বের প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।]

মহড়া।

সখিরে গৃহে ফিরে চলো।
শ্রমে শ্রীমতীর শ্রীমুখো ঘামিলো॥
নিকুঞ্জে আজু যাওয়া না হোলো॥
ঐ দেখনা কিশোরী, বৃক্ষ শাখা ধরি,
কাতরা হোয়ে দাঁড়ালো॥

চিতেন।

কিশোরী কিশোরে, দোঁহে একত্তরে,
হেরিব সাধো ছিলো।
তাহে নিদারুণো বিধি, হোয়ে প্রতিবাদী,
সে আশা পুরাতে না দিলো।

অন্তরা।

হায় শ্রী হরি স্মরিয়ে, সুযাত্রা করিয়ে,
যেতে ছিলেম কুঞ্জকাননে।
তাহে হেন বিঘ্ন, জন্মিলো গো কেন,
আমাদের কি কপাল বিগুণে॥

[এই উৎকৃষ্ট গীতের সংপূর্ণ সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।]

ঐ গানের পাল্‌টা অথচ উত্তর।

মহড়া।

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিতো কে আছো আমারো॥
পথ শ্রান্তে নহিগো কাতরো।
হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জনো বরণো,
উদয়ে অবশো শরীরো॥

চিতেন।

অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো,
আরো না চলে চরণ।
সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে
সম্বরা যে ভারো অম্বরো॥

অন্তরা॥

হায়, সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গ ভঙ্গিমো,
বয়ানো কোরে তা কি কবো॥
লেগেছে যাহারে প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে সে ভাবো॥

চিতেন।

কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো,
না রাখে জীবনো আশ্।
তারো জলে বা স্থলে বা,
অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবারো॥

[হে ভাবুকগণ, আপনারা ভাবগ্রাহি ও মর্ম্মগ্রাহি হইয়া এই গীতের ভাব ও মর্ম্ম গ্রহণ করুন।]

মহড়া।

ও শ্রীরাধে,
তোমার প্রেমেরো প্রেমি যে হওয়া ভার।
মহিমা অপার।
তব মায়াতে ত্রিজগতো বশো,
প্যারি তুমি বশো বল দেখি কার॥

চিতেন।

গজ গামিনি রাই,
জানিয়ে তত্ত্ব জাননা আপনার।
দেখ ত্রিদশেরো পতি যে জনো,
তারে স্থাপিবারো তুমি মূলাধার॥

ঐ গীতের পাল্‌টা।

মহড়া।

রাধে তুমি কি সামান্যা নারী।
তব প্রেমে বাঁধা বংশীধারী।
দেখগো মনে বিচারি।
শ্রীদামেরো শাঁপে, সেই মনস্তাপে,
উদয় হইলে গোলোক পুরী।

চিতেন।

বৃষভানু ঘরে জন্মেছ গোরাই,
করিতে লীলা প্রচার।
রাধাতন্ত্রে শুনেছি মহিমা তোমার॥
পূর্ণ ব্রহ্মময়ী তুমি রাধে,
গোলোকো ধামের ঈশ্বরী॥

[এই দুই গীতের সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া॥

ওহে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী।
মনে ধরে না॥
মনো সে প্রেম পাসরে না,
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা।

চিতেন।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝনা।
আমার এ মনো মন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা।

ঐ গীতের পাল্‌টা মহড়া।

ওহে উদ্ধব, আমি সেই রাধার প্রেমেরি
প্রেমাধীনো।
সেই নিত্য বস্তু হে জেনো।
আরো সকলি অনিত্য, সেই সত্য সত্য,
এ তত্ত্ব তুমিতো না জানো।

[এই দুই গীতের মধ্যে কত প্রেম ও রস আছে তাহা সকলে বিবেচনা করুন। ইহার সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া

সখিরে রসেরো অলসে।
গত দিবসেরো রজনী শেষে॥
অচেতন হোয়ে সুখো আবেশে।
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে শ্যামেরে হারায়ে,
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে॥

চিতেন।

যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাণো শিহরে,
তাই ঘটেছিলো, সই।
অমনি কম্পান্বিতো হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি,
হোরে নিলো বিধি কি দোষে॥

অন্তরা।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা,
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্।
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম॥

চিতেন।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বনো অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি কোন সহচরী,
বদনে দিতেছে হুতাশে॥

[এই গীতের ভাব কৌশল ও যথার্থ গোপনীয় মর্ম্ম যিনি গ্রহণ করিবেন, তাঁহারি মন আর্দ্র হইতে থাকিবে, কি চমৎকার! রচনা প্রণালীতে স্বপ্নাবস্থার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।]

মহড়া।

মানিনী শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে।
তুমি হেয়েছো রাধে॥
ঠেকিলাম্ আজু একি প্রমাদে।
ম্লানো শশিমুখো কেনগো রাই,
হেরিগো আজু এত আহ্লাদে॥

চিতেন।

এই দেখে এলেম্ কৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে
ছিলেগো রাই, দোঁহে অতি পুলকে॥
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল,
উঠিলো কি বাদানুবাদে।

[আহা! ইহার সংপূর্ণ ও দ্বিতীয় পাইলাম না।]

মহড়া।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে!
তবে কি হবে সজনি।
লম্পটো স্বভাবো তার জানি॥
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়।
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়॥
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী।

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেতো হরি আসিবে নিশ্চয়্।
বিলম্ব দেখে তায়, হতেছে সংশয়॥
বহু শ্রমে কুসুমেরি হার্।
গাঁথিলাম্ সখি গলে দিব কার্॥
যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি।

অন্তরা।

কৃষ্ণপ্রাণা আমি আমার্, অনন্য গতি।
বোলে কি জানাবো তোমায়,
তুমি কি জাননা দূতি॥

চিতেন।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িছে ক্লেশ্॥
আসারো আশয়ে এতক্ষণ।

নারে তুলে পারতে॥

রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ ॥
মাধবো না এসে যদি, এসে দিনমণি।
[আমি ভাব গ্রহণ করিতে করিতে অস্থির হইয়াছি, ইহার স্বরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারিলাম না।]

মহড়া।

শ্যামের ঐ গুণেতে ঝোরেগো নয়ন।
সে যে বিপত্তো মধুসূদন ॥
নাম ধরে, ত্রিসংসারে, ত্রিলোকো তারণ।
মহা ঘোর বিপত্তি কালে।
যে ডাকে শ্রীকৃষ্ণ বোলে ॥
সে সঙ্কটে কৃষ্ণ তারো করেন্ দুখো নিবারণ ॥

চিতেন।

সাধে কি আমারো মনো কৃষ্ণ প্রতি ধায়।
কি গুণে বেঁধেছে, পাশরিতে নারি তায় ॥
যত লীলা করেছেন্ মাধব্।
অন্তরে জাগিছে সে সব্ ॥
বাঁচাইলেন্ ব্রজপুরী, ধরি গিরি গোবর্দ্ধন।
[ইহার আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

সখি শ্যাম্চাঁদে করগো মানা।
কোন ছলে, যেন এসে না কদম্বতলে,
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচেনা
[এতদ্ভিন্ন আর কিছুই পাইলাম না।]

মহড়া।

অকূলো পাথারেতে।
ডোবে নৌকা রাখ ওহে রাধানাথ ॥
তরি করে টলো টলো, কি হোলো,
কি হোলো, জলেতে ডুবিলো অকস্মাৎ।

চিতেন।

প্রতিদিনো হরি, এই তরি,
লোয়ে করি যাতায়াৎ।
এমনো সঙ্কটে, ঠেকিনি কখনো,
তোমারো চরণো প্রসাদাৎ ॥
[আহা! ইহার আর আর অংশ পাইলাম না।]

মহড়া

বোঝা গেল না। হরি কেমন্ তোমার করুণা।
মরিহে কি বিবেচনা ॥
দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পূরাতে কুবুজার মনো বাসনা।

চিতেন।

সকলি বিস্মৃতো, কি ব্রজনাথো,
হোলে একোকালে।
ভেবে দেখহে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়েনা ॥

শ্যাম্, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,
রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ, জো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণো কৃষ্ণ,
বোলে লোটায় ক্ষিতি

চিতেন।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি ব্রজেরো সমাচার।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা ॥
[অতি সুন্দর।]

মহড়া।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
ত্যজিয়ে এ সুখো বৃন্দাবন।
দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন ॥
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন।

চিতেন।

একেতো সহজে এ ব্রজধাম,
সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কালগুণেতে, পূর্ণ সুখো সম্পদ ॥
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
সব মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন, এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন॥

চিতেন।

মুকুলে মুকুলে, কোকিলে জাল,
করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে, গুঞ্জরে অলি সব।
আমরি আমরি, এই শোভা হেরি,
হইলে কি সবো বিস্মরণ।

মহড়া।

আজ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালি।
করিয়ে সখী মণ্ডলী॥
নাগরালি তোমার যত, কর্ব্ব হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসেরো, অবশেষো, দিব মস্তকে ঢালি॥

[এই গীতের অপরাংশ পাইলাম না।]

মহড়া।

কি কাযো আর ব্রজভুবনে।
হায়, সে নীলরতনো, দরশনো বিহনে॥
রোয়ে রোয়ে চিতো, হয় চমকিতো,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে।

চিতেন।

হায়, যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি, গোপীগণে।
সেই হোতে প্রায়, আছি মৃতবৎ,
পরাণো গিয়েছে তাহারি সনে।

অন্তরা।

হায়, কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো,
কিরূপে মিলিব তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরে, নাগরো বিনে।

চিতেন।

হায়, রজনী কি দিনো, হোয়ে জ্বলাতনো,
এই আরাধনো করিগো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো,
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে॥

অন্তরা।

হায়, যে শ্যামসোহাগে যারো অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী, সকলো স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনো
সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে॥

চিতেন।

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো,
কি কাযো এ ছারো, দেহ ধারণে।
চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ্‌ দিব যমুনা জীবনে॥

অন্তরা।

হায়, এই সে সুখেরো, গোকুলো নগরো,
হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বেরো তলো, বিহারের স্থলো,
হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে।

চিতেন।

হায়, ঘটায়ে প্রমাদো, গিয়েছে বিনোদো,
এ খেদো সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদুনন্দনো, বিপদো ভঞ্জনো.
দিয়ে দরশনো, বাঁচাও প্রাণে॥

[অতি উত্তম]

মহড়া।

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম্‌ তোমার্‌ শ্যাম চাঁদেরে॥
শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।
নিশির শেষেরো অলসে অচেতন,
কারো সঙ্গে নাহি বসনো ভূষণ,
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে॥

চিতেন।

তুমি রাধে অতি সাধে, করেছ প্রণয়।
সে লম্পটো কভু নয়, সরল হৃদয়॥
তোমারো সঙ্কেতো জানায়ে।

শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লোয়ে।
দেখিবেতো এসে রাধে, দেখাই তোমারে।
[ইহার সমুদয় পাইলাম না।]
মহড়া।
এ সময় সখা দেখা দেওহে।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ,
আমার আঁখি মনো সদাই দয়হে॥
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রায়,
হায় হায় হায় হে।
চিতেন।
গীরিস্ম, বরষা, হিমো শিশিরে, যত দুখো হে।
সব সম্বরণো কোরেছি,
কৃষ্ণ বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে॥
অন্তরা।
প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়
কোকিলেরো স্বর জাল্।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো
ডাকিহে তোমারে নন্দলাল্।
চিতেন।
জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেন,
নিদয়ো জনার্দ্দনো হে॥
মহড়া।
দীননাথ, দীন ডাকে তোমায় হে,
দীনবন্ধু বোলে।
পোড়ে অপার অকূলে॥
সেকি এম্নি দুঃখে জ্বলে।
চিতেন।
ওহে নিতান্ত সে সঁপে মন প্রাণ,
তব শ্রীচরণ কমলে।
ডাকে সে মনের ব্যাকুলে॥
অন্তরা
তব হৃষীকেশ কেশব দামোদর
মুকুন্দ মধুসূদন নাম।
বিপদে পড়িয়ে যে ডাকে তোমায়,
হেলে পায় সুখ মোক্ষধাম।
চিতেন।
ওহে তবে দীন প্রতি, এ, যে, বিপরীত,
এ কি হে তব লীলে।
না পাই কোন কালে।
মহড়া।
শ্যাম তিলেকো দাঁড়াও,
হেরি চিকণো কালো বরণ।
শ্যাম্ তিলেকো দাঁড়াও॥
এ অধীনীর মনের মানস পুরাও
সাধ মম বহু দিনের, আজ্ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও॥
চিতেন।
নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।
যায় নিশি যাক্, জানুক্, গুরুজন॥
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো॥
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষ শুনাও॥
অন্তরা।
শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান্ আমি করিব শ্রবণ॥
চিতেন।
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি কুলবতীর মন।
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥
[অতি উত্তম।]
মহড়া।
আবার ঐ দেখ বাঁশী বাজেগো কুঞ্জবনে।
শুনগো সখি, এবার্ গেল কুলবতীর কুল মান,
হবে কি,
মনে হোলে হৃদি বিদরিয়ে যায়,
বারে বারে সবো কেমনে॥
চিতেন।
একবার্ বেজে শ্যামের মুরলী গো,
সই ঐ কাল বিপিনে।
মনো সহ প্রাণো, করেছে হরণো,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥
[সমুদয় পাইলাম না।]

মহড়া।

অতি কাতরে কিশোরী কয়।
আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি, করে সবিনয়॥
যেমন্ আছিস্ তেম্নি আয়গো,
আর্ বিলম্ব নাহি সয়।

চিতেন।

মুক্তকেশী, হোয়ে আসি গৃহ বাহিরে।
সজল নয়নে সাধে, সবারে॥
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার,
এসোগো এ সময়।

ঐ গানের পাল্‌টা অথচ উত্তর।

মহড়া।

ইথে কার অসাধ কমলিনি।
বল শুনি হাঁগো রাধে, হেরিতে নীলকান্ত মণি॥
আমরাতো সব তব আজ্ঞাবর্ত্তিনী।
যাবে কৃষ্ণ দরশনে, এতো শ্লাঘা কোরে মানি॥

চিতেন।

কায় মনো প্রাণো যারো, পদে সমর্পণ।
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কখন্॥
যদ্যপি কাল্ বল তুমি, আমরা প্রস্তুতো এখনি।

[এই সাট্‌টি অতি সুন্দর। ইহার সংপূর্ণ পাইলাম না।]

মহড়া।

এসেছো শ্যাম্, কোথা নিশি জাগিয়ে।
শূন্যদেহ লইয়ে, এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে॥
এখন্ কি হইল মনে, শ্রীমতী বোলে,
কি ভাবিয়ে রাধানাথো,
এখন হোলে উপনীতো, কোথা করিলে
প্রভাতো শ্রীরাধারে তেজিয়ে॥

চিতেন।

কোন্ প্রাণে সে তোমারে, দিলেহে বিদায়।
তুমি বা কেমনে তেজে, আইলে হেথায়।
বিদরে আমারো বুকো, তব মুখো হেরিয়ে।

[এই গীতের অপরাংশ ও দ্বিতীয় পাইলাম না।]

অদ্য সখী সংবাদ এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া নিম্নভাগে কয়েকটি বিরহ প্রকাশ করিলাম।

মহড়া।

তোমার আশাতে এ চারিজন
মোরো মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্॥
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ।
দরশো পরশো, শুনিতে সুভাষো,
করিতেছে আরাধন্॥

চিতেন।

অন্যরূপো আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণে, প্রাণো তুমি জুড়াবার॥
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন্।

অন্তরা।

প্রাণ, ইহারো কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম্ বিষমো দায়॥

চিতেন।

অস্থিরো হোলো এ চারি জনে।
প্রবধি প্রবধো নাহি মানে॥
ইহার বিহিতো, যে হয় ত্বরিতো,
কর প্রেয়সি এখন্।

অন্তরা।

প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো।
এতো চিরো পদো নহে জানো॥

চিতেন।

এ তুমি শুনেছো জানতো প্রাণো।
অনুগতেরো রাখ সম্মানো॥
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি কর,
সুধা বিতরণ॥

অন্তরা।

প্রাণ, এ রূপো আশ্বাসো কথায়।
বল কি ফল আছে তায়॥

চিতেন।

প্রতি দিনো আসি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয়ো এ আশা বাই॥

তুরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,
আরো না সহে যাতন।

[চমৎকার, চমৎকার]

ঐ গীতের দ্বিতীয় অথচ উত্তর।

মহড়া।

প্রাণ স্থিরো নীরে বেঁধে প্রস্তরো।
তুমি চঞ্চলো কেন এতো।
যাতে জনমে তব মনো প্রীতো ॥
তাই কি না হবে, বুঝ নাহে ভাবে,
আছিতো অনুগত

চিতেন।

আয়াসো পেয়ে হয় যে সুখো লাভ্।
সেই যে সুখেতে সুখো প্রভাব্ ॥
দেখো তার্ প্রমাণো, চাতক্ নব ঘনো,
ব্যাভারে কি কি মতো।

[এই দুইটি গানে কবি অতি বিচিত্র কবিত্ব ও রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার সংপূর্ণ পাইলে পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করত কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব! আমরা সংগ্রহের নিমিত্ত সাধ্যের ক্রটি করি নাই, বোধ করি ইহার পর কোন না কোন মহাশয় কর্ত্তৃক আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে।]

মহড়া।

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশায় ॥
তুমিতো আমারি আছো গিয়েছো কোথায়।

চিতেন।

সুখে থাকো মনে রাখো, এখন্ এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যত ভালোবাসো ভাবে বুঝা যায়।

ওহে, তোমারো ও গুণো প্রাণো,
থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে, লাগে কারো গায় ॥

চিতেন

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর।
হেন অসাধার, গুণ আছে কার ॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়।

যদি নারী হোয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ
তোমার্ মতন্ রসিক্ পেলে,
পূরে তারো আশ ॥

চিতেন।

যে রূপো সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, সেই সে জানে ॥
এক মুখে তব গুণো, কয়ে না ফুরায়।

ওহে যত দিনো, দেহে প্রাণো, থাকিবে আমার
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার ॥

চিতেন।

তুমি যেমনো সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষো লেশ ॥
তোমারো রীতো চরিতো জাগিছে হিয়ায়।

অন্তরা।

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি তব, কি সরলো মন্ ॥

চিতেন।

রঘুনাথো কহে কেন ও বিধুমুখি।
কি দোষো দেখি হোয়েছো দুখী ॥
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছো উহায়।

[কি আশ্চর্য্য সুকৌশল সংযুক্ত সুব্যঙ্গ পরিপূরিত সুধাময় শব্দে এই গীতটি বিরচিত হইয়াছে।]

মহড়া।

যৌবনকালে যদি নারী, বুঝিতো পীরিৎ।
তমোগুণে না হইত পূরিৎ ॥
পুরুষেরো হইত বাধিৎ।
তাবতো হইত প্রেমে, সুখো সমুচিৎ ॥

চিতেন।

সময়ে প্রেমেরো নাহি, করে আকিঞ্চন।
করমে কখন্, যায় যৌবনো যখন্॥
সে প্রণয়ে হয়ো কিনা, নানা বিঘটিৎ।

[আহা মরি "যৌবনকালে নারী যদি বুঝিতো পীরিৎ" আহা! আমি সেই কবির চরণে প্রণাম করি, যে কবির রসনা হইতে এই চমৎকার উক্তি উক্ত হইয়াছে।]

মহড়া।

বুঝিছি মনেতে।
রমণীর প্রেম কেবল্ ধন।
মিছে মিছে সে মিলন॥
তাদের ধন লোয়ে কথা,
পীরিতি বা কোথা, কাকস্য পরিবেদন।

চিতেন।

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ।
তবু কেমন চরিতো, তাহে কদাচিতো,
নাহি পাওয়া যায় মন॥

অন্তরা।

রূপে কাম্ সদৃশো, পুরুষো, অর্থ হীন যদি হয়।
সেই রসিকো জনে, নারী নয়নে,
না ফিরে চায়॥

চিতেন

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়,
যেচে তারে সঁপে যৌবন।
তাহে কুৎসিতো কুজনা, নাহি বিবেচনা,
স্বকার্য্য করে সাধন॥

অন্তরা।

কেবল্ অর্থেতেই লোভো, মৌখিকো সে সবো,
কহে যে প্রেমো কথন।
পীরিতি রসেরো, রসিকো নারী,
সহস্রে মেলে একজন।

চিতেন।

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,
হোলে হয় স্বর্ণ ভুষণ।
তাদের্ সেই হয় প্রিয়তমো, সেই মনোরমো,
ধনদে তোষে যে জন॥

অন্তরা।

যার স্বামী অকৃতী,
তারে সে যুবতী নাহি করে মান্যমান।
বলে ধিক্ থাক্ পিতা মাতারে,
এমন্ দরিদ্রে যে দিয়েছে দান॥

চিতেন।

যদি কপালোগুণে পুনো সে জনে,
অর্থ করে উপার্জ্জন।
তখন্ হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
কোরে হর আরাধন॥

অন্তরা।

দেখে অর্থ আছে যারো, সদা নারী তারো,
করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদপদ্মে স্থানো, দিও ওহে প্রাণো,
আমি করিব সহগমন॥

চিতেন।

পূরাতে বাসনা, ললনা ছলনা,
কথাতে করে কেমন্।
করে আগেতে যেমনো, না থাকে তেমনো,
হোলে পরে পুরাতন॥

[সমুদয় পুরুষোক্তি বিরহের মধ্যে এই বিরহটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।]

মহড়া।

এত দুখো অপমান। সাধেরো পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, নূতনো আগুনো,
উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে,
কোরে ছিলেম পীরিতি!
আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হোলো,
সদা ঝোরে দুনয়ান॥

[এই গানের সমুদয় না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম।]

মহড়া।

পীরিতের ও কথা, কোয়েতো ফুরায় না।
প্রাণ, যত কও ততই, উপজে কতই,
পরীসীমা হয় না॥

[হায় কি পরিতাপ! এই গীতের আর কিছুই পাইলাম না, যাহার চরণের এত শোভা, তাহার মুখের মাধুরী কতই হইবে বলিতে পারি না।]

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।
এমন্ প্রেমের সাধ্, করে যেই জন॥
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

চিতেন।

যেখানেতে না রহিল, মানি জনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান্, তারে সঁপে প্রাণ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক ভাজন।

অন্তরা।

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বলাতন।

চিতেন।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জনো তাহায়, ফিরে নাহি চায়॥
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ।

অন্তরা।

সখি পীরিতি পরম ধনো জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারেখার॥

চিতেন।

সামান্য খেদেরো কথা একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই॥
ঘরে পরে আরো তারে করয়ে লাঞ্ছন।

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই।
এমনো প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই॥

চিতেন।

হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি॥
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন।

যার স্বভাবো লম্পটো সই তারে কি এ বোধ।
আছে, কি করিবে তব, প্রেম অনুরোধ॥

চিতেন।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন।
এরূপো মিলন্, না দেখি কখন॥
রঘু বলে কোথা মেলে, দুজনে সুজন।

[উত্তম, উত্তম।]

মহড়া

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,
তা কি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন্ তোমারে॥
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের মলিনো,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।

চিতেন।

নিম্বতরু যদি রোপনো হয়ো,
শত ভারো শর্করে।
সে যে মিষ্ট রসো, না হয়ো কথনো,
নিজ গুণো প্রকাশো করে॥

[এই গীতের সমুদয় পাইলে কি সুখের ঘটনা হইত।]

মহড়া।

তুমি কার্ প্রাণ, করি দেহ শূন্য এলে বাহিরে।
হেরো যেরূপো, বাসনা করে॥
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ,
সেইখানে রাখি তোমারে।

চিতেন।

পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জ্ঞানো হয় প্রাণ তেমতি॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ,
পাইতেছে তব অম্বরে।

[আহা, আহা এই কবিত্ব গুণে যাবজ্জীবন বদ্ধ রহিলাম।]

মহড়া।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥

শুনেছ কখনো, জলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে।

চিতেন।

প্রতিপদের্ চাঁদো, হরিষে বিষাদো,
নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,
তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে॥

[এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই, যিনি ইহার সংপূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিবেন। "তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে" একথার তুল্য নাই, মূল্য নাই, অতি অমূল্য ধন।]

মহড়া।

এই ভয় সদা মনেতে॥
বিচ্ছেদো বা ঘটে পীরিতে॥
হোতেছে এখনো, নূতন যতনো,
কি হোলে কি হবে শেষেতে।

চিতেন।

প্রাণ নব অনুরাগে, পীরিতি সোহাগে,
আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো,
পাই সদা দেখিতে॥
হেন ভাবো যদি, থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে।

[উত্তম।]

[১৬] মহড়া।

রহিলনা প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়॥
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণো যায়।

চিতেন।

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমার সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোকো গঞ্জনায়॥

হায় কত জনে কত, বলেছে নাথো,
মোরে থাকি মরমে।
বদনো তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে॥

চিতেন।

হায়, কি পুরুযো নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়॥

অন্তরা।

হায়, হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে
সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা তথাপি লোকে জানে॥

চিতেন।

হায়, পীরিতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভে মম অঙ্গে রয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসে,
ব্যাপিলো জগতোময়।

["মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই গান কি মধুর মধুর।]

৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস *

কলিকাতার ঠঠনে নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি সাধারণের নিকট "লোকেকাণা" নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার নাম না জানেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। ইনি পেসাদারি পাঁচালীর দল করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁরি দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কারণ ইনি অতি সুকবি ছিলেন। তৎকালে এই বিশ্বাসের অপেক্ষা রহস্য-ঘটিত কবিতা রচনা বিষয়ে অপর কেহই পারদর্শী ছিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কবি ছিলেন এমত নহে। সংগীত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, খেয়াল, ও ধুরপৎ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত পাঁচালীর সুর প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চর্য। এইক্ষণকার পাঁচালী সম্প্রদায়দিগের তৎসমুদয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে, তাহাই লইয়া তাবতে নাড়া চাড়া করিতেছেন!

বিশ্বাস অতিশয় বহ্বক্তা ছিলেন, ইনি যথার্থই একজন উপস্থিত বক্তা। ভাঁড়ামি ব্যাপারে "গোপাল ভাঁড়" হইতে বড় ন্যূন ছিলেন না। উপস্থিত মতে ইনি যে সকল কথা কহিতেন, ও যে যে কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন তচ্ছ্রবণে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাবতেই কুতূহলে পরিপূর্ণ হইতেন হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিত। অদ্য যাঁহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, শোকে অত্যন্ত কাতর, চক্ষের জলে পৃথিবী আর্দ্র হইতেছে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের মুখ নির্গত কৌতুকজনক একটি কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ অমনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক হাস্য আস্য হইতেন। গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিশ্বাস অতি সুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা ছিলেন।

ইনি সকলেরি প্রিয় ছিলেন, ধনি মাত্রেই ইহাঁকে স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন ও এবং অনেকেও ভয় করিতেন। ভয় করিয়া সর্ব্বদাই অর্থ দিতেন, ইহার কারণ, ভাঁড়ের মুখ, কি জানি, কখন কি বলিয়া বসে, এই ভাবিয়াই ধন দানে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিয়া রাখিলেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস কৌতুক ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিশ্বাস! তোমাকে লোকে লোকেকানা কেন বলে?" লক্ষ্মীকান্ত তখনি এই উত্তর করিলেন, "মহাশয়! যে ব্যক্তি বলে লক্ষ্মীকান্ত, সেই বলে বিশ্বাস। আর যে গুওটা বলে লোকে, সেই বলে কাণা।"

এই নগরস্থ কোন প্রধান মান্য ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক এক দিন হাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "বিশ্বাস! তোমাদের বামুণ কায়েতের মধ্যে হাজার হাজার বেশ্যা দিবারাত্র রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে, কেমন আমারদের স্বোণারবেণের ভিতরে একটি বেশ্যা দেখাইতে পার?" বিশ্বাস তদ্দণ্ডেই অম্লানমুখে উত্তর দিলেন "মহাশয়! আপনাদের স্বোণারবেণের জেতের কথা কেন কহেন? স্বোণার জাতি, জাতি বৈষ্ণব, ভেকে কায্ কি"।

অপিচ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস লক্ষ্মীকান্তকে আপনার বাগানে বন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস উদ্যানে গিয়া উক্ত বাবুর সহিত এরূপ করিয়া উদর ভরিয়া আহার করিলেন, যে, পাতে শাকান্নও রাখিলেন না। বাবুর বাবুআনা আহার, পত্রে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই পড়িয়া রহিল, আহারান্তে যখন উভয়ে আচমন করেন, তখন ভৃত্য পত্র ফেলিয়া দিল, বিশ্বাসের পাতে কিছুই নাই। অন্য জন্তু দূরে থাকুক, বিশ্বাসের ভোজনে পিপীড়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, আশ্বাস করিয়া আইলে তাহাকে নিশ্বাস ছাড়িয়া তনু ত্যাগ

* সংবাদপ্রভাকর, শনিবার ১ মাঘ, ১২৬১ সাল। ইং ১৩ জানুআরি ১৮৫৫।

করিতে হয়। বাবুর পাতে সমস্তই রহিয়াছে, একারণ কুক্কুর আসিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বাবুজী শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ছি, বিশ্বাস! দেখ তোমার পাতে কুক্কুরেও আহার করে না"—এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণেই এই সদুত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ কুক্কুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না।"

হে পাঠকগণ! এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি আপনারা উক্ত ব্যক্তির বাক্ পটুতা ও অত্যাশ্চর্য্য সদ্বক্তৃতা বিষয়ে কি রূপ প্রশংসা করিবেন?—প্রস্তাব মাত্রেই বিনা চিন্তায় তখনি এমত সদুত্তর প্রদান করা কি রূপ কঠিন ব্যাপার তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। যাঁহারা এই ব্যক্তিকে লইয়া সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া নানাবিধ বাক্ কৌশল পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

শোভাবাজার নিবাসী পাঁচালীওয়ালা ৺গঙ্গানারায়ণ নস্কর ইঁহার প্রতিযোগী ছিলেন, সেই নস্কর কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। এক দিবস কোনো সভায় উভয়েই সভাস্থ হইয়াছেন, বিশ্বাস একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া পায়চারি করিতেছেন, এক স্থানে স্থির হইয়া উপবেশন করেন নাই। নস্কর তাহা দেখিয়া ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কহিলেন "কেমন হে বিশ্বাস! বড় যে জোয়ারের জলে ভাসিতেছ"—বিশ্বাস উত্তর করিলেন, "সাবধান, সাবধান, দেখো যেন তোমার তর্পনের কোশার মধ্যে না উঠি"॥

এক দিবস কোন সভায় বসিয়া আছেন, এমতকালে নস্কর আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে "কাঁধে বাড়ি ধ" করিয়া বসিলেন, নস্কর কথোপকথনে অন্য মনে রহিয়াছেন, ইহার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠিয়া পশ্চাদভাগে আসিয়া নস্করের মস্তকে "তেপুঁটুলে শ" করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বাসকেই জয়ধ্বনি প্রদান করিলেন।

এই প্রকার দোষাশ্রিত ও দোষহীন রহস্য ও কৌতুকের কথা কত আছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

লক্ষ্মীকান্ত কেবল কৌতুকের কবিতায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়াছেন। পরমার্থ ও ভক্তিরসের ব্যাপার যাহা রচিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার যোগ্য নহে। তন্মধ্যেও কেবল হাস্য পরিহাসের কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা।

"গিরি কই আমার আনন্দময়ী, আসবে কতক্ষণে।
যত বামুন্ করে ছুটাছুটি,
ঘট্ নিয়ে পেতেছে ঘাঁটি,
বুঝি কার চণ্ডী শুনে আমার চণ্ডী, আট্‌কেছে কোন্‌খানে॥"

তথা।

"ভজ্‌বনা ভবানী বাণী, এবার্ খুব মনে দিয়েছি পাড়া।
যত গুপ্ত কথা ব্যক্ত কোল্লে, ব্যাস্ নামে সেই বামুন্ ছোঁড়া॥" ইত্যাদি।

শ্লেষ ও খেউড় বর্ণনায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহাতে আশ্চর্য্য শক্তি ও চমৎকার ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে, তাহার অধিকাংশই অতিশয় অপবিত্র শব্দে বিন্যস্ত, একারণ কোন মতেই পত্রস্থ করা যাইতে পারে না। সেই সকল সুকৌশল সূচক উক্তি যদি কোন উত্তম বিষয়ে উক্ত হইত তবে কি সুখের বিষয় হইত। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই পাঠ করিয়া আনন্দিত হইতেন। ইনি শতরঞ্চ খেলার পাঁচালীতে যদ্রূপ

অদ্ভুত কবিত্বকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ আমরা প্রায় শ্রবণ করি নাই। পাশা ও ঘুড়ি খেলার কবিতা গুলীনও অবিকল তদ্রূপ। কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ অসাধু শব্দ প্রয়োগ থাকাতে প্রকাশ করা বিধেয় হইল না। কেবল শতরঞ্চের পাঁচালীটি সংগ্রহ করিয়া পশ্চাদ্ভাগে উদিত করিলাম, এতদ্দৃষ্টে সকলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। যদিও ইহাতে অপবিত্র ভাষাই অধিক আছে, কিন্তু কবির অসাধারণ কবিতার ব্যাপার সর্ব্ব-সাধারণের সুবিদিত করণ কারণ প্রত্যাশা-পরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

অধুনা লক্ষ্মীকান্তের বংশে বংশধর কেহই নাই। "বৈদ্যনাথ বিশ্বাস" নামে ইহার এক পুত্র ছিলেন, তিনি পিতৃদল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি না হইতেই প্রাণ বিয়োগ হয়। দর্পনারায়ণ নামে বিশ্বাসের একটি দৌহিত্র ছিল, সে ব্যক্তিও অনেক দিন পর্য্যন্ত দল রাখিয়াছিল, পরে জগদীশ্বর তাহাকেও পরলোকগত করিলেন। উক্ত কবি প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন, ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। যথা।

শতরঞ্চের পাঁচালী। পুরুষ উক্তি গীত।

প্রেম কোরে মজালে আমায়,
হায়, হায় হায়, পরাধীন মন।
হায় মন কি করিলে, মিছে মজায়, ভুলে গেলে,
তার উপাসনা কর, যে নহে আপন॥
এস্ক* দূতের আশায় ভুলে,
খেল্‌তে গেলে জিৎবে বোলে,
কলে বলে জিতে নিলে, জান্‌লেনা কারণ।

ছড়া। স্ত্রীলোকের বল।

জুল্ ১, কটাক্ষ ২, পেক্‌না ৩,
হাসি ৪, কব্যাটা ফাঁসুড়ে।
বাক্য ৫, কুহক্ ৬, হাট্ ৭,
এই আট্ বোড়ে॥
মজাড়ে আর কাণ, রূপ, এই দুটো ঘোড়া।
ছেনালী, চাতুরী নামে, নৌকো এক যোড়া॥
যৌবন, লাবণ্য, দুটো হাতিকে বাখানি।
সোয়ার্ তাতে, মোহিনী রাজা,
কাম রূপ মন্ত্রিণী।

পুরুষের বল।

কর্ম্ম ১, ক্রিয়া ২, লজ্জা ৩, শীল ৪,
ছিল আমায়, বেড়ে।
সংসার ৫, ধর্ম্ম ৬, কুল্ ৭, মান ৮,
এই আট্ বোড়ে॥
গাম্ভীর্য্য, গৌরব, নামে, ছিল দুটো ঘোড়া।
নিবৃত্তি আর ভয়, নামে, নৌকা এক যোড়া॥
ধৈর্য্য আর জ্ঞান রূপ, এই দুটো হাতি।
প্রাণ রাজা সোয়ার মন্, মন্ত্রিণী সারথি।

খেলা।

জুল্ বোড়ে, টিপে দিলে, কর্ম্ম বোড়ে,
মেরে নিলে, ক্রিয়া বোড়ে আল্‌গা হোলো।
তার্, কটাক্ষ বোড়ের্, ঘায়, ক্রিয়া বোড়ে,
মারা যায়, ক্রমে বিবদ্ধ হইতে লাগিলো॥
পরে, তার হাসি বোড়ে, হেসে হেসে,
আমার্ লজ্জা বোড়ে, নাশে।
তার্ পেক্‌না বোড়ে, কল্লে আগুয়ান্।
দারুণ, পেক্‌নার ফন্দি, শীলতা করিল বন্দি,
শেষে শীলের বধিল পরাণ॥
পরে, তার বাক্য বোড়ে, এলো,
তাতেই আমার্ ধর্ম্ম গেলো,
কুহক্ বোড়ে, লজ্জা বোড়ে লয়।
তার, ঠাট্ বোড়ে, কুল মারে, ঠমকেতে,
মান্ হরে, এই ষোলো বোড়ের পরিচয়॥
তখন্ কাটাকাটি, ঝুটোপুটি, দেখিয়ে ঝকড়া॥
মজাড়ে আর কাণ, বেরুলো,
তুর্কী এক যোড়া॥
তখন্ বিঘটিত, সমরে, প্রাণ,
রাজা, ভয় পেয়ে।

* এস্ক। আসক্তি অর্থাৎ আসক।

মন্ মন্ত্রিকে সম্মুখে রেখে,
পশ্চাতে লুকায় গিয়ে।
তখন, তার ছেনালী নৌকাতে,
মন্ মন্ত্রি চাপা দিলো।
আবার, কাণ্ ঘোড়া, কোড়া করি,
আগুয়ান্ করিলো।
কাণ্ ঘোড়া লোয়ে ছুঁড়ী, কল্লে এম্নি নক্সা।
প্রতি হাত্, সর্ব্বনাশী, প্রেমে দিল রোক্সা॥
পরে, তার মোলো বল, প্রবল হইলো।
কিস্তিতে কিস্তিতে, প্রাণ্ রাজা, নীচে গেলো॥
তখন্, নৌকা, ঘোড়া, হাতি, বোড়ে,
মন্ত্রির ঘর ছেড়ে।
পাঁচ্টা ঘর আল্গা কোরে,
রাজাকে রাখ্লে বেড়ে॥
তখন্ র্ঁাড় উপ্রো উপ্রি,
পাঁচটা কিস্তি দিলে।
আমার প্রাণ্ রাজাকে,
কয়েদ্ কোরে, পঞ্চরং করিলে॥

যদিও এই কবিতায় ছন্দের ও মিলের বিস্তর দোষ আছে, এবং লিঙ্গ ঘটিত উক্তির দোষ দৃষ্ট হইতেছে এ দোষ যথার্থই দোষ বটে, তাহা স্বীকার করিব; কিন্তু যাঁহারা পাঁচালী রচনা করেন তাঁহার ছন্দ ও মিলের দোষ ও বড় ধর্ত্তব্য করেন না, সুতরাং এই দোষেই আর আর দোষ ঘটিয়া থাকে। ফলে প্রাচীনকালে এরূপ দোষ যদ্রূপ ছিল, বোধ করি এইক্ষণে আব তদ্রূপ নাই ক্রমে ক্রমে খণ্ডন হইয়া আসিতেছে। নব্য রচকেরা ভব্য হইয়া সংশোধন করিতেছেন কিন্তু তাহাই বা কোথা? ইদানিং পেসাদারী দলে ও সৌখিন বাবুদিগের দলে যে সকল পাঁচালী রচিত হইয়া থাকে, তাহাতেও লিঙ্গ, মিল ও ছন্দের বিস্তর গোলযোগই দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল কবি পাঁচালীর ছড়া দেন, তাঁহারা ছড়া দেন, কি ছড়া দেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা ছন্দ ও মিল প্রভৃতির দোষ না ধরিয়া এই স্থলে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম, যেহেতু তিনি খেলার আবিকল প্রণালী ও মর্ম্ম রক্ষা করিয়া রূপক ছলে নায়ক নায়িকার প্রণয়ঘটিত উভয় দলের বল ও চাল্ এবং খেলার জয় পরাজয় যে প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করা কোন্ তুচ্ছ, সর্ব্বস্ব দান করিলেও হানি বোধ হয় না, বরং আহ্লাদ জন্মে।

অপিচ উক্ত বিশ্বাসের বিরচিত একটি গানের কিয়দংশ পত্রস্থ করিলাম, সকলে দৃষ্টি করুন।

যথা।

বাবুজীগো দম্ ফাটে মরি প্রাণ যায়॥
এক বিধির বুদ্ধি মোটা, পদ্মের মৃণালে কাঁটা,
রেস্ত শূন্য নীল্মণি হালদার, দুখো কব কায়।
এই বিধির বিবেচনা, সাগরের জল লোণা,
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস্ কাণা, ঠাকুরকে পিরিলি দায়॥

[যদি কোন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশ্বাসের প্রণীত শ্রবণযোগ্য শব্দ সংযোজিত বিশ্বাসের কবিতা প্রেরণ করেন, তবে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।]

ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র

পাঠ : সংবাদ প্রভাকর ১২৬১ সাল

জিলা রাজসাহী। ৩০ অগ্রহায়ণ, ১২৬১

সম্পাদক মহাশয়! সংপ্রতি আমি কলিকাতা নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকাযোগে জলপথ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজসাহী উপস্থিত হইয়াছি। অধুনা পদ্মানদীর ক্রমে ক্রমে পরাক্রমের হ্রাসতা হইতেছে। মধ্যে মধ্যে চর বিরচিত হইতেছে, জল এ পর্য্যন্ত সংপূর্ণরূপে নির্ম্মল হয় নাই। বোয়ালিয়ার নীচে এবারে পূর্ব্ববৎ স্রোতঃ না হওয়াতে জিলার লোকেরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, কারণ এই ঘটনায় ভাঙ্গনের অনেক হ্রাসতা হইয়াছে। আমি অষ্টাহকাল দিবারাত্র বড় কুটির ঘাটে কাপ্তেন সাহেবের বাটীর নীচে নৌকার উপর বাস করিতেছি, ইতিমধ্যে কোন দিবস ক্ষণকালের নিমিত্ত একটি ধাপ ভাঙ্গিতে দেখিলাম না। এ বৎসর এ সময়ে পূর্ব্ববৎ ভাঙ্গন ধরিলে কাপ্তেন সাহেবের মনোহর কুটি ও রম্য উদ্যান, ঘোড়ামারার বাজার—কমিস্তনরের প্রধান কেরাণী কমল বাবুর বাসা, কালেক্টরের প্রধান কেরাণী শিব বাবুর বাসা, ডেপুটী কালেক্টর মথুর বাবুর বাসা, সদর আমিন গঙ্গাচরণ বাবুর বাসা এবং গবর্ণমেণ্টের স্কুল বাটী প্রভৃতি এতদিনে কোথায় মুখে করিয়া লইয়া যাইত, বোধকরি পদ্মাদেবী খরতর তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিলে নারদকে উদরস্ত করিয়া বড় কুটিকে কুটি কুটি করিয়া ভাসাইতেন। তাহা হইলে জিলার দফা একেবারেই রফা হইত। ফলে সংপ্রতি প্রবাহের ও তটের যদ্রূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে হঠাৎ তাদৃশ সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, তবে আগামি বর্ষায় আবার কি হয় বলিতে পারি না, কিন্তু সম্মুখে তীরের উপর নীরের ক্রোড়ে যেরূপ চটান পড়িয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনেকাংশেই মঙ্গল বোধ হইতেছে, তাহাতে ভাঙ্গা বন্ধ হইলেও হইতে পারে।

এবারকার অতি বৃষ্টিতে পদ্মা অত্যন্ত প্রবলা হওয়াতে অনেকের ঘর, বাটী, পথ, ঘাট ও স্থল সকল জলে প্লাবিত হইয়াছিল, স্থানে স্থানে অদ্যাপি সে জলের শেষ হয় নাই। খানা ডোবা সমুদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এ জন্য ভূমি অত্যন্ত আর্দ্র হওয়াতে মধ্যে প্রায় একমাস জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য হইয়াছিল, তাহাতে বহু প্রাণির হানি হইয়াছে, এইক্ষণে জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া আসিতেছে।

সংপ্রতি এখানে যত লোক লোকান্তরিত হইয়াছে তন্মধ্যে এমত বিশেষ ব্যক্তি কেহই নাই, যাহার নাম উল্লেখ করিলে সাধারণে অবগত হইতে পারেন, কেবল এক মৈত্র বাবু শেষাবস্থায় কীর্ত্তির দ্বারা অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, এই মৃত ব্যক্তির নাম "লোকনাথ মৈত্র" ইনি অন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা ভাগ্যধর হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি ও অন্য প্রকার বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি অশেষবিধ অপকর্ম্মে রত থাকাতে ও নিয়ত পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার ইষ্ট সাধন করাতে এখানকার কেহই তাঁহার অনুরাগ করেন না। এমত জনরব যে আসন্নকাল দেখিয়াও কোন মনুষ্য বিষণ্ণ হয়েন নাই, বরং চিত্তকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মৃত লোকের ব্যবহারবিষয় অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন করে না, এই মৈত্র দুইটি মহতী কীর্ত্তি করিয়াছেন, তদুপলক্ষে তাঁহার সুখ্যাতি ঘোষণা অবশ্যই করিতে হইবে। ইহার প্রথম কীর্ত্তি রামপুরে "লোকনাথ স্কুল" নামে এক স্কুল এবং দ্বিতীয়

কীর্ত্তি কাশীধামে "অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা"। ঐ স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত মাসিক ১০০ একশত মুদ্রা আয়ের উপযুক্ত ভূমি নির্দ্দিষ্টরূপে দান করিয়াছেন। তদ্দারা অনায়াসেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাশীতে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহাতে কয়েকজন লোক প্রতিপালিত হইতেছে এবং প্রতি দিন ১০০ একশত জনের অধিক মানুষ উত্তমরূপে আহার প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইতেছে। কীর্ত্তি কর্ত্তার এই দুই কীর্ত্তি পৃথ্বীব্যাপিকা হইবে তাহাতে সংশয় কি?

মৈত্র বাবুর শ্রাদ্ধকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, কিন্তু শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই বিষয়ের শ্রাদ্ধ হওনের উপক্রম হইয়াছে, কারণ ইনি আপনার "উইল মত" অর্থাৎ ইচ্ছামত উইল করাতেই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইহার তিন স্ত্রী, কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়াকে একেকালে বঞ্চনা করত কেবল কনিষ্ঠাকে যথা সর্ব্বস্বের অধিকারিণী ও কর্ত্রী করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারি উপর পোষ্যপুত্র গ্রহণের ভারার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে প্রথমা ও দ্বিতীয়া উভয়ে একত্র হইয়া সেই উইলের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে যথারীতি ক্রমে আদ্দাস উপস্থিত করিয়াছেন, আবার মৃত মহাত্মার কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী স্বতন্ত্ররূপে আর এক অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। এই প্রকারে নালিস হইলে আর কিছুই থাকিবে না, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই উচ্ছন্ন যাইবে, অধুনা যদি পরস্পর ঐক্য হইয়া ঘরে ঘরে মীমাংসা করত ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন তবেই মঙ্গল, বিষয়টি রক্ষা পায়। নচেৎ কাঁথা ঝুলি প্রভৃতি সমুদয় উকিল, মোক্তার, সাক্ষি ও বিবাদ বাঞ্ছিত বঞ্চকব্যূহের উদরায় স্বাহা হইবেক।

কি পরিতাপ। মৈত্র মহাত্মা জীবিতাবস্থায় যাহা করিবার তাহাই করিয়াছেন, মরণ সময়ে সত্যকে স্মরণ করিয়া একবারও ধর্ম্মপানে দৃষ্টি করিলেন না?

সংপ্রতি কয়েক দিবস "লোকনাথ স্কুলে"র ছাত্রদিগের পাঠের বিষয়ে অত্যন্ত গোলযোগ হইতেছে, যেহেতু প্রধান শিক্ষক সাহেবটি ছুটি লইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় শিক্ষকটি কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়াছেন। সুতরাং শিক্ষক না থাকিলে কেবল "মনিটরে"র দ্বারা কি প্রকারে প্রতুলরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? অধুনা যাঁহারা এই স্কুল কমিটির অধ্যক্ষতার পদে অভিষিক্ত আছেন, এ বিষয়ে তাঁহারদিগের বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।*

এই ক্ষণে বোয়ালিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কর্ম্ম অতি উৎকৃষ্টরূপে সমাধা হইতেছে, শিক্ষকগণ এবং পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় উপযুক্ত ও সজ্জন, শিক্ষা প্রদান কল্পে পরম পারদর্শি, ইহাতে সুনীতিক্রমে সদনুশীলন সহযোগে ছাত্র মাত্রেই সুপাত্র হইবে তাঁহাতে সন্দেহাভাব। যিনি Head Master অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক তিনি হুগলি কলেজের ছাত্রীয় বৃত্তিধারি পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক, ইহার বৈচক্ষণ্য, সৌজন্য এবং নৈপুণ্যের ব্যাপার দেখিয়া আমি সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। অপরাপর শিক্ষকেরা তাবতেই কার্য্য নিপুণ, সুশীল ও সুশিক্ষক। পণ্ডিত নানা শাস্ত্রমণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র ধারণ করেন, এবং উপদেশ প্রদানে তৎপর। আপাততঃ ইংরেজী শিক্ষা যদ্রূপ হইতেছে বাঙ্গালা ভাষা তদনুরূপ হইলে আরো অধিক সুখের নিমিত্ত হইতে পারে। ইহাতে আমি পণ্ডিতের দোষ দেখিতে পাই না, কারণ পূর্ব্বে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি "ফিরিঙ্গি" বঙ্গভাষার প্রতি কিছুমাত্র আদর করিতেন না; সুতরাং তৎকালে তাঁহার অনাদরে ছাত্রেরাও আলোচনায় অনুরত হয় নাই, এইক্ষণকার প্রধান

* সংবাদ প্রভাকর। ২০ পৌষ ১২৬১

মহাশয় নিজে বাঙ্গালি, ইনি জাতীয় ভাষার অনুশীলনে অবশ্যই অনুরাগী হইবেন। যাহাতে বালকেরা উত্তমরূপে পড়িতে, শুদ্ধরূপে লিখিতে ও রচনা করিতে পারে, সে পক্ষে যথাবিহিত মনোযোগ করিবেন। আমি এ বিষয়ে তাঁহার প্রতি যদ্রূপ প্রত্যাশা করি, ভবিষ্যতে যদি তদ্রূপ দেখিতে না পাই, তবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইব এবং প্রধান মহোদয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য ও অমনোযোগ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ্য পত্রে আক্ষেপ প্রকাশ করিব। সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা সত্বে যদি বিষয় বিশেষের ব্যাঘাত হইয়া সুফল সিদ্ধ না হয়, তবে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের ব্যাপার আর কি আছে?—ইহারদিগেরি বা দোস কি? কারণ এ পক্ষে সুদৃষ্টির বিষয়ে কমিটির কমিটি দেখিতে পাই। মেম্বরগণ সর্ব্বদা তত্বাবধারণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ না করিলে কোন মতেই সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না।

গত ২৬ অগ্রহায়ণ বেলা দশ ঘটিকার পরে "লার্ড বিসাপ" সাহেব এখানে আসিয়া বোয়ালিয়ার স্কুলে গমন করত ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি হাস্য বদনে মধুর বচনে বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া বিদায় হইলেন।

এইক্ষণে এখানকার কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব "সরকুটে" গমন করিয়া নানা স্থানে শিবির স্থাপন করিতেছেন। কালেক্টরের অনবস্থান জন্য সুযোগ্য ডেপুটী কালেক্টর বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালেক্টরি আফিসের চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইনি অতি সজ্জন ও কর্ম্মদক্ষ। কালেক্টর সাহেব ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার ভাতা রহিত করিয়াছেন, এই ভাতা বন্ধ হওয়াতে বোধ হয় তাঁহাকে শীঘ্রই আপনার হাতার মধ্যে মাথা ঢুকাইতে হইবে।*

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোম্পানির ভাতায় পুষ্ট হইতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্র হাতায় প্রবেশ করিতে হইবে না। বিচক্ষণ প্রধান সদর আমীন বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় আপাততঃ শান্তি সম্বন্ধীয় সমুদয় চলিত কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় স্বীয় কর্ম্মে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! কি আশ্চর্য্য! জিলার সিবিল সাহেবেরা যৎকালে মফঃস্বলে গমন করেন, তৎকালে সরকার হইতে খোরাকি পাইয়া থাকেন, হাতার বাহিরে মাত্র বাড়াইলেই খাতার পাতা খুলিয়া ভাতার টাকার অঙ্কপাত করিয়া বসেন, কিন্তু এই ধর্ম্মাবতারেরা ধর্ম্মের প্রতি একবারো দৃষ্ট করেন না। কেননা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া পাকেট পরিপূর্ণ করেন। কিন্তু এদিকে নীল ও রেসম প্রভৃতির কুটির মধ্যে প্রবেশ করত কুটিয়াল সাহেবদিগের অন্নধ্বংসিয়া উদর পূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন না! তাঁহারা কি এই কর্ম্ম ন্যায়সঙ্গত কর্ম্ম করিতেছেন? সিবিলের মধ্যে প্রায় অনেকেই সরকুটে আসিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি কোন কোন স্থানে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি ও সকলেই দেখিয়াছেন যেখানে শ্বেত-পুরুষের কুটি, সেইখানেই যেন সাহেবদিগের তাম্বু পড়িয়াছে। এই জিলার দুই হুজুর প্রথমে কয়েক দিবস সরদহে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। এইক্ষণে কোন্ স্থানে কোন্ দিবস কোন্ কুটিতে অবস্থান করিতেছেন তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি নাই।

রাজসাহীর কমিস্তনর সাহেব অতিশীঘ্র এস্থান হইতে দিনাজপুরে গমন করিবেন, তাঁহার

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ৭ পৌষ ১২৬১

সরকুটে কতদিন বিলম্ব হইবে এবং তিনি পরে কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিবেন তাহা জানিতে পারি নাই।

এখানকার ইঞ্জিনিয়র আফিস উঠিয়া সংপ্রতি দিনাজপুরে স্থাপিত হইবে। কিন্তু ঐস্থানে চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ্য নহে। কারণ রঙ্গপুরে স্থাপিত হওনেরি অধিক সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে রাজশাহী মুরশিদাবাদ ইঞ্জিনিয়র আফিসের অধীন হইল। এখানে কেবল একজন মাত্র গোমস্তা থাকিবে।

প্রসন্ননাথ ফণ্ড হইতে এখানে যে এক "ডিস্পেন্সরি" স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয় না। কারণ তথাকার ডাক্তারটি উপযুক্ত নহে, মিডিকেল কালেজে শিক্ষা করে নাই, লেখাপড়া জানে না। ডাক্তর ইজডেল সাহেবের নিকটে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাহা শিখিয়াছে, তাহাই তাহার পুঁজি পাটা, এরূপ অভ্যাসে যতদূর হইতে পারে তাহা বিবেচনা করুন। চিকিৎসা বিদ্যায় যাহার সংস্কার না থাকে তাহার নিকট কি সাহসে শরীর ও প্রাণ সমর্পণ করা যাইতে পারে? তাহার দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা কেবল আপনার সর্ব্বনাশ করাই হইয়া উঠে। ঐ ব্যক্তি ৪০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়। তাহার পক্ষে এ বেতন যথেষ্টই রহিয়াছে। কেননা ফোড়া কাটা ও পটি বসানো প্রভৃতি কর্ম্মই তাহার চূড়ান্ত কর্ম্ম। হয় গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করুন। নয় রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর অতিরিক্ত আর কিঞ্চিৎ মূলধন প্রদান করুন। তাহা হইলে ১০০৲ একশত টাকা মাসিক বেতনে জনৈক সুশিক্ষিত সব আসিষ্টাণ্ট সারজন নিযুক্ত করিতে পারিবে। এতদ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা হইবার সম্ভাবনা হইবেক! সরকার বাহাদুরের পক্ষে এ বিষয় কোন্ তুচ্ছ? সমুদ্র হইয়া গোষ্পদ পূর্ণ করা, জলধর হইয়া চাতক চঞ্চুর তৃষ্ণা ক্ষমা করা অতি সামান্য, গণ্য মধ্যেই নহে। অপিচ দীঘাপতি পতি রায় বাহাদুর, অতি দয়ালু। স্বভাবদাতা, দেশের হিত সাধনের কার্য্য তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তরই জাগরূক রহিয়াছে। অতএব তিনি কৃপা-কটাক্ষ পূর্ব্বক আর কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিলে অনায়াসেই এতন্মহ মাঙ্গলিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবেক।*

এখানকার কালেক্টরী খাজাঞ্চি শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বেতন ১১৩ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সুসংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন, কেননা যাঁহারা রাজকার্য্য উপেক্ষা না করেন, তাঁহারদের বেতন যতই বৃদ্ধি হয় ততই আনন্দের কারণ। এ পদের অল্প বেতন বিধান সেজন্য অনেকেই রাজনিয়মে দোষারোপ করিতেন, কারণ যে ব্যক্তি এক প্রকার চাকলার সমস্ত রাজস্বের ভার আপনি একাকী বহন করেন, যে ব্যক্তি বহুমূল্যের জমিদারী প্রতিভূ রাখিয়া এতদ্রূপ গুরুতর সংশয় সংঘটিত প্রচুর পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহাকে যৎসামান্য কর্ম্মকারকের ন্যায় যৎসামান্য বেতন দান করা কোনমতেই বিধেয় নহে। এই খাজাঞ্চি বাবু সর্ব্বতোভাবে সুযোগ্য, সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশ, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত অতি সুন্দররূপে প্রশংসার সহিত এতৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, ইনি যেরূপ রাজার বিশ্বাস্য, সেইরূপ প্রজার প্রিয়পাত্র; সুতরাং এমত ব্যক্তির বেতন বৃদ্ধিতে আহ্লাদিত না হইবেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই।

এ বৎসর এ অঞ্চলে দ্রব্যাদি সকলি দুর্ম্মূল্য, ভালরূপ খাদ্যদ্রব্য প্রায় পাওয়া যায় না, নূতন তরকারি কিছুই উঠে নাই, মৎস্য অন্য বৎসরের ন্যায় সুলভ নহে।

* সংবাদ প্রভাকর। ৮ পৌষ ১১৬১

শীতের প্রাদুর্ভাব কিছুমাত্র নাই, বরং সময়ে সময়ে গ্রীষ্মানুভব হয়। অদ্যাপি এক দিবসের নিমিত্ত লেপ গায়ে দিতে হইল না, শীতের এতদ্ভুত স্বল্পতা জন্য লোকের পীড়া হইতেছে, পবনের প্রবলতা প্রযুক্ত গত রাত্রিতে শীতের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহাতে স্বচ্ছন্দ, শরীরে আহার নিদ্রার সুখ সম্ভোগ হইয়াছে, এইরূপে ক্রমে ইহার যত প্রাবল্য হইবে প্রজারা ততই সুস্থ ও সুখি হইবেন।

অধুনা এই জিলায় কি স্থল পথে কি জলপথে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা হইতেছে, দস্যু ভয় অনেক নিবারণ হইয়াছে, ইহা সাধাধণের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখানকার এতদ্দেশীয় হাকিম সকলেই অতি সদগুণান্বিত, প্রতিষ্ঠাভাজন, কর্ম্মতৎপর ও সুবিচারক। প্রধান সদর আমিন বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, সদর আমিন বাবু গঙ্গাচরণ সোম, ডেপুটি কালেক্টর বাবু মথুরানাথ বন্দোপাধ্যায়, ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ম্মে অশেষানুরাগ লাভ করিয়াছেন। কি জমিদার, কি বাদী প্রতিবাদী, কি উকিল, মোক্তার, কি বিচারার্থি এবং কি অপরাপর ব্যক্তি তাবতেই, মুক্তকণ্ঠে ইঁহারদিগের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

রাজসাহীর অন্তঃপাতি নাটোরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয় সম্প্রতি শান্তি রক্ষার কর্ম্মে সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার শাসনে চুরি ডাকাইতি নাই বলিলেই হয়, পরন্তু ইনি বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, বাঙ্গালা পাঠশালা ও ও পুস্তকালয়ের প্রতি প্রখর প্রযত্ন প্রচার করিতেছেন। আমি তাঁহাকে এজন্য অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া লেখনী সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

এখানকার আদালতের পেস্কার বাবু শিবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় "ট্রান্সলেটর" অর্থাৎ অনুবাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই কর্ম্মের বেতন ৭৫ পঁচাত্তর টাকা, আমলার মধ্যে শিব বাবুর ন্যায় নির্দ্দোষী, নির্লোভী, নিরহঙ্কৃত, পরিশ্রান্ত ও যোগ্যব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ইংরাজী, পারস্য ও বঙ্গভাষায় সমান উপযুক্ত, জজ, মেং চিপ সাহেব ইহাকে বিশেষ বিশ্বাস পাত্র ও কার্য্যক্ষম জানিয়া মনের সহিত সম্মান ও স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহার পদোন্নতির নিমিত্ত অনেকবার উচ্চস্থানে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। এই শিব সর্ব্বদাই শিবময়, প্রকৃত শিব বলিলেই হয়।

এ জিলার আদালতের শিরিস্তাদার ও কালেক্টরি শিরিস্তাদার উভয়েই অতি ভদ্র ও ইঁহারদিগের উভয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।*

কমিশ্যনরের হেড কেরাণী বাবু কমল, যাঁহার নিকট কমল স্থিত কমল সমল, অমল নহে, ইঁহার সদগুণের বিষয় আমি লিপিদ্বারা ব্যক্ত করণে অশক্ত, ইনি পরমেশ্বরের যথার্থ ই প্রিয়পাত্র, ইনি এবং কালেক্টরি হেড কেরাণী বাবু শিবপ্রসাদ সান্ন্যাল, এই শিব সাক্ষাৎ শিব, নির্ম্মল গুণ ভূষণে ভূষিত। ইঁহারা উভয়েই এককালীন দোষ শূন্য, শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে সৎকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, এখানে ইঁহারদিগের মিত্র ভিন্ন শত্রু কেহই নাই। কারণ উপকারের কার্য্য ভিন্ন অন্য ব্যাপারে ভ্রমেও প্রবৃত্ত নহেন। সংপ্রতি এই উভয় বন্ধু একত্র সংযুক্ত হইয়া "চাহর-দরবেশ" নামক পারস্য পুস্তক বঙ্গভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। আমি তাহার কিয়দংশ দৃষ্টি করত অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। যেহেতু তাহা অতি সুসাধু সরল শব্দে অনুবাদিত হইতেছে।

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ৯ পৌষ ১২৬১

নাটোর ডিস্পেন্সরির ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয় অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার গুণে তথাকার সকলেই বদ্ধ, ইনি যেমন সুচিকিৎসক, সেইরূপ সদগুণান্বিত সুশীল, দয়ালু ও পরোপকারী। চন্দ্র বাবুর ব্যবহার চন্দ্রে কলঙ্ক মাত্রই নাই। এখানকার আপামর সাধারণ তাবতেই তাহার প্রেমে বিশেষ বাধ্য হইয়াছে।

এ জিলার প্রধান ভূম্যধিকারী নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর সংপ্রতি স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা মহানগরে গমন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, উক্ত মহাশয় সাধারণ হিতকর ব্যাপারে অত্যন্ত অনুরত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি অগণ্য ধন্যবাদের আস্পদ হইতেছেন।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর "খেলয়াৎ" প্রাপনার্থ অবিলম্বে কলিকাতা গমন করিবেন, এদেশে এমত জনরব হইয়াছে, ইনি প্রকাশ্য কার্য্য দ্বারা অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সভ্যতা ও ভব্যতা এবং বাক্যালাপ বিষয়ে কিরূপ, সংসর্গ বিহীনতা প্রযুক্ত তদ্বিশেষ জানিতে পারিলাম না।

এখানকার অধিকাংশ জমিদারেরা বিদ্যালোচনায় আমোদি নহেন। ধনাঢ্য মহাজনেরা এবিষয়ের প্রসঙ্গমাত্র করেন না। এ কারণ তাঁহারদিগের সন্তানেরা জ্ঞানালোকের অভাবে নিরন্তর অসভ্যতারূপ অন্ধকারে আবৃত থাকেন। গৃহস্থ বিষয়ে ভদ্র লোকেরাও এ পক্ষে তাদৃশ প্রেমিক নহেন, এজন্য বালকেরা বিদ্যারসের রসিক না হইয়া ইতর রসেই রসিকতা করিয়া থাকেন, যদিস্যাৎ সকলে জ্ঞানালোচনার যথা কর্ত্তব্য উৎসাহ করিতেন তবে এতদিনে "বোয়ালিয়া বিদ্যালয়ে"র গৃহ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইত। কি পরিতাপ! অধুনা এই স্কুলে যতগুলিন বালক অধ্যয়ন করিতেছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন জিলাস্থ আমলাগণের সন্তান। রাজসাহী জিলার বালকের সংখ্যা তাহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ হয় কিনা, তাহাতেও সন্দেহ আছে।*

গৌড় রাজধানীর পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাংশ সকল রক্ষার নিমিত্ত রাজপুরুষদিগের যত্ন

সম্পাদক মহাশয়! আপনি এবং আপনার পাঠকগণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন, গৌড় রাজ্যের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাংশ সমুদয় রক্ষার নিমিত্ত সংপ্রতি গভর্ণমেণ্ট অতিশয় মনোযোগী হইয়াছেন। এজন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি এমত অনুমতি করিয়াছেন যে, "ভবিষ্যতে আর যেন কেহ তথাকার পুরাতন বিচিত্র ও বিচিত্র ইষ্টক এবং প্রস্তরাদি হরণ করিয়া না লইতে পায়।" এই অনুমতি বলবতী থাকিলে এখনো দর্শকদিগের নয়ন-পথে এই পুরাতন অদ্ভুত মনোহর ব্যাপারের অত্যাশ্চর্য্য, কার্য্য, কৌশল ও শিল্প পরিপাট্য প্রচুররূপে পরিচিত হইতে পারিবেক, যদিও পূর্ব্বে বহু লোকে লোভাধীন হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক অপহরণ দ্বারা তাহার সারাংশ ধ্বংস করিয়াছে, তথাচ এ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, অনেক স্থানে এরূপ চমৎকার প্রায় দেখা যায় না। এই গৌড়ের বিস্তারিত বিবরণ আমি অবিলম্বেই বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিব না, যাহা হউক, সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই মহদভিপ্রায়ে সকলকেই সাধুবাদ প্রদান কর, আমি এতচ্ছ্রবণে যে প্রকার আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা বাক্যপথের অতীত, কারণ ইহাতেই যথার্থ রাজধর্ম্ম রক্ষা হইতেছে। প্রাচীন

* সংবাদ প্রভাকর॥ ১২ পৌষ, ১২৬১

রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমারদিগের কর্ত্তারা আর কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে আরো কত সুখের বিষয় হইত।

ফরিদপুর। ৫ই পৌষ, ১২৬১

গত ২৯ অগ্রহায়ণ বুধবার বেলা একাদশ ঘটিকার সময় আমরা রাজসাহীর বড়কুটির ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া পাবনাভিমুখে যাত্রা করত পর দিবস সন্ধ্যার সময়ে পদ্মানদী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইছামতীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, এই ইছামতীর মুখ হইতে পাবনার বাজার ও কাছারী বাটী স্থলে এক ক্রোশ পথ, জলে বরং দুই ক্রোশের অধিক হইবেক। প্রাচীন কথা আছে "মরা গাং কুমীরে ভরা" এ নদী যথার্থ তাহাই, অর্থাৎ জীবন বিরহে ইহার জীবন অবসান হইতেছে, কিন্তু তাহারি মধ্যে যথাযথা জল কিঞ্চিৎ গম্ভীর কুম্ভীর তথা তথা বাস করত মৎস্য গ্রাস ও মনুষ্য পশু নাশ করণের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। বর্ষা সময়ে ইহারদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, কিন্তু এই শীতকালে আহারাভাবে দুর্দ্দশায় শেষ হইয়াছে। এ বৎসর এই ইছামতীতে জলের স্বল্পতা হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে অর্দ্ধ হস্তের অধিক জল নাই। ইহাতে কি প্রকারে বড় বড় নৌকার গমনাগমন হইতে পারে। বিস্তর মহাজনি নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে, এবং যাঁহারা কোন বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে এ পথ দিয়া যাতায়াত করিতেন তাঁহারদিগের পক্ষেও বিষমতর ব্যাঘাত হইয়াছে, কারণ এই নদী বহতা থাকিলে ঢাকা, ফরিদপুর নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, ভুলুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে এবং তত্তৎ স্থান হইতে আসিতে অত্যন্ত সুযোগ হয়, বিশেষতঃ রংপুর, দিনাজপুর, শেরপুর, বগুড়া, কোচবিহার এবং আসাম এবং গোয়ালপাড়া প্রদেশে যাতায়াত পক্ষে এই সময়ে এ পথের অপেক্ষা সুযোগের পথ আর নাই।

সংপ্রতি ভ্রমণ করিতে করিতে নদনদী সকলের যে প্রকার অবস্থা দেখিলাম তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়াছি, কারণ চর রচিত হইয়া প্রায় সর্ব্বত্রই শুষ্ক হইতেছে, পাবনার খালের মোহনা হইতে বাইশ কোদালের মোহনা পর্য্যন্ত পদ্মার গর্ভে জলের বলের হ্রাসতা হইয়া প্রায় স্থলের সঞ্চার হইয়া উঠিল, যেখানে এপার ওপার দুই ক্রোশের ন্যূন নহে, সেখানে অর্দ্ধপোয়ার মধ্যে গভীর জল দেখিতে পাইলাম না, প্রায় সমস্ত নদী ব্যাপিয়া জয়ঙ্কর "মসিনা" পড়িয়াছে, তাহার উপর নৌকা পড়িলে আর রক্ষা থাকে না দৈবাৎ দুই একখানা বাঁচিয়া যায়, নচেৎ প্রায় সমুদয় মারা পড়ে, এই মসিনার নাম চর ; ইহার উপর স্থলচরের পদার্পণ দূরে থাকুক, জলচর মাত্রেই বাস করিতে পারে না। এই মসিনা দুই প্রকার, সচল ও অচল, যাহারা অচল, তাহারা তাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে, যাহারা সচল, তাহারা নিমেষের মধ্যে অচল পর্য্যন্ত রসাতল দিতে পারে, অধুনা যাহারা এই পথে জলযান হইয়া উজান যান, তাঁহারদিগের যান রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। যদিও ভাঁটি পথে বিপদের ঘাটি নাই, তথাচ যৎকিঞ্চিৎ সুসার বটে, যাহারা উযানে পাবনা যাত্রা করিতেছে, নদীর ভীষণ ভঙ্গি দৃষ্টে তাহাদের মনে যাব না যাব না "পাবনা" পাব না এ ভাবনাই হইতেছে। আমরাও "পাবনা" পাব না ভাবনা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরমেশ্বর অনুকূল হইয়া অভিলাষ পরিপূর্ণ করিলেন, গত শুক্রবার বৈকালে পাবনার একটিং সদর আমিন সুবিজ্ঞোত্তম বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পাল্কি পাঠাইয়া দিলেন। পরে ক্ষুদ্র একখানা ডিঙ্গি করিয়া বহুকষ্টে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাজারের ঘাটে উপস্থিত হইলাম, এখানকার বাজার অতি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ, সমুদয় ইষ্টক নির্ম্মিত দোহারা চকবন্দি ঘর। অনেক

প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পট্টবস্ত্র ও সূতার বস্ত্র যথেষ্ট, মৎস্য, তরকারি, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি সুলভ বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এ বৎসর দধি দুগ্ধ ও ঘৃত কিঞ্চিৎ দুর্মূল্য হইয়াছে, ইহার কারণ মহা ারি জন্য অনেক গোবৎস মারা পড়িয়াছে।*

এই পাবনা বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষে একটা প্রধান স্থান। এখানে বিস্তর ধনী মহাজন আছেন; চতুর্দ্দিকের নানাস্থানে তাঁহারদিগের আড়ৎ ও দোকান আছে, যেখানে পাবনার মহাজনের ব্যবসায় নাই, এনত গোলা গঞ্জ প্রায় নাই, ঐ সমস্ত মহাজনের মধ্যে অধিকাংশ শুঁড়ি, এদেশে শুঁড়ি জাতিরাই মান্য ও ধনাঢ্য। সামান্য লোকেরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগ্যে "সা, জী" শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকে। যথা—"মুখুর্য্যে" সা, জী মুশয়, গুপ্ত সা, জী মুশয়, ঘোষ সা, জী মুশয়" যেহেতু তাহাদিগের এমত বোধ আছে যে সা, জীরা অর্থাৎ শুঁণ্ডিরাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক।

এ জেলায় নানা প্রকার শস্য জন্মে ও নীলের কুটি অনেক। এবং অধিকাংশ নীলকরেরাই অত্যন্ত অত্যাচারি, ইহার বিশেষ হেতু অবগত হইলাম, যিনি শুভ্রকান্তি শান্তিরক্ষক খোদাবন্দ, তিনি কুটিয়ালগণের পক্ষে বিশেষ আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, প্রধানের সহিত সদ্ভাব থাকাতে তাঁহারা নির্ভয়ে পীড়নের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

নিজ পাবনায় ভদ্রলোক অতি অল্প, শুঁড়ি ও মুসলমানের অংশই অধিক, কিন্তু জেলার মধ্যে অনেক গ্রামে অনেক ভদ্রলোক আছেন।

পাবনায় মাজিষ্ট্রেট মেং বফোর্ড সাহেব বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের বিষয় ঘটিত কোন এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদানার্থে যশোহরে গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন। ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ সরকার এবং সদর আমিন বাবু অদ্যাপি বাটী হইতে প্রত্যাগত হয়েন নাই, অবিলম্বেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এমত সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, এস্থলেই ইহাদিগের উভয়েরি বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে, কালোর আলো অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। রাস্তার পশার কিঞ্চিৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখিলাম, ইহাতে হাকিমের দোষ, কি সাকিমেরই দোষ, বড় বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বিবেচনায় "হয়ের" দোষি "সয়ের" অপেক্ষা প্রবল বোধ হয়।

বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী কয়েক দিবসের নিমিত্ত প্রতিনিধিরূপে সদর আমিনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, এই সঙ্ক্ষেপ সময়ের মধ্যে তিনি সুবিচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বপ্রিয় হইয়া সমূহ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অনুরাগ করিতেছেন, আমরা ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখি হইলাম। যেহেতু ইনি অতি মহৎ ও সুপণ্ডিত, চৌধুরী বাবুর বাসায় বসিয়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, পাঠশালার পণ্ডিত ও খাজাঞ্চি বাবু প্রভৃতি কতিপয় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে কথোপকথনে ও সদালাপে অশেষানন্দ লাভ করিলাম, ইঁহারা অতি সজ্জন।**

আমরা গত ২রা পৌষ শনিবার প্রাতে ভাবনা ছাড়িয়া পাবনা ছাড়িয়া নৌকা চালনা করিলাম, তদবধি এ পর্য্যন্ত কোন ভয়ঙ্কর চরের করে পতিত হই নাই, যত আসিতেছি ততই পদ্মাকে প্রবলা দেখিতেছি। রবিবার দিবসে পূর্ব্বাহ্ন বেলা নয় ঘটিকা সময়ে "বাইশ কোদালের" মোহনার পারে ত্রেমহনীতে "যমুনার" নমুনাদৃষ্টে চক্ষুস্থির করিতে হইল, এবং ভাবিলাম এই যমুনা যথার্থই যমের ভগিনী বটেন, কতস্থানে ইহার কত প্রকার ভাবভঙ্গি ও মূর্ত্তি দেখিলাম,

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২১ পৌষ ১২৬১ ** সংবাদ প্রভাকর ॥ ২২ পৌষ ১২৬১

তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। প্রয়াগে যুক্তবেণী, ত্রিবেণীতে মুক্তবেণী, বাদাবনে ইচ্ছামতীর মাথার বেণী, জাফর গঞ্জে পদ্মার সহচরী রাক্ষসীরূপিণী, এখানে এপার ওপার দৃষ্ট হয় না, অত্যন্ত প্রবলা, কত গ্রাম কত গঞ্জ উদরস্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না, যমুনার জল অতি নির্ম্মল ও কল্যাণকর, ইহার জলে স্নান ও এই জল পান করত প্রণিপাত করিয়া পুনর্ব্বার পদ্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফরিদপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই শীতকালে এখানকার পদ্মার যে প্রকার আকার দেখিলাম ইহাতে বর্ষাকালে কিরূপ হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইলে ভয়েই হৃৎকম্প হইতে থাকে। ঐ দিবস যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে পদ্মার পার ফরিদপুরের সম্মুখে "টেঁপাখোলার" ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এই টেঁপাখোলা ফরিদপুর জেলার সদর ঘাট, পূর্ব্বে এ গ্রাম অতি বৃহৎ ছিল অনেক ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক বাস করিতেন, পদ্মার অত্যাচারে সমুদয় উচ্ছন্ন গিয়াছে, অধুনা টেঁপাখোলার কেবল খোলা সার হইয়াছে, সে গ্রাম নাই, সে হাট বাজার নাই, সে বসতি নাই, সে শোভা নাই, শুদ্ধ এক নামমাত্র রহিয়াছে।

টেঁপাখোলার ঘাট হইতে ফরিদপুরের কাছারি ও স্কুল ঘর অর্দ্ধ ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, বাজার এক ক্রোশের ন্যূন নহে, পদ্মার ক্রোড়ে চরের সঞ্চার হওয়াতে শীতকালে বাজারের ঘাটে নৌকা যায় না। ইহাতেই সংপ্রতি পদব্রজে গমনাগমনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু রাজপথ অতি উৎকৃষ্ট, দোসারি বড় বড় বৃক্ষ সকল ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক পথিকপুঞ্জের পথশ্রান্তি নিবারণ করিতেছে। বর্ষা সময়ে বণিকবৃন্দের বাণিজ্য পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ হয়। কারণ বাজারের ঘাটে অনায়াসেই নৌকা গিয়া থাকে, ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হয় না। অধুনা শকটের আশ্রয় লওয়াতে অতিশয় ক্লেশ ও ব্যয়ের আধিক্য হইতেছে, এজন্য এ সময়ে বড় বড় মহাজনেরা বড় বড নৌকার আমদানি রপ্তানি প্রায় রহিত করিয়াছেন।

এই ফরিদপুর বাণিজ্যপক্ষে অতি বিখ্যাত ও প্রধান স্থল, কত দেশের কত মহাজন কত দ্রব্য ফরিদপুরে খরিদ করিয়া কত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন, এখানে বহু প্রকার শস্য, নীল, ইক্ষু, ইক্ষুর গুড় ও তাহার চিনি, খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি যথেষ্ট জন্মে। খেজুর গাছ এত অধিক কুত্রাপিই নাই। এইখানকার গুড় চিনি সর্ব্বত্রই রপ্তানি হইতেছে।

মৎস্যের কথা কি কহিব, এক আনার মাচ কলিকাতার এক টাকার হইবে। মাচ এত শস্তা দেখিয়া তাহার আহার বিষয়ে ঘৃণা জন্মিয়াছে। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি অল্প মূল্যে অধিক পাওয়া যায়। তরি-তরকারি প্রায় সকলি মিলে, বাঙ্গালির খাদ্য সুখের পক্ষে এই স্থান প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ফরিদপুরের কাছারির নিকট হইতে "ঢোল সমুদ্র" দর্শন করিলে মন মহানন্দে মুগ্ধ হইতে থাকে, তাহার শোভা অতি সুন্দর।

ফরিদপুরের বাজার পাকা নহে, দোকান সকল চকবন্দী নহে, সমস্তই খড়ুয়া ঘর, দেখিতে উত্তম নহে, কিন্তু তথায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য প্রায় সকলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতি রবিবার ও বুধবারে হাট হইয়া থাকে। সেই হাটে অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়।

এখানকার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেব অতি সুজন, অপক্ষপাতি, কিন্তু বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন নাই। বাঙ্গালায় কিছু নিপুণ হইলে প্রজার পক্ষে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

সাহেব এক্ষণে সরকুটে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি গত দিবস প্রাতে আসিয়া নিয়মিত

সময়ে কাছারি করেন, এবং নড়ালের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারি বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করত স্বয়ং বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বাবুকে অতিশয় সন্তোষিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার ভ্রমণে যাত্রা করিলেন, রাত্রিতে রায় বাবুর সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সদালাপ হইল। উক্ত মহাশয় মঙ্গলবার দিবসে স্নান ভোজন করিয়া স্বধামে গমন করিবেন, এরূপ শুনিলাম। মাজিষ্ট্রেট সাহেব রায় বাবুর নিকটে ফরিদপুরের স্কুলের জন্য বাটী নির্ম্মাণ ও পুস্তকালয় স্থাপন বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি তদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য আনুকূল্য করণে অঙ্গীকৃত হইলেন। বোধ করি বিদ্যোৎসাহি মাত্রেই এই সুসংবাদ শ্রবণে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইবেন।

বৈকালে এখানকার সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ ডাক্তার অস্মদবন্ধু বাবু কালাচাঁদ দে মহোদয় নৌকায় আসিয়া সাক্ষাৎ করাতে তাঁহার নিকট বিপুল বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, অপর কতিপয় সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারি ঐরূপে নৌকায় দেখা করিয়া সদালাপে বিশেষ বাধিত করিলেন, ঐ সময়ে মুন্সেফ বাবু এবং কেরাণী বাবু পাল্কি পাঠাইয়া দিলেন, আমি তাহাতে আরোহণ করত সন্ধ্যার সময় কেরাণী বাবুর বাসায় সমাগত হইলাম, ইঁহার নাম বাবু চাঁদমোহন মৈত্র, ইনি অতি মান্য বংশ কৃতবিদ্য ও সর্ব্বগুণে ভূষিত, মুন্সেফ বাবু পীড়িত থাকাতে তাঁহার সহিত দেখা হইল না। ইঁহার সুখ্যাতি সৌরভে ফরিদপুর আমোদিত করিয়াছে। কেরাণী বাবুর বাসায় স্কুলের শিক্ষক বাবুরা ও অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা আগমন পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে আমাকে সদগুণের গুণে বদ্ধ করিলেন।

অদ্য প্রাতে আমরা ঢাকায় যাত্রা করিলাম।*

পাবনা জেলার বর্ত্তমান সংক্ষেপ বিবরণ

নারায়ণগঞ্জ। ৭ পৌষ ১২৬১

ইংরাজি ১৮২৮ সালে পাবনা জেলা স্থাপিত হয়, মেং এ. জে. এস. মিলন সাহেব সর্ব্বাগ্রেই ইহার মাজিষ্ট্রেটি পদে অভিষিক্ত হয়েন। ইনিই আসিয়া জিলা স্থাপন করেন। তৎকালে কেবল জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের "মহকুমা" মাত্র ছিল, ফৌজদারি ভিন্ন অন্য বিষয়ের সম্বন্ধ গন্ধ ছিল না। পরে ১৮৩৩ সালে তাহার সহিত কালেক্টরি সংযুক্ত হইয়া জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এ পর্য্যন্ত এক প্রণালী ক্রমে চলিতেছে।

জেলা রাজসাহী ও জেলা যশোহরের কয়েকটি থানা লইয়া পাবনা জেলার জন্ম হয়। এতদ্দারা বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে, প্রজাপুঞ্জের অশেষ ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে। জলে স্থলে চুরি, ডাকাইতি ও রাহাজানি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ইতর কার্য্য রহিত হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

সংপ্রতি এই জেলায় কালেক্টরি রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ে অন্যূন ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে ভূমির রাজস্ব ৪০০০০০চার লক্ষ টাকা।

ষ্ট্যাম্প, আফকারি, ডাক, গুদারা ও জেলখানার উৎপন্ন ২০০০০০ টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০০০ টাকা। বরং ইহার অধিক হইবে, তথাচ অল্প নহে।

---

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৩ পৌষ ১২৬১

অধুনা এই জেলার অধীনে ৮টি থানা ও ২ টি ফাঁড়ী আছে। যথা—

থানা	ফাঁড়ি
নিজ পাবনা সদর থানা অথবা	
১। কোতয়ালী	১। অরণকোলা
২। হাতিয়াল	২। নওপাড়া
৩। মথুরা	
৪। নাজিরগঞ্জ	
৫। পাংসা	
৬। ধর্ম্মপুর	
৭। কুষ্টিয়া	
৮। খোক্‌সা	

এই কয়েক থানার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দারোগা একজন মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর দারোগা দুই একজন আছেন কিনা সন্দেহ।

জেলা সীমা।

দক্ষিণ সীমা। কোঁড়পদী, চন্দনা ও কামারখালি নদীর তীর পর্য্যন্ত ১৮ ক্রোশ পথ হইবে।

উত্তর সীমা। বড়াল নদ। ১৪ ক্রোশ পথ।

পূর্ব্ব সীমা। যমুনা নদী ও হুড়া সাগরের মহনা। ১২ ক্রোশ পথ।

পশ্চিম সীমা। পার সিংলির কুটি পর্য্যন্ত। ১৮ ক্রোশপথ।

জেলার শ্বেতবর্ণের কর্ম্মকর্ত্তা মেং বফোর্ড সাহেব। ইনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, ইঁহার এসিষ্টণ্ট অর্থাৎ সহকারী কেহই নাই।

অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর একজন মাত্র।

সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ একজন মাত্র।

সব-এসিষ্টাণ্ট সারজন একজন মাত্র।

বাবু শ্যামচাঁদ সরকার এখানকার বর্ত্তমান ডেপুটী কালেক্টর, ইনি অতি যোগ্য ও কার্য্য নিপুণ।

সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত। এখানে তাবতেই ইঁহার অনুরাগ করিয়া থাকে।

ডাক্তারটি বাঙ্গালী নহেন, সাহেব, কিন্তু বিলিতি নহেন, দিশী। ইঁহারি হস্তে ডাকের ও রেজেষ্টরি কর্ম্মের ভারার্পিত আছে।

এতদ্ভিন্ন এই জেলার অধীনে খেতুপাড়া ও সাজাৎপুর এই দুই স্থানে দুইজন মুন্সেফ আছেন।

পাবনার সেশন সম্পর্কীয় কার্য্য রাজসাহীর সেশন জজের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়।

দেওয়ানীর অধিকাংশই যশোহর জিলা ভুক্ত। কিয়দংশ রাজসাহীর সহিত সম্পর্ক রাখে, অর্থাৎ পদ্মার উত্তর পার রাজসাহী, দক্ষিণ পার যশোহর।

এই জিলার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা পরগণা ও তাহার বর্ত্তমান জমিদারদিগের নাম বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। যথা—

পরগণা	জমিদার
বিরাহিমপুর	বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি
বেগ্‌সাবাদ	ব্রজসুন্দরী ও প্যারীসুন্দরী দাসী
ইসলামপুর	ঐ ঐ
গঙ্গাপথ	ঐ ঐ
বাজুচম্প	বিজয়গোবিন্দী চৌধুরী প্রভৃতি
ডিহি সাহাজাৎপুর	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি
ডিহি কাশীপুর	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিহি সড়াতুল	মনোমোহন সান্যাল
নাজির ইনাইৎপুর	আজিম চৌধুরী
পরগণে নাজির	অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়
ফড় ফতেজঙ্গপুর	ভৈরবচন্দ্র মজুমদার
মামুদশাহি কিয়দংশ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী
ইসপ্‌সাহী	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি
তপা	অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি
সাহুঁরী	হরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি
মহিমসাহী কিয়দংশ	জার্ডিন স্কিনর এণ্ড কোং
নসরৎসাহী	রাজা ইন্দুভূষণ
তরপ হাবাসপুর	রাণী স্বর্ণময়ী
বিরাহিমপুর	আজিম চৌধুরী প্রভৃতি
স্বোনাবাজু	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি
হলসী	ডবলিউ উড়িন্ সাহেব প্রভৃতি
ডিহি ভদ্রঘাট	ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী
রোকনপুর কিয়দংশ	রাও রামশঙ্কর
জীয়ারপুখি	শ্রীকান্ত রায় প্রভৃতি

এতদ্ভিন্ন দুই একটা ক্ষুদ্র পরগণা ও ডিহি থাকিলে থাকিতে পারে।

এই জিলায় নীলকুটি সংক্রান্ত যে কয়েকটি কান্সরণ :আছে তদ্বিশেষ নিম্নভাবে প্রকাশ করিলাম। যথা—

কান্সরণ	মাজ্জিপাড়া	কান্সরণ	মোহনগঞ্জ
”	ধূলাউড়ী	”	যোড়াদহ
”	সলিই দহ	”	কুমিদপুর
”	ধোকড়া কোল	”	জামির্ত্তে
”	হিজলা বট	”	বেলেকাঁদি
”	সালঘর মধুয়া	”	মীরপুর
”	দামুদিয়া	”	পারসিংলি
”	ভেলনা বাড়িয়া	”	বামুনদে

এই কয়েকটা প্রধান কান্সরণ, ইহার এক এক কান্সরণের অধীনে দশ, বারো, পনেরো, ষোল করিয়া কুটি আছে। কোন কান্সরণেই পাঁচ, সাতটার ন্যূন নাই।

এই সমস্ত কুটির অধ্যক্ষেরা সকলেই ইংরাজ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ইংরাজ ও জমিদার-দিগের অনেক কুটি আছে।

কান্সরণওয়ালা কুটিয়ালদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত অত্যাচারি, তাহারদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজারা সর্ব্বদাই পীড়িত। তাঁহারা রাজার আনুকূল্য ও সুবিচার না পাইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে। নীল রেশমের কুটির অত্যাচারে ভদ্রাভদ্র কোন প্রজাই সুখি নহে। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে সেখানে, যে সে ব্যক্তির মুখে এতদ্রূপ দুঃখজনক ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম।*

এই জিলা বাণিজ্যের পক্ষে প্রধান স্থান, কুটিয়াল ও ধনি মহাজনদিগের সংখ্যা অধিক।

নীল এবং রেশম প্রচুর ও উত্তম জন্মে, চাউল বড় অধিক জন্মে না।

রেশমের বস্ত্র অধিক প্রস্তুত হয়।

কলাই, মুগ, খেশারী, মুসরি, মটর ও ছোলা অধিক উৎপন্ন হয়।

গম, যব, তিল, তিসি, সর্ষা পাট অধিক জন্মে না।

খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি, ইক্ষু ও ইক্ষুর গুড় ও চিনি অধিক জন্মে না।

বিবি সাহেবেরা যে পালকের পোষাক পরেন, যে পক্ষির পক্ষ মস্তকে ধরেন, সেই পক্ষির পক্ষের ব্যবসায় এখানে বিস্তর হয়।

পাবনা জেলার মধ্যে ভদ্রলোকের অধিক। এবং হিন্দুই অনেক, মুসলমান অল্প। এক একটা গ্রাম কেবল বিশিষ্ট লোকেই পরিপূর্ণ। এখানকার মধ্যে শুঁড়ি, তিলি ও গোয়ালা জাতিতেই অধিক ধনি। ঐ সমস্ত জাতির মধ্যে বিদ্যার চালনা প্রায় নাই বলিলেই হয়, ভদ্র জাতির ম ধ্য বিদ্যার আলোচনা নিতান্তই নাই এমন নহে। ফলে এ পক্ষে যতদূর করা কর্ত্তব্য তাহা করেন না।

রাজসাহীর দয়াশীল জজ মেং চিপ সাহেব বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আপনার মাসিক দানে ও জন সাহেব ও জমিদারের সাহায্যে পাবনায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে কয়েক জন ইংরাজী শিক্ষক ও এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। সেই পাঠশালায় অনেকগুলিন বালক কয়েক বৎসর উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। পরে এক বৎসর গত হইল, গবর্ণমেণ্ট সেই স্কুলের সমুদয় ভার গ্রহণ করত "এডুকেসন কৌন্সেলের" অধীন করাতে তাহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উত্তম হইয়াছে। শিক্ষা ভাল হইতেছে, এবং ১৫০ দেড়শত বালকের অধিক হইয়াছে।

এইক্ষণে ৪ চারি জন ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। প্রধান শিক্ষক গৌরনারায়ণ রায়, ইনি ঢাকা কালেজের ছাত্র, ১৫০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্বান বটেন, কিন্তু সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, এ বিষয়ের কারণ কি, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

দ্বিতীয় রামচন্দ্র নন্দী, ইনি হুগলী কালেজের ছাত্র, অতি সুপাত্র, এখানে সকলে সকল বিষয়েই ইহার সুখ্যাতি করেন। ৫০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়েন।

তৃতীয় শিক্ষক কৃষ্ণধন মজুমদার, ইনি ঢাকা কালেজের ছাত্র, ৩০৲ টাকা বেতন পান, উত্তম পাত্র।

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৫ পৌষ ১২৬১

চতুর্থ শিক্ষক উমেশচন্দ্র সরকার, উনি পাবনার পুরাতন স্কুলের ছাত্র, ২০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন, সুজন বটেন।

গবর্ণমেন্ট পণ্ডিতের পদ রহিত করাতে মেং চিপ সাহেব ঐ পণ্ডিতকে প্রতিপালন এবং বঙ্গ ভাষায় অনুশীলন জন্য এখানে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে কত ধন্যবাদ প্রদান করিব তাহা মুখে ব্যক্ত করিতে পারি না।*

ঢাকা, বরিশাল ও যশোহর, এই তিন জিলার কিছু কিছু অধিকার লইয়া ফরিদপুর স্থাপিত হয়। প্রথমে এই জিলা সম্পূর্ণ জিলা ছিল, একজন সিবিল কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করতেন, আর একজন জজের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল এখানকার জজের পদ রহিত হইয়াছে, এইক্ষণে কেবল জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী.কালেক্টরের "মহকুমা" মাত্র আছে।

ফরিদপুরের ফৌজদারি সংক্রান্ত সমুদয় বিচারের কার্য্য ঢাকার সেশন জজের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। এবং ইহার কালেক্টরি সর্ব্বতোভাবেই ঢাকা ডিবিসনের কমিস্তনর সাহেবের অধীন।

যে যে জিলার সহিত দেওয়ানী বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সেই সেই জিলায় দেওয়ানী মোকদ্দমার আপিলের বিচার সমাধা হয়, কিন্তু মূল বিচার এইখানেই হইয়া থাকে, কারণ সদর আমিনের কাছারি স্থাপিত আছে।

জিলার সীমা। পূর্ব্ব সীমা। ১ এক ক্রোশ, পদ্মা নদীর তীর, টেঁপাখোলার ঘাট। এই ঘাট ফরিদপুরের সদর ঘাট।

দক্ষিণ সীমা। বারসিয়া ও এলন খালি নদী। ১১ এগারো ক্রোশ পথ।

উত্তর সীমা। পদ্মা নদী। ১২ বার ক্রোশ পথ।

পশ্চিম সীমা। চন্দনা নদী। ১১ ক্রোশ পথ। কিন্তু জিলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ অন্যূন ২৪ ক্রোশ পথ।

পশ্চিম উত্তর কোণ ১৮ ক্রোশ পথ। এবং পশ্চিম দক্ষিণ কোণ ১৯ ক্রোশ পথ।

এই জিলার উৎপন্ন অতি অল্প, ভূমির কর, আফকারি, ষ্টাম্প, ডাক, গুদরা ও জেলখানার লভ্য লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ আয় ১০০০০০ টাকা।

গুদরার উৎপন্ন ১৮০০ টাকার অধিক নহে। কিন্তু এই টাকা কোন হিতকর কর্মে প্রায় ব্যয় হয় না। কারণ পথঘাটের অবস্থা অতিশয় কদর্য্য দেখিলাম।

গত বৎসর জেলখানার বন্দিদিগের পরিশ্রম দ্বারা ১৭০০ টাকা লাভ হইয়াছিল।

এখানকার কয়েদিরা বস্ত্র, কাগজ, মোড়া, খোলে, ইষ্টক, চেটাই, তাল পত্রের ছাতি ও টোকা, বাঁশের ঝুড়ি, কাষ্ঠের চৌকী, তক্তাপোষ প্রভৃতি এবং টিকে গুল পর্য্যন্ত প্রস্তুত করে। অপর কোন জিলার জেলখানায় টিকে গুল প্রস্তুত হইতেছে এমত দেখা যায় নাই, শুদ্ধ এই এই বিষয় এই স্থানে নূতন দেখিলাম। ফরিদপুরের কারাবাসিগণ অন্য জিলার বন্দিদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছে।

অধুনা এইচ্. সি. রেক্স সাহেব এখানকার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত আছেন। সিবিলের মধ্যে ইনি একাকী মাত্র। এই সাহেব অতি সজ্জন ও নিরপেক্ষ, যদিও বয়সও অল্প, কিন্তু বিলক্ষণ প্রবীণতা আছে। এই মহাশয় নীলকরদিগের

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৮ পৌষ ১২৬১

অনুরোধের বশ্য নহেন, সবল অবল সকলেরই প্রতি সমান নেত্রে দৃষ্টি করেন। ইহার শাসন ভয়ে নীলকরেরা প্রবল হইয়া প্রজা পীড়নে স্পষ্টরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, সুতরাং রেক্ষ স্বভাতির প্রতি পক্ষপাত পূরিত প্রীতি প্রচার না করাতে প্রজাপুঞ্জের প্রেমাস্পদ ও পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

বিশেষতঃ ইনি বিদ্যা বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার আন্তরিক, মৌখিক ব্যাপার নহে, কারণ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত উত্তম একটি গৃহ নির্ম্মিত এবং একটা "লাইব্রেরী" অর্থাৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন। এই সৎকর্ম্ম সাধন নিমিত্ত জমিদারদিগ্যে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার এই অনুরোধকে এক প্রকার উপাসনা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাহেবটি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, কেবল বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন নাই। এই প্রযুক্ত আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কেননা তিনি যে প্রকার বহু গুণে ভূষিত, সেই প্রকার প্রজাদিগের জাতীয় ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিলে সর্ব্বতো-ভাবে যশস্বী হইতে পারিতেন। বাদি প্রতিবাদি ও সাক্ষিদিগের কথা ও অভিপ্রায় এবং বিষয়ের মর্ম্ম সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন, কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

ইঁহার নিকট নালিসি মোকদ্দমা অতি অল্প অর্পিত হইতেছে, যেহেতু ইনি কোন কোন বিষয়ে বাদির আর্দ্দাস অগ্রাহ্য করেন, বরং তাঁহার অর্থ দণ্ড করিয়া প্রতিবাদিকে নিষ্কৃতি দেন, সুতরাং এই কারণে অনেকেই নালিস করিতে ভীত হয়েন, সাহেব কি অভিপ্রায়ে এরূপ করেন তাহা বলিতে পারিলাম না, বোধকরি মনে একখানা কিছু বিবেচনা করিয়া থাকিবেন, তাঁহার মনে এমত প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, ফরিদপুরের লোকেরা মিথ্যা রূপেই অনেক নালিস উপস্থিত করে, যাহা হউক, আমারদিগের বোধে তিনি প্রজার ভাষায় সুযোগ্য হইলে কখনই এমত করিতেন না, কারণ আবেদন পত্র শ্রবণ করিয়া আশু তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাদ্দ্বারা অনায়াসেই সত্য মিথ্যা বোধ হইতে পারিত, তিনি যদি এখনো এ বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করেন তবে অতিশয় সুখের বিষয় হয়।*

এখানকার প্রধান সদর আমিন মেং সি. মেকি সাহেব। মেং মেকি নিতান্ত মেকি নহেন, নামের গুণ না ধরিলেই প্রশংসিত হইবেন। ইহার বিচার বিষয়ে বুদ্ধি ভাল, বিষয় বোধ বিলক্ষণ আছে।

সদর মুন্সেফ বাবু রাসবিহারী বসু, ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র। অতি সুবিচারক এবং সূক্ষ্মদর্শী, জিলার তাবতেই ইঁহার অনুরাগ ব্যক্ত করেন, ইনি দেশ হিতকর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল।

সংপ্রতি এ জিলায় ২ দুই জন অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর আছেন, তন্মধ্যে প্রধান গণিত, বাবু রামগতি মিত্র। ইহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইবে। এই প্রাচীনাবস্থায় যুবা পুরুষের ন্যায় বিলক্ষণ সবল আছেন, যথাযোগ্য পরিশ্রম করিয়া যথারীতি ক্রমে সুখ্যাতির সহিত স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বয়সে প্রবীণ, কার্য্যে প্রবীণ, বুদ্ধিতে প্রবীণ, কিন্তু পরিশ্রমে নবীন।

দ্বিতীয় ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলকমল শীল, এই শীল শিল নহেন, সুশীল এবং সুজন।

এখানকার সব-আসিষ্টান্ট সারজন বাবু কালাচাঁদ দে, যিনি বহু দিবস ভবানীপুরের ডিস্পেন্সরিতে থাকিয়া সমূহ সুখ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই মহাশয় ফরিদপুরে আসিয়া

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৯ পৌষ ১২৬১

ততোধিক গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ইঁহার সাধু ব্যবহারে ও সুচিকিৎসায় সকলেই সন্তুষ্ট। আমরা দুঃখিত হইলাম জজ সাহেব ইঁহার প্রতি রেজিষ্টরি কার্য্যের ভারার্পণ করেন নাই, ঐ কর্ম্ম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন। যখন পাবনায় সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন রেজিষ্টরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি কেন সে বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। বিচার ও যুক্তি মতে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব কালাচাঁদ বাবুকে রেজিষ্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়াছে।*

এই জিলার সদর মুন্সেফ ভিন্ন অপর দুই জন মুন্সেফ আছেন। যথা—ভাঙ্গা। মুন্সেফ ১। মুখসুদপুর। মুন্সেফ ১। এই দুই স্থানের মুন্সেফ কিরূপ উপযুক্ত ও বিচার-তৎপর আমরা তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। বোধ করি উত্তম হইবেন, কারণ অধম হইলে অবশ্যই দুর্গন্ধ নির্গত হইত।

ফরিদপুরে থানা সাতটা এবং ফাঁড়ি দুইটা। যথা—

থানা নিজ ফরিদপুর কোতয়ালী ১

ঐ	বেলগাছী	২	থানা	মুখসুদপুর	৬
ঐ	ভূষণা	৩	ঐ	শিবচর	৭
ঐ	বাটুকে	৪	ফাঁড়ি	সদরপুর	১
ঐ	তালমা	৫	ঐ	গোপীনাথপুর	২

জিলার রেভিনিউ অর্থাৎ কালেক্টরি সংক্রান্ত মাসিক ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ কোং ১৩৫০ টাকা।

জুডিসিয়েল অর্থাৎ ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের মাসিক ব্যয় সাহেব সহিত সর্ব্বশুদ্ধ কোং ৫০০০ টাকা।

জিলাভুক্ত পরগণা ও তাহার অধিকারিদিগের নাম বিশেষরূপে লিখিত হইল। যথা—

জমা—

পরগণা	জমিদার
হাবিলি	বাবু হরকুমার ঠাকুর
পাটপসার	" বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি
নসিবসাহী	" নিমাইচাঁদ সান্যাল প্রভৃতি
তেলিহাটি	" রামরত্ন রায়
ধুলদী	" ঐ
বেলগাছী	" ঐ রকম ৮০, করমবক্স চৌধুরী।০
সাতোর	" শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী প্রভৃতি
মকিমপুর	রাণী রাসমণি দাসী
তপ্যে বিনোদপুর	বাবু গুরুদাস রায়
রূপাপাত	" ঐ
মহিমসাহী কিয়দংশ	পত্তনিদার রবর্ট সাহেব, নীলকর
নলদী	রাণী কাত্যায়নী

নীলকুটির, কান্সরণের বিশেষ নাম।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ৩ মাঘ ১২৬১

কান্সরণ মীরগঞ্জ। অধ্যক্ষ, মেং মেকেথর সাহেব। ইনি জমিদার, পত্তনিদার ও ইজারদার হওয়াতে প্রজারা সুখি নহে। কারণ তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে।

কান্সরণ পাঁচুড়ে। অধ্যক্ষ মেং রেমি সাহেব। অতি ভদ্র।

কান্সরণ মদনধারি। অধ্যক্ষ মেং বেল সাহেব। প্রজাপ্রিয় নহেন।

কান্সরণ কাসিমপুর। অধ্যক্ষ মেং ডনলপ সাহেব। অতি ভদ্র।

কান্সরণ গাঁড়াখোলা। অধ্যক্ষ মেং রবর্ট সাহেব। প্রজাপ্রিয় নহেন।

কান্সরণ সহবদপুর। অধ্যক্ষ মেং ষ্টেফেন সাহেব। দুরন্ত নহেন।

এই সমস্ত কান্সরণের অধীনে অনেক কুটি, তদ্ভিন্ন জমিদারদিগের বিস্তর কুটি আছে।

নীল এখানে উত্তম জন্মে।

এই জিলাবাসি লোকের মধ্যে কানাইপুরের সিক্‌দারেরা প্রধান ধনাঢ্য, ইহঁারা গুণ্ডী।

সৈয়দপুরের রায়েরা বিখ্যাত ধনি, ইহারাও গুণ্ডী।

জিলার ভদ্রগ্রাম

বেনেবৌ—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য আছেন, তাঁহারাই প্রধান।

পাঁচচর—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য অছেন, তাঁহারাই প্রধান।

খাদারপুর—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য আছেন, তাঁহারাই প্রধান।

মহিষালা—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাঁহারাই প্রধান।

মদনদিয়া—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাঁহারাই প্রধান।

পেয়ারপুর—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাঁহারাই প্রধান!

পশড়া—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাঁহারাই প্রধান।

লক্ষীপুর—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাঁহারই সম্ভ্রান্ত।

কাঁচিআইল—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাঁহারাই সম্ভ্রান্ত।

জালগি—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাঁহারাই সম্ভ্রান্ত।

মোচড়া—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাঁহারাই সম্ভ্রান্ত।

ভাজন ডাঙ্গা—বৈদ্য ও কায়স্থ।

কাফরা—বৈদ্য ও কায়স্থ।

নিজ ফরিদপুরে ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক, ভদ্রলোক অতি অল্প।*

এই জিলায় যত প্রজা আছে তন্মধ্যে মুসলমান ॥৵৹ দশ আনা, হিন্দু।৵৹ ছয় আনা।

এই অল্প ভাগ হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ॥৹ আনা, বৈদ্য ⁄৹ আনা, কায়স্থ ৵৹ দুই আনা, অপর সকল জাতিতে।⁄৹ পাঁচ আনা হইবে।

ভদ্র কায়স্থ অত্যল্প, আর সমুদায় ইতর। কায়েতে দাঁড় বহে, মোট বহে, খানসামাগিরি করে, খেজুর গাছ কাটে। লেটেলি করে, না করে এমন কর্ম্মই নাই। ইহারা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিতে পারিলে ধন বলে আবার বড় কায়েৎ হইয়া বসে। ফরিদপুরের কয়েক জন ইতর কায়স্থ অর্থ প্রভাবে কলিকাতায় গণ্য ও মান্যরূপে চলিত হইয়াছে।

এখানে নবসাক প্রায় নাই, তাহারদের সংখ্যা গণনার মধ্যেই নহেন।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ৪ মাঘ ১২৬১

এই স্থানে "কুশলনাথ" নামে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, জিলাবাসি প্রজা মাত্রেই দেবতা বলিয়া অতি ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ব্বক সেই বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার দিবসে তাহার তলে সমারোহ ঘটিত মেলা হইয়া থাকে। তাবতেই চিনি দুগ্ধ দিয়া পূজা দেয়। ছাগ মেষ বলিদান করে। শুভ প্রার্থনায় পূজা মানে, ধন্না পাড়ে।*

ঢোল সমুদ্র—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি বাটির লাগাও দক্ষিণে "ঢোল সমুদ্র"। এই ঢোল সমুদ্রকে সমুদ্রবৎ বলিলেই হয়। চতুর্দ্দিকেই সমান, ইহার প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ দুই ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার জল অতি মিষ্ট ও উপকারক। ইহাতে নানা জাতীয় মৎস্য যথেষ্টই পাওয়া যায়। জেলে মালারা সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া মৎস্য ধরিতেছে। ঢোল সমুদ্র দেখিতে অতি সুন্দর, তাহার জলে বিবিধ প্রকার জলচর পক্ষিও চরে, চরচর পক্ষি চরিতেছে —ক্ষুধা হরিতেছে—মধুর স্বরে সুধা ক্ষরিতেছে, গান ধরিতেছে, ভাবুক মনুষ্যের কর্ণে পীযূষ ভরিতেছে। মোহিত করিতেছে। বর্ষাকালে যখন পদ্মার সহিত ইহার সংযোগ হয় তখন আরো অধিক শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সময়ে তাঁহারা নৌকাপথে ভ্রমণ করেন, তাঁহারা পরমানন্দে পূর্ণ হইতে থাকেন।

বাণিজ্য—ফরিদপুর বাণিজ্য কার্য্যের প্রসিদ্ধ স্থান। সমুদয় নদ নদীর মধ্য দিয়া নিয়ত নানাবিধ দ্রব্য পূরিত কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। এই জিলার অন্তঃপাতি সৈয়দপুর নামক স্থান ব্যবসায়ের প্রধান স্থান। বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি এত অধিক চিনি ও গুড়ের ক্রয় বিক্রয় হয় না। এখানে কি খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি, কি আকের গুড় ও আকের চিনি, সকলি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কলিকাতার হৌস ওয়ালাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মকারকেরা সর্ব্বদাই তথায় বাস করতঃ চিনি গুড় ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন। উক্ত সৈয়দপুর হইতে প্রতি দিবসেই কলিকাতা নগরে নৌকা রপ্তানি হইতেছে।

এই জিলার সাঁতোর পরগণায় যেমন উৎকৃষ্ট শীতলপাটি প্রস্তুত হয় সেরূপ আর কোন-খানেই হয় না। ঐ স্থান হইতে কয়েকটা অতি পরিপাটি শীতলপাটি প্রস্তুত হইয়া বিলাতের মহামেলায় প্রেরিত হইয়াছিল।

শস্য—তণ্ডুল উত্তম হয়, কিন্তু প্রচুর রূপে জন্মে না, যে পরিমাণ জন্মে তাহাতে জিলার লোকেরি নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, সুতরাং অন্যত্র প্রেরিত হইতে পারে না।

ছোলা, মটর, অড়হর ও মুসারি অধিক জন্মে, একারণ অন্যত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার অড়হর অতি উপাদেয়, এক ভাবেই দ্রব হইয়া যায়।

স্বোণামুগ হয় না, হারিমুগ, কলাই ও খেঁসারি অল্প জন্মে।

পাট, সোণ, তিসি, সর্ষা প্রভৃতি যে পরিমাণ হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

খেজুরগাছ এখানকার প্রধান সম্পত্তি। খেজুরগুড়ের ব্যবসা করিয়া অধিক লোক প্রতিপালিত হয়।

আখের চাষ অল্প নহে, কিন্তু খেজুরের অপেক্ষা ন্যূন বটে।

আম্র ভাল জন্মে না, যাহা হয় তাহা পোকায় পরিপূরিত। তাল বৃক্ষ প্রায় নাই, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ বিস্তর আছে।

এখানে গোল আলু চাস নাই। কিন্তু লাউ, কুমড়া, সিম, বেগুণ, পটল, উচ্ছা, চুপড়ি

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ৫ মাঘ ১২৬১

আলু, থোড়, মোচা, কলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার তরকারির অভাব নাই, পরিমিতরূপে উৎপন্ন হয়।

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মৎস্যের কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, এই কয়েক দ্রব্য অতি সুলভ ও সুস্বাদু।

এখানকার অধিকাংশ প্রজাই অত্যন্ত দুঃখি ও শঠ, তাহারা প্রায় তাবতেই ইতরবৃত্তি দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।*

সুধারাম—২৬ পৌষ ১২৬১

সম্পাদক মহাশয়! আমি গত দিবস যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে সুধারামে আসিয়া প্রাণাধিক সদগুণান্বিত বন্ধু বাবু গুরুচরণ যশ মহাশয়ের বাসায় অবস্থিত হইয়াছি। ইনি আমাকে কিরূপ সমাদরে রাখিয়াছেন এবং এই দূরদেশে ইঁহার সমীপস্থ হইয়া কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব। এই যশের যশের বিষয় দশের মুখেই ঘোষিত হইতেছে, এমত সজ্জন মনুষ্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুধারাম, সুধারাম মজুমদার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই স্থান পূর্ব্বে জনশূন্য নদীর চর ছিল, সুধারাম প্রজা পত্তন পূর্ব্বক আপন নামে নাম প্রদান করিলেন। তাহাতেই সুধারাম নামে বিখ্যাত হইল। এ সুধারামের তিন নাম, সুধারাম, ভুলুয়া ও নওয়াখালী, যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মালয়, বিদ্যালয় ও জমিদারের কাছারী এবং হাট বাজার সেই স্থানের নাম সুধারাম, কিন্তু কালেক্টরি সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যে "জিলা ভুলুয়া" এই শব্দ লিখিত হয়। ফৌজদারী ও নিম্‌কিতে "জিলা নওয়াখালী" এই বাক্য লিখিত হইয়া থাকে, এবং জমিদারের কর্ম্মকারকেরা "সুধারাম" এই শব্দ লিখিয়া থাকেন।

"ভুলুয়া" নামক একটী পরগণাতেই কেবল একটি জিলা, সংপ্রতি এই ভুলুয়ার কিয়দংশ "খারিজ" হইয়া দুই একটা নূতন পরগণার জন্ম হইয়াছে। ফলে. তাহা অতি ক্ষুদ্র, ভুলুয়ার চতুর্দ্দিকের সীমা অতি বৃহৎ ; ভুলুয়া পরগণা তিন নাম ধারি স্বয়ং এক জিলা এবং জিলা ত্রিপুরা ও জিলা চট্টগ্রামের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে। উক্ত জিলা ও পরগণার প্রধান জমিদার শ্রীমান রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ইঁহারা পুরুষানুক্রমে সর্ব্বাংশেই প্রধান, সে বিষয় কাহারো অবিদিত নাই, সর্ব্বত্রই ব্যক্ত আছে। বিশেষতঃ উক্ত দুই সহোদর অতি মহাত্মা, প্রকৃত সাধু, অত্যন্ত মহৎ, সদ্বিদ্বান, বিনয়ি মর্য্যাদক, দেশহিতৈষি, আপনারা যেমন সর্ব্বেতোভাবে প্রধান, পরগণাটিও যেমন প্রধান, সেইরূপ পরগণার সুপ্রেণ্টেডেণ্ট পদে একজন প্রধান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ভুলুয়ার প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি। ইহাতে ছদ্মবেশে ও প্রকাশ্যভাবে, নানারূপে পরীক্ষা করিতেও অনুসন্ধান লইতে বাকি নাই। জিলা শুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ভদ্র, কি অভদ্র, সমস্ত প্রজাই অতি সরল চিত্তে অকপটে মুক্তকণ্ঠে গুরুচরণ বাবুর সুখ্যাতি করিতেছে, যাহারা রাজারদিগের প্রজা নহে, কোন সম্বন্ধই রাখে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করেন, অথবা বাণিজ্য কিম্বা অপর কোন উপায় দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন তাঁহারাও ইহার প্রণয় জালে চিরবদ্ধ হইয়াছেন, সকলেই কহেন। এই পরগণার বয়সে কখনই ইঁহার ন্যায় এমত সুজন ধার্ম্মিক নির্দ্দোষ পুরুষ কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া এখানে আসেন নাই, ফলে তাহাই যথার্থ, যেহেতু অতবড় একটা জিলার ভিতরে এ ব্যক্তির কেহই শত্রু নাই,

* সংবাদ প্রভাকর॥ ৬ মাঘ ১২৬১

ভাবতেই মিত্র। কেননা ইনি লোভের অধীন নহেন, প্রজার ও প্রভুর কিছু মাত্র হানি করেন না। উভয়েরি মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই গুণরত্নে কে না কেনা হইবে ?

অদ্য আমি সংক্ষেপ মাত্র মাত্র লিখিলাম। অবিলম্বেই জিলার সমস্ত বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিব। আমা হইতে প্রভাকরের যত সাহায্য হয়, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।

সংপ্রতি এখানকার জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ. বি. সিমসন সাহেব সরকুটে গমন করিয়াছেন, ইহার অনবস্থানে আসিষ্টান্ট মেং আলেক্‌জেণ্ডর সাহেব মাজিষ্ট্রেটি পদের চলিত কর্ম্ম এবং অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ শর্ম্মা নির্ব্বাহ করিতেছেন, মেং সিম্‌সন্ সাহেব অতি যোগ্য ও ভদ্র, সকলেই তাঁহার অনুরাগ করিতেছে।

এই নওয়াখালীতেও প্রতিমাসেই একখানা করিয়া গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজ আসিয়া থাকে, সেই জাহাজে এখানকার রাজস্ব কলিকাতার ট্রেজরিতে প্রেরিত হয়। বর্ত্তমান জানু-আরি মাসে এ পর্য্যন্ত ষ্টিমার আইসে নাই, এক সপ্তাহ গত হইল তাহার আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেন আইল না, ও কি জন্য এত বিলম্ব হইতেছে, তাহার কারণ কিছুই ব্যক্ত হয় নাই, প্রায় আট লক্ষ টাকা বক্সবন্দী হইয়া খাজনাখানায় মজুদ রহিয়াছে, দুইবার তাহার চট উয়ে নষ্ট করিল, তৃতীয়বার আবার নূতন চট দেওয়া হইয়াছে, এবারেও কি হয় বল যায় না।

সুধারামে আসিয়াও আমরা কিছুমাত্র শীত পাইলাম না, মধ্যাহ্ন সময়ে বরং গ্রীষ্মানুভব হইয়া থাকে।

এখানে নদীর জল অতি অপকৃষ্ট, পুষ্করিণীর জল অতি উত্তম।

আগমনকালে লক্ষ্মীপুর ও দালাল বাজারের অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। অধুনা লক্ষ্মীপুর প্রকৃত লক্ষ্মীছাড়া অলক্ষ্মীপুর হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কুটি উঠিয়া যাওয়াতেও যাহা ছিল তাহাও নদীতে শেষ করিয়া দিয়াছে, সমুদয় ভাঙ্গিয়া লইয়াছে, যেখানে ৫০০ ঘর ধনি মহাজন ছিল সেখানে আর এক জনো নাই, সে "বাপ্তা" বস্ত্র আর প্রস্তুত হয় না, যেখানকার বস্ত্র লইয়া বিলাতের লোকেরা শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতেন, সেখানকার লোকেরা এইক্ষণে বিলাতিবস্ত্র কিনিয়া অঙ্গ আবরণ করিতেছে, যোগি জাতিরাই এখানে বাপ্তা প্রস্তুত করিত, অধুনা তাহাদের বংশ ভাবতেই তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াছে।

দালাল বাজারের ৺রাজা গৌর কিশোর। যিনি জেতে যোগী ছিলেন। পাঁচকড়া অংশের দালালি পাইয়া বিস্তর ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কয়েকখানা জমিদারী ক্রয় করেন। এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। নানা প্রকার সৎকর্ম্মের দ্বারা বিখ্যাত হয়েন। অতি সুন্দর অট্টালিকা ও দেবালয় সকল নির্ম্মাণ করেন। অধুনা তাহার সেই বাটীর অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। সে শোভা কিছুই নাই, ক্রমেই ভগ্ন হইতেছে। বিষয় যাহা আছে তাহার অধিকাংশই দেবসেবাতে ব্যয় হইয়া থাকে। এদিকে আবার তাঁহার পোষ্যপুত্র গোবিন্দ কিশোরের সহিত দৌহিত্রদিগের মোকদ্দমা চলিতেছে। তাহাতেই প্রাচীন ঘরটা ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়পক্ষে কেন রফা করেন না, শেষ কি দফা রফা হইলে রফা করিবেন ?*

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২১ মাঘ ১২৬১

সুধারাম—৬ মাঘ, ১২৬১

ভ্রমণকারি বন্ধু লেখেন, এখানকার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মেং সিমসন সাহেব পুনর্ব্বার প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র বিনাশ করিয়াছেন। ঐ শার্দ্দূল একটি মনুষ্য হত্যা করিয়াছিল তাহার শরীর ৭ সাত হস্তের ন্যূন নহে।

উক্ত সাহেব আগামি সরকুট শেষ করত কাছারির আসনে উপবেশন করিবেন।*

সুধারাম—১ মাঘ, ১২৬১

এখানকার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মেং সিমসন সাহেব বড়দিনের দিবসে তাহার অধীনস্থ সমুদয় আমলাদিগের মর্য্যাদা পূর্ব্বক উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি তাবতেই এই মহাভোজে মহা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে সাহেবের অন্যূন ৭৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সকলেই নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন, পোলাও, কালিয়া ও বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন পরমানন্দে উদর পূরিয়া আহার করিয়াছেন। এ বিষয়ে সাহেবকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবেক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি জমিদারী কাছারীর আমলাদিগের এই ভোজ সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহার শুভানুধ্যায়ি অধীন বটেন।

উক্ত সাহেব সংপ্রতি মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহাতে তাহার এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম, অর্থাৎ অধিকারের অবস্থা দর্শন এবং মৃগয়া করণ দুই কার্য্যই চলিতেছে। তাহার সহিত ৫ পাচটা হস্তি আছে। কয়েক দিবস হইল তিনি গুলির দ্বারা প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র বিনাশ করিয়াছেন! ঐ শার্দ্দূল শ্রীমান রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের হস্তির শুণ্ড নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে।

গত ২৮ পৌষ শেষ রাত্রি এবং পর দিবস প্রাতে এখানে বৃষ্টি হইয়াছিল। একারণ গত দিবসাবধি শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ঢাকা কালেজের বৃত্তান্ত

কালেজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও শ্রেণী

কালেজ তিন অংশে বিভক্ত আছে। যথা—কালেজ ডিপাটমেণ্ট, সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট ও জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট। কালেজ ডিপাটমেণ্টে প্রথমতঃ দুই শ্রেণী ছিল, পরে ১৮৪৯ সালে চারি শ্রেণী হইয়াছে। সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে প্রথমতঃ দুই শ্রেণী ছিল, ১৮৫১ সালে তিন শ্রেণী হইয়াছে এবং জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টেও চারি শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত। এবং চতুর্থ শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ছাত্র অধিক হইলে তিন চারি অংশেও অংশীকৃত হইয়া থাকে।

ছাত্রের বেতন

প্রথমত স্কুল স্থাপন হইলে ছাত্রদিগের বেতন লাগিত না, পরে ১৮৩৭ সালাবধি অত্যল্প বেতন দিতে হইত। তদনন্তর কালেজ স্থাপিত হইলে পর প্রথমতঃ জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে অর্দ্ধ মুদ্রা, এবং সিনিয়ার ও কালেজ ডিপাটমেণ্টে এক মুদ্রা বেতন দিতে হইত। তৎপরে ॥০ অর্দ্ধ মুদ্রার স্থলে এক মুদ্রা এবং এক মুদ্রার স্থলে দেড় তঙ্কা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল, জুনিয়ার ডিপাটমেণ্টে পূর্ব্বমত এক মুদ্রা, কিন্তু সিনিয়ার ও কালেজ ডিপার্টমেণ্টে দুই তঙ্কা বেতন দিতে হয়। ছাত্রবৃত্তি ভোগিদিগের বেতন লাগে না।**

---

*সংবাদ প্রভাকর ॥ ২১ মাঘ ১২৬১ ** সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৪ মাঘ ১২৬১

এখানে ৮টি ত্রিংশৎ তঙ্কা করিয়া সিনিয়ার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি আছে ও ৮ আটটি করিয়া ১২টি জুনিয়ার অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি আছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিভোগিরা দুই বৎসর ক্রমাগত ছাত্র বৃত্তি রক্ষা করিতে শক্ত হইলে চত্বারিংশৎ মুদ্রা পাইয়া থাকেন। গত পরীক্ষায় যাঁহারা ছাত্রবৃত্তিভোগি হইয়াছেন তাঁহাদের নাম।

নাম	কোন্ শ্রেণী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন	ছাত্রবৃত্তির বিবরণ		মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কালেজ ডিপার্টমেণ্ট	প্রথম শ্রেণী		৪০	
মেং সি. এষ্টিফেন	ঐ	ঐ		৪০	
মেং টি কালনাযু	ঐ	দ্বিতীয় শ্রেণী		৪০	
উমাকান্ত ঘোষ	ঐ	ঐ		৪০	
ঈশ্বরচন্দ্র বসু	ঐ	ঐ		৪০	
দীনবন্ধু মল্লিক	ঐ	তৃতীয় শ্রেণী		৩০	
গিরিজাশঙ্কর দাস	ঐ	চতুর্থ শ্রেণী		৮	
কালীপ্রসন্ন রায়	ঐ	ঐ		৮	
রাধাগোবিন্দ মৈত্র	সিনিয়র ডিপার্টমেণ্ট	প্রথম	দ্বিতীয় শ্রেণী	৮	
রাজচন্দ্র সান্যাল	ঐ	ঐ	ঐ	৮	বহরমপুর কলেজে গিয়াছেন
কালীনাথ বিশ্বাস	ঐ	ঐ	ঐ	৮	(বহরমপুর কলেজে গিয়াছেন)
মদনমোহন গুপ্ত	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
রাজকুমার রায়	ঐ	ঐ	ঐ	৮	বহরমপুর কলেজে গিয়াছেন
ঈশানচন্দ্র নাগ	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
আনন্দমোহন মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
শরচ্চন্দ্র সেন	ঐ	ঐ	ঐ	৮	কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন
ব্রজমোহন রায়	ঐ	ঐ	ঐ	৮	
মেং এম. জে. ষ্টিফেণ	ঐ	ঐ	ঐ	৮	

এতদ্ব্যতিরিক্ত আরো কয়েকজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ছাত্র বৃত্তি খালি না থাকায় প্রাপ্ত হয়েন নাই।*

পুরস্কার

অত্রত্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত সজ্জনেরা দানশীলতা, গুণগ্রাহকতা ও বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পুরঃসর প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষান্তর সকলেই যথাসাধ্য মতে পুরস্কার বিতরণে পরাঙ্মুখ হয়েন না, এ নিমিত্ত মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল বিদ্যোৎসাহি মহাত্মাদিগ্যে ধন্যবাদ প্রদান করি। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় বদান্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক এ কালেজে প্রতি বর্ষে সহস্রাধিক মুদ্রার নানাবিধ পুরস্কার বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর যাঁহারা নিয়মিত সংখ্যা প্রদান করেন, তাঁহারদিগের নাম ও

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৫ মাঘ ১২৬১

মুদ্রার সংখ্যা নীচে লিখিত হইল। যথা,

দাতার নাম	মুদ্রার সংখ্যা	বিশেষ বৃত্তান্ত
শ্রীযুক্ত এন. পি. পোগোস	১০০	(স্বর্ণমুদ্রা) ইনি কালেজের ছাত্র ছিলেন।
" হেনরী এথার্টন	১০০	পূর্ব্বে এখানকার আবকারি কমিশ্যনর ছিলেন।
" জে. পি. ওয়াইস	৫০	
" খাজে আলী মূল্যা	৫০	
" চার্লস এলেন	২৫	
" জে. ষ্টিফেন	৫০	
" কে. ষ্টিফেন	১০০	ইনি পূর্ব্বে কালেজের ছাত্র ছিলেন।
" বাবু রামলোচন ঘোষ	৪০	এইক্ষণে জিলা কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমিন
" বাবু রাজমোহন রায়	৪০	
" বাবু মিত্রজিৎ সিংহ	৪০	

" ডনেলি মেডাল নামক রৌপ্যমুদ্রা ৫০—ডনেলি সাহেব পূর্ব্বে এখানকার আবকারি কমিশ্যনার ছিলেন এবং এখানে তাঁহার পরলোক হইলে পর তাঁহার অধীন কর্ম্মকারিয়া তাঁহার নাম চির স্মরণীয় করণার্থে এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য মুদ্রা দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতিরিক্ত এই জিলার সিবিল সংক্রান্ত সাহেবেরাও কেহ কেহ শ্রীযুক্ত ও বাবু সনাতন বশাখ ও শ্রীযুত বাবু রাইমোহন রায় ও অন্যান্য কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন।

পুরস্কার বিতরণ—পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোকেল কমিটির মেম্বর ও অধ্যক্ষ দ্বারাই এই মহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরে ১৮৪৯ সাল হইতে ক্রমিক দুই বৎসর মান্যবর মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেব আসিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে এক বৎসর কৌন্সেলের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত মোয়েট সাহেব আসিয়াছিলেন, পরে এক বৎসর শ্রীযুত ডাক্তার গ্রাণ্ট যিনি পূর্ব্বে কৌন্সেলের মেম্বর ছিলেন এবং গত সন এখানকার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সারজন সাহেব তৎপরিবর্ত্তে এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই বৎসর কি হয় বলা যায় না। কৌন্সেলের কেহ আসিয়া পুরস্কার দিলে যে ছাত্র ও লোকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহার সন্দেহ কি?

পুস্তকালয়—এইক্ষণে কালেজে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৯৫৩ এক সহস্র নয়শত ত্রিপঞ্চাশৎ গ্রন্থ।

কালেজ বাটী—পূর্ব্বে ভাড়াটিয়া একবাটী ছিল, পরে ৩৬৬৬১।৶৩ মুদ্রা ব্যয় দ্বারা এক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তত্রাচ পারিতোষিক বণ্টন কিম্বা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য একটি বৃহৎ ঘর নাই, পুরস্কার বিতরণ কালে কালেজ বাটীর উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ মধ্যে এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১৮৪৬ সালের ১ মে অবধি এই বাটীতে কালেজ হয়।

পরিশেষ—উপরোক্ত বৃত্তান্ত সমস্ত হইতে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক যে, ঢাকা জিলার চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল লোকেই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। এমত বিদ্যালয়ের যথার্থ যে উপকার তাহা তাঁহারাই সুন্দরমত অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই, ইহা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার, বিদ্যা শিক্ষা ও অন্তরকরণ প্রশুদ্ধ করার স্থল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাকরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি

জিলার লোকদিগের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থলই ঢাকা কালেজ। উপরোক্ত সকল স্থানেই এক একটি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় আছে বটে, কিন্তু সে সকলই এই কালেজের অধীন, এবং তথা হইতে এই ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে ঐ ছাত্রবর্গ এই কালেজে আসিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই কালেজের শ্রীবৃদ্ধি শ্রীযুত লুয়িচ সাহেবের দ্বারা সংপূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এবং আমরা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট অহরহ এই প্রার্থনা করি, যে, তিনি ত্বরায় ইংলণ্ড হইতে সুস্থ হইয়া প্রত্যাগমন পুরসর স্বীয় কর্ম্ম পূর্ব্বমত নির্ব্বাহ করত বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের লোক সমূহের সুখ সমৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় পত্র—মহামান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অত্র কতিপয় দিবস অবস্থিতি করত সদালাপ ও সৌজন্য দ্বারা মহাশয় অস্মদাদিকে যাদৃশ বাধিত করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। মহাশয় সুধারাম গমন কালীন অত্রত্য মহাবিদ্যালয়ে আদিমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালীয় সমস্ত বিবরণ আমারদিগকে সংগ্রহ পুরসর প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মৈত্র মহাশয় কথিত বিষয় প্রস্তুত করত অদ্য প্রেরণ করিলেন, এ বিধায় উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার আমরা প্ররচন করিলাম না, নিবেদন ইতি। পৌষ মাসীয় চতুর্ব্বিংশ দৈবসিক লিপী।

ঢাকা কালেজ। নিঃ পত্র। শ্রীহরকিশোর বসোঃ শ্রীচন্দ্রকুমার গুহ রায়স্য। শ্রীকালীনাথ মিত্রস্য।

উল্লিখিত ছাত্রগণের নিকট অতিশয় বাধিত হইলাম।*

জিলা ভুলুয়ার পুরাতন ও বর্ত্তমান বিবরণ

সুধারাম—৫ মাঘ, ১২৬১

বাঙ্গালা ১১৮৬ সালে মেং জান সাহেব এজেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়া নওয়াখালীতে আগমণ পূর্ব্বক নিমক পোক্তান আরম্ভ করেন।

ইংরাজী ১৮২২ সালে ভুলুয়া জিলা স্থাপিত হয়, তৎকালে মেং প্লোডিন সাহেব কালেক্টারের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এখানে কেবল উল্লিখিত নিমক পোক্তানের এজেণ্টের অফিস মাত্র ছিল, তাহাতে বিস্তর নিমক প্রস্তুত হইত, এইখানে পোক্তান রহিত হওয়াতে এজেণ্টের আফিস উঠিয়া গিয়াছে, শুদ্ধ কয়েকটা চৌকির অধ্যক্ষতা পদে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োজিত আছেন।

কালেক্টরি ও মাজিষ্ট্রেটি স্থাপনের পরে কিছুদিন আদালত অর্থাৎ রেজিষ্টরি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুদিন হইল তাহাও রহিত হইয়াছে। অধুনা এ জিলার শান্তি সম্বন্ধীয় কার্য্য ও বিচার জিলা ত্রিপুরার সিবিল ও সেসন জজের অধীন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত তাবদ্ব্যাপার জিলা চট্টগ্রামের কমিস্যনর সাহেবের অধীন হইয়াছে। এখানে শুদ্ধ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের "মহকুমা" মাত্র রহিয়াছে।

মেং এফ. বি. সিমসন সাহেব জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন, তিনি যোগ্য, নিরপেক্ষ, সুবিচারক।

মেং আলেকজেণ্ডার সাহেব আসিষ্টাণ্ট, ইনি বিষয় কর্ম শিক্ষা করিতেছেন।

---

* সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক॥ ২৩ মাঘ ১২৬১

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ শর্মা, আবকারি ডেপুটী কালেক্টর। বাবু রামগোপাল ঘোষ রায় বাহাদুর, ডেপুটী কালেক্টর—কালেক্টর—ইহারা উভয়েই উপযুক্ত ও সজ্জন।

শ্রীযুত মৌলবী আলি হায়দর, সদর আমিন, সুবিচারক ও অতি উত্তম।

মেং পিকাক্ সাহেব, নিমক চৌকির সুপ্রেণ্টেণ্ডেন্ট, পূর্ব্বে হাবড়ায় ছিলেন, ইহাকে অনেকেই জানেন, বাঙ্গাল বাবুর দ্বারা গুণ প্রকাশ আছে, সুতরাং লেখা বাহুল্য মাত্র।

জিলার সীমা—মহাসমুদ্রের উত্তর। ফড়ফেণির পশ্চিম। জিলা ত্রিপুরার হোসনাবাদ তিষ্ণ, বাগসরাই ও হাজিগঞ্জ প্রভৃতির দক্ষিণ। এবং তেঁতুলা ও মেঘনা নদীর পূর্ব্বভাগে।

ইংরাজী ১৮৫২ সালের আপ্রিল অবধি ১৮৫৩ সালের মে পর্য্যন্ত সমুদয় আয় ব্যয়ের বিবরণ।

কালেক্টরি রাজস্ব	১০০৬২৪২৸৵৭
খাসমহলের উৎপন্ন	২৪৭৪৬১৸/০
সমষ্টি	১২৫৩৭০৪॥৶/৭
গুদরা	৩৫০০
ট্যাক্স	৭৯২
জরিবানা	২৫০
জেলখানার উৎপত্তি	১৬৮৮৸/৪
সমষ্টি	৬২৩০৸/৪
সর্ব্ব সমষ্টি	১২৫৯৯৩৫॥১১
তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ আয় ঃ	
ভূমি সম্পর্কীয় স্থির জমা	৬৪৬১৩৯/৯
ঐ অস্থির জমা	১৫৬৩৷/৭
	৬৪৭৭০০৷৶/৪
হাট বাজার ইত্যাদির কর	২৮২৪৷৵৩
লাভ লোকসান, জরিবানা এবং হুণ্ডিয়ান প্রভৃতি।	৭৮১॥৶/০
কোর্ট ওয়ার্ডের অর্থাৎ নাবালকি বিষয়ের আয়	৪৫৷০
আখরাজাত তহশিল	১৪০২৵১
ক্রোকি মহলের আখরাজাত	২৪৫৪॥৵৩
কলিকাতার আমদানি রেবিনিউ রেমিটেন্স	৩৪৬৫০৲
হুণ্ডি	৩৫১৯৭৷/৮
শালট রেমিটেন্স	৪৩৪৩৭২/১
ডিপজিট	৬৫১০৫৸৵৩
ডাক অফিসের উৎপন্ন	২২০৮৷৶/৬
জুডিসিএল রিমিটেন্স	১১৪৮৩॥/৭

লোন	২০০০/
মালিকানা	৮৮২৩৸৪
সিভিল ফণ্ড	৯২৯॥৶/১০
এনিউটি ফণ্ড	৭৯৭/ ৮
আরাকান ফণ্ড	৫১৸৶/৯
মেডিকেল ফণ্ড	২৬২॥/০
মিলেটরি ফণ্ড	৪৬১॥৪
মিলেটরি পেমেণ্ট	৭৫৲
ষ্টাম্প	৩৪২৯৩৸৶/০
ফৌজদারি বেমকররি	১৭২৵১
কালেক্টরি বেমকররি	৩৷/১
কাগজের নকল ও এস্তকালি ফিজ	১৮৬৵৬
আদালতে খরচ উসুল	৬৯৭৷৶/১
মিণ্ট মাষ্টারের জরিপ খরচ	১৭৫॥/৯

সমষ্টি ১২৮৭১৩০টাকা*

স্থধারাম—৫ মাঘ, ১২৬১

হে মহাশয়! উক্ত সময়ের মধ্যে যে যে বিষয়ের যত ব্যয় হইয়াছে তদ্বিশেষ।

কালেক্টরী সম্পর্কিত সমুদয় ব্যয়	৪২৬৬৭৷৵১
ফৌজদারী ঐ ঐ ঐ	৫৬৯২৪॥২
নিমক মহল ও অন্যান্য বাজে আফিস সম্পর্কীয় সমুদয় বিষয়ের ব্যয়	২০৭৩৮৭৫
জেলখানার উৎপন্ন হইতে দারোগাকে ফিস দেওয়ায়	১৭২৵৭
ব্যয়ের সর্ব্ব সমষ্টি	২৯৭১৬১৷/৬

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৭ মাঘ ১২৬১

এই জেলার অধীনে বেগমগঞ্জ, আমীর গাঁ, দৌলত খাঁ এবং সন্দীপ, এই চারি স্থানে চারি জন মুন্সেফ নিয়োজিত আছেন।

থানা ১০ দশটা ও ফাঁড়ি ২ দুইটা আছে। যথা—

থানা বেগমগঞ্জ	—	১
থানা রামগঞ্জ	—	১
থানা হাতিয়া	—	১
থানা সন্দীপ	—	১
থানা বামনী	—	১
থানা ছেঁদে	—	১
থানা আমীর গাঁ	—	১
থানা লক্ষ্মীপুর	—	১
থানা ধর্মেসনে	—	১
থানা সুধারাম। সদর কাতয়ালী		১
		১০
ফাঁড়ি ফরাসগঞ্জ	—	২
ফাঁড়ি রায়পুর, এখানে কেবল একজজন বরকন্দাজ আছে		১
		১

নওয়াখালীতে ৯ নয়টা নিমক চৌকীতে ৯ নয়জন দারোগা নিযুক্ত আছেন। যথা—

চৌকী সন্দীপ	—	১
চৌকী হানিয়া	—	১
চৌকী শাহাবাজপুর		১
চৌকী নওয়ালী	—	১
চৌকী জগুদিয়া	—	১
চৌকী দক্ষিণ শীক	—	১
চৌকী লক্ষ্মীপুর	—	১
চৌকী লালগঞ্জ	—	১
চৌকী মেঘনা পেটরান		১

এখানকার জেলখানার কয়েদিরা ইষ্টক, মোড়া, বস্ত্র, পাটি, চিক ও কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

এ জিলায় নীলের কুটি একটিও নাই, ইহাতে প্রজারা অত্যন্ত সুখি, কাহারো কিছু মাত্র দুঃখ নাই।

এখানকার ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ পরগণা ভুলুয়া এবং আমিরাবাদ। জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তথা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

পং—বাবুপুর
জং—তালেক
পং—আলীনগর, বেসরাবাদ
জং—মেং কোরজন সাহেব
পং—দক্ষিণ শাহাবাজপুর।
জং—খাজে আরতুন ও অন্যান্য।
পং—সায়েস্তানগর।
জং—শ্রীমতী যোগামায়া দেবী ৸০ আনা
জং—পাণ্ডবচন্দ্র রায় ।০ আনা
পং—বাবুপুর
জং—কৃষ্ণকান্ত রায় ও প্যারীসুন্দরী দাসী প্রভৃতি
পং—কৃষ্ণদেবপুর।
জং—কালিদাস ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য।

বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ এই পরগণা আপনার পুরোহিতকে দান করেন। অধুনা সেই পুরোহিতের সন্তানেরা ১০০০ টাকা মাল গুজারী দিয়া প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০০ টাকা উপস্বত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, যদি রীতিমত, বন্দোবস্ত হয়, তবে এক লক্ষ টাকার লভ্য হওনের সম্ভাবনা।

পং—ওমরাবাদ।
জং—আমীরুদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য।
পং—ডাঁডরা।
জং—মহম্মদ ফয়জ্ মিয়া ও অন্যান্য।
পং—ভবানীচরণ।
জং—যোড়শীবালা ও বামাসুন্দরী দেবী।
কিসমৎ—দুর্গাচরণ ও সন্দীপ ইজারদার।
জং—সরফৎ আলী চৌধুরী।
পং—কাঞ্চনপুর।
জং—একজন মুসলমান।
পং—আবদুল্লাপুর।
জং—বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি।

পং—জুগুদিয়া।
জং—উমাকান্ত সেন প্রভৃতি।
পং—কাদবা, বেদরাবাদ, আমিরাবাদ।
জং—রাণী অন্নপূর্ণা এবং মেং কোরজন সাহেব প্রভৃতি।
পং—বৈকুণ্ঠপুরের কিয়দংশ।
জং—কৃষ্ণকুমার বসু প্রভৃতি।
পং—গোপালপুর, খাসমহল।
যোগমায়া দেবীর ইজারা।
এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা থাকিতে পারে।

পরন্তু কাঞ্চনপুর, রামচন্দ্রপুর, ঘোষবাঘ, অশ্বদিয়া প্রভৃতি পরগণায় বিস্তর খারিজা তালুক আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন তালুকে দুই টাকা পর্য্যন্ত মালগুজারী আছে।*

সুধারাম—৫ মাঘ', ১২৬১

চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরার এবং ঢাকার কিছু কিছু অংশ লইয়া এই জিলা স্থাপিত হয়।

জিলার মধ্যে মুসলমান ৮৵০, হিন্দু ৵০ আনা, এই দুই আনা হিন্দুর মধ্যে ভদ্র জাতি অর্দ্ধ আনার কিঞ্চিৎ উপর হইলেও হইতে পারে, নচেৎ তাবতেই ইতর জাতি।

চামড়াখোলা, খিলপাড়া, বাবুপুর, সুধারাম, ওমরাবাদ, ডাঁওরা, ভুলুয়া ও জুগদিয়া প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রামে ভদ্র লোকের বসতি আছে।

এখানকার কায়স্থে পাল্কি বহে, তাহারা শূদ্র জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারদিগের জল সকলে ব্যবহার করে। কিন্তু তাহারদের গুরু-পুরোহিতের জল কেহ স্পর্শ করে না।

এ জিলার কিশোরগঞ্জ, দুখমুখা, ওটার হাট, স্বোণাইমুরি, প্রতাপগঞ্জ ও ধর্ম্মগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মেলা হইয়া থাকে।

সুধারাম, কালীতারা, বিবির বাজার, বড় বাজার, কিশোরগঞ্জ, ক্রস সাহেবের হাট, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, দালাল বাজার, শন্তোসীতা, দৌলত খাঁ, আমানি, ছেঁদে, জুগুদে, ভুলুয়া: বেগমগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক স্থানে বাজার আছে, তাহার কোন কোন বাজার দুই বেলা ও কোন কোন বাজার এক বেলাই হয়, তদ্ভিন্ন বার বিশেষে হাট হইয়া থাকে।

অপিচ স্বোণামুড়ি, প্রতাপগঞ্জ, পাল্লার হাট, চন্দ্রগঞ্জ, চেঙ্গচেতল, ভবাণীগঞ্জ, বক্তার:মুন্সী স্বোণাপুর, ফরাসগঞ্জ, ধর্ম্মপুর, খিলপাড়া, দত্তপাড়া, পুকুরদিয়া, চৌমুহিনী, প্যারীসুন্দরী, গোলকবাবুর হাট, আটবেগী, জগদানন্দ, তেরহেঁকি, সম্পদ সাহার হাট, পুকুরদে, তক্তাখালি, করুইতলা কাছামালি, স্বোণাদিয়া, কালীগঞ্জ, মুন্সির হাট, বেচুমিয়ার হাট, করমবক্স, চকউতলি, রমজনবিবি, ফকিরচাঁদ, রঘুনাথ বসুর হাট, চাপরাসির হাট, কুটির হাট, কবিরের হাট, ওটার হাট, দুদমুখো, কালির হাট, মামুদালির হাট, সাহেবের হাট, লালগঞ্জ, রাম রতনের হাট, সাহেবগঞ্জ, নওয়াদুন ও ভূমি মুন্সির হাট, হাট হইয়া থাকে। এবং প্রতাপগঞ্জ ঈশ্বরগঞ্জ নামে নূতন দুই হাট বাটুয়া ও আমিন গাঁয়ে হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত হাতিয়া সাহাবাজপুর ও সন্দীপের মধ্যে কয়েকটা বাজার এবং অনেক হাট আছে।

এখানে চর ভূমি অনেক আছে, এবং নূতন নূতন চর অনেক হইতেছে, এই সমস্ত-চরে ক্রমেই উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে।

এখানকার জলবায়ু বড় উত্তম নহে, নদী সকল সমুদ্রের প্রতিবাসিনী হওয়াতে লবণাম্বু বহন করে, তাহার জল স্পর্শ করিবার বিষয় কি? পুষ্করিণীর জল আহার করিতে হয়, কেবল কোন কোন পুষ্করিণীর জল হিতকর ও সুস্বাদু বটে, বায়ু বড় উৎকৃষ্ট নহে।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৮ মাঘ ১২৬১

ভূমি অত্যন্ত আর্দ্র ও গুণবিশিষ্ট বটে। অনেক প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু কৃষকেরা কৃষিকর্ম্মে নিপুণ নহে, এজন্য অনেক বিষয়েই ব্যাঘাত হইতেছে। মৃত্তিকা দেখিয়া বোধ হয় রীতিমত কৃষি কর্ম্মের সূত্রপাত হইলে অনায়াসেই বিবিধ প্রকার দ্রব্যের উদ্ভব হইতে পারে। চাউল এখানে অতি উত্তম এবং অধিক জন্মে, সকল ভূমিতেই কেবল ধান্যের চাষ দেখিলাম। সর্ষা, তিসি, তিল, অতি অল্প, সোণামুগ নাই, অড়হর অল্প, হালিমুগ ও খেঁসারি জন্মে বটে, ফলে অপর্য্যাপ্ত নহে। যব ও গম নাই, চাষ করিলে জন্মিতে পারে। মটর ও ছোলার চাষ দেখিতে পাইলাম না, বুনানি করিলে জন্মে। এখানকার মাটিতে তামাকু ও নীল জন্মে না। ইক্ষু অল্প, খেজুর বৃক্ষ অনেক আছে, কিন্তু গুড় প্রস্তুত করিতে জানে না। লঙ্কা মরিচের চাষ বিস্তর, গোল আলু, রাঙ্গা আলু, পালঙ্ক শাকাদি নাই। বেগুন অত্যল্প, কদলী, মোচা, থোড়, কাঁকরোল, করলা, বিলিতি কুমড়া, লাউ, ইত্যাদি তরকারি যথেষ্ট। শিম বিস্তর, দুঃখি লোকেরা শিমের বিচির ডাল প্রস্তুত করিয়া আহার করে। পটল ও উচ্ছা অধিক হয় না, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, অত্যল্প জন্মে। পেয়ারা গাছের বন সর্ব্বত্রই, কিন্তু ফল ভাল হয় না। আনারস, পেঁপিয়া, চাঁপা ও মর্ত্তমানকলা, বেল, বাতাবি ও পাতি লেবু, চালতা, কামরাঙ্গা, দাড়িম্ব যথেষ্ট, আমড়া নয়াড় প্রায় নাই। আম্র বিস্তর হয়,—কিন্তু পোকায় পরিপূর্ণ, সুস্বাদু নহে। কাঁটালের কথাই নাই, অধিক জন্মে ও উত্তম বটে। শজিনা ও নিম্ববৃক্ষ প্রায় নাই বলিলেই হয়। শশা, মানকচু অধিক জন্মে, এখানে এই দুই দ্রব্য উত্তম। আতা ও লোনা গাছ কোন কোন স্থানে আছে।

সুপারি এত অধিক আর কুত্রাপিই দেখিলাম না। সুপারি ও ধান্যের দ্বারা প্রায় তাবতেই উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নারিকেল বিস্তর বটে কিন্তু বৃক্ষ অধিক দিন জীবিত থাকে না, এবং নারিকেল হইতে তৈল ও ছোবড়া হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিতে জানে না ইহা সামান্য খেদের বিষয় নহে।

বেত্র ও বাঁশ এখানকার এক প্রধান আওলাৎ।

এখানে কেবল মাদারের বন, কায়স্থে অধিক শূর, এবং শূকর অনেক। ইহাতে এক প্রাচীন কথা আছে।

"শূর, শূয়ার, মাদার। তিনে ভুলুয়া আঁধার॥"

এই "ভুলুয়া" নামের এক আশ্চর্য্য কথা আছে। এদেশের সকলেই কহেন "আদিশূর" নামক একজন কায়স্থ রাজা চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ নৌকাযোগে গমনকালে ভয়ঙ্কর নদীর মধ্যে অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া এমত মানস করিয়াছিলেন যে, যদি এই জল সকল শুষ্ক হইয়া জল সঞ্চারিত হয় তবে আমি এই স্থানে বাস করিয়া কালীর পূজা করিব। পরে তিনি চন্দ্রশেখর হইতে প্রত্যাগমন কালে তথায় আসিয়া দেখেন যে, জগদীশ্বরেচ্ছায় সেই নদীর প্রচুরাংশে চর চরিত হইয়াছে,পরে তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করত বলি প্রদান করেন। কিন্তু বলিদান সময়ে পাঁটার শরীর হাড়ি কাষ্ঠের দক্ষিণ ভাগে ধৃত হয়। কর্ম্মকার সেই বিপরীত ভাবেই অজমুণ্ড ছেদন করে, ইহাতেই সকলে কহিল "মহারাজ, ভুল্ হুয়া"। সেই ভুল্ হুয়া শব্দেই স্থানের নাম ভুলুয়া হইল, ফলতঃ ভুল্ হুয়া শব্দ নহে, "ভুল্ উয়া", কারণ বাঙ্গালেরা হকারে অকার উচ্চারণ করে। হুয়াতে উয়া বলিয়াছিল, এজন্যই "ভুলুয়া" নাম রক্ষিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাও বিশ্বাসযোগ্য, অসম্ভব নহে, কেননা তদবধি এ পর্য্যন্ত এই প্রদেশের তাবতেই ঐরূপ বিপরীত ভাবে পাঁটা কাটিয়া থাকে, অতএব যখন ইহা প্রত্যক্ষ

দর্শন করা যাইতেছে তখন কোন মতেই সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ শূর বংশীয় অনেকে অদ্যাপি এখানে বাস করিতেছেন।

"সুধারাম" এই নামের কারণ বিলক্ষণরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সুধারাম মজুমদার নামক একজন কায়স্থ বাঙ্গালা ১১৫৬ সালে নবাবের নিকট হইতে সনন্দ সুধারাম হইয়া আবাদ করত প্রজা পত্তন করিয়া আপনার নামে গ্রামের নাম রাখিয়াছিলেন। সেই সনন্দ মজুমদারের পৌত্রের নিকট আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, তাহাতে নবাবের কর্ম্মকারের নাম ও নবাবের মোহরাঙ্কিত আছে। ঐ মজুমদারের বংশেরা অতি মান্য এবং এখানকার প্রধান ছিলেন, এইক্ষণে বিষয় অনেক নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মানের কিছু মাত্র হানি হয় নাই।

এখানে নানা পক্ষি আছে। শূকর ও ব্যাঘ্রাদির ভয় অত্যন্ত।

প্রজারা অধিকাংশই দুঃখি। এ অঞ্চলে বৃষ্টি অধিক হয়. এবং বর্ষায় নদনদী প্লাবিত হওয়াতে অনেক স্থানে লবণাম্বু প্রবেশ করে. এ কারণ কৃষিকর্ম্মের অত্যান্ত ব্যাঘাত হয়।

যদি কৃষিকার্য্য নিপুণ কোন কোন ব্যক্তি এখানে আসিয়া স্থান পরীক্ষা পূর্ব্বক যথারীতি-ক্রমে নানা দ্রব্যের কৃষিকার্য্য করেন. তবে তাঁহারা স্বয়ং সৌভাগ্যশালী হইয়া এতদ্দেশকে শক্তিশালী ও সৌভাগ্যশালী করিতে পারেন। কারণ যে যে সাহেব ও বাবু লোকেরা আপনাপন উদ্যানে মটর, ছোলা. গোল আলু, ফরাসবিন. রাঙ্গা আলু, পালঙ্ক শাক, কপি ও ইক্ষু প্রভৃতির বীজ বপন করেন. তাঁহারা উত্তমরূপে ফল লাভ করিতেছেন।

অপিচ এই জিলার এই এক প্রধান দুর্ভাগ্য. নদ নদী নিকটস্থ নহে, যে যে নদী নিকটে আছে, তাহাতে বার মাস নৌকা চলে না. বিশেষতঃ হাতিয়া সন্দীপের নদী অতিশয় প্রবলা, সমুদ্র বিশেষ, বাণিজ্য দ্রব্য সহিত কত কত বণিক ও কত কত আরোহী তাহার বানে নৌকাশুদ্ধ নিয়তই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ ভয়ঙ্করী নদী নিকট হইলেও এক প্রকার মঙ্গল হইত, তাহাও জিলা এবং বিশেষ বিশেষ স্থান ও গ্রাম হইতে অনেক দূর। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল2 শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের সহিত এ স্থানের বাণিজ্য সংযোগের পক্ষে অত্যন্তই ব্যাঘাত দেখিতেছি। যদি স্থানে স্থানে খাল কাটানো হয় তবে বাণিজ্যের কত উন্নতি হয় তাহা কথনাতীত। সমস্ত প্রজাই সুখি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যদিস্যাৎ হস্তক্ষেপ করেন, তবে বহুলোকের বহুপ্রকার উপকার হয়, যথার্থ রাজধর্ম্মই প্রকাশ পায়, বাণিজ্যের বাহুল্য হইলেই কৃষিকর্ম্মের আধিক্য হওনের সম্ভাবনা। ইহাতে কেবল প্রজার মঙ্গল এমত নহে। রাজা প্রজা উভয়েরই পক্ষে শিব সম্পাদন হইবে, প্রজার বাণিজ্য ও রাজার কুৎ। রাজপুরুষেরা খাল খনন করিয়া কুৎ বসাইলে অতি সহজে বিপুল বিত্ত লাভ করিতে পারিবেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ আপনারদিগের ভুলুয়া জমিদারির মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটা খাল খনন করিয়া বিস্তর লাভ সম্ভোগ করিতেছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০ দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করতঃ অধুনা প্রতি বর্ষে ১৫০০০ তঙ্কা লভ্য করিতেছেন, এ লভ্য কত লভ্য, অতএব গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত খাল কাটিয়া দিলে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি। আমরা প্রত্যক্ষ সমুদয় অবস্থা দর্শন করিয়া এরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। রামপুরে ডাকাতে নদীর যে খাল আছে তাহা প্রবল করিয়া দিলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও শ্রীহট্ট প্রভৃতির বণিকেরা মেঘন দিয়া হাতিয়া স্পর্শ পূর্ব্বক ডাকাতের ভিতর পড়িয়া ঐ খাল দিয়া এবং কুমিল্যার লোকেরা ডাকাতে দিয়া উক্ত খালে স্বচ্ছন্দেই এখানে আসিতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরো উপায় আছে,

গভর্ণমেণ্ট তাহার নক্সা চাহিলেই অনায়াসেই অর্পণ করিতে পারি। পরন্তু ফেণী নদীর যোগে চট্টগ্রামাভিমুখে স্বতন্ত্র এক খাল কাটিলে কত যে কল্যাণ হয় বলিতে পারি না, দেশজাত সকল প্রকার দ্রব্যই অতি সুলভ হইয়া উঠে।*

সুধারাম। ৫ মাঘ, ১২৬১

ঢাকা, বিক্রমপুর, ভূষণা, সুবর্ণগ্রাম ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানের অপেক্ষা এখানকার লোকেরা অনেক কথা স্পষ্টরূপে কহিতে পারে, ভাষার মধ্যে অনেক কথাই শুদ্ধ, অর্থ গ্রহণ করিতে ক্লেশ বোধ হয় না। এ জিলার ভদ্রাভদ্র তাবতেই অত্যন্ত বিনয়ি ও নম্র; ছোটলোক সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানেই জানে। বিষয় কর্ম্ম ভালরূপেই বুঝিতে পারে, জমিজমা ও মোকদ্দমা বিষয়ে প্রায় তাবতেই নিপুণ। যাহারা বেহারা, পাল্কি বাহিয়া দিনপাত করে তাহারাও পত্রাদি লিখিতে ও হিসেব করিতে পটু। এখানে অসম্বোধনের কোন শব্দই ব্যবহার্য্য নাই, "তুমি" ও "তুই" শব্দ ব্যবহার করে না, অতি সামান্য জনেরাও আপনাদিগের মধ্যে যখন কথোপকথন করে তখন "আপনি" এবং "আজ্ঞা" "কর্ত্তা" ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়া থাকে, আপনার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই আপনি ও আজ্ঞা শব্দে সম্বোধন করে। ইহারদিগের এরূপ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

এদেশের ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও চাকরি স্বীকার করেন না, সকলেই শাস্ত্র ব্যবসায় ও যোজনাদি দ্বারা দিনপাত করেন, প্রায় সকলেই ব্যাকরণ জানেন। এখানে "কলাপ" ব্যাকরণ প্রচলিত। একঘর ব্রাহ্মণ বিষয়কর্ম্ম করাতে সুধারামের তাবতেই তাঁহাকে ঘৃণা করেন, তিনি তালুকদার ও ধনী হইয়াও চাকরি করণ দোষ জন্য সকলের নিকট ঘৃণিত হইয়াছেন। এ জিলায় রাঢ়ীয় ও বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়াও এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, উভয়ের মধ্যে বিবাহাদি ক্রিয়া অনায়াসেই হইয়া থাকে। বৈদ্য ও কায়স্থে বিবাহ চলে। এখানে বল্লালী মতে কুলীন মৌলিক নাই, নীচ জাতিরা উচ্চ জাতিতে কন্যা প্রদান করিতে পারিলেই কুলক্রিয়া ও মর্য্যাদা বোধ করেন। শুঁড়ি ও সুবর্ণ বণিকেরা শূদ্র কায়স্থে কন্যা সম্প্রদান করিলে সম্ভ্রান্ত হয়েন, বিশেষতঃ ইঁহারা ঐ শূদ্র কায়স্থের কন্যা বিবাহ করিলে সম্মানের সীমা থাকে না, স্বর্গে, আরোহণ করিতে পারিলেও এত সুখানুভব হয় না।

ভুলুয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের মধ্যেই বিবাহের ব্যবহার এইরূপ অদ্যাবধি চলিত আছে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যেরা এমত করেন না, যিনি করেন তিনি ত্যাজ্য হয়েন।

বিক্রমপুর, বরিশাল, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ভুলুয়ার ব্রাহ্মণেরা আদ্য শ্রাদ্ধের দিবসে বৈদ্য ও কায়স্থের বাটিতে অনায়াসেই ভোজন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণেরা পাক করিলে কোন দোষ হয় না। তাবতেই খাসি, পাঁটা ও কচ্ছপের মাংস খাইয়া থাকেন। শুকনা হুঁকার বিচার নাই, শুঁড়ি, ও ব্রাহ্মণে এক ডাবায় তামাকু চলিয়া থাকে, জল থাকিলেই দোষ। কোন কোন স্থানে যবনে ব্রাহ্মণে এক শুকনায় তামাকু চলে—এরূপ সংবাদ অবগত হইলাম।

এই দেশের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভদ্র জাতির স্ত্রীলোকেরা তামাকু ব্যবহার করেন, শুনিতে পাই জুতাও পায় দিয়া থাকেন! এমত জনরব, নওয়াখালি, ত্রিপুরা ইত্যাদির অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের বিধবারা দুই সন্ধ্যা অন্ন আহার করিয়া থাকেন, ইহা যথার্থ কিনা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারিলাম না, কিন্তু বিধবারা একাদশীর দিবসে খই আহার করিয়া থাকেন,

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২ মাঘ ১২৬১।

একথা অনেকের মুখে শ্রবণ করিলাম, এবং বিক্রমপুর ও বরিশালের মধ্যে কোন কোন পরিবারে অগ্যাপিও এরূপ ব্যবহার ব্যবহৃত হইতেছে।

ভুলুয়া জিলায় স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত সদ্ব্যবহার দৃষ্ট করিলাম, কি ভদ্র কি অভদ্র সকল জাতির রমণীগণ পথে ঘাটে বাহির নয় না, কেবল মেছুনীরাই বাহির হইয়া বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

এ জিলায় প্রতারক ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা অতি অল্প, কারণ আদালতে জালখতের ও প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা অত্যল্প। মনুষ্যসকল স্বাভাবিক ভীত, চোর ডাকাইত নাই বলিলেই হয়, কি জলপথ ও কি স্থলপথ কোন পথেই দস্যুভয় নাই, যেখানে সেখানে দিবারাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করা যায়, এ সুখ কত সুখ তাহা বিবেচনা করুন। প্রজার মধ্যে সত্যবাদিই অধিকাংশ, তাহারা তাবতেই স্বধর্ম্মানুরাগি। যে ব্যক্তি অতি দুঃখি সে ব্যক্তিও অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত ক্লেশ পায় না, কেন না অতি অল্পে দিন নির্ব্বাহ হয়, ধান্য সুপারি প্রভৃতি কুড়াইয়া অনায়াসেই উদর পূরণ করিতে পারে।

যথার্থরূপ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে সকলেই নিরুৎসাহি, এজন্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের সংখ্যা অত্যল্প, কিন্তু বিষয় কর্ম্মের লেখা পড়া সকলেই জানে, দরবার করিতে হইলে উকীল মোক্তারের বড় অপেক্ষা করে না। যে ব্যক্তি লাঙ্গল চষিতেছে সে ব্যক্তিও আইনের কথা কহিতে পারে। এই স্থান হইতে চট্টগ্রামের প্রজারা এ বিষয়ে আরো অধিক যশস্বি, তাহাদের মধ্যে পার্শি বাঙ্গালা ও আইন কানুন না জানে এমত মানুষ অতি বিরল।

এই সুধারামে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় কর্ম্মালয়ে যত লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা হইতে চতুর্গুণের অধিক ভুলুয়ার জমিদারীতে প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

ভুলুয়ার অন্তঃপাতি সন্দীপের মধ্যে অনেকগুলীন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য নহেন, পতিতবৎ রহিয়াছেন। ইহার কারণ সন্দীপে পূর্ব্বে একজন মুসলমান মাত্র রাজা ছিলেন, তিনি ঐরূপ নিয়ম করেন যে বিবাহ কর্ম্মে এখানে জাতি বিচার রক্ষা হইবে না, পাত্র যদি সুন্দর ও গৌরাঙ্গ হয় তবে তাহার সহিত সুন্দরী গৌরাঙ্গী কন্যার বিবাহ দিতে হইবেক। এই রাজাজ্ঞায় ও শাসনে ব্রাহ্মণ শূদ্র দূরে থাকুক পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে ও মুসলমানে বিবাহ চলিয়াছিল, তন্নিমিত্ত তথাকার বিপ্র সন্তানেরা এ পর্য্যন্ত অপবিত্ররূপে অপ্রচলিত আছেন, অপর স্থানের ব্রাহ্মণ বা অপর বর্ণের সহিত একত্র বসিতে পারেন না।

এখানকার প্রাচীন ও নূতন বিবরণ ভ্রমণ উপলক্ষে যত সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ প্রেরণ করিলাম, প্রভাকরে প্রকটনপূর্ব্বক সাধারণের সুবিদিত করিবেন, এইরূপে আমি যত জ্ঞাত হইব ক্রমে ততই লিখিয়া প্রেরণ করিব।

পূর্ব্বে এখানে বিদ্যালয় ছিল না, মধ্যে পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট ও জমিদারদিগের সাহায্যে এক স্কুল হইয়াছিল, অধুনা তাহা রহিত হইয়া অন্যান্য জিলার ন্যায় এক গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত চারিজন শিক্ষক এবং বাংলার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, ইঁহারা তাবতেই উপযুক্ত। ছাত্রের সংখ্যা ৮০ জনের অধিক নহে, ইহারা যথা প্রণালীক্রমে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছে, অল্প দিবসের মধ্যেই সুশিক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহাভাব। একজন ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ের সমস্ত বিবরণ রচনাপূর্ব্বক আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন তাহা এই পত্র সম্বলিত প্রেরিত হইল, পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন,

পরন্তু আর কতিপয় ছাত্রের রচিত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পরে প্রেরণ করিব, তদ্দৃষ্টে তুষ্ট হইবেন।*

সুধারাম। ৬ মাঘ, ১২৬১

ষ্টিমার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ভুলুয়ার কালেক্টরি খাজানা খানায় প্রায় ৮০০০০০ আট লক্ষ টাকা জমা রহিয়াছে, সংপ্রতি গত ২রা মাঘ রবিবার প্রাতে সেই টাকা বাষ্পীয় জাহাজে চালান দেওয়া হইয়াছে, জাহাজ আসিয়া সন্দীপের নদে অবস্থান করিয়াছিল। ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ শর্ম্মা এবং নাজির মহাশয় প্রভৃতি কয়েকটি ব্যক্তি টাকা লইয়া জাহাজ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেব অদ্য প্রাতে সরকুট সাঙ্গ করত জিলায় আসিয়া কাছারী করিয়াছেন। অদ্য একটা জমিদারি বাকি খাজনার নিমিত্ত নীলামে বিক্রীত হইবে, তাহা ক্রয় করণার্থ জমিদার মাত্রেই অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন।

গত সোমবার দিবসে এখানে অতিশয় একটা দুঃখের ঘটনা হইয়াছে, কালেক্টরি সেরেস্তাদার ৺ বাবু ব্রজকিশোর দাস মহাশয় অতিসার রোগে এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত জ্ঞান পূর্ব্বক জগদীশ্বর স্মরণ করিতে করিতে যোগধামে যাত্রা করিয়াছেন। এই মহাশয় সর্ব্বতো-ভাবে সজ্জন ও বহু লোকের প্রতিপালক, পরোপকারী, প্রিয়ভাষী ও নির্ব্বিরোধী ছিলেন, এজন্য ইঁহার অভাবে জিলার তাবতেই হাহাকার করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে উত্তম উত্তম অনেক কর্ম্ম অনেক স্থানেই করিয়াছিলেন। সেই সেই কর্ম্মে সেই সেই স্থলে বিস্তর সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। অধিক কি লিখিব, আমি ভ্রমণকারি। কস্মিন্‌কালেই ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পূর্ব্বে নামও শুনি নাই, এখানে আসিয়া কেবল দুই দিন মাত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই ইঁহার শোকে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছি। এই মৃত ব্যক্তির কর্ম্মের প্রার্থনায় অনেকেই আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছেন। কালেক্টর সাহেব কাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তাহা বলিতে পারি না।

এখানকার কারাগারে দুই শত জন বন্দীর অধিক নাই, তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমান।

এ জিলার কালেক্টরি খাজাঞ্চি বাবু উমাচরণ সেন অতি সজ্জন, উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত বংশ্য, কর্ম্মতৎপর ও বিশ্বাসপাত্র, ইনি সেরেস্তাদারির পদ প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বতোভাবে উত্তম হয়।

কয়েক দিবসাবধি অত্যন্ত শীত হইয়াছে। ইহাতে আমরা অতিশয় সুখি হইয়াছি। আহার নিদ্রায় আর কোন ক্লেশ হয় না।

আমরা আর দুই তিন দিবসের পরেই হস্তী এবং পাল্কীযোগে চন্দ্রশেখর ও চট্টগ্রামে যাত্রা করিব, তথা হইতে স্থলপথে কমিল্যা যাইয়া "দাউদকাঁদি" নামক স্থানে নৌকারোহণ করিব। দাউদকাঁদি হইতে মৈমনসিংহ, কি শ্রীহট্ট অথবা বারিশাল, কোন্ জিলায় যাত্রা করিব অধুনা তাহার নিশ্চয় কিছুই লিখিতে পারিলাম না।†

সুধারাম। ১১ মাঘ, ১২৬১

বিক্রমপুর নিবাসী সুধরাম প্রবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর কবীন্দ্রশেখর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক উপঢৌকন স্বরূপ আমাকে যে কয়েকটি কবিতা প্রদান করেন, তাহা এই পত্র সম্বলিত প্রেরণ করিলাম।

* সংবাদ প্রভাকর। ২ ফাল্গুন, ১২৬১ † সংবাদ প্রভাকর। ৩ ফাল্গুন, ১২৬১

প্রভাকরেছ্যঞ্চতয়ৈব দীধিতিঃ প্রভাকরে নাস্তি তথাত্রদীধিতিঃ।
প্রভাকরঃ শুষ্ক-সরোজ-শোষকঃ প্রভাকরঃ শুষ্ক-সরোজ-পোষকঃ।
প্রভাকরস্যাভ্যুদয়ে সরোবরস্থিতরজবৃন্দং প্রতিভাতি বাসরে।
প্রভাকরস্যাস্ত দিবানিশং সতাং মনঃসরোজ্জান-সরোজসঞ্চয়ঃ।
লোকালোককরঃ প্রভাকরবরশ্চিত্তারজস্থ শ্রীকরোধৈর্য্যাক্রজ্যকরঃ সমস্ত-জগতীসম্পৎ করশ্রীকরঃ।
নিত্যানন্দকরাকরঃ প্রসবিতঃ সংবাদ-পীযূষিতপ্রাতঃসায়মসৌবরেণ্য ইতি যৎ সপ্রাতরুজ্জৃম্ভতে॥
সংদৃষ্টঃ সততং প্রভাকরকরঃ সন্তোষসংজ্ঞা করো হৃৎপদ্মাপরিমাণ ভাসন করোদৃষ্টোন কৈস্তংকরঃ॥
মন্যেতন্নবজন্মনঃ ফলমিদং ভাগ্যানুরূপং বরোদৃষ্টঃ সোঽস্মিহেশ্বরঃ সুখকরোগুপ্তঃ প্রকাশীকরঃ॥

অনুগত

শ্রীভবানীশঙ্কর কবীন্দ্রশেখরেণেতি*

জিলা চট্টগ্রামের পুরাতন ও নূতন বিবরণ

চট্টগ্রাম। ২৪ মাঘ, ১২৬১

বাঙ্গলা প্রদেশের নবাব কাছিমালি খাঁ ইংরাজী ১৭৬০ সালে এই চট্টগ্রাম ইংরাজদিগ্যে দান করেন। পরে ১৭৬১ সালের ১লা জানুআরি দিবসে হেরি, বিরেলষ্ট, বেগুল্ক, মেরিণো এবং টামস রম্বলড্ সাহেব এখানে আসিয়া এতৎস্থান অধিকার করেন।

এই চট্টগ্রাম জিলার সীমা—উত্তরে বড় ফেণি নদী, দক্ষিণে নাফ নদ, পশ্চিমে মহাসমুদ্র এবং পূর্ব্বভাগে মেন পর্ব্বত।

ইহার উত্তর দক্ষিণ সীমা ৬ ছয় দিবসের পথ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা ৪ চারি দিবসের পথ।

আবাদী ভূমি—৭২৫০৮৴৯৮ দ্রোণ। পতিত ভূমি—৬৪৪৭৮॥৴১৬॥৴ দ্রোণ।

সর্ব্বশুদ্ধ ভূমি—১৩৬৯৮৬৷৶৬৷৴ দ্রোণ। দ্রোণ, অর্থাৎ ১৬ ষোল কানিতে এক দ্রোণ। এবং কানি অর্থাৎ ১ বিঘা ৪ চারি কাঠাতে ৴০ এক কানি। এই মাপ মগি মাপ।

ভূমির রাজস্ব।	কোং	৭৬০৩৬২৸৮	ফেরিফণ্ড।	কোং	১০৪৯০
আপকারি রাজস্ব।	কোং	৩৭১১৫	চৌকিদারী ট্যাক্স।	কোং	২৪৫২
ষ্ট্যাম্পের উৎপন্ন।	কোং	৭২১৯০	সর্ব্বশুদ্ধ কোং		৯০৭০৮১৸৮
পরমিট উৎপন্ন।	কোং	১৮০০০	নিমকের-উৎপন্ন অনুমান কোং		৮০০০০০
ডাকমাশুল।	কোং	৬৪৭২			
					১৭০৭০৮১৸৮

এই উৎপন্নের মধ্যে নিমক মহলের ব্যয় ব্যতীত দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং কালেক্টরি প্রভৃতিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রতিবর্ষের নির্দ্দিষ্ট ব্যয় কোম্পানী ৫০৭০০০।

এতৎবাদে সরকারের আনুমানিক বার্ষিক লাভ কোং ৫০৭০০০।

এতদ্ভিন্ন নিমকের ব্যয়াতিরিক্ত বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে।

* সংবাদ প্রভাকর। ৪ ফাল্গুন, ১২৬১

এই জিলার রাজকীয় পদে নিম্নলিখিত চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত আছেন।

মেং এইচ. ষ্টেনিফোর্ট। কমিশ্যনার। এই মহাশয় অতি যোগ্য, সর্ব্বপ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী বহুগুণজ্ঞ।

মে এইচ. ফার্ব্বস। সিভিল ও সেসন জজ। ইনি অতি উপযুক্ত, প্রশংসাপাত্র, সুবিচারক।

মেং ডবলিউ. মেলেট। এডিসনেল সিভিল ও সেসন জজ। ইনি অতি উত্তম মনুষ্য।

মেং জে. ই. এস. লিলি। কালেক্টর। সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ।

মেং জে. আর. মাসপ্রাট। মাজিষ্ট্রেট। অতি উত্তম, সদ্বিচারক, নিরপেক্ষ।

বাবু গৌরচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় শ্রেণী, অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর, অতি যোগ্য, কার্য্যতৎপর, রাজা-প্রজা উভয়ের প্রিয়।

বাবু গৌরচন্দ্র রায়, চতুর্থ শ্রেণী অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর। অতি মহন্মনুষ্য, কার্য্যদক্ষ সচ্চরিত্র, সরল, রাজা-প্রজা সকলের প্রিয়।

মেং এল. বারবর। অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। মোং কাক্সবাজার। এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও সৎস্বভাব, পরিশ্রম পরবশ হইলে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন।

মেং ডবলিউ. সারসন। অচিহ্নিত আফকারি ডেপুটী কালেক্টর। যোগ্য প্রতিষ্ঠা পাত্র।

মেং সি. চ্যাপম্যান্। সালট এজেন্ট। অতি নিপুণ, সুধীর কর্ম্মানুরাগী, সুখ্যাতি পাত্র।

মেং জে. আর. মেম্বর। সাল্ট সুপ্রেণ্টেণ্ট, একটিং ঘাট কাপ্তেন এবং কষ্টম কালেক্টর। অতি যোগ্য, উদ্যোগী, পরিশ্রমী কার্য্যনিপুণ।

মৌলবী আসরপ আলি খাঁ। প্রধান সদর আমিন। উপযুক্ত, নম্র, প্রিয়ভাষী, বিচার তৎপর, পরিশ্রম করিলে প্রভুর বিশেষ প্রিয় হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য। এডিসনেল প্রধান সদর আমিন। অতি সুপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী, সুবিচারক, অত্যল্প দিবস এখানে আসিয়া রাজা-প্রজা উভয়ের স্থানেই যশস্বী হইয়াছেন।

মৌলবী আমীরুদ্দীন খাঁ। সদর আমিন ও সদর মুন্সেফ। উত্তম মনুষ্য, অনেক মোকদ্দমায় সুখ্যাতি পাইয়াছেন।

মৌলবী আবদুল ফত্তা। সদর মুন্সেফ ও কাজি। যোগ্যপাত্র, বিচারতৎপর, যশস্বী।

বাবু বৈষ্ণবচরণ রায়। এডিসেনেল সদর মুন্সেক। সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্য্যক্ষম।

উল্লেখিত একাদশ জন মুন্সেফ ব্যতীত এই জিলার স্থানে স্থানে অপর একাদশ জন মুন্সেফ নিযুক্ত আছেন। যথা—

চৌকী জোয়ার গঞ্জ।
" মুন্সেফ বাবু মহেশচন্দ্র রায়। অতি যোগ্য। ১ মুন্সেফ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী। সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। ১
" ফটিকচারি। " মোলবী আবদুল জব্বর। মধ্যমরূপে খ্যাতাপন্ন। ১ চৌকী রাঙ্গনিয়া। " উমাচরণ কায়স্থগিরি। অতি উত্তম, সদ্বিদ্বান্। ১
" ভাটিয়ারি। " মেং ফেনি সাহেব। অতি উত্তম ১ " পটিয়া। " মৌলবী সৈয়দ আহম্মদ। ১ম শ্রেণী মধ্যমরূপে গণ্য। ১
" হাটহাজারি। " হাওয়ালা " জগচ্চন্দ্র রায়।

অতি যোগ্য ও মান্য। ১
চৌকি দেয়াঙ্গ। ” মুন্সি আমিনুদ্দীন।
যোগ্য ব্যক্তি। ১
” সাতকানিয়া ” গোলকচন্দ্র রায়।
১ম শ্রেণী, অতি যোগ্য, সূক্ষ্মদর্শী ১
” রউজান। ” মৌলবী আবদুল রউফ।
মধ্যমরূপে গণ্য। ১
” সন্দীপ। ” মৌলবী আনয়ারালি।
মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অতি যোগ্য,
কার্য্যনিপুণ। ১
১১

থানা সাতকানিয়া। রত্নকৃষ্ণ দাস। উত্তম ১
” চকরিয়া। গৌরীকান্ত ঘোষাল। উত্তম ১
” রাম্বু। আমানাৎ উল্লা! ১
” টেকনাফ। রামসেবক নন্দী। একটিং ১
” ফটিকচারি। কৃষ্ণচন্দ্র গুহ। উত্তম ১
” রাউজান। জনৈক একটিং দারোগা ১
” হাটহাজারি। জগদ্বন্ধু ঘোষ ১
১১

এখানে ১১ টা থানা ও ৬টা ফাঁড়ি আছে। যথা—
থানা জোরয়ারগঞ্জ।
একটিং দারোগা ভগবানচন্দ্র মজুমদার।
উত্তম ও যোগ্য। ১
” চট্টগ্রাম সদর কোতয়ালী। আসিমুদ্দীন।
১ম শ্রেণী, উত্তম। ১
” পটিয়া। তজম্মল আলী। উত্তম ১
” ভাটিয়ারি। ভোলানাথ গুহ।
একটিং, যোগ্য ১

ফাঁড়ি। সীতাকুণ্ড।
এখানকার মুন্সী অতি যোগ্য। ১
” রাঙ্গনিয়া। ১
” জলদী। ১
” আনোয়ারা ১
” কুতুবদিয়া ১
” মহিষখালি ১

এখানে শাল্‌ট এজেণ্ট ও নিমক চৌকীর সুপ্রেণ্টেডেণ্ট ব্যতীত পোক্তান সংক্রান্ত অপর দুইজন সুপ্রেণ্টেডেণ্ট আছেন। তাঁহার একজন চরে থাকেন, একজন সদরে থাকেন, তন্মধ্যে একের বেতন ৩০০৲ টাকা ও একজনের বেতন ২০০৲ টাকা।

পোক্তান গোমস্তা ২ দুই জন।

বাহির চড়ায় একজন—তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা।

জলদিয়ায় একজন—তাঁহার বেতন ১০০৲ টাকা।

এই জিলার উত্তরভাগে চৌকীয়াতের একজন সুপ্রেণ্টেডেণ্ট দারোগা আছেন। তাঁহার বেতন ৯৫৲ টাকা।

পূর্ব্ব ভাগে তাঁহার বেতন ৯৫ টাকা।

দক্ষিণ ভাগে তাঁহার বেতন ৭৫৲ টাকা॥

এখানে একটিমাত্র প্রধান গোলা সদরঘাটে স্থাপিত আছে, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকিশোর প্রামাণিক মহাশয় তাহার দারোগা, ইঁহার বেতন ২০০৲ টাকা। এই মহাশয় অতি ধার্ম্মিক, উপযুক্ত, সুধীর, বহুগুণজ্ঞ, কর্ম্মতৎপর।

এখানে নানা স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ টা রিটেইল গোলা আছে, তাহাতে ১৯ জন দারোগা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নিমক চৌকী

চৌকী। কুমুরিয়া ১
” কাক্সবাজার ১

চৌকি ফেণি ১
” বাঁশখালি ১

এই চারি স্থানে চারিজন দারোগা আছেন। তাঁহারদিগের প্রত্যেকের বেতন ৩০৲ টাকা।

নিমক চৌকীর মুহুরির ঘাট।	
কুলদিয়া	১
ঢোকুরিয়া	১
রাইমির	১
কতুবদিয়া	১
কালুরঘাট	১
জলকদর	১
মহিষখালি	১

এই সাত চৌকীতে সাতজন মুহুরি প্রত্যেকে ১০ টাকা করিয়া বেতন প্রাপ্ত হয়েন।

এ বৎসর অনুমান ৮০০০০০ মণ লবণ পোত্তান হইবার উদ্যোগ হইয়াছে।

এ জিলার প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ চারি জন।

প্রথম শ্রেণীর দারোগা এক জন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা দুই জন।*

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট অচিহ্নিত কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র রায় মহাশয় অতি ধাম্মিক ও যোগ্য। ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় ভাষায় অত্যন্ত উপযুক্ত, এমত সৎ মনুষ্য অত্যল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কমিশ্যনরের সেরেস্তাদার অতিশয় কার্য্য নিপুণ. উত্তম মনুষ্য, ইনি পরীক্ষা দ্বারা মুন্সেফি পাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কালেক্টরী সেরেস্তাদার বাবু গোলোকচন্দ্র রায় সর্ব্ব বিষয়েই উত্তম, ইনি অবিলম্বেই পেন্সিয়ান লইবেন।

কালেক্টরী মহাফেজ বাবু কালীকান্ত মজুমদার অতি সজ্জন, যোগ্য পাত্র।

যোড়শীবালা ও বামাসুন্দরী দেবীর সরবরাহকার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয় অতি ধার্ম্মিক, কৃতকার্য্য, মহৎ, নির্লোভী, ডেপুটী কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিলেন, ইহার কারণ তিনি তৎকর্ম্ম গ্রহণ করিলে স্ত্রীলোকদিগের বিষয় রক্ষা পায় না।

ফৌজদারী রোবকার নবিস বাবু তারিণীচরণ দাস। পেস্কার বাবু কালীপ্রসাদ মুন্সী কর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ, প্রশংসাভাজন। আদালতের সেরেস্তাদার বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মুন্সী ও পেস্কার বাবু গোপীমোহন রায়, উভয়েই অতি ভদ্র, কর্ম্মদক্ষ, সুজন।

এডিসেনেল জজের পেস্কার বাবু চৈতন্যচরণ দত্ত অতি উপযুক্ত, দোষশূন্য।

নিমকমহলের সেরেস্তাদার শ্রীযুত বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ সিংহ সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ।

নিমক চৌকীয়াতের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ।

উকীল সরকার বাবু জগদ্বন্ধু সেন এবং উকীল বাবু ঈশানচন্দ্র দাস। উভয়েই উকীলের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, অতি যোগ্য, ঈশান বাবু ইংরাজী ভাল জানেন।

এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত ও সৎস্বভাবের মনুষ্য আমলা ও উকীলের মধ্যে অনেকেই থাকিতে পারেন, আমরা হাকিমানের রিপোর্টের অনুসন্ধানে তদ্বিশেষ জানিতে পারি নাই, যদি কেহ যথার্থরূপে লিখিয়া প্রেরণ করেন তবে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পত্রস্থ করিব।

এখানকার সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম মহাশয় অতি যোগ্য, বিশেষ সুখ্যাতি সহযোগে সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছেন।

নিমক মহলের নেটিব ডাক্তর ও ডিস্পেন্সরির প্রধান কম্পৌণ্ডর শ্রীযুক্ত বাবু রামকানু দত্ত বিশেষ প্রশংসার পাত্র, ইঁহারদের ক্ষমতায় ও পারকতায় চমৎকৃত হইয়াছি।†

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ৮ ফাল্গুন, ১২৬১ † সংবাদ প্রভাকর ॥ ৯ ফাল্গুন, ১২৬১

পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমানের ঘটনা—পূর্ব্বে এই জিলায় ৪ চারি জন জজ, ২ দুই জন কালেক্টর, এবং ৩২ বত্রিশ জন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, এক্ষণে ২ দুই জন জজ, ১ এক জন কালেক্টর, ৪ চারি জন ডেপুটি কালেক্টর, ২ দুই জন প্রধান সদর আমিন, ৩ তিন জন সদর মুন্সেফ ও একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন। তিন জন সদর মুন্সেফের মধ্যে এক জন এবং চারি জন ডেপুটী কালেক্টরের মধ্যে একজন ডেপুটী কালেক্টর কাক্সবাজারে থাকেন, তিনিই তথাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা প্রধানপক্ষ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়াছে, অথচ বঙ্গদেশের অন্যান্য জিলা হইতে এই জিলাকে অতি প্রধান ও বৃহৎ বলিতে হইবে।

কারাগার—চট্টগ্রামের কারাগারে এইক্ষণে ৩৫২ জন দোষি ব্যক্তি আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। ইহারা বস্ত্র, ইষ্টক, কাগজ, মোড়া, চৌকী, চিক ও চেটাই ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

পরগণা—"ইছলামাবাদ" নামক কেবল একটি পরগণাতে এই চট্টগ্রাম জিলা স্থাপিত হইয়াছে। কালেক্টরীতে উক্ত পরগণা ব্যতীত অপর কোন পরগণার নাম লিখিত হয় না, কারণ "ইছলাম খাঁ" কর্ত্তৃক প্রথমে এই দেশ আবাদিত হয়, সুতরাং তাঁহার নামেই পরগণার নাম প্রদত্ত হইয়াছে, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পরগণা আছে, কিন্তু রাজস্ব সম্বন্ধে তাহাদের নাম কখনই উল্লেখিত হয় নাই।

জমিদার—এই জিলার তৌজীতে পূর্ব্বে জমিদারের সংখ্যা ৮২০০০ ছিল। এইক্ষণে ৪২০০০ হইয়াছে, যাঁহারদিগের রাজস্ব /০ এক আনা অর্দ্ধ আনা ছিল, সেই সমুদয় জমিদারের জমিদারী সকল সরকার বাহাদুর নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন।

মালগুজারি—এখানে কোন জমিদারীর মালগুজারি ১২০০০৲ টাকার অধিক নাই। কতকগুলীন একত্র যুক্ত হওয়াতে কেবল "তরফ জয়নারায়ণ ঘোযাল" নামক জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব ৫০০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্চর্য্য কথা কি কহিব, দুই আনা, এক আনা এবং ইংরাজী ৭ পাই পর্য্যন্ত কোন কোন জমিদারির বাৎসরিক রাজস্ব কালেক্টরিতে গৃহীত হইয়া থাকে।*

পলটন—অধুনা এখানে ৩০০ মাত্র পল্‌টনে সেফাই আছে।

রাস্তা—এই জিলার রাস্তা ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের অধীন। সম্প্রতি ঢাকা হইতে আরাকাণ পর্য্যন্ত "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" নামে এক প্রশস্ত বৃহৎ রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে। এই রাস্তা অনেক প্রজার বাটী ও বাগান প্রভৃতির উপর দিয়া গমন করিতেছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অন্যূন ৮০০০০০ মুদ্রা ব্যয় হইবেক, এই বিষয় সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইতেছে।

নীলকুটি—জিলা চট্টগ্রামে নীল, রেশম, চিনি ও সরাপ প্রভৃতির কুটি একটিও নাই। নীল, রেশম না থাকাতে প্রজারা অত্যন্ত সুখে আছে, কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

কর্ম্মচারী—এ জিলায় বিদেশস্থ লোকেরাই প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া সম্মান, সুখ ও সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছেন। বিক্রমপুরের এক এক ব্যক্তি বহু লোকের প্রতিপালক, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেছেন, তদ্বিষয়ে অবারিত দ্বার। বাবু গৌরচন্দ্র রায়

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ১০ ফাল্গুন, ১২৬১

মহাশয়ের বাসায় নিয়মিত ১০০ ব্যক্তি অন্ন পাইতেছে। সময়ে সময়ে তিন চারি শত লোকের সমাযম হয়॥

জিলায় ভদ্রলোক ও ভদ্র জাতি—এই জিলায় পড়ুইপাড়া, নওয়াপাড়া, কোলিশহর, সুচক্রদণ্ডী, ধলঘাট, ডেঙ্গাপাড়া এবং চক্রশালা প্রভৃতি গ্রামসকল অতি ভদ্রগ্রাম, এই সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বিস্তর আছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে বল্লালি প্রথা প্রচলিত নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বাবধি বৈদ্যজাতিরাই এ দেশে প্রধান ধনি ও অত্যন্ত মান্য। কায়স্থ মাত্রেই বৈদ্যের অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এবং অতিশয় সম্ভ্রম করেন।*

বিবাহাদি ক্রিয়া—বৈদ্যেরাই এখানকার কুলীন, পূর্ব্বে শূদ্র ও বৈদ্যে বিবাহ চলিত, এইক্ষণেও ক্বচিৎ কখনো না হয় এমত নহে। কায়স্থেরা বৈদ্যকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিগ্যে ধন্য বলিয়া গণ্য করেন, কতকগুলীন বৈদ্য কস্মিন কালে কায়স্থের সহিত বিবাহ-ক্রিয়া করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সম্বন্ধদোষে দোষী কিনা তাহা বলিতে পারিলাম না, ইঁহাদিগের সম্প্রদায় স্বতন্ত্র। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে আঢ্য ও গৌরবান্বিত। অপিচ কতকগুলীন বৈদ্য যাঁহারা পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন সেই দোষ পরিহার পূর্ব্বক পবিত্র হইয়াছেন। পরন্তু কতকগুলীন বৈদ্য যাঁহারা অদ্যাপি শূদ্রের সহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পতিত হইয়াই আছেন, ঐ পতিত দলের সহিত পবিত্রদিগের আহার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম কিছুই চলিত নাই।

শ্রীপুর, ধলঘাট, কেলিশহর, পড়ুইপাড়া গৌরহলা, কুইপড়া, নয়াপাড়া, দেবগ্রাম ও বড়মা ইত্যাদি স্থানের বৈদ্যেরা প্রথমাবধি শুদ্ধাচারে আছেন, ক্রিয়াদোষ কিছুই হয় নাই, ধন ও মান সর্ব্বাংশেই প্রধান। যদিও মেং হারবি সাহেবের হাঙ্গামায় অনেকের মহানিষ্ট হইয়াছে, তথাচ কেহ এককালে নিঃস্ব হয়েন নাই, তাবতেরি ভূমি সম্পত্তি আছে, কিছু কিছু অর্থ আছে, মান আছে এবং নানা প্রকার সৎ ক্রিয়া আছে, অনেকেরি বিলক্ষণ মনুষ্যত্ব আছে।

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই সদাচারি, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, ক্রিয়াশালী, ইতরবৃত্তি প্রায় কেহই করেন না।

ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র প্রধান ধনি আছেন, তাঁহারা ভূম্যধিকার রাখেন ও মহাজনী করেন।

কায়স্থ—কায়স্থদের মধ্যে দুই একজন নূতন ধনী হইয়া মান সম্ভ্রম লাভ করিতেছেন।

মুসলমান—মুসলমানের ভিতরে অনেকেই সম্ভ্রান্ত, ধনী, ভূম্যধিকারী এবং বিদ্বান আছেন।

যবন জাতির এদেশে বিশেষ কীর্ত্তি কিছুই নাই, যে কয়েকটা মসজিদ ও দর্গা আছে তাহা যৎসামান্য, গণ্য করণের যোগ্য নহে।†

সাধারণ বিষয়—এখানকার লোকেরা বিশেষ সাহসী উৎসাহী নহে, বিদ্যাবিষয়ে ও দেশহিতকর ব্যাপারে অদ্যাপি অধিকাংশ ব্যক্তির অনুরাগ জন্মে নাই।

নানা জাতীয় প্রজার সংখ্যা—এদেশে প্রজার মধ্যে মুসলমান ॥৵০ আনা, হিন্দু ।০ আনা মগাদি মিশ্রিত জাতি দেড় আনা, ফিরিঙ্গি ও নেটিব খ্রীষ্টান অর্দ্ধ আনা।

ভিক্ষা—এখানে হিন্দু জাতিতে ভিখারী প্রায় কেহই নাই, ব্রাহ্মণেরাও ভিক্ষা করেন না, যাজনাদি ক্রিয়া এবং ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাই উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ১১ ফাল্গুন ১২৬১ † সংবাদ প্রভাকর॥ ১২ ফাল্গুন ১২৬১

মুসলমান জাতিরাই ভিক্ষা করিয়া থাকে, এবং তাহারা বিস্তর দুষ্কর্ম্ম করে।

ব্যভিচার—এই এক সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম জিলার ভিতরে হিন্দু জাতিতে প্রায় বেশ্যা নাই, এ বিষয় কত আনন্দকর তাহা কথনাতীত, আর এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর বেশ্যা আছে, কিন্তু তাহারদিগের ভিতর এক অত্যাশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। কুলটাগণ সতীত্ব সংহার পূর্ব্বক বহুকাল বেশ্যাভাবে বাহিরে থাকিয়া পুনর্ব্বার আবার সতী হইয়া গৃহে যাইতে পারে, তখন তিনি সাবিত্রীরূপে পতির কণ্ঠভূষণ হইয়া বসেন।

হাটবাজার—রাঙ্গুনে, রওজার, আবু, তরাপ—এই তিনস্থানে উত্তমরূপ হাটবাজার আছে, ঢাকা জিলা ব্যতীত অন্যত্র এরূপ আর নাই, এই তিন স্থান বাণিজ্য পক্ষে প্রধান স্থান।

হিন্দুপুরুষ—এখানে হিন্দু পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়দোষ অত্যল্প, অনেকেই জিতেন্দ্রিয়, এ বিষয় আমরা তাঁহারদিগ্যে সাধু সাধু সাধুশব্দে পূজা করিতে ইচ্ছা করি। মনুষ্য মাত্রেই পরিমিত ব্যয়ি, অন্যায় ব্যয় কেহই করেন না, এজন্য তাবতেই সুখে আছেন, দুঃখের লেশমাত্র জানিতে পারেন।

ইন্দ্রিয় দোষ এবং অপরিমিত ব্যয়, জীবের পক্ষে এই উভয় হইতে অশিবের ব্যাপার আর কিছুই নাই। সুতরাং এইস্থলে আমার বিরেচনায় চট্টগ্রামের লোকেরা চট্টগ্রামের লোক না হইয়া প্রকৃত ভট্টগ্রামের।

এই দেশের লোক যদিও ধনশূন্য, কিন্তু অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত কাহারো কষ্ট নাই, সকলেরই ভূমি আছে, তাহার উপস্বত্বের উপরেই নির্ভর করেন।

দস্যুতা—চুরি ডাকাইতি প্রায় নাই, প্রজারা নির্ভয়ে সম্পত্তি সমূহ রক্ষা করত পরমানন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ কাহারো একগাছি তৃণস্পর্শ করে না, এখানকার স্থলপথ জলপথ—দুই পথেই দস্যুভয় নাই, দ্রব্যাদি সহিত পথে ঘাটে যেখানে সেখানে অনায়াসেই একাকী অবস্থান করা যাইতে পারে। শান্তি সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারকেরা কেবল শান্তিজল স্পর্শ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এতদ্রূপ অরণ্যময় পার্ব্বতীয় প্রদেশে চুরি দস্যুতার এত স্বল্পতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে এ দেশের প্রতি পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ স্বীকার করিতে হইবেক, ইহার কারণ দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ ভূমিসকল শস্যশালিনী। দ্বিতীয়তঃ উদরের দায়ে কেহই লালায়িত নহে, সকলেরি সম্ভব মত বিভব থাকাতে দিনপাত বিষয়ের কোন ভাবনাই নাই। আনন্দের কথা কি লিখিব, উৎকট অপরাধের কোনরূপ মোকদ্দমা প্রায় ফৌজদারিতে উপস্থিত হয় না, কেন না তদ্রূপ সংঘটনা হয় না।

মোকদ্দমা—এদেশের আপামর সাধারণ ছোট বড় তাবতেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে, পার্শি ও বাঙ্গালা না জানে এমত ব্যক্তি প্রায় নাই। সকলেই মোকদ্দমাবাজ, আইন-কানুন জ্ঞাত আছে। যে ব্যক্তি লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি চষিতেছে, সে ব্যক্তিও বলিতে পারে এই মোকদ্দমা এইরূপ, এইরূপ দরখাস্ত করিতে হইবেক, এইরূপ অজুহাত লিখিতে হইবেক। এইমাত্র যাহাকে গোচারণ করিতে দেখিলাম, ক্ষণ পরে দেখি সেই মনুষ্যই আবার আইন খুলিয়া মোকদ্দমার কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। এমন মামলাপ্রিয় লোক অপর জিলাতে দেখি নাই, কথায় কথায় আদালতে নালিশ করিয়া বসে।*

এ দেশের লোকেরা যাহা ধরে, তাহা করেই করে। তাহাতে সর্ব্বনাশ হইলেও পরাঙ্মুখ হয় না, কিন্তু প্রাণান্তেও ফৌজদারী নালিশ করে না, এক পয়সা কড়ির নিমিত্ত

* সংবাদ প্রভাকর। ১৩ ফাল্গুন ১২৬১

অনায়াসেই ষ্ট্যাম্প কাগজে আদালতে নালিশ উপস্থিত করে। সদর দেওয়ানী পর্য্যন্ত তাহার আবার আপীল হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল এইরূপে এক পয়সার এক মোকদ্দমার আপীল সদরের পূর্ব্বতন জজ শ্রীযুক্ত কালবিন সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাতে চৌকী হাট হাজারির মুন্সেফ বাবু "কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী" মহাশয়ের "ফয়সলা" বজায় থাকে, এই বিষয় সমুদয় সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল।

এক জনের কুক্কুট আর এক জনের ধান্য খাইলে অথবা এক জনের গাভী আর এক জনের বেড়া ভঙ্গ করিলে সেই হানিগ্রস্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটিতে না গিয়া ৵০ দুই আনা ।০ চারি আনার দাবিতে মুন্সেফের নিকট আর্দ্দাস করে। রহস্যের কথা কত লিখিব, এ দেশের কুমার-জাতির মধ্যে যদি কেহ সভামধ্যে আপনার নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করে তবে ঐ নমস্য ব্যক্তি ঐ নমস্কার অপ্রাপণের জন্য স্বচ্ছন্দেই নালিশ করে। অপিচ তাঁতি জাতির মধ্যে যদি কোন বিবাহাদি কোনরূপ ক্রিয়া সূত্রে কোন ব্যক্তিকে পান সুপারি দ্বারা মর্য্যাদা করিতে ত্রুটী করে তবে তৎক্ষণাৎ দেওয়ানীতে তদ্বিষয়ে নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবম্ভূত নালিশের আবেদনপত্রে মুন্সেফি কাছারি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ হইতেছে, মুন্সেফেরা মধ্যে মধ্যেই তাহার ডিক্রী ডিসমিস করিতেছেন, যথাযোগ্য স্থানে আবার তাহার আপীল হইতেছে। চট্টগ্রামের লোকেরা যদিও প্রতিষ্ঠা রক্ষার নিমিত্ত অনর্থক ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করে, কিন্তু তাহারা কখনই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা পূরিত মিথ্যা নালিশ ও জালসাজি প্রায় করে না, এজন্য তাহারদিগের যথোচিত অনুরাগ করিতে হইবেক।

নদ-নদী—এখানে জলনিধি মহা সমুদ্র। তদ্ভিন্ন "হাতিয়া" "সন্দীপ" ও "বামনী" এই কয়েকটা নদী অতি বৃহৎ, সমুদ্র বিশেষ, ইহারা লবণাম্বু পরিপূরিত, বড় ফেণির জল সর্ব্বতই লবণ। এই নদী এদেশের পক্ষে ক্ষুদ্র বটে। "মাতামুহুরি নদী" ক্ষুদ্র, তাহার জল অতি মিষ্ট। কচা ও শ্রমতী নদীর জল অতি উত্তম। শঙ্খ নদের জল কোন কোন স্থানে মিষ্ট, কোন কোন স্থানে লোণা। ডলু নদীর জল অতি উৎকৃষ্ট। আর কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নদী আছে, এই স্থলে তদুল্লেখের প্রয়োজন করে না।

সদরঘাট—জিলা সদরঘাটে পরমিট নিমক কাছারির নীচেই "কর্ণফুলী নদী"। তাহার শোভা অতি সুন্দর, জাহাজ ও সুলুপ এবং আর আর অশেষ প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূরিত নৌকায় পরিপূর্ণ। তণ্ডুলাদি নিয়তই রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু বিদেশীয় আমদানী অতি অল্প। সদরঘাট এখানকার বাণিজ্যের প্রধান স্থান, এখানে দেশ বিদেশীয় অনেক মহাজন অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করেন। কর্ণফুলী নদীর জল সর্ব্বত্র লোণা নহে, কোন কোন স্থানে মিষ্ট আছে, মহাসমুদ্র হইয়া চট্টগ্রাম আসিতে ও চট্টগ্রাম হইয়া মহাসমুদ্রে যাইতে এবং হাতিয়া ও সন্দীপের সমুদ্রবৎ নদী হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি যাইতে ও তত্তৎ স্থান হইতে চট্টগ্রামে আসিতে হইলে এই কর্ণফুলীকে অবলম্বন করিতে হয়। সিন্ধুপথে জাহাজ ও সুলুপ সন্দীপের নদীতে "বালাপ" নামক বেতের বাঁধুনির নৌকা ভিন্ন অপর কোন নৌকায় আসিবার উপায় নাই, কারণ ঐ পথে লৌহার বাঁধুনি নৌকা আইলেই মারা পড়ে। বাণে নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, তক্তা সকল খুলিয়া যায়, কেবল এই শীতকালে বোট ও পিনিস আসিতে পারে, গ্রীষ্ম পড়িলে আর আসিবার বিষয় কি?

সমুদ্র তীরে হালিসহর নামক স্থানের বায়ু অতি উত্তম। সাহেব লোকেরা পীড়িত হইলে আরোগ্যের নিমিত্ত তথায় গমন করেন।

তীর্থ—চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, আদিনাথ, পাতাল, দ্বাদশশিলা, জটাশঙ্কর, জ্যোতির্ম্ময়, ধর্ম্মাগ্নি, বিরূপাক্ষ, লবণাখ্য, সহস্রধারা, বাড়বানল, চন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, দধিকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড প্রভৃতি অনেক তীর্থ এই জিলার মধ্যে আছে। ইহার এক এক তীর্থ অতি রমণীয়, তত্তৎস্থানে অনেক চমৎকার দেখা যায়।*

ফিরিঙ্গি—চট্টগ্রামে অনেক ফিরিঙ্গি আছে। ইহারা চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি নামে বিখ্যাত, ১০০০ এক হাজার ঘরের ন্যূন নহে, ইহারা ফিরিঙ্গি বাজার ও বান্দেল এই দুই স্থানে বাস করে, পর্টুগিসেরা প্রথমে এই দেশে আসিয়া এই সকল ফিরিঙ্গির আদি পুরুষদিগ্যে জন্ম প্রদান করে, ইহারা তাবতেই রোমান কেথলিক ধর্ম্মাবলম্বি, এদিকে গির্জায় গিয়া ভজনা করে, দর্গায় গিয়া সির্নি দেয়, এবং কালীর মন্দিরে গিয়া বলি প্রদান করে, ফিরিঙ্গি জাতির বালক বালিকার শিক্ষার নিমিত্ত বান্দেলে ভিন্ন ভিন্ন দুই স্কুল আছে। এখানে রোমান কেথলিক "নান, ও ফ্রেয়ার" অর্থাৎ কুমারী ও কুমার আছে, ইহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, তথাচ বিবাহ করে না। বান্দেলের গির্জা ও নানারি বাটী অতি সুন্দর, দেখিলে চক্ষু প্রফুল্ল হয়, চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গির মধ্যে তাবতেই কৃষ্ণবর্ণ অতি কুৎসিত, কচিৎ দুই একজন গৌর আছে, ইহারা বাণিজ্য করে, কেরানীগিরি করে। চাপরাসি ও খালাসিগিরি ও আর আর ইতর কর্ম্ম করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করে।

মেলা ও ব্রত—শিবচতুর্দ্দশীর দিবসে চন্দ্রনাথে প্রতিবৎসর গুরুতর এক মেলা হয় তাহাতে বহু লোকের জনতা হইয়া থাকে।

সমুদ্রতীরে বারুণীর মেলাকে মহামেলা বলিলেই হয়।

রাউজন থানার অধীন পাহাড়তলীতে মগেরদের প্রকাণ্ড এক মেলা হয় তাহার সমারোহ অষ্টাহ পর্য্যন্ত থাকে।

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের রবিবারে সূর্য্যব্রতের মেলা এদেশের নানা স্থানেই হইয়া থাকে।

এখানকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সূর্য্যব্রত করে।

বেহারা—এদেশের কায়স্থেরা পাল্কী বহিয়া থাকে, তাহারদের নাম সর্দ্দার, অত্যন্ত পরিশ্রমি, আরোহি সহিত পাল্কী লইয়া অনায়াসে অক্লেশে বড় বড় পর্ব্বতে যাতায়াত করে। ইহার দিগ্যে বেহারা বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, সর্দ্দার বলিলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই সর্দ্দার কায়স্থ ভিন্ন চণ্ডাল ও মুসলমানেরা পাল্কী বহন করে, কিন্তু তাহারা ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে!

ব্যবসায়—এখানকার ফিরিঙ্গি ও মুসলমানেরাই বাণিজ্যকার্য্যে অধিক অনুরাগি, হিন্দুরা তদ্রূপ নহে, অত্যল্প মাত্র, ইহার কারণ হিন্দুগণ সমুদ্র পথে গমনাগমনে অশক্ত। কেহ কেহ কেবল দেশীয় বাণিজ্য ও টাকার মহাজনি করিয়া থাকেন।

আহারীয় দ্রব্য—এখানে কাষ্ঠ ব্যতীত অপর দ্রব্য সুলভ নহে, ঘৃত, মৎস্য অতি দুর্লভ, চাউল মধ্যমরূপ, তাহারো অধিকাংশ বিদেশে প্রেরিত হয়, এজন্য সুলভ হয় না। গোল আলু অন্য দেশ হইতে আইসে, অতি মহার্ঘ্য। পটল নাই, যাহা আছে তাহা তিক্ত, দেশীয় জনেরা তাহাকে বিষফল কহে। বেগুণ, কলা, শাক, মোচা, কচু, করলা, ওল, লাউ, কুমুড়া প্রভৃতি পরিমিতরূপে জন্মে। উচ্ছা, কাঁকুর, ফুটি সম্ভব মত, বাজারে শুদ্ধ শুঁটকি। পচা চিংড়ি,

* সংবাদ প্রভাকর।। ১৫ ফাল্গুন ১২৬১

লাক্ষা ও লটে মাছের রাশি, লটে মাছে কাঁটা মাত্র নাই। ফলে ঐ সকল মৎস্য ভদ্রলোকের ভক্ষ্য নহে।

দুগ্ধ নিতান্ত মন্দ নহে, উত্তম দুগ্ধ টাকায় ॥৹ অর্দ্ধ মোন, কিন্তু রাহ্‌গির পথিকের পক্ষে বড়ই প্রমাদ। তাহারা প্রায় দুগ্ধ পায় না। ঘৃত বড় জঘন্য, ময়দা মধ্যম, বাজারে মিষ্টান্ন ভাল নহে, এখানে বাঙ্গালির খাদ্য সুখ কিছুই নাই। গোচে গাচে আহার করিয়া দিনপাত করিতে হয়। যাহারা মফস্বলে বাস করেন তাঁহারদের পক্ষে আহারের বড় ক্লেশ, নিত্য বাজার প্রায় কুত্রাপিই বসে না, হাটে হাটে মাছ তরকারি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এখানে মধ্যে মধ্যে তপস্বি-মাছ পাওয়া যায়! তাহার আস্বাদন উত্তম নহে। খোরশুলা ও বাটা মৎস্য অতি সুস্বাদু, কিন্তু সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, এবং কলিকাতার অপেক্ষাও তাহার মূল্য অধিক

পাঁটা বড় সস্তা, এস্থান মাংসাশির পক্ষে অতিশয় সুখকর।

চট্টগ্রামে ইংরাজের খাদ্য সুখের পরিসীমা নাই, কারণ মুর্গি, পেরু, পাঁটা ও শূকরাদি অতি অল্প মূল্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ফলমূলাদি—এদেশের আম্র ভাল নহে, একে টক, তাহে পোকায় পরিপূর্ণ। কাঁটাল যথেষ্ট ও উত্তম। পেঁপিয়া বড় ভাল, নীচু, পীচ ও গোলাপ-জামাদি দুষ্কর, পেয়ারা ভাল, পাটনাই কুল কোন কোন বাগানে ফলিয়া থাকে, দিশি কুল, তেঁতুল, চালতা, কামরাঙা বিস্তর! সজিনার ফুল ও সজিনার খাড়া অতি দুর্লভ, পর্ব্বতের উপর এক প্রকার কমলালেবু জন্মে, তাহা অতি ক্ষুদ্র ও মিষ্ট নহে, সসা অনেক, দাড়িম্ব ভাল নয়। তরমুজ অপকৃষ্ট, আনারস উৎকৃষ্ট। খর্জ্জুরের ন্যায় "চিনার" নামক এক প্রকার ফল জন্মে। তাহার সৌরভ ফুটি হইতে কিঞ্চিৎ ভাল।

ইক্ষু অনেক, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট নহে, তাহার চিনি হয় না, গুড় অতি কদর্য্য হয়। খেজুরে গুড় যৎ সামান্য, চিনি প্রস্তুত করিতে জানে না।

কৃষিকার্য্য—এ দেশ পর্ব্বতময়; একারণ ভূমি সাধারণরূপ উর্ব্বরা, এবং কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে তাদৃশ নিপুণ নহে, এজন্য অধিক শস্য জন্মে না, কিন্তু চাউল, মুগ, কলাই, খেসারী, অড়হর অধিক জন্মে, গোধূম পরিমিত রূপ হয়। ছোলা, মটর, মুসারী, জব, তিসি হয় না, সর্ষা অত্যল্প হয়। কৃষ্ণতিল অনেক হয় ও অতি উত্তম।

নানাদ্রব্য—এখানে গর্জ্জন তৈল, নারিকেল তৈল, কেরণ-ফুলের তৈল, নাগ কেশর ফুলের তৈল ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈল জন্মে। নারিকেলের কাছি অনেক প্রস্তুত হয়, এই সমস্ত দ্রব্য নৌকাপথে প্রেরিত হইয়া থাকে।*

কয়েক দিবস হইল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বাসার নিকট এক রজকের গৃহে সিঁদ দিয়া তস্করেরা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে!

নৌকার ঝাঁপ কাটিয়া দুর্জ্জনেরা এক ভদ্র লোকের বহু মূল্যের দ্রব্যাদি হরণ করিয়াছে।

সহরের ভিতর মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া অত্যাচার করে।

এখানে সর্পভয় অধিক। এই শীতকালেই ক্রূরজাতি বিবর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লোকের ঘরে ও পথেঘাটে ভ্রমণ করিতেছে, সর্পভয়ে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়।

সংপ্রতি সদর আমিন ও মুন্সেফি আদালতের ওকালতি পদের প্রার্থিদিগের পরীক্ষা

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৬ ফাল্গুন ১২৬১

হইয়াছে, তাহাতে ১২ দ্বাদশ ব্যক্তি "ডিপ্লোমা" পাইয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কয়েক ব্যক্তি নিতান্ত অযোগ্য, অনেক যোগ্য ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তমরূপ উত্তর প্রদান করিয়াও বাঞ্চত হইয়াছেন। একারণে অনেকেই পরীক্ষকদিগের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন, ফলে আমার বিবেচনায় নিতান্ত ন্যায়মত বাছনী হইয়াছে এমন নহে।

এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু গুরুচরণ দাস মহাশয় অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছেন, ইনি অতি উপযুক্ত। সকলেই ইঁহার অনুরাগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সৈয়দ আব্দুল মসজিদ, অতি সজ্জন, যোগ্যপাত্র, অধুনা তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার মহকুমা এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র হয় নাই।

সদর আমিন শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র পালিত মহাশয় সর্ব্বতোভাবেই প্রশংসিত, সুবিচারক, এখানে সকলের প্রিয় হইয়াছেন।

প্রধান সদর আমিন শ্রীযুত শ্রীনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অল্পদিন আসিয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ মুন্সী মহাশয় সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্ত, সজ্জন, ধার্ম্মিক।

ফৌজদারি ও কালেক্টরি সেরেস্তাদার মহাশয়েরা যোগ্য ও সুলোক।

আদালতের উকীল বাবু বিশ্বেশ্বর দাস, তথা কাশীশ্বর দাস অতি উপযুক্ত। বিশ্বাসপাত্র, সম্ভ্রান্ত।

আর আর বিষয় পরে লিখিব।*

ভূমিজ দ্রব্যাদি—পর্ব্বতে বেত্র অতি উত্তম জন্মে। হরিণ ও মহিষের শৃঙ্গের ব্যবসায় এখানে মধ্যমরূপ হইতে পারে। নারিকেল নাই, কিন্তু অনেক আমদানি হইয়া থাকে। সুপারি অল্প জন্মে, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

নীল হয় না, তামাকু হয় না, গাঁজা, সিদ্ধি হয় না, কয়েক প্রকার লেবু জন্মে। রাঙ্গাআলু বিস্তর হয়। পান, মূলা, পাট, শোন অনেক। এখানকার হিন্দুরা মাঘ মাসেও মূলা খাইয়া থাকেন।

বাঁশ অনেক প্রকার, এবং বাঁশের শিকড়ের লাঠি অতি উত্তম হয়।

পর্ব্বতীয় কাষ্ঠ—এখানকার পর্ব্বতে নানাপ্রকার কাষ্ঠ পাওয়া যায়। যথা—

গুটগুটিয়া, চেকরাসী, জারুল, সেগুণ ইত্যাদি। এই সমস্ত কাষ্ঠে চৌকী, সিন্ধুক, খট্টা, কৌচ, বাক্স ও দেরাজ প্রভৃতি উত্তমরূপে গঠিত হয়।

চট্টগ্রামের তাঞ্জাম পাল্কি অতি হাল্কি অথচ উত্তম কাষ্ঠ এবং গঠনের গুণে শীঘ্র ভগ্ন হয় না।

চর্চ্চ—এখানে তিনটি গিরিজা আছে যথা—কেথলিক, প্রোটেষ্টেণ্ট এবং বেপ্টিষ্ট।

বন্যবৃক্ষ—এদেশে পর্ব্বতে বন্যবৃক্ষই অধিক, ইহাতে কাষ্ঠের ক্লেশ কিছুমাত্রই নাই, এক পয়সার কাষ্ঠে একটা ভোজের রন্ধন অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইতে পারে।

পক্ষী—নানা জাতীয় পক্ষী এই বসন্তকালে পর্ব্বতে, বনে উপবনে, গৃহস্থের গৃহস্থিত বৃক্ষশাখায়, নদীতটে, ও চরে বসিয়া অশেষবিধ মধুর স্বরে সংগীত করিয়া চিত্ত হরণ

---

* সংবাদ প্রভাকর। ১০ ফাল্গুন ১২৬১

করিতেছে। ময়না অনেক, মদনা, টিয়া, শালিক, ময়ূর, কুক্কুট, পায়রা, ঘুঘু, বুলবুল, দধিয়াল নানা প্রকার, হংস বহু প্রকার, চটক, পাপিয়া, ফিঙ্গা, ভরত; বৌ কথাকও, বেনেবৌ, গৃহস্থের খোকা হোক, চোখ গেল, মানিয়া ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও বড় বড় অনেক বিহঙ্গম আছে, কাক বিস্তর কিন্তু দাঁড়কাক অত্যল্প।

হিংস্র জন্তু ও সর্প—হিংস্র জন্তু বিস্তর, পর্ব্বতে গণ্ডার অনেক, মহিষ বিস্তর, উল্লুক নানা প্রকার, ভল্লুক যথেষ্ট, হস্তি নিতান্ত ন্যূন নহে, হরিণ অসংখ্য, বাঘ অগণ্য। স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুর অত্যাচার আছে, ব্যাঘ্র মানুষ্যের প্রতি অল্প আক্রমণ করে, বড় অধিক আক্রমণ করে না। মেষ, ছাগ, গো বৎসের উপর সর্ব্বদাই আক্রমণ করিয়া থাকে।

সর্পের দৌরাত্ম্য প্রায় নাই, কিন্তু পর্ব্বতে পীতরাত, দুধরাজ, প্রভৃতি বড় বড় সর্প ও অজগর আছে, তাহারা প্রায় মনুষ্য হিংসা করে না।

শিল্পকর্ম্ম—এখানকার কুমারের মৃত্তিকার দ্রব্য উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারে না

পাতার ছাতা এখানে অতি সুন্দর। পাটি ভাল হয় না মোটা কিন্তু শস্তা।

বস্ত্র ও অলংকার যৎসামান্য, ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত হয় নাই। বাসন যাহা প্রস্তুত করে তাহা সুদৃশ্য নহে।

পর্ব্বতীয় জাতি সমূহ, আহার-বিহার, বিবাহ-পদ্ধতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি—চট্টগ্রামের পর্ব্বতের উপরেই অধিক লোক বসতি করে, তাহারা তাবতেই ইতর ও বন্যরূপে গণ্য, মগ, চাকমা, ত্রিপুরা, কুকি, লুচি, বনযুগি ও রিয়াং ইত্যাদি জাতিরাই পর্ব্বতীয়। এই সকল জাতির অধিকাংশই মগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা তাবতেই প্রায় এক ধর্ম্মক্রান্ত, সকলেরি আহার ব্যবহার একরূপ, খাদ্যাখাদ্য কিছুই বিচার করে না, গো, শূকর, কুক্কুট সমস্তই ভক্ষণ করে, কিন্তু প্রাণান্তেও গো হত্যা করে না, ভাগাড় হইতে মরা গোরু আনিয়া ভোজন করে, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু তাবতেরি অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকে, তাহাতে বিকার মাত্র নাই, যাহা পায় তাহাই খায়, সর্ব্বদাই মাচার উপর বাস করে, ইহারদিগের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে দুই বৎসরের অধিকাল একস্থান অবস্থান করে না। দুই বৎসর পরিপূর্ণ হইলে অগ্নিদ্বারা সে স্থান দগ্ধ করত অনত্র প্রস্থান করে, সময়ে সময়ে অতিশয় অত্যাচার করে, নর হত্যা করে, স্ত্রী ও বালক বালিকা হরণ করিয়া লইয়া যায়, কখনো কখনো সুগম পাইলে বলি প্রদান পূর্ব্বক নর মাংস ভক্ষণ করে, কোন মতেই তাহারদিগ্যে শাসন করা যাইতে পারে না।

ইহারা বারুদের অগ্নিতে শবদাহ করে, দাহ কালীন অনেকে একত্র হয়।*

ইহারদিগের বিবাহের প্রথা অতি চমৎকার, অর্থাৎ প্রাচীন কালের ন্যায় স্বয়ম্বরার প্রথা প্রচলিত আছে, স্ত্রীলোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরুষ মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। এই সকল জাতির মস্তকের উপর রাজকর নির্দ্দিষ্ট আছে, যদবধি অবিবাহিত থাকে তদবধি রাজস্ব দিতে হয় না, বিবাহ হইলেই উভয়ের মস্তক গণনা করিয়া খাজনা গৃহীত যয়। কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতী, কি প্রাচীন, কি প্রাচীনা—স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই বিবাহ না করিলেই স্বাধীনতা থাকে। বিবাহ করিলেই রাজার অধীন হইয়া রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হয়। ইহারদিগের পুরুষেরা অতি অকর্ম্মণ্য, অলস, কেবল আহার নিদ্রাতেই কালক্ষয় করে, পরিশ্রমে তৎপর নহে, স্ত্রী জাতিরা কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক রাজকর প্রদান করে ও সংসার নির্ব্বাহ করে।

---

* সংবাদ প্রভাকর। ১৯ ফাল্গুন ১২৬১

মগের রাজার নাম "ক্র", তালুকদারের নাম "রোয়াজা" এবং পুরোহিতের নাম "রাওলী"।

মগ ও ত্রিপুরা জাতির "ফরাতারা" নামক দেবতাব উপাসনা করে, চন্দ্রনাথের পর্ব্বতের নীচে এক বটবৃক্ষের তলে ৪ চারিখানি প্রস্তর আছে, সেই প্রস্তরকেই "ফরতারা" বলিয়া পূজা করিয়া থাকে, ইহারদিগের পুরোহিতেরা বিবাহ করে না।

মগদের "ধন" নামক বাদ্য অতি মিষ্টি, তিন ক্রোশ পথ হইতে তাহার শব্দ শুনা যায়। ঐ বাদ্য কাংশ্য যন্ত্র।

চাটগেঁয়ে মগদের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান এবং খ্রীষ্টান হইয়াছে। মগাই হিন্দুর দল স্বতন্ত্র, তাহারা ব্যবহার্য্য নহে, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় ক্রিয়া কর্ম্ম আচার ব্যবহার সকলি করে।

নিমকের আড়ৎ—এখানে অতি ধনী ব্যাপারিদেরগের মধ্যে কয়েকটা নিমকের আড়ৎ আছে, তন্মধ্যে মাণিকগঞ্জ নিবাসী দধিরাম নিত্যানন্দ, দধিরাম রায়চাঁদ, বিক্রমপুরের ভাগ্যকুল নিবাসী গুরুপ্রসাদ কুণ্ডু। বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গ নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র চন্দ্র, মহেশচন্দ্র পাল। ঢাকা নিবাসী স্বরূপচন্দ্র পোদ্দার। মাণিকগঞ্জের বালিটি নিবাসী পণ্ডিত রাম সাহা, এই কয় ঘর প্রধান ধনি। ইহারা প্রত্যেকে বিস্তর টাকার লবণ ক্রয় করেন। তিলকচন্দ্র পোদ্দার প্রভৃতি ১০।১২ ঘর মহাজন মধ্যমরূপ।

বস্ত্র—চট্টগ্রামে কাপড়ের মহাজন কয়েকজন আছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে কেহই বিশেষ ধনি নাই।*

মির এহিয়া বিদ্যালয়—চট্টগ্রামে "মির এহিয়া" নামক এক দাতব্য বিদ্যালয় আছে, তথায় বাঙ্গালা এবং পারস্য এই দুই ভাষায় উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, এই পাঠশালার কার্য্যনির্ব্বাহ নিমিত্ত নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে প্রতিমাসে ৫০ টাকা উৎপন্ন হয়, অধুনা ছাত্রের সংখ্যা ৩০ জন মাত্র। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা বড় উত্তম নহে, কারণ অধ্যক্ষগণ বিশেষরূপে মনোযোগ তত্ত্বাবধান করেন না। শুনিতে পাই, কালেক্টর সাহেব অবিলম্বেই এই পাঠাগারের হিতসাধন পক্ষে যত্নশীল হইবেন, তাহা হইলেই উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা বটে। অধুনা ঐ বিদ্যালয় নগরের প্রান্তভাগে মাঠের মধ্যে স্থাপিত আছে, ইহার পরিবর্ত্তে নগরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে ও ইংরাজী ভাষায় উপদেশ প্রদান করিলে সর্ব্বতোভাবেই উত্তম হয়।

এখানে মির এহিয়া নামক এক সম্ভ্রান্ত যবন ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে এক ভজনালয় ও পাঠালয় স্থাপনের অনুমতি করিয়া যান, তাঁহার পুত্রেরা ভূমির উপস্বত্ব হইতে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম স্কুল—চট্টগ্রাম পূর্ব্বতন কমিশ্যনার মেং ডেম্পিয়ার সাহেব ১৮৩৬ সালে কতিপয় ইংরাজ ও ধনি প্রজার অনুকূলতা দ্বারা এক গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও অনুরোধ ক্রমে এই স্কুলের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮৩৭ সালে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধীন করিলেন, তদবধি এপর্য্যন্ত জিলা স্কুলের শ্রেণী মধ্যে এই স্কুল প্রধানরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। অন্যূন ২০ বিংশতি জন ছাত্র বৃত্তিভোগী, ঢাকা কলেজে প্রেরিত হইয়াছেন।

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২০ ফাল্গুন ১২৬১

ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তম উত্তম রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, মেং রিকেটস্ এবং বকলণ্ড সাহেব এই স্কুলের নিতান্ত হিতৈষি ছিলেন, তাঁহারদিগের উৎসাহে ইহার অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! এদেশীয় লোকেরা পাঠশালার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না। চট্টগ্রামিরা বরং দ্বেষ করিয়া বহুবিধ বাধা জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া থাকেন।

অধুনা পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা ২৪৭ জন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৭, বৈদ্য ৬৮, কায়স্থ ৮৮, ইতর জাতি ২, খ্রীষ্টান ১৪, মুসলমান ৬৭, এবং মগ ১ জন। উত্তরোত্তর ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই নগরে ৪০০ খ্রীষ্টান লোক বাস করে, পাঠশালায় তাহারদিগের সংখ্যা এরূপ অল্প হওনের কারণ এই যে তাহারা প্রায় অর্থহীন। তাহারদের অভিভাবকেরা ইতর কর্ম্মদ্বারা দিনপাত করে। সুতরাং বেতন দিয়া এখানে আসিতে পারে না, একারণ ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটেই অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কারণ পাদ্রির স্কুলে বেতন দিতে হয় না। এখানে মুসলমানদিগের যদ্রূপ সংখ্যার আধিক্য, ইহাতে বোধ হয় অতি শীঘ্রই ১০০ জন যবন ছাত্র হইতে পারিবে। এবং বর্ত্তমানে যাহারা অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য স্কুল অপেক্ষা অধিক।

এখানে জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত লোকেল কমিটির অধ্যক্ষগণ একজন ডাক্তার নিযুক্ত করা শ্রেয়স্কর বোধে গভর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন। এব অনুরোধ গ্রাহ্য হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

সংপ্রতি ছাত্রের সংখ্যা অধিক হওয়ায় পাঠশালায় গৃহ বিস্তৃত করণার্থ কমিটি বারম্বার রাজপুরুষদিগ্যে পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর আইসে নাই। এতদ্রূপ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মে কর্ত্তারা এমত অমনোযোগ কেন করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না।

এই স্কুলে ৭ সাত জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে প্রধান শিক্ষক বাবু রামশঙ্কর সেন। ইনি বৈদ্যবাদ প্রতাপ নিবাসী, ঢাকা কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপাত্র ছাত্র। অতি যোগ্য, সচ্চরিত্র, ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ। শিক্ষা প্রদানের প্রণালী পক্ষে পরম পারদর্শী, অতিশয় পরিশ্রমী, বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে বিশেষ অনুরাগী, ইহার মাসিক বেতন ১০০ টাকা।

দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফরাসডাঙ্গা নিবাসী, হুগলী কালেজের যশস্বী ছাত্র, সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, ইহার মাসিক বেতন ১০০ টাকা।

তৃতীয় শিক্ষক মেং কারডাগো, যোগ্য। ইঁহার বেতন ৪০ টাকা।

চতুর্থ শিক্ষক বাবু পূর্ণচন্দ্র কায়স্থগিরি, বৈদ্য, চট্টগ্রাম নিবাসী, পদের উপযুক্ত, বেতন ৩০ টাকা।

পঞ্চম শিক্ষক, শরচ্চন্দ্র কায়স্থগিরি, বৈদ্য, চট্টগ্রাম নিবাসী, বেতন ২৫ টাকা!

ষষ্ঠ শিক্ষক, আবদুল লতিব। মুসলমান, চট্টগ্রাম, নিবাসী, বেতন ১৬ টাকা।

সপ্তম শিক্ষক, শরচ্চন্দ্র বাবু, বেতন ১৬ টাকা।

প্রতিদিন ১৯০ ছাত্র আগত হয়।

এইক্ষণে পণ্ডিতের পদ রহিত হওয়াতে বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষক তজ্জন্য গুরুতর শ্রম করিতেছেন। অপর সকলে শুদ্ধরূপে বাঙ্গালা কহিতে পারেন না। ইহাতে কিরূপে উপদেশ করিবেন, তাঁহারদিগের উপদেশ সুসংস্কার না হইয়া

কুসংস্কার হওনেরি সম্ভাবনা, যাহা হউক, পুনর্ব্বার এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত করা অতি কর্ত্তব্যই হইতেছে।

এই স্কুলের মাসিক ব্যয় ৪০০ টাকা, তন্মধ্যে ছাত্রদিগের বেতন হইতে মাসে প্রায় ২০০ টাকা আয় হইয়া থাকে।

বিদ্যাগারের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া লোকেল কমিটির অধ্যক্ষগণ প্রধান শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ফলে এ বিষয়ে অতি কর্ত্তব্য বটে।*

সিবিলেরা এ পাঠশালার প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা প্রায়ই রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছে। কমিস্তনর সাহেব আগামী পরীক্ষায় ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন। কালেক্টর মেং লিলি সাহেব ১৫০ টাকা, মেং ম্যাঙ্গলস্ সাহেব ২০ টাকা প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এখানে একটা পুস্তকালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হইতেছে, কিন্তু এদেশীয় লোকেরা তাহাতে আনুকূল্য করেন এমত বোধ্য নহে।

চট্টগ্রাম স্কুলের ছাত্র দুর্গাচরণ দত্ত, উমাচরণ দাস এবং গঙ্গাদাস দাস এই কতিপয় ছাত্র বঙ্গভাষায় "দেশভ্রমণ" বিষয়ের যে প্রবন্ধ রচনা পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করেন আমি তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। যেহেতু তাঁহারা প্রথমানুষ্ঠানেই যখন সদভিপ্রায় সম্বলিত সুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন ক্রমে অতি উত্তম হইবেন তাহাতে সংশয় কি। ভালরূপে পরিশ্রম করুন, অনুশীলনে অনুরত হউন।

এ জেলায় বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইলে অতি কল্যাণের কার্য্য হয়।

জলবায়ু—এখানে পুষ্করিণী ও পর্ব্বতের ঝর্ণার জল ব্যবহার করিতে হয়। ঝর্ণার জল অতি সুমিষ্ট ও হিতকর, পূর্ব্বে এখানকার জলবায়ু অতি উত্তম ও স্বাস্থ্যকর ছিল। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বায়ুর দোষে লোকের অত্যন্ত পীড়া হইতেছে, ত্র্যাহিক জ্বরে কত লোক ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না, কেহই সুখি নহে, সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়। শরীরের পক্ষে চট্টগ্রাম এইক্ষণে হট্টগ্রাম হইয়াছে।

এখানকার পর্ব্বতের শোভা অতি মনোহর, যাঁহারা শিখরবাসি তাঁহারা অনেকাংশেই সুখে থাকেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় সকল পর্ব্বতের উপরেই স্থাপিত আছে, সাহেব লোকেরা ও কোন কোন বাঙ্গালী তথায় অবস্থান করেন।

জলাশয়—এ জেলায় পুষ্করিণী বিস্তর, তার জল নিতান্ত মন্দ নহে। জলকষ্ট মাত্র নাই। সংপ্রতি চাঁদমিয়া দারোগার পুত্র কাতলগঞ্জে বৃহৎ এক সরোবর খনন করিতেছেন, তাহাতে সাধারণের উপকার হইবেক।

খাল—একটা খাল খনন করিয়া ভুলুয়া জেলার সহযোগে মেঘনা অথবা ডাকাতে নদীতে কিম্বা কমিল্যা জেলার দাউদকাঁদীর মেঘনার সহিত সংযোগ করিয়া দিলে বাণিজ্য কার্য্যে ও গমনশীল লোকের পক্ষে কত উপকার হয় তাহা কথনাতীত। এতদ্দ্বারা জেলার শ্রীবৃদ্ধি, প্রজার কল্যাণ ও আর আর বিস্তর হিতসাধন হইবে। এই বিষয়ে কমিস্তনর মেং ষ্টেনিস্ফোর্থ সাহেবের বিশেষ মনোযোগ করা অত্যাবশ্যক হইতেছে, খাল কাটিয়া টোল বসাইলে রাজার লভ্য হইবে। অতএব যাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের মঙ্গল এমত কর্ম্ম ত্বরায় করাই কর্ত্তব্য।†

* সংবাদ প্রভাকর। ২৩ ফাল্গুন ১২৭১ † সংবাদ প্রভাকর। ২৪ ফাল্গুন ১২৭১

কমিল্যা—৩০ মাঘ, ১২৬১

আমরা গত ২৩ মাঘ রবিবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে চট্টগ্রাম পরিহার পূর্ব্বক বাড়বাকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অতিক্রম করত ২৮ মাঘ শুক্রবার বেলা এক প্রহরের পরে কমিল্যায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখানকার প্রধান সদর আমিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় মহাশয় আমারদিগ্যে যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক বাসস্থান ও উত্তমরূপ আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ততোস্ত সন্তুষ্ট হইলাম, এই মহাত্মা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। অতি মহৎ, বিচারকার্য্যে অতিশয় যোগ্য, সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ, অতি ধার্ম্মিক, অতি অল্প দিবস এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছেন, ইঁহার সুবিচারে তাবতেই আনন্দিত হইয়া নিয়তই প্রশংসা করিতেছেন।

এখানকার কালেক্টরি হেড কেরাণী বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু, স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু অমৃতলাল গুপ্ত, তৃতীয় শিক্ষক হরিশ্চন্দ্র বাবু তথা দ্বারকানাথ গুপ্ত, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কতিপয় সুশিক্ষিত সুসভ্য যুবকের সহিত সদালাপ করতঃ সীমাশূন্য সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, ইঁহারা তাবতেই অতি ভদ্র, নির্ম্মল জ্ঞানানুরাগি, ঈশ্বর প্রেমিক। ইঁহারদিগের সহিত যিনি আলাপ করেন, তিনিই যথার্থ সুখী হইয়া থাকেন।

কালেক্টরি সেরেস্তাদার বাবু চন্দ্রশেখর রায় অতি বিশিষ্ট, সুখ্যাতি পাত্র, এখানে তাবতেই তাঁহার অনুরাগ করেন।

ত্রিপুরার রাজবাটীর দেওয়ান বাবু গৌরমোহন রায় মহাশয় সর্ব্ববিষয়েই যোগ্য ব্যক্তি, সংস্কৃত পারস্য বাঙ্গলা ভাল জানেন, সুলেখক, সুবক্তা, প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ। সংগীত শাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী, কোকিল কণ্ঠ। ইঁহার সহিত সাক্ষাতে মহানন্দ লাভ করিয়াছি।

আর আর অনেক মহাশয় এখানে আছেন, তাঁহারদের প্রত্যেকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, কারণ আমি এখানে অধিককাল অবস্থান করিতে পারিলাম না।

যাঁহার যাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, সকলেরি নিকট আমি বিশেষ বাধ্য হইয়াছি।

ত্রিপুরার রাজা এইক্ষণে আগরতলায় রাজভবনে আছেন, পক্ষির আমোদেই অধিক আমোদ পাইয়া থাকেন, সংপ্রতি পুরুষে পুরুষে বিবাহ দিয়া গুরুতর উৎসব করিয়াছেন। রাজা প্রায় গোপনেই থাকেন, দরবারে বসেন না। ক্রমেই ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে, এমত প্রাচীন রাজার ঘরের অবস্থা এরূপ হওয়াতে সকলেই ক্ষুব্ধ হইবেন।

কমিল্যার পুষ্করিণী অনেক, ও বড় বড়, তন্মধ্যে রাণীদিঘীর জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহেব লোকেরা সেই জল পান করেন।

এখানে গোমতী নামে এক নদী আছে, বর্ষাকালে তাহার উপর দিয়া নগরের ঘাটে বড় বড় নৌকা আইসে, এইক্ষণে কেবল ছোট ছোট ডিঙ্গির গমনাগমন হইয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গামণ্ডলের সদর কাছারী জাফরগঞ্জ পর্যন্ত বারমাস বড় বড় নৌকা আসিয়া থাকে। এই স্থান এখান হইতে চারি ক্রোশ পথ হইবে, সেই স্থান বাণিজ্য পক্ষের প্রধান স্থান।

ত্রিপুরা জেলায় খাদ্য সুখ উত্তম। মৎস্য, তরকারি, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, চিনি সকলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অড়হর ডাউল এখানকার মত উত্তম আর কুত্রাপি জন্মে না।

চাউলের কথা কি লিখিব ১ এক টাকায় ১।০ এক মোন দশ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

চট্টগ্রাম হইতে কমিল্যায় আসিতে দস্যুভয় মাত্র নাই, পথ অতি উত্তম, সরাই ও হাট

বিস্তর আছে, কিন্তু ভদ্রলোকের আহারীয় দ্রব্য কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুষ্করিণী কত, তাহার সংখ্যা হয় না, বড় বড় এক একটা পুকুর। তাহা কত কালের ও কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেহই কহিতে পারে না।

কমিল্যার অধীনে রাস্তার ধারে ত্রিপুরার রাজারদিগের অনেক পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে জগন্নাথ দীঘি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এ জেলায় এতবড় সরোবর নাই, কিন্তু ইহা বর্দ্ধমানের কৃষ্ণসায়র অপেক্ষা ছোট।

কমিল্যার বাজার, হাট ও অধিকাংশে আমলাদিগের বাসা, দোকান পশার, গৃহস্থের গৃহ সকল অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়াছে। ইহাতে লোকের বিস্তর অনিষ্ট ও ক্লেশ হইয়াছে।

জেলার সহরটি অতি ক্ষুদ্র, ইষ্টকালয় অত্যল্প, রাজার বাটী পাকা বটে, কিন্তু সুদৃশ্য নহে।

শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে চন্দ্রনাথে অসংখ্য যাত্রি গমন করিতেছে।

এখানকার স্কুলের কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে, সেক্রেটারি ডাক্তার টি. ডিউকা সাহেব তাহার উন্নতি কল্পে অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি প্রতি রবিবারে সভা করিয়া লেকচার দিয় থাকেন। এই সাহেবটি যথার্থ ই বিদ্যানুরাগি, সদ্বিদ্বান, জনহিতৈষী।

এখানকার ব্রহ্মসভার ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মেরা তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ অতিশয় যত্ন করিতেছেন। কিন্তু কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক ও বিদ্যালয়ের বালক ব্যতীত অপর কেহই এ পক্ষে অনুরত নহেন!

এই স্থান বাণিজ্যের প্রধান স্থান, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী।

এখানকার বিস্তারিত বিবরণ অবিলম্বেই লিখিয়া প্রেরণ করিব।

আগামী কল্য আমরা কমিল্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকাপথে দাউদকাঁদিতে যাত্রা করিব।*

জিলা ত্রিপুরা

গঙ্গামণ্ডলের সদর কাছারী

জাফরগঞ্জ। ২ ফাল্গুন, ১২৬১

আমরা গত ৩১ মাঘ ভোজনান্তে বেলা দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কমিল্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুইখানি ডিঙ্গি আরোহণ করত গোমতী নদী ভাঁটিয়া মেঘনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছি, সন্ধ্যার পরেই মৃত মহাত্মা মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের বিখ্যাত গঙ্গামণ্ডল জমিদারির সদর কাছারী জাফরগঞ্জে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। ধার্ম্মিকবর মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর রিসিবর হইতে ছয় বৎসরের জন্য এই পরগণা ইজারা লইয়াছেন। যদিও ইজারার ডাক অত্যন্ত অধিক হইয়াছে কিন্তু প্রার্থনা করি জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন। শস্য প্রচুররূপে উৎপন্ন হউক, প্রজারা সুখি হইয়া স্বচ্ছন্দে রাজস্ব প্রদান করুক। গঙ্গামণ্ডলের ভূমি প্রকৃত স্বর্ণভূমি। শস্য উত্তম জন্মে, নানা দ্রব্যই উৎপন্ন হয়। এক ছটাক ভূমি কখনই পতিত থাকে না। কিন্তু সময়ে সময়ে দৈবঘটনাতে অতিশয় বিড়ম্বনা করে। ত্রিপুরার অধীন গোমতী প্রভৃতি এবং শ্রীহট্টের অন্তঃপাতি কয়েকটা নদনদী বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া সমীপস্থ সমুদয় শস্য সংহার করে। সুতরাং শস্যের হানি হইলে প্রজারা কোন মতেই কর প্রদান করিতে পারে না, ইহাতে বৎসর বৎসর অনেক বাকী পড়িয়া থাকে। এ কারণ রাজা-দিগ্যে বিস্তর হানি সহ্য করিতে হয়। যদি দৈববিড়ম্বনা না হয় তবে এই গঙ্গামণ্ডলে ব্যয় বাদে ১০০০০০ লক্ষ মুদ্রা লাভ হওনের

* সংবাদ প্রভাকর। ২৫ ফাল্গুন ১২৬১

অসম্ভাবনাই নাই। গোমতী প্রভৃতি নদী নদ সকল যদিও অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু বর্ষায় রুদ্র হইয়া বসে। এক দিবস গুরুতর বৃষ্টি হইলেই পর্ব্বতের জল নাবিয়া বন্যা হইয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করে। স্থানে স্থানে কয়েকটা খাল খনন করিলে বোধ করি এই অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, কারণ স্রোত চতুর্দ্দিগে প্রবাহিত হইলে নদ প্লাবিত হইতে পারে না, তাহা হইলেই প্রজাপুঞ্জের ঘর দ্বার ও ফসলাদি স্বচ্ছন্দেই রক্ষা পায়। শুনিলাম রাজারা এই সুযোগযুক্ত সদুপায় সম্পাদনের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

রাজারদিগের সুখ্যাতি সৌরভে এদেশ আমোদ করিয়াছে, পিতার ন্যায় হইয়া প্রজাগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছেন, তাহারা রাজ পীড়ায় কখনই পীড়িত হয় না, ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারে না। যদিও অজন্মা হয় তবে আপনারা ক্ষতি সহ্য করিয়াও প্রজাকে রক্ষা করেন। এজন্য সকলে রাজগুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

সদর কাছারীতে এক কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার সেবা অতি উত্তমরূপেই হইয়া থাকে। নিত্য ভোগরাগ পারিপাট্য রূপেই হয়। তদ্ভিন্ন পর্ব্বাহ উপলক্ষে বাহুল্য পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, কালীর বাটীতে যে আইসে সেই প্রসাদ পায়। এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগত যত আইসেন কেহই বিমুখ হয়েন না। সকলেরি যথাযোগ্য সমাদর ও সেবা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্রেই সমাগত হইলে আহারীয় দ্রব্য এবং প্রণামি টাকা প্রাপ্ত হয়েন। পাত্র বিশেষে এক অবধি দশ [টাকা] পর্য্যন্ত দান হইয়া থাকে। দায়গ্রস্ত ভদ্র সন্তানেরা আগত হইলেই এস্থান হইতে তাঁহারদিগের দায়ের অনেক লাঘবতা হয়। এইরূপ সদ্ব্যয়ের বিশ্রাম এক দিনো নাই, নিয়তই হইতেছে। এই বিষয়ে আমি যদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি প্রকাশ করিব। রাজারদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সমক্ষে সানন্দে সমুদয় ব্যক্ত করিব।

গঙ্গামণ্ডলের কাছারী বাটী পাকা নহে, সমুদয় তৃণের ঘর। অগ্নিতে প্রতি বর্ষেই অনিষ্ট করে। আমলারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকেন। এইক্ষণে পাকা হওনের উদ্যোগ হইতেছে, ইট প্রস্তুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহার কার্য্যারম্ভ হইবেক। তাহা হইলে আর কোন ভাবনা থাকে না। খাজনা ও মহাফেজখানা নিঃসন্দেহে রক্ষা পায়, যে জমিদারির এত উৎপন্ন তাহার কাছারী বাটী এতদিন কেন পাকা হয় নাই, ইহাতেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছি, অথচ প্রতি বৎসর সাড়ে তিন হাজার, চারি হাজার টাকা ঘর মেরামতে ব্যয় হইয়াছে। ইহার কারণ পূর্ব্বকার আমলারা এই টাকার অধিকাংশই আপনারা উদরস্থ করিতেন।

অধুনা ঢাকা নিবাসী সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য রায় বংশীয় রাজমাতুল রায় বংশীলোচন মিত্র মহাশয় এই পরগণার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া অতি সুনিয়মে প্রচুর প্রশংসার সহিত কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন। ইনি যেমন সদ্বংশোদ্ভব সেইরূপ সজ্জন, এবং সেইরূপ কার্য্য তৎপর, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া পরগণার হিত সাধন করিতেছেন, ইনি যথার্থই ধার্ম্মিক, ইহার কর্ম্মের পারিদর্শিতা ও ধার্ম্মিকতা দেখিয়া আমি যথেষ্ট তুষ্টিলাভ করিয়াছি।

এই পরগণার আখড়াজাৎ খরচ অতি বাহুল্যই দেখিলাম, এইক্ষণে যে ব্যয় হইতেছে তাহা হইতে অনেক সংক্ষেপে অনায়াসেই কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে।

গোমতী নদী—এই গোমতীকে এখানে গুমতি বলিয়া থাকে। এই গুমতির ঘুমতি অতি ভয়ঙ্কর, চূর্ণির ঘূর্ণি ইহার নিকট কোথায় আছে, ইহার জল সর্ব্বত্র উত্তম নহে, কোন কোন স্থানে মিষ্ট বটে। গোমতীর পরিসর চূর্ণির ন্যায়। মণিপুরের পর্ব্বত নিকট নির্গত

হইয়া মেঘনায় আসিয়া শরীর সমর্পণ করিয়াছে, ইহার উভয় তীরের ভূমি সকল অত্যন্ত শস্য-শালিনী, স্থানে স্থানে গঞ্জগোলা অনেক আছে, এই নদীর তীর ব্যতীত এদেশের আর কোন-খানেই তামাকু জন্মে না। ইক্ষু অতি উত্তম জন্মে, অড়হর, মুগ, কলাই, তিল, সর্ষা ও তরকারি অতি সুন্দর হয়। নদীতে মৎস্য প্রায় নাই, নিরামিষ্য নদী বলিলেই হয়। নানা দেশীয় ব্যবসায়ীরা এই নদীতে নৌকা আনিয়া হাটে হাটে ধান্য, চাউল, অড়হর, তামাকু প্রভৃতি ক্রয় করিতেছে, তণ্ডুল এত সস্তা আর কুত্রাপি দেখিলাম না। মোটা সরু সকল চেলের একদর, টাকায় ১০ দশ পশুরি ১১ এগারো পশুরি বিক্রয় হইতেছে, এই পথে বিস্তর নৌকার আমদানি রপ্তানি দেখিলাম। জলের স্বল্পতা জন্য জাফরগঞ্জের ওদিগে দুই ক্রোশ পথের অধিক বড় নৌকা আর যাইতে পারে না। ১০০ একশত মোনী নৌকা কমিল্যা পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ইহার পর আর চলে না, ডিঙ্গি নৌকা সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারে।*

কমিল্যা স্কুল

৩ ফাল্গুন ১২৬১

পূর্ব্বে কমিল্যায় বিদ্যালয় মাত্র ছিল না, ইহাতে বালকবৃন্দের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিষমতর ব্যাঘাত হইত। এখানকার পূর্ব্বতন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট মেং মণি সাহেব বিশেষ যত্ন ও শ্রম সহযোগে এখানকার সমুদয় রাজকর্ম্মচারি ও ভূম্যাধিকারিদিগের অনুরোধ করত চাঁদার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমতঃ ইংরাজী ১৮৩৭ সালে সাধারণ ব্যয়ে এক "প্রাইভেট স্কুল" স্থাপন করেন। পরে বিদ্বানব্যূহের বিদ্যানুশীলনে বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা প্রকাশ করাতে রাজপুরুষেরা অনুকম্পা পুরঃসর ১৮৩৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দিবসে এই স্কুলকে সাধারণ শিক্ষা সমাজের অধীন করেন, তদবধি ইহা "কমিল্যা গবর্ণমেণ্ট স্কুল" নামে বিখ্যাত হইল।

প্রথমে এতৎ পাঠালয়ে ইংরাজীর নিমিত্ত দুইজন শিক্ষক এবং বাঙ্গালার জন্য একজন পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। পরে ক্রমেই ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ১৮৪৬ সালে আর দুইজন অতিরিক্ত মাষ্টর নিয়োজিত লইলেন।

এইক্ষণে মেং লেস্টর সাহেব প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি অতি যোগ্য, ক্ষমতাপন্ন, ইহার সদুপদেশে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়াছে, ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ঢাকা কালেজে গিয়া "সিনিয়ার স্কালারসিপ" প্রাপ্ত হওয়াতে সাহেব অতিশয় যশস্বী হইয়াছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু অমৃতলাল গুপ্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগ্যে ইংরাজী বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া আবার প্রথম শ্রেণীর বিদ্যার্থিব্যূহের বঙ্গ ভাষার অধ্যাপন কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ইনি উভয় ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ এবং বিস্তর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "লোকেল কমিটির" অধ্যক্ষগণের মধ্যে কেহই বঙ্গভাষার আস্বাদ জ্ঞাত নহেন, একারণ কোন ব্যক্তিই এপক্ষে উৎসাহ প্রদান করেন না। পরীক্ষকের মধ্যে কেহই তাহার মর্ম্মানুধাবন করণে পটু নহেন, সুতরাং তাঁহারদিগের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভাব্য নহে এবং এই প্রযুক্ত ছাত্রেরাও অনুশীলনে যথোচিত মনোযোগ করে না।

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ২৩ ফাল্গুন ১২৬১

তৃতীয় শিক্ষকবাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় ভাষায় পারদর্শী, অতি সজ্জন।

চতুর্থ শিক্ষক বাবু নীলকমল চক্রবর্ত্তী ও পঞ্চম শিক্ষক বাবু অভয়চন্দ্র বিশ্বাস, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মে উপযুক্ত।

অধুনা বিদ্যালয়ে অন্যূন ১৩৫ ছাত্র অতি উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং ক্রমেই বালকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যক্ষেরা বালকবর্গের বয়সের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। অনুরোধক্রমে অধিক বয়স্ক বালককে নিযুক্ত করেন ইহা নিতান্তই ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়।

ছাত্রের নিকট মাসিক ১ এক মুদ্রা বেতন গৃহীত হয়। এতদ্দারা যে অর্থ উৎপন্ন হয় তাহাতে পঞ্চম শিক্ষকের বেতন দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কালেক্টরি রাজকোষে প্রেরিত হয়।

ডাক্তার সাহেব এই স্কুলের সেক্রেটারি, তিনি বিদ্যা বিষয়ের বিশেষ বন্ধু।

ছাত্রের মধ্যে ২৫ জন মুসলমান, ফিরিঙ্গি ৬ জন, শিক ১ জন, হিন্দুস্থানী ২ জন এবং অপর তাবতেই বাঙ্গালি।

স্কালারসিপ—গবর্ণমেণ্ট ৪
ত্রিপুরার রাজা ... ২
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ১
প্রত্যেকে ৮ টাকা।

জমিদার বাবু নবকৃষ্ণ রায় ১৫ টাকা বার্ষিক পরিতোষিক দেন।

এবারে কয়েক জন সাহেব পুরস্কার দিবেন। মেং ক্রোজন সাহেব ৬ জন দুঃখি বালকের বেতন দেন।

ত্রিপুরার রাজা ৪ জন বালকের বেতন দেন।
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৫ জন ,, ,,
আলা সদর আমিন ১ জন ,, ,,
বাবু নবকৃষ্ণ রায় ১ জন ,, ,,
মেং জকসন সাহেব ২ জন ,, ,,

ডাক্তার সাহেব প্রতি মাসে ২৷৷০ টাকা দেন, তদ্দারা কয়েক জন ছাত্র অধ্যয়ন করে।

ত্রিপুরার রাজার টাকা প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে এই স্কুলে একজন পণ্ডিত ছিলেন, এইক্ষণে সেই পদ রহিত হওয়াতে মাষ্টারেরাই বাঙ্গালা ভাষার উপদেশ দিতেছেন, একজন পণ্ডিত পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়।

এই স্কুলের অধীনে একটা পুস্তকালয় হইলে ভাল হয়। যেহেতু পাঠার্থিপুঞ্জ অনেক পুস্তক দৃষ্টি করিয়া অনায়াসেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

দুঃখের বিষয় এই, যে, এদেশের লোকেরা বিদ্যা বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসুক নহেন। ছাত্রগুলীন প্রায় সকলেই ভিন্ন জেলাবাসি, কমিল্যার বালক যে কয়েকটি আছে তাহা গণনার মধ্যেই নহেন।

যে কয়েক জন বাঙালি মাষ্টারের সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইল তাঁহারা তাবতেই মহন্মনুষ্য। অত্যন্ত পরিশ্রমি, বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অতিশয় যত্নশীল, গবর্ণমেণ্টের নিয়ম দোষে তাঁহারা শ্রমের উপযুক্ত বেতন কিছুতেই প্রাপ্ত হয়েন না।

আমরা একজন ছাত্রের কবিতা রচনা দৃষ্টে তুষ্ট হইয়াছি। যদি অধ্যক্ষেরা বিহিত মনোযোগ করেন তবে তাবতেই বাঙ্গালার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে পারে, এ বিষয়ে জেলার জমিদার মহাশয়দিগের কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ বিস্তার করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে।

তাঁহারা অনুগ্রহ করিলে অতি সহজে পুস্তকালয় ও আর আর অনেক সম্ভাবিত সৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

এই স্কুলের গৃহটি অতি সুন্দর এবং অতি সুন্দর স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিক্রমপুর

রাজনগর। ৫ ফাল্গুন ১২৬১

রাজা রাজবল্লভ ও রাজনগরের কথা

গত ৩ ফাল্গুন বুধবার বেলা এক প্রহরের পরে "দাউদকাঁদি" হইতে নৌকা চালনা পূর্ব্বক "মেঘনা" "পদ্মা" ও "কীর্ত্তিনাশা" অতিক্রম করত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে রাজনগরের খালের ভিতর প্রবেশ কবিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে বাজারের ঘাটে পুলের নীচে আগমন করিলাম, ঐ রাত্রি তথায় অবস্থান করত দিবস প্রত্যুষে অর্থাৎ অদ্য প্রাতে বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভের রাজভবন ও আর আর প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দর্শনার্থ গমন করিলাম, বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্রমশই ভ্রমণ করিলাম, তথাচ সমুদয় দেখিয়া শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ সর্ব্বনাশা কীর্ত্তিনাশা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কীর্ত্তিনাশ করাতে অতিশয় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। একজন পুরুষ হইতে এত কীর্ত্তি স্থাপনা অত্যাশ্চর্য্যই কহিতে হইবে। রাজনগর প্রকৃতই রাজনগর ছিল। ইহার মধ্যভাগে ক্ষুদ্র এক নদী, তাহার দুই পার্শ্বেই ভদ্রলোকের বসতি। রাজনগরে ব্রাহ্মণ প্রায় ১০০০ এক সহস্র ঘর হইবে। ইহার মধ্যে অনেকেই কুলীন ও পণ্ডিত, নৈকোষ্য বিস্তর আছেন, ব্রাহ্মণের ভিতরে রাজপুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনি, মহারাজ আপনার ঐ পুরোহিতদিগ্যে জিলা ভুলুয়া ও বরিশালের মধ্যে বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার বার্ষিক উৎপন্ন ১০০০০০ এক লক্ষ মুদ্রা হইবে। এই ভট্টাচার্য্যেরা অতি সৎ ক্রিয়ান্বিত, সুপণ্ডিত, সুশীল, বহুলোক প্রতিপালক, এখানে বৈদ্য অনেক, তাবতেই সূত্রধারণ ও পক্ষাশৌচ গ্রহণ করেন, ইঁহার সদাচার সদ্বিদ্বান, সম্ভ্রান্ত, ভূমির উপস্বত্ব, রাজকর্ম্ম এবং চিকিৎসা এই তিন প্রকার উপায় দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন, বিক্রমপুর ও চাঁদ প্রতাপ ও অন্যান্য পরগণার মধ্যে বৈদ্য কত আছেন তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই আচারভ্রষ্ট, সূত্রধারণ করেন না, এবং মাসাশৌচ গ্রহণ করেন। ক্রিয়া কর্ম্মের সময়ে সংপূর্ণরূপেই শূদ্রবৎ ব্যবহার করেন, ফলে আশ্চর্য্য এই, যে, উক্ত রাজনগরস্থ ন্যায়াচারি বৈদ্যবৃন্দের সহিত উল্লেখিত বিরুদ্ধাচারি বৈদ্যব্যূহের বিবাহিক ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। অনায়াসেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রদান সময়ে একপক্ষ "দেবী" একপক্ষ "দাসী" এইরূপ হাস্যজনক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, ৺শিবনারায়ণ ঘোষের কন্যার সহিত আন্দুলের মৃত রাজা রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের পরিণয় সময়ে যেমন "বর্ম্ম" ও "দাস" এই দুই শব্দ লইয়া মহাগোলযোগ উঠিয়াছিল, ইঁহারদিগের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকালাবধি তদ্রূপ কৌতুক ও কলহ হইয়া থাকে।

এই নগরে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি অনেক দেখিলাম, এখানকার কায়স্থদের মধ্যে ধনি ও মান্য অত্যল্প।

এখানে আমোদ প্রমোদের সমুদায় ব্যাপার আছে, কবিওয়ালা, যাত্রাকর, বাদ্যকর অনেক।

রাজনগরের "রাজদীঘি" বর্দ্ধমানের "কৃষ্ণসায়রের" ন্যায় বৃহৎ হইবে, এপার হইতে

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২৭ ফাল্গুন ১২৬১

ও পারের মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে হয় না, ঐ দীঘির ধারেই বাজার, বাজারের দীর্ঘতা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে, দোকান পশার বিস্তর, সকল প্রকার দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলমূল, তরকারি, মৎস্য, দধি, ঘৃত, ক্ষীর যথেষ্ট ও অত্যন্ত সুলভ। দুই সন্ধ্যা বাজার বসিয়া থাকে, রবিবার ও বুধবারে হাট হয়। বহু দূরের লোক এই বাজারে বাজার করিতে আইসে, বাজারের কাঁশারিপটিতে অনেক বাসনের দোকান। তথায় নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত হয়, কাপুড়ে পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বঙ্গদেশের ভিতরে যেমন ঢাকা জিলা সর্ব্বপ্রধান, ঢাকা জিলার মধ্যে যেমন বিক্রমপুর পরগণা সকল পরগণার প্রধান, সেইরূপ বিক্রমপুরের মধ্যে রাজনগর গ্রাম সকল গ্রামের প্রধান।

রাজনগরে "রাজসাগর" সরোবর যেমন, সেই প্রকার বড় বড় সরোবর আরো অনেক আছে, যথা, "রাণী সাগর", "আনন্দ সাগর", "কৃষ্ণ সাগর" ও "সুখ সাগর" প্রভৃতি। ইহার কোনটাই ক্ষুদ্র নহে, প্রায় সাগর তুল্য, অতি মনোহর, কি পরিতাপ! সুখসাগর প্রভৃতি কয়েকটা ডাগর ডাগর কীর্ত্তিনাশার নাগর হইয়া অধুনা তাহারি হৃদয়ে বিহার করিতেছে, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভঙ্গে অনেক রম্য মহর্ম্ম্য ও সুচারু উদ্যান সকল তনু ত্যাগ করিয়াছে, অধুনা তাহারদিগের কোনরূপ চিহ্নও আর দেখা যায় না, ঐ কীর্ত্তিনাশা পৃথ্বীপালের কত বৃত্তি নাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। এই দুর্ঘটনা কিন্তু বহুদিন হয় নাই। অত্যল্প দিবস হইল যাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ করত যখন চমৎকৃত হইলাম, তখন দৃষ্টি করিলে না জানি চক্ষের আরো কত সার্থকতা হইত।

মহারাজা রাজবল্লভের পিতা ৺কৃষ্ণজীবন মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত এক পুরাতন পুষ্করিণী দৃষ্ট হইল। তাহা কলিকাতার লালদীঘি হইতে বড় হইবে, কৃষ্ণজীবন মজুমদার সামান্য কর্ম্ম করিতেন, তৎপুত্র রাজবল্লভ স্বীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা দ্বারা নবাবের দেওয়ানী করিয়া অদ্বিতীয় সম্ভ্রান্ত ও সৌভাগ্য শালী হইয়াছিলেন। ইনি এত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে ইঁহার মরণের পর নবাবের লোকেরা ক্রমশঃ এক মাস বাটী লুট করিয়াও সমুদয় শেষ করিতে পারে নাই, আহা! জগদীশ্বরের কি বিচিত্র লীলা! যে ব্যক্তি এক যজ্ঞ সূত্রের সূত্রে কোটি মুদ্রার অধিক অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন, পুরোহিতকে যে ভূমি দান করেন তাহার বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রা, যে ব্যক্তি দেবালয় প্রভৃতিতে কত অর্থ ব্যয় করেন তাহার সংখ্যাই হয় না, যে ব্যক্তি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরকে "রাখি বন্ধনের দক্ষিণাস্বরূপ" ৩০০০০০ তিন লক্ষ টাকা অনায়াসেই দান করেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই দক্ষিণা পাইয়া রাজস্ব ঘটিত ঋণ জাল হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। এইক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা ভগ্ন দশায় মগ্ন হইয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন, তাঁহারদিগের বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া দুঃখে চক্ষের জল সংবরণ করা দুষ্কর হয়, ঐ রাজবংশের সুখ অংশের ধ্বংশের আর কিছুই বক্রী নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত কেহ অভিমানটুকু পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সে বিষও নাই। সে চক্রও নাই, অথচ ফোঁস ফোঁসানির ত্রুটি হয় নাই, ইঁহারা অভিমানের অধীন হইয়া অনেক সম্পত্তি ও সুখ সৌভাগ্যের হানি করিয়াছেন, অহঙ্কার পরবশ না হইলে এত বিপদগ্রস্ত কখনই হইতেন না, কেবল অহঙ্কারেই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অভিমানের অধীন হইয়া নম্রতা স্বীকার করিলেন না, ইহাতেই নিষ্কর ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত হইল, বড় বড় জমিদারি সমুদয় বিক্রয় হইয়া গেল, হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা এদেশের অনেকেই দৃষ্টি করেন নাই। সে সকল কোথায় গেল তাহার নিরূপণ নাই, এক সের স্বর্ণ শত মুদ্রায় বিক্রয় করিলেন।

এইরূপে সমস্তই নাশ পাইল, যখন মালক্ষ্মীর কুদৃষ্টি ও অলক্ষ্মীর সুদৃষ্টি হয়, তখন এই প্রকার প্রকার ঘটনাই সংঘটিত হইয়া থাকে।*

মহারাজ রাজবল্লভ বিধবার বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বহু বিত্ত ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক অনেক স্থান হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ছিলেন। রাজা আর কিছুদিন সজীব থাকিলে অনায়াসেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শীঘ্রই সম্পাদন করিবেন এমত সময়ে মুঙ্গেরের নবাব তাঁহাকে ধৃত করত গলে প্রস্তর বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিনষ্ট করিলেন। কি পরিতাপ! আমি ঐ ব্যবস্থাপত্রের নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কোনখানেই প্রাপ্ত হইলাম না। কোন কোন ব্যক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া প্রভাকর যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন।

অনন্তর, শতরত্নের উপর চতুর্থতল পর্য্যন্ত আরোহণ করিলাম। এই শতরত্ন অদ্যাপি হতরত্ন হয় নাই, ইহাতে কত রত্ন ব্যয় হইয়াছে, নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এক এক রত্নে একটি ঘর ও প্রত্যেক ঘরে এক এক বারাণ্ডা। নীচে উপরের সমুদয় ভ্রমণ করিলে অতিশয় শ্রম বোধ হয়, ইহার গাঁথনির পারিপাট্য কি ব্যাখ্যা করিব। এত প্রাচীন হইল, জন্মাবধি কখনই মেরামত হয় নাই। তথাচ এ পর্য্যন্ত কোন ঘরেই এক বিন্দু জল পড়ে না, আশ্চর্য্য খিলেন, ও চূণ সুর্কির আশ্চর্য্য জমাট।

একুশরত্ন, পঞ্চরত্ন, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, আর আর দেব মন্দির, পূজার বাটী, নৃত্যাগার, বৈঠকখানা, দেওয়ানখানা ও বসতি বাটী প্রভৃতি একে একে দর্শন করিলাম। একুশ রত্নের কথাই নাই, অদ্যাপি নূতন রহিয়াছে, কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। এই রত্নটি পঞ্চতল, দ্বিতীয় তলে পঞ্চ, তৃতীয় তলে পঞ্চ, চতুর্থতলে পঞ্চ, পঞ্চম তলে পঞ্চ এবং সর্ব্ব উর্দ্ধে এক রত্ন। প্রত্যেক রত্নেই এক এক ঘর ও বারাণ্ডা এবং বেদী, এই রত্নই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপরে উঠিলে চতুর্দ্দিক অতি বিচিত্ররূপে বিলোকিত হয়, সর্ব্বনাশা কীর্ত্তিনাশাকে ক্ষুদ্র এক খালের ন্যায় দেখা যায়।

সকল রত্নেরি শোভা এইরূপ মনোলোভা, বৈঠকখানা প্রভৃতি ঘর সকল জনশূন্য অরণ্যময়। তাহার উপর বড় বড় বৃক্ষ হইয়াছে। কোন কোন গৃহের কড়ি, বরগা, ছাদ নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীর সকল সমভাবেই রহিয়াছে, তাহার কোন অংশই ধ্বংশ হয় নাই। একখানি ইট খসে নাই, ইট হইতে বিন্দুমাত্র চূণ খসে নাই। বৃষ্টির জলে কিছুই ঢসে নাই, পোতা বসে নাই, জমাট রসে নাই। পুনর্ব্বার ছাদ প্রস্তুত করিয়া দিলে স্বচ্ছন্দে তন্মধ্যে একশত বৎসর সুখে বাস হইতে পারে।

বহির্ব্বাটীর কতিপয় প্রকোষ্ঠ এবং অন্তঃপুরের অনেকাংশ অদ্যাপি নাশ হয় নাই সমভাবেই আছে। রাজপরিবারেরা এই ক্ষণে তন্মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন।

বহু পরিবার জন্য এখন ঘর ঘর রাজা, ইদানীং আর যত না হউক, সকলে "হুজুর সাজিয়া জুজুর মত ভঙ্গি করিয়া থাকেন বটে।"

পরন্তু নৌকারোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরে স্থানে স্থানে শুদ্ধ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সকল দেখিতে পাইলাম। এবং উপরে মধ্যে মধ্যে আর আর অনেক কীর্ত্তি আছে। সময়ের স্বল্পতা ও পথশ্রান্তি জন্য তৎসমুদয় দেখিতে পাইলাম না, এ কারণ অন্তঃকরণে অতিশয় খেদ রহিয়া গেল।

* সংবাদ প্রভাকর। ২৯ ফাল্গুন ১২৬১

উক্ত মহাত্মা যত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা তাহার অর্দ্ধেক নাই। পদ্মা তাহা নাশ করত কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য, আরবি হিন্দি প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় যোগ্য ও রাজকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পরোপকারী ও দাতা ব্যক্তি প্রায় কাহাকেই দেখা যায় না।

সর্ব্বত্রই এমন একটী জনরব আছে। যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ইঁহার নিকট রাখিবন্ধনের দক্ষিণা স্বরূপ তিন লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া নল চালা দিয়াছিলেন। সেই নলে এরূপ লিখিত হইয়াছিল, "রাজা জরাসিন্ধু কলিযুগে বৈদ্য বংশে রাজা রাজবল্লভ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ইহার একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে, আমি তাহা দশবারো জনের মুখে শ্রবণ করিলাম। আলস্য বশতঃ তাহা লিখিয়া লওয়া হয় নাই এবং অভ্যাস করিতে পারি নাই। এই প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এই স্থলে সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের সুগোচর করিতে পারিলাম না।

বিক্রমপুরস্থ আমার কতিপয় বন্ধু উক্ত মহারাজের জীবন চরিত সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলে আমি ক্ষণার্দ্ধ কাল তৎপ্রকাশে বিলম্ব করিব না।

আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করি যে বঙ্গ মহাশয় নৌকাযোগে ঢাকা, বিক্রমপুর, কমিল্যা, সুধারাম ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে আগমন করেন, তিনি যেন একবার রাজনগরে আসিয়া মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করেন। বরিশাল হইতে রাজনগর হইয়া উল্লেখিত সমুদয় স্থানে গমন করিতে হইলে কেবল এক দিবসের পথের বিলম্ব মাত্র হয়। কিন্তু রাজনগরের পথ অতি সুপথ, নদী অতি ক্ষুদ্র, কোন আশঙ্কাই নাই। সর্ব্বত্রই খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জল নির্ম্মল ও মিষ্ট। অতএব অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।*

রাজনগরের খাল সামান্য এক নদী, স্থান ভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা চিকন্দি, পালন্দিয়া, ইহাতে জোয়ার ভাটা খেলে, কিন্তু জল অতি মিষ্ট, এই নদীর উভয় তীরেই চটকল অতি শোভনীয়, দৃষ্টি মাত্রেই তুষ্টির উদয় হয়। ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, নানা শস্য প্রসবিনী। নদীর দুই পারেই বিক্রমপুর পরগণা। বিক্রমপুর পরগণার ন্যায় বৃহৎ পরগণা কুত্রাপি আর দৃষ্ট হইল না, এই পরগণাতে সমুদয় ভদ্র লোক। মেঘনা, পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, শীতলাখ্যা প্রভৃতি বড় বড় নদী ও ক্ষুদ্র নদীনদ কত এই বিক্রমপুরের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে তাহা গণনা করা যায় না। যেখানে যাই সেই খানেই বিক্রমপুর। বিক্রমপুর আর শেষ হয় না, ইহার চতুঃসীমার সীমা নির্ণয় করণে অক্ষম হইলাম। এবং পরগণা মধ্যে প্রজার সংখ্যা কত তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

নওয়া ভাঙ্গিনী নদী—৬ ফাল্গুন শনিবার প্রাতে আমরা এই ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করত পদ্মায় প্রবেশপূর্ব্বক কিছুকাল পরেই বরিশাল জেলা স্পর্শ করিলাম। এই বরিশাল অতি বিশাল। এমন দস্যুভয় আর কুত্রাপি নাই। লাঠালাঠি কাটাকাটি নিয়তই হইতেছে। নৌকারোহী জনসমূহের রজনীতে নিদ্রা হইবার বিষয় কি। সমস্ত রাত্রি ত্রাহি ত্রাহি করিয়া জাগরণ করিতে হয়। নিদ্রা যাইলে অথবা কিঞ্চিন্মাত্র অসাবধান হইলে তৎক্ষণাৎ অমনি দুরাত্মারা নৌকার ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া প্রস্থান করে। ঝাঁপ কাটিয়া নৌকায় আসিয়া খোলে ঢুকিয়া নীচের দ্রব্যাদি ও উপর হইতে উপরের জিনিসপত্র গ্রহণ করে। নৌকা

* সংবাদ প্রভাকর॥ ২ চৈত্র ১২৬১

চালাইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতে থাকে। ইহারদিগের হস্তে কিছুতেই নিস্তার নাই। দড়ি, কাছি, দাঁড়, বাঁশ যাহা পায় তাহাই চুরি করে। এ পথে বোম্বেটিয়া ও ছিঁককে চোর দুই আছে। এখানকার স্থলপথ অপেক্ষা জল পথেই অধিক আশঙ্কা। আমরা তাবতেই নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। দিবারাত্রি বসিয়া সতর্ক থাকিয়া ভয়ে ভয়ে কাল হরণ করিতেছি।

ঐ দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নওয়াভাঙ্গা নদী বাহিয়া মান্যাগ্রগণ্য শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারি নাজিরপুর পরগণার অধিকার মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এখানকার নদী তীরস্থ ভূমি অতি উর্ব্বরা। সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, আম্র, তাল, খেজুর, বাঁশ, রম্ভা, সিমুল, কুল, তেঁতুলাদি বহুবিধ ফলকর বৃক্ষ দৃষ্ট হইল।

মটর, মশুরি, গেঁসারী, মুগ, কলাই, সর্ষা' অড়হর প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য জন্মে। ধান্য অন্যান্য ফসল হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, গৃহস্থের গৃহে ও ক্ষেতে তরিতরকারি পরিমিত রূপ জন্মিয়া থাকে। মৎস্য বিস্তর, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি সুলভ বটে। নদীতটে ইতর লোকের বসতিই অধিক, ভদ্র লোকেরা কিঞ্চিৎ দূরে বাস করেন। বনশূকর ও বনমহিষে সর্ব্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। এই স্থল হইতে নাজিরপুরের সদর কাছারি এক ভাঁটার পথ, কিন্তু ইদিলপুরে কাছারী অতি নিকট, একে ভয়ঙ্করী, তাহাতে অন্ধকারময়ী। উভয় কাছারী বামভাগে রাখিয়া বরিশালাভিমুখে রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে যাত্রা করিলাম।

বরিশাল। ৭ ফাল্গুন ১২৬১

অদ্য পূর্ব্বাহ্ন বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে আমরা বরিশালে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের শোভা অতি সুন্দর, জল উত্তম নহে, নদী অতি প্রবল, জলের উপর হইতে সহরটি দেখিলে নয়ন প্রফুল্ল হইতে থাকে। এখানে খাদ্য সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না। ফল মূল দধি দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর মৎস্য মাংস তরিতরকারি চাউল ডাউল মিষ্টান্ন চিনি, গুড় তেল লবণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল সস্তা। নারিকেল অনেক। এখানকার মত উত্তম চাউল বোধ করি বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি নাই। বাণিজ্যের পক্ষে এই স্থান অতি প্রধান স্থান, বাণিজ্যে দ্রব্য পরিপূরিত নৌকার আমদানি রপ্তানি কত হয় তাহারি সংখ্যা হয় না, বাষ্পীয় জাহাজ এখানে অনায়াসেই আসিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত আমরা স্থলে উঠি নাই, জলেই রহিয়াছি, এ কারণ অদ্য এই পত্রে বিস্তারিত লিখিতে পারিলাম না।

বরিশাল। ১৫ ফাল্গুন, ১২৬১

ইংরাজী ১৮০৩ সালে বাখরগঞ্জ জিলা স্থাপিত হয়, তৎকালে বরিশাল অঞ্চলে স্থলে ও জলে দস্যুভয়ের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তন্নিবারণ নিমিত্ত ১৮১১ সালে এই জিলা বাখরগঞ্জ হইতে উঠিয়া বরিশাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি এ পর্য্যন্ত এই স্থানেই এই জিলার সমুদয় কার্য্য নিষ্পাদিত হইতেছে, এই ক্ষণে বাখরগঞ্জ নগরের চিহ্নমাত্র নাই ঐ স্থল পরগণা বুজর গোমেদপুরের অন্তর্গত কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ দূর হইবে, এখানে যৎকালে জিলা ছিল তৎকালে বহু সংখ্যক খৃষ্টান আসিয়া বাস করে, তাহারা বহু পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্যাবধি তথায় অবস্থান করিতেছে।

জিলার সীমা

দক্ষিণ সীমা—মহা সমুদ্র। উত্তর সীমা—আঁড়িয়ল খাঁ নদ ও ঢাকা প্রদেশ।

পশ্চিম সীমা—চিথলমারি, যশোহরের অন্তঃপাতি মধুমতী নদী।

পূর্ব্ব সীমা—মেঘনা নদী, ত্রিপুরা ও ভুলুয়া প্রদেশ।

এই জিলা উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘে ৫৬ ক্রোশ এবং পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রস্থে ৩৬ ক্রোশ হইবেক।

প্রজা সংখ্যা—এই জিলায় অন্যূন ১০০০০০০ দশ লক্ষ মনুষ্য আছে। তন্মধ্যে দশ আনা হিন্দু এবং ছয় আনা মুসলমান।

খৃষ্টান যাহা আছে তাঁহা গণনার মধ্যেই নহে, এক পাই হইবে না।

পরগণা এবং তাহার অধিকারিদিগের নাম ও যে যে পরগণায় যত প্রধান গ্রাম আছে তদ্বিশেষ।—

১। পরগণা—চন্দ্রদ্বীপ।
জমিদার—রাজবল্লভ রায়।
এই পরগণায় বরিশাল, মাধবপাশা, কাশীপুর, নাখুটিয়া, গাবা, রমতপুর, বানরীপাড়া এবং বগরমহল এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে।

২। তপ্পে বীরমোহন।
জমিদার—রামরত্ন রায় প্রভৃতি।
এই পরগণায় মাদারিপুর, মাইজপাড়া, গোপালপুর এই কয়েকটি ভদ্র গ্রাম আছে।

৩। পরগণা—বাঙ্গরোড়া।
জমিদার—মেং ব্রৌণ সাহেব প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—গৈলা, ফুলশ্রী, চন্দ্রহার, শ্লোক, বাটাযোড়, বারতি, হবিবপুর।

৪। পরগণা—ফতেজঙ্গপুর।
জমিদার—হরিনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—খেলে, ফতেপুর, গোয়ালা, আম গাঁ ও বাজিতপুর।

৫। পরগণা—জাহাপুর।
জমিদার—ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মুলদী

৬। পরগণা—বীরমোহন।
জমিদার—রামরত্ন রায় প্রভৃতি।

৭। পরগণা—আজামপুর।
জমিদার—মনোহর চৌধুরী প্রভৃতি।

৮। পরগণা—বাহাদুরপুর।
জমিদার—ওয়াকিন, গ্রিণর, নিকসল, পোগস্।
ভদ্র গ্রাম—কোকিলে।

৯। পরগণা—বিক্রমপুর (কিয়দংশ)।
জমিদার—রাজনগরের অনেকেই অংশি।

১০। পরগণা—বুজগ উমেদপুর।
জমিদার—সরকার বাহাদুর।
ভদ্র গ্রাম—আঙ্গারিয়া, রঙ্গশ্রী, রুস্মী ও শিবপুর।

১১। পরগণা—দুর্গাপুর।
জমিদার—বাবু গোপাললাল ঠাকুর।

১২। পরগণা—গ্রেদবন্দর।
জমিদার—ব্রজমোহন সেন প্রভৃতি।

১৩। পরগণা—হবিবপুর।
জমিদার—লক্ষ্মীকান্ত ভুঁয়া প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মাইটভাঙ্গা, শাঁকারী কাটি।*

১৪। পরগণা—হাবেলি মিনিগঞ্জ।
জমিদার—খাজে আবদুল গণি।
ভদ্র গ্রাম—পোনাবেলে, সৈদীপুর ও বারুইকরণ।

১৫। পরগণা—হাবেলি।
জমিদার—দুর্গাগতি রায় প্রভৃতি।

১৬। পরগণা—ইদ্রাকপুর।
জমিদার—কুমিরুদ্দিন চৌধুরী প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সরিকেল, ঘটেশ্বর ও আগরপুর।

১৭। পরগণা—জালালপুর।
জমিদার—গোলাম মর্ত্তজা প্রভৃতি।

১৮। পরগণা—খাঞ্জা বাহাদুর নগর।
ভদ্র গ্রাম—বাহাদুরপুর।

১৯। পরগণা—তরফ। কলমিরচর।
জমিদার—গোলোকনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

২০। পরগণা—কোটালিপাড়া।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ১২ চৈত্র ১২৬১

জমিদার—রাজমোহন রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—মদনপাড়, উনিশা, কান্তবপাড়া, গচাপাড়া ও ঘাঘর।
এই ঘাঘরে এক মেলা হইয়া থাকে, তথায় বহু লোকের সমাগম হয়।

২১। পরগণা—লক্ষ্মীদিয়া।
জমিদার—নওরাজা জমিদার।

২২। পরগণা—মান্দারিপুর।
জমিদার—গোবিন্দ পাল প্রভৃতি।

২৩। পরগণা—ময়েজঙ্গী।

২৪। পরগণা—মরহুদ, কোতালি জায়গির।
জমিদার—গোপাললাল ঠাকুর।

২৫। পরগণা—নাজিরপুর।
জমিদার—গোপাললাল ঠাকুর।
ভদ্র গ্রাম—সাফিপুর।

২৬। পরগণা—উত্তর সাহাবাজপুর।
ভদ্র গ্রাম—সোমসাবাদ ও গঙ্গাপুর।

২৭। পরগণা—আরঙ্গপুর।
জমিদার—কালীপ্রসাদ রায়।
ভদ্র গ্রাম—কসলকাটি ও বালিগ্রাম।

২৮। পরগণা—কাদারাবাদ।
জমিদার—ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সুলতানাবাদ।

২৯। পরগণা—কাশিমনগর।
জমিদার—রাধামাধব রায় প্রভৃতি।
ভদ্রগ্রাম—নৌলাবাগী।

৩০। পরগণা—কাসিমপুর, সেলাপটী।
জমিদার—মহিমাচন্দ্র রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—পাঙ্গাশিয়া।

৩১। পরগণা—কাসিমপুর—তেলিহাটী।

৩২। পরগণা—রাজনগর কিয়দংশ।

৩৩। পরগণা—রামনগর।
জমিদার—ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

৩৪। পরগণা—দোদংনাথানম তালুক।

৩৫। পরগণা—রসুলপুর।
জমিদার—করিমুদ্দীন চৌধুরী প্রভৃতি।

৩৬। পরগণা—রতনদি, কালিকাপুর।
জমিদার—বিষ্ণুচন্দ্র রায়।
ভদ্র গ্রাম—মহিষে, গাভরিয়া ও উজিবপুর।

৩৭। পরগণা—শাহাবাদপুর।
জমিদার—দুর্গাগতি রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সিঙ্কাটি, কয়রা ও মানপাশা।

৩৮। পরগণা—শাহাপুর।
জমিদার—রামনারায়ণ রায় প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—ওলপুর, দুর্গাপুর ও রায়গঞ্জ।

৩৯। পরগণা—সাইস্তাবাদ।
জমিদার—মীর তোজমল আলী প্রভৃতি।
ভদ্র গ্রাম—সাইস্তাবাদ ও ফুলতলা।

৪০। পরগণা—সাইস্তানগর।
জমিদার—আরমান আলী।
ভদ্র গ্রাহ—গারুলিয়া।

৪১। পরগণা—তকিপুর কালা।
জমিদার—আরমান আলী।

৪২। পরগণা—সুলতানাবাদ।
জমিদার—আবদুল্লা চৌধুরী প্রভৃতি।

৪৩। পরগণা—শ্রীরামপুর।
জমিদার—এজামেহেদী।
ভদ্র গ্রাম—শ্রীরামপুর।

৪৪। পরগণা—সৈয়দপুর।
জমিদার—লালা মিত্রজিৎ সিংহ।
ভদ্র গ্রাম—আমুয়া, চেঁছড়ি ও কাহুদামকাটি।

৪৫। পরগণা—আত্রপুর।
জমিদার—উমেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

৪৬। পরগণা—সলিমাবাদ।
জমিদার—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর।
ভদ্র গ্রাম—রায়ের কাটি, বনগ্রাম, কীর্ত্তিপাশা, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ ও সুতালুটি। *

৪৭। পরগণা—তেলিহাটি মহব্বতপুর।
জমিদার—রামরত্ন রায়।

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৪ চৈত্র ১২৬১

৪৮। পরগণা—আমিরাবাদ।
জমিদার—মৌলবী সয়বজমা।

৪৯। পরগণা—ইদিলপুর।
ভদ্র গ্রাম—ইদিলপুর, হাটুরে, নলমুড়ি, বুড়ীর হাট ও ভয়েরা

৫০। পরগণা—গুণানন্দী।
জমিদার—একজন ফিরিঙ্গি।

৫১। পরগণা—দক্ষিণ সাহাবাদপুর।
ভদ্র গ্রাম—নাগদী।

৫২। পরগণা মুজরদী।

এই জিলায় শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয়ের "ইদিলপুর" পরগণা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ ইহার সদর মালগুজারি ও উৎপন্ন সকল হইতেই অধিক। এই জমিদারির অবস্থা আমরা শ্রবণ ও দর্শন করিলাম, ইহাতে ঠাকুরবাবু যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসেই বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে সে পক্ষে কোন সন্দেহই নাই। পতিত জঙ্গল ভূমি হয় বিলি করিয়া দিন, নয় খাসে আবাদ করুন। এতদ্রূপ চিরলভ্যকর ব্যাপারে কি জন্য তাচ্ছিল্য করেন বলিতে পারি না।

এই ইদিলপুর পরগণার নীচেই শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের সলিমাবাদ পরগণা।

বরিশালে ঘোষাল বাহাদুরের কাছারি বাটী প্রভৃতি কয়েকটা উত্তম বাটী আছে, তদ্ভিন্ন গুরুধামের শোভা অতি মনোহর। ঝালকাটি নামক স্থানে মহারাজগঞ্জ নামক এক নূতন গঞ্জ করিয়াছেন, এই গঞ্জ এই ক্ষণে জিলার মধ্যেই প্রধান গঞ্জ রূপে গণ্য হইতেছে।

মুন্সেফ—এই জিলায় সদর মুন্সেফ সদর আমিন ব্যতীত অপর পাঁচ জন মুন্সেফ আছেন। যথা—

চৌকী—মেহেন্দিগঞ্জ।
মুন্সেফ—মৌলবী ম ন মহম্মদ। প্রথম শ্রেণী।

২। চৌকী—কাউখালি।
মুন্সেফ—বাবু মধুসূদন ঘোষ।

৩। চৌকী—বহুফল।
মুন্সেফ—বাবু ব্রজমোহন দত্ত।

৪। চৌকী—মাদারীপুর।
মুন্সেফ—বাবু বিশ্বেশ্বর সেন।

৫। চৌকী—কোটেরহাট।
মুন্সেফ—বাবু গৌরহরি বসু।

থানা—বাখরগঞ্জ জিলায় ১৩ থানা ও ৯ ফাঁড়ি। যথা—

১। থানা—নিজ বরিশাল। সদর কোতোয়ালি।
এই থানায় ১৭৫ চৌকীদার। ১৮ জন বরকন্দাজ।

২। থানা—ব্রজাগঞ্জ।
এই থানার অধীনে ২৯৮ চৌকীদার। ১৪ জন বরকন্দাজ।

৩। থানা—মেহেন্দিগঞ্জ।
এই থানার অধীনে ১৬৭ চৌকীদার। ১৪ জন বরকন্দাজ।

৪। থানা—খলিসাখালি।
এই থানার অধীনে ১৫৯ চৌকীদার। ১০ জন বরকন্দাজ।

৫। থানা—বহুফল।
এই থানার অধীনে ২৩২ চৌকীদার। ১০ জন বরকন্দাজ॥

৬। থানা—আঙ্গারিয়া।
এই থানার অধীনে ৩০৮ চৌকীদার। ১৫ জন বরকন্দাজ।

৭। নলছিটি।
এই থানার অধীনে ২৮৫ চৌকীদার। ১৫ জন বরকন্দাজ।

৮। থানা—কচুয়া।
এই থানার অধীনে ৯৮ চৌকীদার। ৮ জন বরকন্দাজ।

৯। কেঁওয়াড়ি।

এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকীদার। ১৩ জন বরকন্দাজ।

১০। থানা—কোটালিপাড়া।

এই থানার অধীনে ২১২ চৌকীদার। ২০ জন বরকন্দাজ।

১১। থানা। গৌরনদী

এই থানার অধীনে ২৭৬ চৌকীদার। ১৪ জন বরকন্দাজ

১২। থানা। বুড়ীর হাট।

এই থানার অধীনে ২৩৮ চৌকীদার। ৭ জন বরকন্দাজ।

১৩। থানা। টগরাপুর।

এই থানার অধীনে ১৩৯ চৌকীদার। ১২ জন বরকন্দাজ।

ফাঁড়ি

১। ফাঁড়ি। গঙ্গাপুর।

এই ফাঁড়িতে ৫৪ চৌকীদার।

১ জন বরকন্দাজ।

২। ফাঁড়ি। কোকাইনগর।

এই ফাঁড়িতে ৬৩ জন চৌকীদার। ২ জন বরকন্দাজ।

৩। ফাঁড়ি। শ্রীরামপুর।

এই ফাঁড়িতে ৪৪ জন চৌকীদার।

৪। ফাঁড়ি। রাজাপুর॥

এই ফাঁড়িতে ৯৩ জন চৌকীদার। ৪ জন বরকন্দাজ

৫। ফাঁড়ি। ঝালকাটি

এই ফাঁড়িতে ২৭ জন চৌকীদার। ৩ জন বরকন্দাজ।

৬। ফাঁড়ি। বাজের।

এই ফাঁড়িতে ৯২ জন চৌকীদার।

২ জন বরকন্দাজ।

৭। ফাঁড়ি। আগরপুর।

এই ফাঁড়িতে ৪৭ জন চৌকীকার।

৩ জন বরকন্দাজ।

৮। ফাঁড়ি। কাউখালি।

এই ফাঁড়িতে ৪৭ জন চৌকীদার।

৪ জন বরকন্দাজ।

৯। ফাঁড়ি। ভগীরথপুর।

এই ফাঁড়িতে ৭৯ জন চৌকীদার।

নিমক—বাখরগঞ্জে নিমক চৌকির এক সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট আফিস আছে। সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধীনে দুই জন প্রথম শ্রেণীযুক্ত সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট দারোগা ও দুই জন দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট দারোগা নিয়োজিত আছেন। তন্মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর দারোগা চট্টগ্রাম জিলায় থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে বেতন পাইয়া থাকেন।*

এতদ্ভিন্ন ৮টা চৌকী, ৩টা ফাঁড়ি এবং ১টা কুৎচৌকীর ঘাট আছে। যথা—

চৌকী—নলছিটি	...	১
চৌকী—বাখরগঞ্জ	...	১
চৌকী—গৌরনদী	...	১
চৌকী—ধূলে	...	১
চৌকী—চরখালি	...	১
চৌকী—কাউখালি	..	১
চৌকী—প্যাটুয়া	...	১
চৌকী—বোকাইনগর	...	১
		৮
ফাঁড়ি—নেয়ামত	...	১
ফাঁড়ি—বঙ্গাবাড়ী	...	১
ফাঁড়ি—বলুফল	...	১
		৩
কুৎচৌকী—ঝালকাটি	...	১২

এ জিলায় আবকারি ডিবিজন ৪টা। যথা—

বরিশাল ডিবিজান	...	১

* সংবাদ প্রভাকর॥ ১৫ চৈত্র ১২৬১

সুন্দরদী ডিবিজান
কাউখালি ডিবিজান
দামপাড়া ডিবিজান

নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আয়। যথা—
গর বন্দবস্তী খাস মহালের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৪৩৩৭৫১৮
দাইনি মকর বার্ষিক উৎপন্ন কোং ১০৩৭১৬১৮২১
নিমক মহলের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ২৩৩৯/১২
আবকারির বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৫০৮৮৯॥৶৩
ষ্টাম্প কাগজের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৮১০২০॥৶১১
ফেরি ফণ্ডের বার্ষিক লৎপন্ন কোং ৩৭৫
ট্যাক্সের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ১০২
ডাক ঘরের বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৩৯৭৮॥৬
পুলিসের ডাকের ব্যয় নির্ব্বাহ জমিদারদিগের নিকট হইতে বার্ষিক উৎপন্ন কোং ৪৩৩৭ টাকা
কর্ম্মালয় বিশেষের বার্ষিক ব্যয়—
নিমক মহলের ব্যয় কোং ১৮৯৫১।৴৫
আবকারির বিশেষের বার্ষিক কোং ৯৪১৯।৵৭
ষ্টাম্প কাগজের বিশেষের বার্ষিক কোং ৮৩৭০॥৵৯
ফেরি ফন্দের বিশেষের বার্ষিক কোং ১২০
ট্যাক্সের বিশেষের বার্ষিক কোং ৯৩৬
ডাক ঘরের বিশেষের বার্ষিক কোং ১৬৬০।৵০
পুলিস সংক্রান্ত ডাকের বিশেষের বার্ষিক কোং ৩৮৭৭ টাকা

কারাগার—এখানকার কারাগারে অনেক বন্দি আছে। তাহার মধ্যে ভদ্র লোকের সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। হত্যা, ডাকাইতি, চুরি ও দাঙ্গা করিয়া অনেকেই কারাবদ্ধ হয়। জেলখানায় কয়েদিরা ছালা, চিক, চৌকী, মোড়া, ইট ও পেঁটরা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কয়েদির সংখ্যা ৬৮০ জন।

জেল আমলা—জেল দারোগা ... ১
জমাদার ... ২
দফাদার ... ৮
কামজারি বরকন্দাজ এবং আর আর পেয়াদা } ১৪৫ জন।*

নারিকেল যথেষ্ট, কিন্তু তৈল ভালরূপে প্রস্তুত করিতে জানে না, ঐ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে কত লাভের বিষয় হয় তাহা কল্পনাতীত।

শিল্পকার্য্য—এখানে কোনরূপ শিল্প কর্ম্ম বিখ্যাত নহে, যে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা যৎসামান্য, কোন মতেই প্রশংসা করিতে পারা যায় না। পাটী যাহা প্রস্তুত করে তাহা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি সাতরের তুল্য নহে। ঘটেশ্বরে এক প্রকার পান্সি নৌকা প্রস্তুত হয় তাহা দ্রুতগামিনী বটে, টুরকি ও কোটালিপাড়াতে নৌকা অনেক প্রকার নির্ম্মাণ করে, কিন্তু তাহা ঘটেশ্বরের সমান উৎকৃষ্ট নহে। নানা প্রকার মোড়া ও সাজি প্রস্তুত হয়। এখানে কাঁসারিয়া বড় বড় পাৎলা ঘটি প্রস্তুত করে, তাহা ব্যবহার যোগ্য বটে। প্রতিমার গঠন ভাল হয় না, চিত্রকরেরাও উপযুক্ত নহে। স্ত্রীলোকেরা নারিকেলের চিঁড়া, জিরা, ও পুষ্পাদি যাহা নির্ম্মিত করে, তাহা অতি সুদৃশ্য।

প্রধান প্রধান বন্দর—নলছিটি, মহারাজগঞ্জ, রাজগঞ্জ, কালেয়া, মাদারিপুর, টরকি, কাসুদাসকাটি, সরিকেল, বাখরগঞ্জ, বরিশাল, মুলদী, ভয়রা এবং সুভালুড়ি।

এই সকল বন্দরের মধ্যে নলছিটির বন্দর অতি প্রধান ও প্রাচীন, কিন্তু সংপ্রতি গুরুধামের

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ১৬ চৈত্র ১২৬১

নীচে রাজা বাহাদুরেরা মহারাজগঞ্জ নামে নূতন যে এক বন্দর করিয়াছেন তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তথায় পাকাঘর অনেক।

গুরুধাম—গুরুধাম অট্টালিকাময়। নদীতীরে বাঁধাঘাট কয়েকটা ও রম্য উদ্যান সকল দর্শকদিগের নয়ন ফুল্লকর হইয়াছে। ঘোষাল বাহাদুরের গুরুধামের শোভা যদ্রূপ বরিশালের শোভা তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ মহারাজগঞ্জ নামক মনোহর নূতন বন্দর স্থাপিত হওয়াতে এই স্থানের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি হইয়াছে।

চর—সরিকেল, কলকিনী, রামজানপুর, হেমামন্দী, গাজীপুর, জালালপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, কদমতলী, রঘুনাথনী, বিশকাঁটালি, মুরদিয়া, কুমুরে, কলমি, রামহরি, দুর্গাপুর, কেওচর ও ও হোগলবুনে, এই কয়েকটা বিখ্যাত চর এই জিলায় আছে।

নদ-নদী—মেঘনা, বুড়ীগঙ্গা, পদ্মা অথবা কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, দামোদর, ভৈরব, তেঁতুলে, রামনাবামনা, কচার্দ্দন, কালীগঙ্গা, কেলেজিরার দল, বেন্নুয়ার দল এবং বরিশাল নদী, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নদী ও খাল আছে, ও এই জিলাযুক্ত সুন্দর বনের মধ্যে ছোট বড় অনেক নদী নদ ও খাল দেখিতে পাওয়া যায়।

বিল—কোটালিপাড়ার বিল, এই বিল বিখ্যাত বিল। এতদ্ভিন্ন অবিখ্যাত অনেক বিল আছে।

দেবালয়—এই জিলায় প্রত্যেক গ্রামে মনসা দেবীর ও কালীর এক এক মন্দির আছে, দেশীয় লোকেরা এই দুই দেবীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করেন।

দেবতার নাম	ধাম	দেবতার নাম	ধাম
শ্যামরাল।	পানাবেলে।	মনসা।	বগুড়া।
বিরূপাখা।	কাশীপুর।	পাষাণময়ী কালী	বরিশাল
মহামায়া।	ঐ	তালতলার কালী	ঐ
মদনমোহন।	বরিশাল	খালধারের কালী	ঐ
জগন্নাথ।	ঐ	গাংধারের কালী	ঐ
		জীবন সিংহ বাবুর কালী	ঐ

উৎসব—দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, কার্ত্তিকপূজা রাসযাত্রা, নবান্ন, সরস্বতীপূজা, বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা, চড়ক, রথযাত্রা, মনসাযাত্রা, ঝুলান যাত্রা, এবং জয়দুর্গা পূজা।

দুর্গা প্রতিমায় আশ্চর্য্য এই যে, দুর্গার বামভাগে গণেশ, দক্ষিণ ভাগে কার্ত্তিক। ১৫ টাকা হইতে ৪০ টাকায় অনায়াসেই দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। কোটালিপাড়া পরগণার মধ্যে এক প্রহরের পথের ভিতর ১০০০ দুর্গা পূজা হয়।

রাসযাত্রায় নাথটিয়ার রাজচন্দ্র রায়ের ভবনে অতি সমারোহ ও মেলা হয়, কয়েক দিবস অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে, অন্যূন ২০০০০ লোকের জনতা নিয়তই হয়।

এদেশে হিন্দু, মোসলমান উভয়েই নবান্ন করেন। নবান্নে অত্যন্ত আমোদ হয়। নারিকেলের জলে চেলের গুঁড়ি ও নারিকেল কোরা, মসলা ও গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহারি ভুষ্টি নাশ করেন।

এখানে কেবল পূর্ণিমার দিবসেই দোল হয়, অষ্টাহ পূর্ব্বে আবির ও পিচকারির আমোদ চলিতে থাকে।

চড়কে অতিশয় ঘটা হয়, কিন্তু সংক্রান্তির দিবসে বিশেষ সমারোহ না হইয়া তৎপর দিবসেই হইয়া থাকে। এখানে তাহাকে "গোলুইয়া" কহে।

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা যাত্রা হয়, ইহাতে আর যত জাঁক জমক না হউক, সমস্ত জিলা লইয়া ৪০০০ পাঁটা বলিদান হইয়া থাকে। প্রতিমা গড়িয়া মনসাপূজা করে, রোগাদির প্রতীকারার্থ মনসাকেই মানসা করে।

রহমতপুরের চক্রবর্ত্তিদিগের বাটীতেই হিন্দোলযাত্রার বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে।

জয়দুর্গাপূজার দিন নির্দ্দিষ্ট নাই, যখন ইচ্ছা তখনি ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করে, প্রতিমা গড়ে না।*

পণ্ডিত ও পঞ্জিকা—এ জিলার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ পরগণাতে অনগণ্য অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ও অধিক চতুষ্পাটী। এই স্থল সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে এখানকার প্রধান স্থল। এখানে অদ্যাপি পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই পঞ্জিকা অতি প্রসিদ্ধ।

চিকিৎসা—এখানে পীড়া হইলে ঔষধ প্রয়োগ অধিক না করিয়া কেবল ঝাড়ান করে, ও স্বস্ত্যয়ন করে। রমতপুর, চাঁদশি ও বারতি এই কয়েকস্থানে কয়েক জন বিখ্যাত বৈদ্য আছেন, তাঁহারা চিকিৎসায় অত্যন্ত নিপুণ।

নিজ বরিসাল। জিলা অথবা নগর—বরিসাল দীর্ঘে দেড়ক্রোশ এবং প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। ইহার উত্তর সীমা আমানতগঞ্জ। দক্ষিণ সীমা সাগরদি। পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদীর শাখা বরিশাল নদী এবং পশ্চিম সীমা কাশীপুর। এখানে চির-নিবাসির সংখ্যা অত্যল্প, বিদেশীয় শুদ্ধ মনুষ্য গণনা করিলে দ্বাদশ সহস্র লোক হইবে।

পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা নগরের শোভা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, বন প্রায় শেষ হইয়াছে, ইষ্টক গৃহ অধিক নিৰ্ম্মিত হইতেছে, জল হইতে নগর দৃষ্টি করিলে মনে আনন্দ জন্মে। পথ ঘাট নিতান্ত মন্দ নহে, নদীতে নৌকা অসংখ্য।

পুষ্করিণী অনেক আছে, কাছারীবাটী সমুদয় এক স্থানে হওয়াতে সকলের পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ হইয়াছে, নগর মধ্যে কয়েকটা খাল ও সেতু আছে তাহা দৃশ্য সুখকর বটে।

এখানে প্রটেষ্টেণ্ট ও কেথলিক এই দুইটা গির্জ্জা আছে।

নাগরীয় বাজার—চক বাজারের দক্ষিণের পুলের উপর সন্ধ্যাকালে বাজার বসিয়া থাকে, তথায় কেবল মণিহারি দ্রব্য ও পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ নগরে যে কয়েকটি বাজার আছে তাহার মধ্যে ঢাকাওয়াল পটী, চকবাজার, গিল সাহেবের বাজার এবং নীলকণ্ঠ রায়ের হাট সর্ব্বপ্রধান, প্রথমোক্তদুই বাজারে বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য এবং শেষোক্ত বাজারদ্বয়ে শুদ্ধ খাদ্য সামগ্রীই অধিক পাওয়া যায়। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে সমারোহ পূর্ব্বক হাট হয়।

দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন—এখানে নির্জ্জলা দুগ্ধ প্রায় পাওয়া যায় না, সকলি জল মিশ্রিত। জিলার ভদ্রলোকেরা মুসলমানের দধি ভক্ষণ করেন। মিষ্টান্ন সকল যবনে স্পর্শ করে, স্বচ্ছন্দেই তাহার আহার চলিয়া থাকে।**

বাজারে মৎস্য অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ঢাকার ন্যায় সুলভ নহে।

প্রকাশ্য ইষ্টকালয়—আদালত ও ফৌজদারী ১ একতালা।

* সংবাদ প্রভাকর॥ ১৮ চৈত্র ১২৬১ ** সংবাদ প্রভাকর॥ ২১চৈত্র ১২৬১

কালেক্টরি ২ দুইতালা	১	স্কুল ঘর—	একতালা।
প্রধান সদর আমিনি	এক-তালা	সাহেবদিগের গিরজা ঘর—	তিনতালা।
এবং সদর আমিনি ও সরকিউট ঘর		দাতব্য চিকিৎসালয় ১—	একতালা।
নিমক চৌকি—	একতালা।	জেলখানায় অনেক ঘর, তন্মধ্যে কয়েকটি একতালা, কয়েকটি দুইতালা।	
জেল হসপিটাল—	একতালা।		

বিশেষ সমাচার—এ জিলার সদর জমা প্রায় ১৬০০০০০ টাকা। মফস্বলের মুন্সেফ অবধি প্রধান সদর আমিন পর্য্যন্ত আনুমানিক ৩০০০ হাজার মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ফৌজদারি মোকর্দ্দমা কত তাহার সংখ্যাই হয় না, তাহার সাক্ষি ৬৮৭ ব্যক্তি কারাবদ্ধ আছে। ইংরাজী ১৮৫২ সালের ভাদ্র হইতে ৫৩ সালের ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ১৬ জন দোষির ফাঁসি হইয়াছে। সর্ব্বদাই ফাঁসি হইতেছে, এত খুনাখুনি আর কুত্রাপি নাই। মানুষ সকল স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর, সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও মোকদ্দমা করিতে ছাড়ে না, একারণ এখানকার আমলারা অতি সুখি। উকীলেরা সুবক্তা, মোক্তারেরা অতি চতুর।

জমিদারি—এখানে জমিদারির অনেক নাম চমৎকার বটে। যথা—

জমিদারি ১। তালুক ২। ওসত তালুক ৩। নমওসত তালুক ৪। টিসওসত তালুক ৫। হাওলা ৬। নিমহাওলা ৭। ওসত হাওলা ৮। নিমওসত হাওলা ৯। টিমহাওলা ১০। মিরাশ ১১। করশা ১২। জামিনী ১৩। আড়জামিনী ১৪। জেমা ১৫। খারিজ জমা ১৬। বারজমা ইত্যাদি।

এতদ্রূপ আধিক্য হওয়াতে প্রজারা বড় সুখি নহে। বন্দোবস্তের কালে অনেক পরগণার অনেকাংশ স্বতন্ত্র হওয়াতে খারিজা হইয়াছে। জমিদারেরা ঐ সকল খণ্ড বিভাগের রাজস্ব আপনারা আদায় করিয়া সরকারি কর কালেক্টরিতে প্রদান করিয়া থাকেন।

জলবায়ু—এই জিলার জলবায়ু সর্ব্বত্র সমান নহে। অধিকাংশ জলময় ও অরণ্যময় হওয়াতে বায়ু হিতকর হয় না। নদী-নদের জল লবণাবৃত, একারণ সর্ব্বদাই প্রজারা উৎকট রোগ ভোগ করে, জলদোষের পীড়া অনেকেরি আছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, শীতকালে তাদৃশ ভয় থাকে না।*

বর্ষা—এখানে বর্ষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয়েক মাস ক্রমশই বৃষ্টি হয়। পরগণা বিশেষে নৌকা ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমনের উপায় থাকে না। ঐ সময়ে হিংস্র জন্তুর অত্যন্ত আশঙ্কা হয়। ভূমি ও বন সকল জলে প্লাবিত হওয়াতে ভুজঙ্গ গৃহস্থের গৃহ মধ্যে এবং ব্যাঘ্রাদি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করে।

জল প্লাবন—বাঙ্গালা ১২২৯ অব্দে এদেশে গুরুতর বন্যা হয়, তাহাতে অধিকাংশ প্রজার মহানিষ্ট ঘটিয়া ছিল, ঘরদ্বারের চিহ্ন মাত্র ছিল না। অনুমান ৩৭০০০ মনুষ্য ও ৮৯০০০ সহস্র পশ্বাদির প্রাণ জলে নষ্ট হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন স্থলে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্রূপ দুর্দ্দশাবশতঃ এতদ্দেশে এ পর্য্যন্ত আপনার পূর্ব্বাবস্থা পরিপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

ক্ষত—জলদোষ ও আর আর পীড়া নিবারণ নিমিত্ত এখানকার লোকেরা জন্মার অর্দ্ধ

* সংবাদ প্রভাকর। ২৩ চৈত্র ১২৬১

হস্ত নিম্নে ক্ষত করত তন্মধ্যে নিম্বকাষ্ঠ দিয়া পাট দ্বারা আবল করিয়া রাখে। ইহাকে গুল ও গুল লওয়া কহে।

বসন্ত এবং ওলাউঠা। এখানে উক্ত দুই রোগের বড় প্রাদুর্ভাব নাই।

শীত-গ্রীষ্ম—এখানে শীত বড় অধিক হয় না, গ্রীষ্মের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে দুই দিবস বৃষ্টি না হইলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, তাহা অসহ্য হইয়া উঠে।

ধাতু—এই জিলায় কস্মিন্ কালে কোন প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

পশ্বাদি—নানা জাতীয় হরিণ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, নানা প্রকার ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, বন্য শূকর ইত্যাদি হিংস্র প্রাণিরা সুন্দর বনে ও অপর বনে বাস করে, কিন্তু ব্যাঘ্র, বরাহ ও মহিষ নিয়ত লোকালয়ের নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকে। মহিষ এবং শূকরেরা ধান্যাদির প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, প্রাণ ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়। বাঘ, মহিষ ও শূকরের ভয়ে রাত্রিতে বাহির হইবার বিষয় কি। গো, মেষ, অজা প্রভৃতি পাল্য পশু বিস্তর, কিন্তু চমৎকার এই যে, এ অঞ্চলে শুভ্র বর্ণের গাভী কিম্বা ষণ্ড কখনই দৃষ্ট হয় নাই, এবং অধিকাংশ ছাগ এক মুষ্ক বিশিষ্ট।

নানা প্রকার ইতর প্রাণী—পশুর মধ্যে শৃগাল, পক্ষির মধ্যে কাক, কীটের মধ্যে মাছি, মশা, পিপীলিকা, ছারপোকা, উই, আঁটলি, জোঁক নানা জাতীয় সর্প-ই অনেক ও অত্যাচারি, বিশেষতঃ পিপীড়ার যদ্রূপ প্রাদুর্ভাব তন্যায় আর কাহারো নহে।

জলচর—মৎস্য যথেষ্ট। কুম্ভীর ও কূর্ম্মাদি অগণ্য এবং তাহারা সততই দৌরাত্ম্য করে। নদী বিশেষে কুম্ভীরের ভয়ে জলে পদার্পণ করা যায় না। ডেঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর, সেই দেশ এই দেশ।

জাতি ও উপজীবিকা—এই জিলায় হিন্দু ও যবনে দশ লক্ষ মনুষ্য হইবে, তন্মধ্যে হিন্দু জাতির কার্য্যবিবরণ লিখিত হইল। ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই জমিদার, যাঁহারা অর্থহীন তাঁহারা যাজন ক্রিয়া করেন। এক ব্রাহ্মণেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অপরাপর জাতির যজন যাজনাদি ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অন্য দেশে মহাবিপ্র অর্থাৎ মড়ুই-পোড়া ব্রাহ্মণেরা পতিত, অস্পৃশ্য, এখানে তাঁহারা ত্যাজ্য নহে। পুরোহিতেরাই স্ব স্ব যজমানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন, তাহাতে পতিত হন না।

বৈদ্যের সংখ্যার অধিক, ইহারা জমিদারি রাখেন, বিষয় কর্ম্ম ও চিকিৎসা করেন।

কায়স্থ জাতিতে অনেক প্রকার ব্যবসায় করেন। যথা চাস করা, নৌকাবহা, দুগ্ধ বিক্রয়, চাউল, মহিষ ও পাঁটা বিক্রয় এবং পরিচারকতা প্রভৃতি করা।

কাঁসারি জাতিরা স্বীয় ব্যবসায় করে।	বারুই	নিজ কর্ম্ম
গোপ জাতি কায়স্থের ন্যায় সকল কর্ম্মই করে।	কুমার	ঐ ঐ
	রজক	ঐ ঐ
তিলি জাতি মুদির কার্য্য করে।	মুচি	ঐ ঐ
মালি জাতি স্বীয় ব্যবসায় করে।	নাপিত	ঐ ঐ
কর্ম্মকার স্বীয় ও স্বর্ণকারের কর্ম্ম করে।	পাটুনি	ঐ ঐ

শুঁড়ী, দোকানদার, জমিদার, তালুকদার, মহাজন, প্রায় তাবতেই রায় পদাধিকারি।

ভুঁইমালি মেথরের কর্ম্ম করে।

ব্যাবাজিয়া, অর্থাৎ বেদে। ইহারা নৌকাবাসি ও সাপ খেলায়।

জেলে। মৎস্য ধরে, নৌকা চালায়।

চণ্ডাল। ঘরামির কর্ম্ম করে, ঝুড়ি বোনে, কৃষি কর্ম্ম ও দুগ্ধ বিক্রয় করে, নৌকা বায়, চর আবাদ করে ও সূত্রধরের কর্ম্ম করে।

মুসলমান—মুসলমান জাতি "সিয়া" ও "শুন্নি" দুই ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে শুন্নি ৮৶১০ এবং সিয়া অর্দ্ধ আনা মাত্র। শুন্নির মধ্যে অধিকাংশ আবার ফিরজি মতাক্রান্ত হইয়াছে। ঐ ফিরজি দলের ক্রমশঃই প্রাবল্য হইতেছে। ইহারা পৌত্তলিক নহে, অথচ মহরম করে না। ফিরজি দল অতিশয় অত্যাচারি। এখানকার মুসলমানেরা দুগ্ধ বিক্রয় করে, নৌকা চালায়, গরু এবং ছাগলাদি বিক্রয় করে ও কৃষিকর্ম্ম করে। জেলখানার ভিতরে কয়েদির মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক দেখিলাম।*

নৌকা—এই বাখরগঞ্জ জিলার মধ্যে অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইল স্ত্রীলোকেরা নৌকা চালনা করে, তাহারা উত্তমরূপে হালি ধরে, দাঁড় বহে, এবং গুণ টানিয়া থাকে। তরি সঞ্চালন ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের তুল্য ক্ষমতা দর্শন করিলাম।

কাটাবৃক্ষের পূজা—উজিরপুরের কাটাবৃক্ষের তলে গিয়া অনেকেই ভক্তি পূর্ব্বক পূজা প্রদান করে। এমত জনরব যে, কোন ব্যক্তি ঐ বৃক্ষকে অস্ত্রাঘাতে দুই খণ্ড করিয়াছিল, ঐ খণ্ডাংশ মৃত্তিকায় পতিত হইয়া পুনরায় আপনিই উঠিয়া পূর্ব্বাংশের সহিত সংযুক্ত হইল, একারণে সকলে দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করেন। বৈশাখের তৃতীয় দিবসে তথায় গুরুতর সমারোহে এক মেলা হইয়া থাকে।

আচার ব্যবহার—এ দেশের প্রায় বহু লোকের স্বভাব অতি উগ্র, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত, লোভ, দ্বেষ, হিংসায় পরিপূর্ণ। তাহারদিগ্যে বিনয় করিলে আরো বিপরীত ঘটিয়া উঠে, কিন্তু বল প্রকাশ করিলে সহজেই আজ্ঞাধীন হয়। বিষয় বোধাংশে উত্তম ঋণ আছে, কিন্তু আন্তরিক গুণ প্রায় নাই, কিঞ্চিন্মাত্র তালুক করিতে পারিলেই সকলে চৌধুরী হইয়া বসেন। চৌধুরী উপাধিই সম্ভ্রমের উপাধি। কোন খানে যাইতে হইলে বৃষ্টি হউক না হউক, সকলেই ছাতাধারী সঙ্গে লইয়া যাইবেন। যাঁহারা সঙ্গতি-হীন তাঁহারা স্বহস্তে ছত্র ধরেন না। খরতর সূর্য্য কিরণে ও মুসলধারে বৃষ্টি পতনেও মাথায় বস্ত্রাচ্ছাদন করেন না, যেহেতু তাঁহাদের মানের হানি হয়। মান তাঁহাদের ভালুক জরের ন্যায়, এক কথায় হয়, এক কথায় যায়।

তাবতেই ত্রিসন্ধ্যা করেন কিন্তু মলত্যাগান্তে বাম হস্তেই কাছা দিয়া থাকেন। এমত শুনিতে পাই যে মুসলমানের সহিত "শুকনা ডাবায়" অর্থাৎ শুকনা হুঁকায় তামাক চলিয়া থাকে। মুসলমানের পাতা দধি ভক্ষণ করেন। মুচিকে অপবিত্র না বলিয়া ঋষি জ্ঞানে গৃহে উঠিতে দেন।

ব্রাহ্মণেরা যে পর্য্যন্ত মন্ত্র গ্রহণ না করেন সে পর্য্যন্ত সকল দেবতার পূজা করিতে পারেন না। স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিলে সম্ভ্রমের লঘুতা হয়। অপিচ ভদ্র জাতি মাত্রেই পট্টবস্ত্র পরিয়া পূজা করেন। তাহা অতি মলিন, এক বস্ত্রে তিন চারি রকমের পূজা চলিয়া যায়। কিন্তু আকাচা ছাড়া কাপড়ে আহারাদি চলিয়া থাকে।

দেশীয় জমিদারগণের ব্যবহার—রায় চৌধুরী উপাধি বিশিষ্ট জমিদাররাই বড় জমিদার, যাঁহারা প্রজা পীড়নে পরম পটু তাঁহারাই সর্ব্ব প্রধান। স্বকার্য্য সাধনার্থ সকলি করিয়া থাকেন।

* সংবাদ প্রভাকর।। ২৪ চৈত্র ১২৬১

প্রজারা প্রাণ ও মান ভয়ে উল্লেখিত জমিদার প্রভুপুঞ্জের শ্রীপাদ পদ্মে সর্ব্বস্বই অর্পণ করে। গুণের মধ্যে এই যে, পরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারা মদ গর্ব্বে গর্ব্বিত, মোকদ্দমা পাইলে আর কিছুই চাহেন না। সৎকর্ম্মে ব্যয় মাত্র নাই, মোকদ্দমায় সর্ব্বনাশ হইলেও সর্ব্বনাশ বোধ হয় না, আপনাপন গুরু পুরোহিতকে বিচার স্থলে আনাইয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করান। যবন জমিদারেরা হিন্দু জমিদার অপেক্ষা অনেক প্রকৃষ্ট, তাঁহারা যদিও প্রজাপীড়ক বটেন, কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়েন।

এই জিলায় যে যে বিদেশীয় জমিদারের জমিদারি আছে, সেই সেই জমিদারির প্রজারা সুখে কাল যাপন করে, কারণ কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

রন্ধন ভোজনের ধারা—রন্ধন ভোজনের প্রণালী অতি জঘন্য, সকল ব্যঞ্জনে মৎস্য দিয়া ঘণ্টবৎ পাক করেন। সোলমাছে মূলা সংযোগ করিয়া যে ঘণ্ট পাক হয় তাহাই অতি উপাদেয়, তাহাকে "হট্টল মূলা" কহেন। বিনা তৈলে মাছের ঝোল রান্ধিয়া সকলেই আহার করেন, তাহার নাম "মাছ সিদ্ধ"। তৈলে ভাজিয়া মৎস্য রান্ধিলে তাহাকে "মৎস্যের রসা" বলেন। মুসারি ও খেঁসারির ডাউল সকলেই আহার করেন, ইহার নাম "কলুই"। অন্য ডাল ব্যবহার করেন না, ডাল রন্ধনের প্রধান উপকরণ "মিডাকুমাড় ও ডুনিয়ার পাতা"। সেফালিকা পত্র দিয়া খেঁসারির ডাল রন্ধন হয়, তাহার নাম "ডাউলের ছুকৎ"।

ছাগ ও কচ্ছপের মাংসে অর্দ্ধভাগ নারিকেল কোরা প্রদান করেন, তাহাই সুস্বাদু বলিয়া আনন্দে আহার করেন। আসন ব্যতীত কোন ক্রমেই ভোজনে বসেন না, পায়সের পর দধি খাইয়া থাকেন। অন্ন ব্যঞ্জনে যত তুষ্ট, লুচি মণ্ডায় তত নহে, দধি চিনি অধিক হইলেই সুখ্যাতি হয়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "কেমন আহার হইল", তবে তখনি উত্তর করেন "না অইবে কিয়া, খুব দদি চিনি দেছে"। এক আনা দক্ষিণা পাইলে ব্রাহ্মণেরা স্বচ্ছন্দেই শূদ্রের বাটিতে আহার করেন। চিঁড়া, দধি, গুড়, চিনি ও নারিকেল কোরা হইলেই সুন্দররূপে জলপান হয়, ৫০০ টাকায় ৫০০০ ব্রাহ্মণের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার হইয়া থাকে।*

স্ত্রী-পুরুষের বেশভুষা—বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরি চুলের গুচ্ছা গুছাইয়া রাখেন ও মস্তকের মধ্য দিয়া সিঁতি কাটিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহারদিগের সৌন্দর্য্যের এক প্রধান অঙ্গ। অনেকেরি গলায় মাদুলি, হাতে কবজ, ওরূপ না করিলে জাতি রক্ষা হয় না। বাজুকে "কবজ" এবং মাদুলীকে "তামিজ" কহে, ১০।১২।১৬ ছড়ার কৃষ্ণবর্ণের ঘুন্সী চন্দ্রহারের ন্যায় পরিধান করেন। রৌপ্য নির্ম্মিত গোট গলদেশে প্রদান করেন, প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবকেরা পায়ে মল ও হাতে বালা ধারণ করেন, সকলেরি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি আছে, তাহার নাম "আঙ্গট"।

স্ত্রীলোকেরা মোটা বস্ত্র দোবেড় করিয়া পরিধান করেন, মোমের দ্বারা কেশ সুশোভিত করত সিঁতার উপর এক অঙ্গুলি পরিমিত তৈল সিন্দুর লেপন করেন, কপাল নানা প্রকার চিত্র বিচিত্রিত তিলক অলকায় আবৃত, কেহ কেহ তৎপরিবর্ত্তে মধ্যভাগে প্রশস্তরূপে সিন্দুরের এক ফোঁটা কাটিয়া শরীরের অতি চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। নাসিকায় মোটা এক নথ, তাহার নাম "বুলক", হস্তে মোটা তাবিজ ও শঙ্খ। এই শঙ্খই মাঙ্গলিক অলঙ্কার, তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা, এরূপ এক যোড়া শঙ্খ একবার ক্রয় করিলে জমিদারির ন্যায় পুরুষ পুরুষানুক্রমে অনায়াসেই তাহার ভোগ দখল হইয়া থাকে। গলদেশ কেবল মাদুলি মালায় মণ্ডিত।

* সংবাদ প্রভাকর। ২৫ চৈত্র ১২৬১

পায়ে বেড়ীর ন্যায় বাঁকমল, হাতে চুড়ি পরিলে, পদে অলক্ত দিলে ও দন্তে মিশি না দিলে অতিশয় নিন্দা হয়।

বিধবা—ভদ্র লোকের বিধবারা একাদশীর দিবসে ফল মূল ও ঘরে কোটা চিঁড়ে এবং খই খাইয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহারা অতি মান্যা ও পুণ্যশীলা "খোয়েঁাড়ী বলিয়া সুখ্যাতি ঘোষণা হয়। কিন্তু এতদ্রূপ ব্যবহার ঢাকা, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, কমিল্যা, ভুলুয়া, সুধারাম ও চট্টগ্রাম মধ্যেও চলিত আছে। এরূপ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, সত্য মিথ্যা পরমেশ্বর জানেন কিন্তু প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করাতে সত্যের পক্ষে অনেক বিশ্বাস হইতেই পারে!

বিবাহাদি ক্রিয়া ও আমোদ-প্রমোদ—যে কোন আনন্দের ক্রিয়া হউক, এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সূত্রে অতিশয় আনন্দ পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া হুলুধ্বনি প্রদান করিয়া থাকে, সেই হুলুর নাম "জোকার"। বিবাহাদি ক্রিয়ার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বাবধি নিয়তই নাগরার বাদ্য হইতে থাকে, তাহার নাম, "খাড়া নাগরা"। ঐ নাগরার বাদ্য দিবসাপেক্ষা রজনীতে অধিক হয়। এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহার শব্দ ধাবিত হয়।*

এ দেশের বিবাহের প্রথা সংপূর্ণ রূপেই বিপরীত। অর্থাৎ বরকে প্রায় কন্যার বাটীতে যাইতে হয় না, কন্যাই স্বয়ং সাজ-সজ্জা করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক বরের আবাসে গমন করেন। এইরূপ নিয়ম ইঁহারদিগের পক্ষে অতিশয় সম্ভ্রম জনক, এতদ্রূপ শুভ কর্ম্মের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহের অঙ্গনারা অঙ্গনের মধ্যে চক্রাকার হইয়া গানারম্ভ করেন, এই গানের নাম "গাহিন লওন", তাহার বাদ্যের নাম "খাড়ানাগরা"। পুরুষেরা বাহিরে আসিয়া অত্যুত্তম গায়িকাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, এতদ্রূপ গায়িকাগণ অন্য পল্লীতে কুটুম্বের ভবনে সংগীত করণার্থ নিমন্ত্রিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু এ দেশের এই উৎকৃষ্ট গুণ যে নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরাও পথে ঘাটে হাট বাজারে বাহির হয় না।

কামিনীদিগের নামের সহিত "মালা" অথবা "দুর্গা" শব্দ সংযুক্ত, যথা—"শ্যামমালা" "রামমালা" "কৃষ্ণমালা" "জগৎমালা" তথা "রামদুর্গা" ও "শ্যামদুর্গা" ইত্যাদি।

পুরুষ জাতির আমোদ প্রমোদের মধ্যে কবি শুনাই সর্ব্ব প্রধান। এদেশে যাত্রার দল এককালেই নাই। কোন স্থান হইতে কচিৎ কোন যাত্রার দল আইলে শুনিতে অত্যন্ত ব্যাগ্র হয়েন। কিন্তু তচ্ছ্রবনের নিয়ম কিরূপ তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। গায়কের কোন্ পালা আরম্ভ করিয়াছে, এমত সময়ে কর্ত্তারা ফরমাইস করিয়া বসেন যে, "য়্যাকটা মালসী মালসী গাওহে", সুতরাং তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞানুসারে মালসী গাহিতে আরম্ভ করে, ইহাতে গাহনার সংপূর্ণরূপ ব্যাঘাত জন্মে। এখানে ভদ্র লোকেরা আমোদ করিয়া কবির দল করিয়া থাকেন, তাহার গাওনা ও সুর গীত অতি চমৎকার; কখনই যাত্রা বা পাঁচালীর দল করেন না।

ভাষা—এই বঙ্গদেশের ঢাকা, বিক্রমপুর, সুধারাম, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের অপেক্ষা বরিশালের ভাষা অতি কদর্য্য, কিন্তু শ্রীহট্টের অপেক্ষা অনেকাংশেই উত্তম, এবং কোন কোন কথা চট্টগ্রাম হইতে ভাল, ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সহিত এখানকার ভাষার কোন কোন অংশের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, এবং উচ্চারণের শেষ একটা রেশ প্রায় তুল্যরূপ, "ক"

* সংবাদ প্রভাকর। ২৩ চৈত্র ১২৬১

স্থানে "অ" এবং "অ" স্থানে "হ" উচ্চারণ প্রায় করিয়া থাকে, "ধ" স্থানে "দ", "ভ" স্থানে "ব" ইত্যাদি।

ইহারদিগের উচ্চার্য্য ব্যঞ্জন যথা। ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, র, ল, শ, হ।

কি কর, শব্দে, "কি অর"। অথবা "কি হর" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

ঘ, ধ, ভ এই তিন বর্ণের উচ্চারণ এককালেই করিতে পারে না।

বেটা স্থানে বেডা, কাটা স্থানে কাডা, পাঁটা স্থানে পাডা, ঘড়ি স্থানে গরি, যাব স্থানে যামু, হরি স্থানে অরি, হস্তি স্থানে অস্তি, করেছ স্থানে করূছ, বসিব স্থানে বস্মু, বসিবেন, স্থানে বসেন, হাট স্থানে আট, আসুন স্থানে আস্থন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি তাবতেই "আজ্ঞা, আপনি মশয়" এই সম্বোধনীর সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।*

সম্পাদকীয়

হে পরম পুরুষ পরমাত্মন্! তোমার পরম কৃপায় আমি বিষমতর বিপদের সাগর হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। হে কৃপাসাগর! তোমার কৃপাসাগরের জীবন ব্যতীত আমার জীবন রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। দয়াময় কেবল তোমারি দয়ায় আপদ-সাগরের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার হইয়াছি; স্থলে জলে কত কত ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু ও প্রাণনাশক সর্ব্বশোষক কত কত দুর্জ্জন শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছি, বিষয় রক্ষার ও প্রাণ রক্ষার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, অকূল চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া অনবরত শুদ্ধ ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিয়াছি, অন্ধকারময়ী ঘোরা রজনীতে চতুর্দ্দিক শূন্য সন্দর্শন করিয়াছি। যামিনী প্রভাতা হইলে পুনর্ব্বার বিশ্বপূজ্য জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের মুখাবলোকন করিব এমত ভরসা করি নাই, তৎকালে ধৈর্য্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে এক একবার "জয় জগদীশ্বর, জয় জগদীশ্বর রক্ষা কর, রক্ষা কর", উচ্চৈস্বরে এই সুবিমল সুধাময় সাধুশব্দ উল্লেখ করিয়াছি; তুমি ভাবগ্রাহি ভক্তবৎসল ভগবান্, অন্তরের ভাব গ্রহণ করত এই সভয়কে অভয় প্রদান করিয়াছ। আমি সাহসের সাহায্য পাইয়া আপনি ধীর হইয়াছি, বুদ্ধিকে স্থির করিয়াছি। তোমার চরণ স্মরণে, তোমার ধ্যান ধারণে, তোমাকে চিন্তা করণে বিষয় বিভব হরণের ভয় ও মরণের ভয় দূর হইয়াছে।

তোমার কীর্ত্তিকলাপ ও বিচিত্র বিশ্ববিরচনার কৌশল কদম্ব বিলোকন বাসনায় কত কত অজ্ঞাত অপরিচিত ভীমতর তরঙ্গময় নদনদী, অতি ভীষণ বিজন বিপিন অরণ্যপূরিত পর্ব্বত, সুজন শূন্য দুর্জ্জন জাল জড়িত জনপথ, রাজপথ এবং বনপথ ভ্রমণ করিলাম; ইহাতে কোন দিন কোনরূপ বিড়ম্বনা বিঘটিত হয় নাই। সম্যক প্রকারে শঙ্কা সজ্ঘটনার সম্ভাবনা সত্বেও বিপদের বর্ত্মে আমারদিগের মস্তকে বিষাদের বজ্র পতিত হয় নাই। যৎকালে চিত্ত নিত্য বিত্ত বিস্মৃত হইয়া অনিত্য বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত ছিল, তৎকালে ভাবি বিপদের ভাবনা করিয়া বহুবিধ অভাবনীয় ভাবনার চালনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন সেই ভয়ঙ্কর ভাবনার সময়ে তোমাকে ভাবনা করিয়াছি তখন সমুদয় ভাবনাই মানসের মন্দির হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। শার্দ্দূল, শূকর, মহিষাদি বনচর, কূর্ম্মকুম্ভীরাদি জলচর,

* সংবাদ প্রভাকর। ২৮ চৈত্র ১২৬১

প্রাণঘাতক বিহঙ্গম, গগনচর, বিবরবাসি ভয়ানক শয়ানক বিষধর, অত্যাচারি অপকারি অস্ত্রধারি পরস্বহারি জীবনারি নরদেহধারি নিশাচর প্রভৃতি কেহই আমারদিগের প্রতি প্রতিকূল হইয়া শাত্রবতা করে নাই, একবার লক্ষ্যও করে নাই। অতি বিস্তার দুস্তার শঙ্কার পারাবার হইতে অনায়াসেই নিস্তার পাইয়াছি। হে কৃপানিধান! এ কেবল তোমারি অনুকম্পা, নচেৎ আর কিছুতেই এরূপ হইতে পারে না। তুমি শিবময় স্বয়ং শিব, যে জীব অশিব সময়ে একান্তচিত্তে তোমাকে ভজনা করে তাহার অশিবের বিষয় কি আছে? তুমি শিব সম্পাদন করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহার সমুদয় মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা হরণ কর, তাহাকে মহানন্দে মুগ্ধ কর, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারেই চরিতার্থ কর। অতএব অদ্য একবার এই সময়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে প্রণিপাত করি। ধন্য, ধন্য, তুমি কি অপার কৃপার নিধি! তোমার কৃপার পাত্র হইয়া যাবজ্জীবন এই জগতীপুরে বিচরণ করিতে পারিলেই সমূহ সৌভাগ্য স্বীকার করিব।

হে দাতারাম! মহাসমুদ্রের শাখা প্রশাখা স্বরূপ যে সকল নদনদী যাহা শুদ্ধ লবণাম্বুতে পরিপূর্ণ, ব্যবহার করা দূরে থাকুক স্পর্শ করিলেই বর্ম্ম হইতে জীবনের বিচ্ছেদ হয় এবং যাহার উভয় পুলিন ঘোরতর নিবিড়ারণ্যে আবৃত, মানবের বসতি মাত্রই নাই, স্থলে জলে সমান শত্রু, তুমি সেই সেই বিশাল স্থানেও আমার দিগ্যে অমৃতময় বারি প্রদান করিয়াছ। অতি উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করিয়াছ। তোমার অনুগ্রহে ভক্ষ্য ভোজ্য ও পানীয় কোন বিষয়েরি অভাবে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। অপ্রাপনীয় স্থলে যাহা অতি অসম্ভবনীয়, প্রাপণের প্রত্যাশামাত্রই ছিল না, কোথা হইতে অকস্মাৎ যেন সেই সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলাম, বন্য লোকেরা অর্থের সহিত বিনিময় করিল, এবং স্থানবিশেষে বিনামূল্যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় কোন কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়া গেল। যে যে বস্তুর অভাবে পূর্ব্বক্ষণে অতিশয় কাতর হইয়াছি, কি হইবে, কিরূপে পাইব, "হে বাঞ্ছাফলপ্রদ বাঞ্ছাফল প্রদান কর।" এই বলিয়া একান্তচিত্তে তোমাকে ডাকিয়াছি, পরক্ষণেই অতি সহজে সেই সকল অভাবের অভাব হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইল, তুমি যেন আমার দিগ্যের রক্ষার নিমিত্ত তত্তদ্দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে, নচেৎ এতদ্রূপ আপদের অবস্থায় এবম্ভূত অভাবের স্থলে এরূপ অদ্ভুত ঘটনার সম্ভাবনা তো কিছুই ছিল না। আহা! এবম্প্রকার চবৎকার শুভকর ব্যাপার সংযোজিত হওনের সময়ে অন্তঃকরণ কি এক অব্যক্ত অপরিচিত আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়, মনের সেই আনন্দের অবস্থা কোনরূপেই প্রকাশ করিতে পারি না। হে বিপদ ভঞ্জন সাধুরঞ্জন! তৎকালে তোমার নিরঞ্জন নামের প্রকৃষ্টরূপ পরীক্ষা করত কেবল কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়াছি। গদগদভাবে ভক্তিভরে প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে কত সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি, তখন বনের মধ্যে মনের মধ্যে সন্তোষ সিন্ধু প্লাবিত হইয়াছিল।—সে ভাব এখন স্বভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। হে স্বভাব! সে কি ভাব? তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিব? প্রার্থনা করি, সে স্বভাবের অভাব যেন কখনই না হয়, প্রতি নিয়তই যেন অন্তঃকরণে সেভাবের আবির্ভাব থাকে, তাহার প্রভাবের প্রবাহ রহিত না হয়।

হে অনাথনাথ বিশ্বনাথ! অধুনা বিশিষ্টরূপেই বিবেচ্য হইতেছে যে বিপদ, জীবের পক্ষে বিপদনাশক বিপদ, অর্থাৎ সমূহ সম্পদের কারণ হইয়াছে, যেহেতু যে ব্যক্তি এই সংসারে বিপদাক্রান্ত না হইল, সে ব্যক্তি কখনই তোমার যথার্থ মহিমা ও অনন্ত গুণগরিমা এবং অসীম কাণ্ড কিছুই জানিতে পারিল না, বিপদকালে যে তোমাকে স্মরণ করে, সেই মনুষ্যই যথার্থ প্রেম

ও ভক্তিরসের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাব ও ভক্তির দৃঢ়তার জন্য সেই মনুষ্যই তোমার স্নেহ এবং করুণার পাত্র হইয়া থাকে। অতএব হে অন্তরাত্মন্! এইক্ষণে আমি বিপদকেই সম্পদ বলিয়া গ্রাহ্য করিব, এতদ্রূপ বিপদ যেন বারম্বার আমার ভাগ্যে বিঘটিত হয়, কারণ বিপদের পদে পতিত না হইলে সম্পদের সুখ কখন সম্ভোগ হইত না।—তুমি কি এক পরম পূজ্য পবিত্র পদার্থ তাহা কোনমতেই জানিতে পারিতাম না। সৌভাগ্য জনিত সম্পদের সময়ে মন স্বভাবতই অনিত্য সুখাসবে উন্মত্ত থাকে, তৎকালে চেতন সহজেই চেতনশূন্য হয়। কেবল ইন্দ্রিয় সুখকর অলীক আমোদেই আমোদ করে। তোমার বিষয়ে শ্রবণ মনন নিদি-ধ্যাসন দূরে থাকুক, তুমি কি পদার্থ, যুগান্তেও একবার তাহা চিন্তা করে না। তুমি "আছ" বলিয়াও জানিতে পারে না। হে নাথ! আমি যদি সম্পদসূচক সুখ সম্ভোগের সময়ে সর্ব্বসম্পদ ও সর্ব্বসৌভাগ্যের নিয়ন্তা স্বরূপ তোমাকেই বিস্মৃত হইলাম, তবে সেই সম্পদ কি প্রকারে আমার পক্ষে কল্যাণকর সম্পদ হইতে পারে? আমি এমত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করি না। ইহার অপেক্ষা বিপদ আমার পক্ষে কোটিগুণে মঙ্গলময় হইতেছে। যে সম্পদে তোমার সাধনার ব্যাঘাত হইল সে সম্পদকে শ্লাঘা পূর্ব্বক ভোগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। যে বিপদে তোমার ভজনা, সাধনা ও চিন্তার বিরতি নাই, সেই বিপদকেই সম্পদ বলিয়া সমাদর করিব এবং স্থিররূপে মনের সহিত এমত প্রার্থনা করিব যে এবম্ভূত মহামঙ্গল মণ্ডিত বিপদের সহিত যেন কস্মিন্‌কালেই আমার বিচ্ছেদ না হয়।

আমি ভ্রামক হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে যখন তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, তখনি আমার মনের সকল দুঃখ নাশ হইয়াছে। কিন্তু যখন মিথ্যা সুখে সুখী হইয়া তোমার চিন্তা হইতে অবসৃত হইয়াছি, তখনি দারুণ দুঃখে দুঃখিত হইয়াছি। তোমার এই বিনোদ ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ডের বিচিত্র বিরচনা দর্শনে আহ্লাদে প্রফুল্ল হওয়া কোথায় আছে, কেবল মহামোহে মোহিত হইয়া মিথ্যা ভ্রমে দুর্ভাবনার বৃদ্ধি করিয়াছি। ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল ও হিতাহিত বিবেচনা বিহীন হইয়াছি। প্রবোধ ও জ্ঞান আমার অন্তঃকরণের নিকটস্থ হয় নাই। ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যকে বিসর্জ্জন করত শুদ্ধ অজ্ঞানতার কার্য্যই করিয়াছি, কি হইতেছে, কি হইবে, কি করিতেছি, কি করিব, কি করিলে কি হইবে ও কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যখন মনে ভয়ের উদয় হইয়াছে, তখন কেবল হাহাকার করিয়া অতি দুঃখে ম্লান হইয়া চক্ষের জল নিক্ষেপ করিয়াছি। যাহারা আমার শত্রু নহে, অজ্ঞানতা বশতঃ তাহাদিগ্যে শত্রুজ্ঞান করিয়াছি—যে রজনী সজনী সহিত আগমন পূর্ব্বক আমার পক্ষে অতিশয় কল্যাণকারিণী হইয়াছে, সেই নিশীকে রাক্ষসীর ন্যায় সর্ব্বনাশী জ্ঞান করিয়াছি—আপনাকে আপনি না জানিয়া স্বরূপে বিরূপ করিয়া আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে সত্যের অপহ্নব করত কতস্থানে কতবার কতপ্রকার মিথ্যা কথা কহিয়াছি, কত ছল করিয়াছি, কত বল করিয়াছি, মিথ্যারূপে আপনার পরিচয় প্রচার করিয়াছি, ভ্রান্তি হেতু তৎকালে এমত অনুমান হইয়াছিল যে এতদ্রূপ ছল ও কৌশল না করিলে কোনমতেই ধন ও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব না।

হে ভক্তাধীন ভাবময়! আমার মনে এরূপ ভ্রান্তি, ভাবনা ও ছলনার উদয় কেন হইল? আত্মরক্ষার কারণ এতদ্রূপ মিথ্যা কথনে প্রবৃত্তির উদয় কেন হইল? আমি এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে অবধারিত করিতে পারি নাই যে এ বিষয় আমার পক্ষে ইষ্টকর কি অনিষ্টকর হইয়াছে, ইহাতে আমার পাপ হইয়াছে, কি হয় নাই, কেন না আমি কাহারো অহিতকরণের মানসে ছলনা করি নাই ও আপন পরিচয় গোপন করি নাই, কেবল দুরাত্মা হিংস্রকগণের হস্ত

হইতে নিস্তার পাইবার উদ্দেশ্য মাত্র, ইহাতে অপর কোন ইষ্টলাভ নাই। যাহা হউক, এজন্য যদি আমি গুরুতর অপরাধী হইয়া থাকি তবে দয়ানিধান, অনুকম্পা পুরঃসর আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর,—আমাকে সেই ভূলোকে সত্যের আলোকে পুলকে পরিপূর্ণ কর,—ভ্রান্তি হর। আমার ভ্রান্তি হর! আমার প্রতপ্ত মনকে শান্তি-সলিলে শীতল কর। সুবুদ্ধি বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আমি যেন পুনর্ব্বার আর এরূপ ভ্রমে পতিত না হই। এমত অব্যবহার্য্য ব্যবহার যেন আমা কর্ত্তৃক আর না ব্যবহৃত হয়!—এই সংসারে আমি যেন আর কাহাকে শত্রু জ্ঞান না করি। তুমি আমার অশেষ প্রকার উপকার সাধনার্থ সর্ব্ব প্রাণির সৃষ্টি করিয়াছ মনে যেন এরূপ বোধের বিরহ না হয়।

তুমি মনোময়! অন্তর্য্যামী, ভক্ত বৎসল, মনেই রহিয়াছ, অন্তঃকরণেই বিরাজ করিতেছ, ভক্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণ করিতেছ। অতএব আমার মনের ভাব এবং সময় বিশেষের অবস্থা সকল তোমার অগোচরে কি আছে? কিছুই অবিদিত নাই। তুমি সর্ব্বসাক্ষী, সকলি দেখিয়াছ ও দেখিতেছ। সুতরাং তোমার যেমন অভিরুচি তাহাই কর। অধুনা এই মাত্র বিবেচ্য হইতেছে যে আমার সাধ্য কিছুই নাই। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র স্বরূপ, যেরূপ চলাও সেইরূপ চলি, যেরূপ বলাও সেইরূপ বলি, যেরূপ করাও সেইরূপ করি। আমি কেবল কলমাত্র, তুমি কলের কর্ত্তা, সুতরাং কর্ত্তার ইষ্টাধীন কার্য্য ব্যতীত এই সকল কল হইতে কোনরূপ ছল হইবার ও কোনরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা কি? তবে আত্মাভিমানে ভ্রমক্রমে যাহা বলি ও যাহা করি সে স্বতন্ত্র, যখন এই অভিমানের অন্যথা হইবে তখন কোন কথাই নাই, কোন ব্যাপারই নাই, কিছুই নাই। প্রভেদ আর কিসে থাকিবে? ফলে যতদিন তুমি আমি ভেদ রহিয়াছে ততদিন সদ সৎকর্ম্ম ও সুখ দুঃখ ভোগাভোগের কর্ত্তাই আমি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহার সহিত তোমার কি প্রকারে সম্বন্ধ থাকিতে পারে? কারণ তুমি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, দুঃখ সুখ বিবর্জ্জিত, পঞ্চাতীত অতীন্দ্রিয়।—তুমি আমাকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শরীরের সহিত মন ও বুদ্ধি বিতরণ করিয়াছ, সেই মন ও বুদ্ধি দ্বারা সকল কার্য্যই ধার্য্য হইতেছে।—তুমি পরীক্ষক স্বরূপ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের পরীক্ষা করিতেছ। জীব শুদ্ধ মায়ার প্রভাবে "আমি" "আমি" ও "আমার" "আমার" করতঃ নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া অহঙ্কারে মত্ত ও তত্ত্বহীন হইতেছে। দৈবাধীন কোনরূপ কার্য্য বিশেষে সুখ সৌভাগ্য ও সুখ্যাতি সঞ্চয় করিতে পারিলে আর অভিমানের পরিসীমা থাকে না। তখন তোমার নামও করে না, ভ্রমেও একবার তোমায় মনে করে না। আমি কর্ত্তা, আমি কৃতী, আমা হইতেই সমস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এই প্রকার কতই অলীকতা' প্রকাশ করে, এবং যদি কোন কার্য্য বশতঃ কোন গতিকে কোনপ্রকার দুর্ভাগ্যজনিত দুঃখে দুঃখিত হয়, তবে আর আমি বলিয়া বোধ থাকে না, তখন তোমার উপর অভিযোগ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া সকলের নিকট এমত প্রকাশ করে যে "ভাই, এ কর্ম্মে আমার দোষ কি, সমস্তই জগদীশ্বরের বিড়ম্বনা, ঈশ্বর নির্দ্দয় হইয়া আমাকে বিপদে ফেলিয়াছেন।" হে তাত! আমি তাত বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু কি করি, বৈরাগ্য বিরহে অজ্ঞানতাক্রমে পুনঃপুনঃ তাহাই ঘটিয়া উঠে। সুখের সময় তোমাকে একেকালে বিস্মৃত হই। এদিগে দুঃখের কালে স্বকর্ম্মের ফলভোগ কখনই স্বীকার করি না, কেবল তোমার প্রতি অভিমান পূর্ব্বক অন্যায়ের দোষারোপ করিয়াই থাকি। হে অবিজ্ঞাত নিরঞ্জন! তুমি করুণারূপ কৌমুদী প্রকাশদ্বারা এই মায়ামুগ্ধ পুরঞ্জন পুরুষের মোহরূপ ঘোরান্ধকার সংহার কর। আর যেন ভ্রমপথের ভ্রামক না হই, আর যেন অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।

হে নাথ! অধুনা আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল এই মাত্র ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে যে অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছ আমি যেন সেই অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ না করি। আমি যেন তোমার নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রসাদরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, সমুদয় সফল হইবে।

আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি, তোমার সাধনা পথ অতি পবিত্র, সে পথে কোন আশঙ্কা নাই, অতিশয় সুখময়, নিষ্কণ্টক, সত্য স্বরূপ সুবৃক্ষের সুশীতল ছায়া দ্বারা সততই সুশোভিত, যে ব্যক্তি একবার সেই সুপথে পদক্ষেপ করিয়াছে সে ব্যক্তি আর কখনই কোনরূপ কুপন্থার পান্থ হয় না, নিয়ত নির্ম্মল আনন্দ সুধায় অভিষিক্ত হইতে থাকে। হে চিদানন্দময় সর্ব্বেশ্বর! ঐ পথটি আমার পক্ষে কোন মতেই সহজ বোধ হয় না, কারণ আমি অন্ধ হইয়া তদ্দর্শনে বিমুখ হইয়াছি। অতএব কৃপাকটাক্ষ পূর্ব্বক চক্ষু প্রদান করিয়া আমাকে সেই পথের পথিক কর, আমি আর কতকাল কুপথে থাকিয়া পাপময় কণ্টকের ক্লেশ সহ্য করিব।

হে ভাবরূপ স্বভাব। এক এক বার আমি স্বরূপে স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তখন তোমার বিরূপে কিছুমাত্র বিরূপ বোধ হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মায়ার কার্য্য! পরক্ষণেই একেবারে তাহার অন্যথা হইয়া যায়, তখন রিপুর অধীন হইয়া কেবল বপু গর্ব্বে গর্ব্ব করিতে থাকি, সুতরাং সম্পূর্ণরূপেই স্বভাবের অভাব হইয়া যায়। শুদ্ধ আমাতে আমার আমি অভিমান থাকাতে "তুমি" পদার্থ বিস্মৃত হইয়া যাই, অর্থাৎ তুমি কর্ত্তা আমার প্রচালক, ইহা মনে থাকে না, আমিই কর্ত্তা, এই অভিমানে অন্ধ হইয়া সত্যপথ সন্দর্শনে বঞ্চিত হই। আমার বোধ, সূর্য্যের ন্যায় স্থির প্রভা প্রকাশ করিতে পারে না। বিদ্যুতের প্রায় এক একবার প্রদীপ্ত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ অমনি বিলুপ্ত হইতেছে। এই প্রণিধান করিতেছি "কেবল তুমিই একমাত্র নিত্য ও সত্য, আর সকলি অনিত্য। এই জগৎ ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা, কিছুই নহে। সমস্তই ভূতের খেলা, এই আছে এই নাই, অতএব ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়া ভূতকে অদ্ভুত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয় না। বিশ্ব নাটকের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিয়া মায়ায় মুগ্ধ হওয়াই অজ্ঞানতার কর্ম্ম। শুদ্ধ ভূতাতীত ভূতনাথকে ভজনা করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে"—কিন্তু কি চমৎকার! ইহার পরক্ষণেই আবার ভ্রমের প্রভাবে ক্রমেই ক্রমের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে, সুতরাং আমি শিবালয়ের সোপানে সমারূঢ় হইয়াও হইতে পারি না। ইহা হইতে আমার আর অধিক দুর্ভাগ্য কি আছে? কণ্ঠে রত্ন পাইয়া যত্ন দোষে আপনিই ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতেছি। যাহা হউক, তোমার প্রসন্নতা ব্যতীত আমি কখনই অখণ্ড নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিব না। হে গুণসিন্ধু দীনবান্ধব! এই দীনের এই দুঃখজনক দারুণ দীনতা দূর কর। আমার প্রতি কৃপা বিতরণে আর কার্পণ্য করা কর্ত্তব্য হয় না; আমি অতিশয় কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি এ সময়ে বধির হইলে আমি আরো অধিক অধীর হইয়া, কেবল চীৎকার করিতেই থাকিব। তুমি মনের মন হইয়া ইহাতেও যদি আমার মনোরথ পূর্ণ না কর তবে আমার অপরাধ কি? তোমার মহামহিমার মর্য্যাদার লঘুতা অবশ্যই হইবেক।

এইক্ষণে আমি প্রাণ, মন ও শরীর প্রভৃতি সর্ব্বস্বই তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে যাহা প্রদান করা বিবেচ্য হয় তাহাই কর। এই জগতে আমি আর কাহাকেও ভয় করিব না, কেবল তোমাকেই ভয় করিব; কারণ তোমাকে ভয় করিলে অপর কাহাকেও ভয় করিতে হয় না, ভয়, ভয় পাইয়া আর কদাচ এ পথে আগমন করিবে না। অপিচ ইহলোকে থাকিয়া আমি আর কাহারো উপাসনা করিব না, কেবল

তোমারি উপাসনা করিব, কারণ আমি সামান্য পদের প্রত্যাশায় যাহার উপাসনা করিব, সে যদি আমার প্রতি তুষ্ট না হয় তবে তো সকলি মিথ্যা হইল। শ্রমের সার্থকতা হইল না, আর যদি তুষ্ট হইয়াই সামান্য কোন পদ দেন, তবে সে পদ আমার বিপদ বিনাশের যোগ্য কখনই হইবে না, কিন্তু তোমার উপাসনার এই এক বিশেষ ফল যে তুমি তুষ্টই হও, আর রুষ্টই হও, দুই পক্ষেই আমার সমান উপকার হইতেছে, যে হেতু তোমার তুষ্টি আর অতুষ্টি উভয় তুল্য, অধিকন্তু যদি তুমি উপাসকের উপাসনায় বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হও, তবে অতি সামান্য পদের কথাই নাই, ইন্দ্রত্ব ও শিবত্ব প্রভৃতি পদ কোন্ তুচ্ছ, আপনার সর্ব্বোচ্চ অদ্বিতীয় পরম প্রার্থনীয় পরম পূজ্য ব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাক। হে দাতারাম। ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? তুমি নিত্যধন, চিত্তধন, সধনের ধন, অধনের ধন, এবং নির্ধনের ধন, অতএব হে সাধনের ধন নিত্যধন! আমার অপেক্ষা নির্ধন আর কেহই নাই, মূলধন কিছুই সঞ্চিত নাই, অথচ নির্ধনের দিন অতিশয় নিকট হইয়াছে। অধুনা আমি সাধনের ধনে বঞ্চিত হইয়া ধনের আশায় দিন থাকিতে তোমার শরণ লইলাম, যাহাতে দীন থাকিতে না হয়, এমত দিন, দিন। যত দিন যায়, তত দীন যায়, অক্ষয় ধনে ধনি করুন।—পদ দিয়া পদে রাখুন, পদে রাখুন।—আর বিপদ ঘটাইবেন না, আমি যখন অকপট চিত্তে ভক্তি ভরে "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া ডাকিব তখন আমার কোন বিপদ থাকিবে না, কি জলে, কি স্থলে, কি রসাতলে, কি অনলে, কি অনিলে, কি কাননে, কি পর্ব্বতে, কোন খানেই আমার আর অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, আমি সর্ব্বত্রই জয়ী হইব, তুমি সর্ব্বস্থানেই সঙ্গে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। কুশল ও কল্যাণ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবেক।

হে প্রভো! আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আমার সেই পাপ তৃণের ন্যায় হইয়াছে, তোমার নামাগ্নিতে এখনি দগ্ধ হইবেক, আমি মনের সকল দ্বিধা দূর করিয়া নির্ভয়ে তোমার নিকট সমুদয় প্রকাশ করিলাম। তুমি ক্ষমাকর হইয়া আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর এবং শান্তি-সলিলে অভিষিক্ত করিয়া পবিত্র কর।

রাগিণী বেহাগ : তাল আড়া

জগদীশ হে, কিরূপেতে করিব প্রচার।
অপার অসীমা মহা, মহিমা তোমার॥
অপরূপ সব কার্য্য, কর তুমি অবধার্য্য।
ভব তব ভবরাজ্য, অতি সুবিস্তার॥
কালে কত রূপ চিত্র, সতত স্বভাবে চিত্র।
হেরি চিত্র, কি বিচিত্র, বিবিধ প্রকার॥
ভূতে ভূত আবির্ভূত, ভূতে ভূত হয় ভূত
ভূতে ভূত জড়ীভূত, ভূত চক্রাকার।
ভেবে ভূত অভিভূত, সকলি করিছ ভূত,
ভূতাতীত তুমি ভূত, ভূতেরি আধার॥
কিবা নিশা, কিবা দিবা, কালের বিনোদ বিভা
প্রভারূপে তাহে কিবা, করিছ বিহার॥
দিবাকর, নিশাকর, এই দুই কর কর।
সেই কর কর কর, তুমি মূলাধার॥
কিবা ধরা কিবা বন, সমীরণ; হুতাশন।
ধরিতেছে প্রতিক্ষণ, ভাতি চমৎকার॥
সকলি পাঁচেতে হয়, পাঁচ ছাড়া কিছু নয়।
এই পাঁচ সমুদয়, ভবের ভাণ্ডার॥
কোথায় পাঁচের থেই, এই এই, সেই সেই।
এই দেখি আছে এই, পরে নেই আর॥
স্বভাবেই দেখা যায়, স্বভাবে প্রকাশ পায়।
স্বভাবেই পুনরায়, হোতেছে সংহার॥
বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি, ঋতুর সুচারু সৃষ্টি।
নিয়ত নয়নে দৃষ্টি, করি কতবার॥
রাশিচক্রে কত রাশি, পক্ষ তায় কত রাশি।
তিথি তায় কত আসি, বারে দেয় বার॥

কোথা আসে, কোথা যায়, কোথা শেষ লয় পায়।
এভাবের অভিপ্রায়, বুঝে সাধ্য কার ॥
যে জন যেরূপ কয়, কিছু তার স্থির নয়।
দেখি যাহা সমুদয়, মায়ারি বিকার॥
দরশন কোথা তবে, বস্তু বোধ কিসে হবে।
একে ঘোর অন্ধ সবে, তাহে অন্ধকার।
ভেদা ভেদ আত্মপরে, এই ভাব পরস্পরে
নয়নে মুদিলে পরে কেবা আর কার।
কত কাঁদে কত হাসে, কত মত ভাষ ভাষে।
মায়ার সাগরে ভাসে, না জানে সাঁতার ॥
খাইয়া বিষম ঢেউ, শুধু করে হেউ ফেউ।
কোনরূপে কভু কেউ, না পায় পাথার ॥
কার বলে বলি, 'আমি' কার বলে'আমি' বলী
এইরূপ বলাবলী, মুখে সবাকার ॥
কার বলে আমি 'বলি', এ বলের কেবা স্বামী।
একবার ভ্রমে আমি, না করি বিচার ॥
হয়েছি কুপথগামী, না চিনিয়া নিজ স্বামী।
অভিমানে আমি আমি, মিছে অহঙ্কার ॥
আমি হই, আমি হই, শুধু মাত্র হই, হই।
আমি কই, আমি কই, কারে কই সার ॥
আমি কভু,আমি নই, আমি হেতোমারি হই।
একমাত্র তুমি বই, কিছু নাই আর ॥
মায়ারূপ সমুদয়, কখনই নিত্য নয় ॥
সহজেই ভূত ময়, অখিল সংসার ॥
কেবলি ভূতের ঢেলা, কেবলি ভূতের মেলা।
সকলি ভূতের খেলা, ভূতের ব্যাপার ॥
মরি:মরি আহা আহা, কেহ নাহি
জানে তাহা।
ভবের ভিভব যাহা, সকলি অসার ॥
সমতা যাহাতে পাই, ক্ষমতা তাহাতে নাই।
মমতা কারণ তাই, করি হাহাকার ॥
দারা সুত জ্ঞাতি ভাই, যথা যাই তথা পাই।
দেখিতেছি কত ঠাঁই, কত পরিবার ॥
পাইয়া নশ্বর দেহ, মিছামিছি করি স্নেহ।
কোনরূপে এরা কেহ, নহে আপনার ॥
এ ভব ভ্রমের হাট, কেবল দেখিতে ঠাট।
এখনি ভাঙ্গিলে নাট, সব ফক্কিকার ॥

যত দিন আমি বাঁচি, তত দিন আমি আছি।
এ আমি, দুধের মাছি, ভনভনি সার ॥
আর কেন বাছা বাছি, এক দুই, পাছা পাছি।
হইয়াছে কাছাকাছি, বাঁচিব না আর ॥
অতএব এ সময়, দয়া কর দয়াময়।
এ দিনের মনোময় হও একবার।
হও প্রভু প্রভাকর, মহাকাশে প্রভাকর,
এখনি বিনাশ কর, ত্রিতাপ আঁধার ॥
একভাবে অহরহ, আমার অন্তরে রহ।
না করিব কারো সহ, কোন ব্যবহার ॥
কে অপাত্র, কেবা পাত্র, মূল কিছু নহে গাত্র।
মৌখিক কেবল মাত্র, লৌকিক আচার ॥
লোকাচারে করি ভয়, বৃথা হোলো
আয়ুঃক্ষয়।...
এখন বুঝিয়া মর্ম্ম, ভেদা ভেদ জাতি ধর্ম্ম।
একেবারে সব কর্ম্ম করি পরিহার ॥
নিত্য ধন, চিত্তধন, নির্ধনের তুমি ধন।
দেহ সে প্রাণ মন, লহ উপহার ॥
বিনাশিয়া মোহমদে, আমায় রাখহ পদে।
তোমার পবিত্র পদে, করি নমস্কার ॥
উপরোধে অনুরোধ, সকলি হইবে শোধ।
স্থির যেন থাকে বোধ তুমি সর্ব্বাসার ॥
সমুদয় পরিহরি, তোমার সাধনা করি।
কৃপা করি করি হরি, ভ্রম নদী পার ॥
স্থির ভাবে ধ্যান ধরি, জপ করি হরি হরি।
পদ তরি, দেহ তরি, পাপ পারাবার ॥
মানিলাম বলিহারি, ত্রাণ কর ত্রাণকারি।
আর না ভুগিতে পারি, মোহ কারাগার ॥
বলিবার কিছু নাই, চলিবার পথ চাই।
যথা রুচি কর তাই, যাহা করিবার ॥
বেজেছে কালের ঢোল, ভেঙ্গেছে সকল গোল
এ সময়ে হরিবোল, হরি হরি সার ॥

পদ্য

জয় জগদীশ বোলে, মুখে যেই ডাকে।
আপদ বিপদ তার, কিছু নাহি থাকে।

কিবা জল, কিবা স্থল, পর্ব্বত কানন।
যথা তথা সদা তার, সুখের সদন ॥
নিরানন্দ নাহি তার, নিকটেতে রয়।
স্বভাবে অভাব নাই, সদানন্দ ময় ॥
তরণে দুখের নদী, চরণে সে রয়।
স্মরণে তোমার নাম, মরণে কি ভয় ॥
যে জন বিপদে পোড়ে, যে ভাবেতে ডাকে।
সে ভাবে সদয় হোয়ে, রক্ষা কর তাকে ॥
কর পার, কর্ণধার, হোয়ে গুণধাম।
সঙ্কট-সাগরে তরি, তরি হরি নাম ॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, সেতু তব পদ।
কোন্ তুচ্ছ জলনিধি, আদি নদী নদ ॥
রতি গতি মতি যার, তোমার ও পদে।
তৃণ জ্ঞান করে সেই, স্বর্গের সম্পদে ॥
সেই জীব হয় শিব, অশিব কোথায়।
শিব পদ লোয়ে শিব, পাছে পাছে ধায় ॥
আমি দীন সুখী নহি, হই কোন দিন।
রিপুগণ সদা করে, আমার অধীন।
তাদের নিকটে আমি, ত্রাণ নাহি পাই।
দোহাই দোহাই প্রভু, তোমার দোহাই ॥
কিছুই না চাই আর, কিছুই না চাই।
এ বিপদে রাখ পদে, পদে দেও ঠাঁই ॥*

দেশ বিদেশীয় পাঠক এবং বন্ধুগণের প্রতি প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন

শারীরিক রোগের প্রতীকার প্রার্থনায় এবং দেশ দর্শনের অভিপ্রায়ে গত অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তম দিবসে আমি কলিকাতার যন্ত্রালয় হইতে নৌকারোহণ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ কয়েক মাস জলপথে ভ্রমণ করিলাম। ভ্রামক হইয়া ভ্রমণ কালে স্থানে স্থানে সমূহ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। কি জলে, কি স্থলে, কি পর্ব্বতে, কি কাননে পরম কারুণিক পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আমারদিগ্যে রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার অনুকম্পায় সম্যক সম্ভাবিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়াছি, ক্ষণকালের নিমিত্ত আপদে পতিত হই নাই, অত্যন্ত ভাবনার পরক্ষণেই আবার অপার আনন্দের সাগর সলিলে ভাসমান হইয়াছি। নূতন নূতন যত দেখিয়াছি ততই নূতন নূতন সুখের সঞ্চার হইয়াছে। নদী-নদের সরল তরল লহরী লীলা, তরঙ্গ রঙ্গ, অতি সহজ ও অতি বঙ্কিম কুটিল গতি।—পর্ব্বত-পুঞ্জের প্রকৃষ্ট ভাতি।—কাননের কমনীয় কান্তি।—সুন্দরবনের সুন্দর শোভা।—কত নগর, কত গ্রাম, কত হট্ট, কত গঞ্জ, কত দেবালয়, কত তীর্থ, কত ক্ষেত্র কত উপবন, কত সরোবর, এইরূপ কত কত বিষয় বিলোকন করত কেবল পুলকে পরিপূরিত হইয়াছি, চক্ষের সার্থকতা হইয়াছে।

অধুনা রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুর, দালালবাজার, লক্ষ্মীপুর, শান্তিসীতা, ভুলুয়া, সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ সীতাকুণ্ড, বাড়বাকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড, লবণাখ্যা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল, নলছিটি, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, তুসখালি মেয়ামতি, সাহেবের হাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসায়ের, টাকী, শ্রীপুর, বাগুণ্ডী, পুঁড়া ঘোরগাছি, বাদুড়ে, বসুরহাট, চাদুড়ে, গোলাপ নগর, বনগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, শিবনিবাস, হাঁসখালি ও রাণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন ও অভিনব নগর, গ্রাম ও গঞ্জ, এবং তীর্থস্থানসকল ভ্রমণ ছলে অতিক্রমপূর্ব্বক অদ্য এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইলাম। আমিই এ পর্য্যন্ত প্রভাকরের ভ্রমণকারী বন্ধুরূপে গণ্য ছিলাম, এইক্ষণে পুনরায় পূর্ব্ববৎ সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলাম। "ভ্রমণকারি বন্ধুর

* সংবাদ প্রভাকর: ১ চৈত্র ১২৬১

লিখিত বিষয়” এই উপাধির শ্রেণী মধ্যে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে, এতদ্দিন তৎসমুদয় মৎকর্ত্তৃক রচিত ও প্রেরিত হইয়াছিল। বোধকরি তৎপাঠে তাবতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তন্মধ্যে কতিপয় জেলা ও নগরের পুরাতন ও নূতন নূতন স্বরূপ ইতিহাস বিস্তৃতরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে আরো বর্ণিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে। আমি স্বয়ং সম্যক্ শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বিদেশীয় বন্ধুবর্গের বিশেষ সাহায্যে যত পারিয়াছি ততই সংগ্রহ করিয়াছি এবং বিদ্যোৎসাহি দেশহিতৈষী জনেরা ইহার পরে যত পারেন ততই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। আমার এবারকার ভ্রমণে অতিশয় উপকার হইয়াছে, এ লাভকে পরম লাভ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক, কেন না, যাঁহারা কস্মিন্‌কালে সংবাদ পাঠ করেন নাই তাঁহারাও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, অত্যন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রচনা সকল শ্রবণ করিয়াছেন ও পাঠ করিয়াছেনও করিতেছেন, বিবিধ বিষয় বিরচনা ব্যাপারে অনুরত ও অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। যে সকল কৃতবিদ্য ও কৃতকার্য্য মহোদয়েরা এ বিষয়ের যথার্থ মর্ম্মগ্রাহি কিন্তু প্রভাকর পত্রের গ্রাহক ছিলেন না, তাঁহারা অনেকেই গ্রাহক হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মধ্যে যিনি ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের একা লইবার সঙ্গতি নাই, তাঁহারও কয়েকজন একত্র হইয়া চাঁদা করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইঁহারা তাবতেই এই প্রভাকরের প্রভা বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, ইহার কল্যাণ কারণে লেখনী ধারণে তাবতেই উৎসুক হইয়াছেন। দেশীয় ভ্রাতারা দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন পক্ষে যদিস্যাৎ পরস্পর এই প্রকার স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়া সমানরূপে মনোযোগী হয়েন তবে আর ভাবনার বিষয় আর কিছুই থাকে না। আমাদিগের সমুদয় দুঃখ এককালে দূর হয়। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই এই বঙ্গভূমি “স্বর্গভূমি” নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভবিষ্যতে বালক ও যুবকেরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া যতই অনুশীলনের আধিক্য করিবেন ততই গৌরব বৃদ্ধি হইয়া দেশে মুখ উজ্জ্বল হইবেক, সভ্যতা এবং সুখ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। অতএব অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র, এই স্থলে ভক্তিপূর্ব্বক শিব স্বরূপ বিশ্বনাথকে প্রণিপাত পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে এইরূপ ভ্রমণ যেন আমার ভাগ্যে সর্ব্বদাই সংঘটিত হয়।

এই ভ্রমণে আমি এতদপেক্ষা অধিক উপকারের প্রত্যাশা আর কি করিতে পারি? এমত সম্ভাবনাই বা কি আছে? আমি আশার অতীত বরং অধিক ফল লাভ করিয়াছি, কারণ অশেষ বিধ দর্শন জন্য বিবিধ ব্যাপারে পরিচিত হওয়াতে বহুদর্শিতা ও সন্তোষ লাভ, গ্রাহক শ্রেণীর বৃদ্ধি হওয়াতে আয়ের আধিক্য, লেখক শ্রেণীর বৃদ্ধি হওয়াতে দেশের উপকার এবং বন্ধু শ্রেণীর বৃদ্ধি নিমিত্ত অব্যক্ত অখণ্ড ব্রহ্মানন্দবৎ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ। মানব জন্মের যাহা সার্থকতা তাহাই হইয়াছে। আজি এতৎস্থলে ইন্দ্রিয়গণকে নির্ম্মল সুখে কৃতার্থ করত স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছি।

একটি গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে যত সুখী না হই একটি লেখক বৃদ্ধি হইলে তাহা হইতে সহস্র গুণে সুখী হইয়া থাকি, অপিচ একটি বন্ধু বৃদ্ধি হইলে যত সুখ হয় বোধ করি এজগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখ আর কিছুতেই হয় না। আমারদিগের ভাগ্যে তিন বিষয়ের কোন বিষয়েরি অভাব হয় নাই। যাঁহারা পাঠক হইয়াছেন তাঁহারা তাবতেই অতি প্রধান, তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পত্রের গৌরব ও পরিশ্রমের সফলতা স্বীকার করিব। যাঁহারা লেখক রূপে ব্রতি হইয়াছেন, তাঁহারা সদ্বিদ্বান, উপযুক্ত, উৎসাহি, সুলেখক ও নীতিজ্ঞ, অন্মধ্যে

কেহ কেহ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও মাষ্টার। কেহ কেহ ভূম্যধিকারী, কেহ কেহ বাণিজ্যকারী এবং কেহ কেহ গবর্ণমেণ্ট ও জমিদার সংক্রান্ত সম্রান্ত পদে নিযুক্ত আছেন। পরন্তু যাঁহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র তাঁহারা তাবতেই অতি সৎপাত্র। রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ভুলুয়া, চট্টগ্রাম, কমিল্যা, বরিশাল এবং টাকী প্রভৃতি সকল স্থানের পাঠার্থি পুঞ্জের সদ্ব্যবহারে, নম্রতায় এবং জাতীয় ভাষায় রচনা বিষয়ক অনুরাগে অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এতন্মধ্যে অধুনা ঢাকা কালেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ একে কালেজ তাহাতে প্রাচীন, রাজসাহী ছাত্রদের প্রবন্ধ পাঠে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। বরিশাল, ফরিদপুর ও পাবনার ছাত্রেরদিগের রচনা অদ্যাপি আমার হস্তগত হয় নাই। ইহার কারণ উক্ত তিন স্থানে অধিককাল অবস্থান হয় নাই, ফলে শিক্ষকগণের সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতেই পরিতোষিত হইলাম। ভুলুয়ার ছাত্রের লেখা পাঠ করিয়া অনেকেই তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। চট্টগ্রাম, কমিল্যা এবং টাকী বিদ্যার্থিব্যূহের প্ররচিত প্রবন্ধপুঞ্জ যদ্যপি অদ্যাপি প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু আমি সেই সমুদয় পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। অধুনা বিশেষরূপে অনুরোধ করি উল্লেখিত বিদ্যালয় সকলের বিদ্যার্থিগণ কলিকাতা, হুগলি এবং কৃষ্ণনগরের ছাত্রের ন্যায় বঙ্গভাষায় যশস্বি হওনে যত্ন করুন। যেহেতু এই তিন কলেজের ছাত্রেরা এ বিষয়ে পরস্পর প্রায় তুল্যানুরূপ, কচিৎ কখনো কোন কোন বিষয়ে কোন কোন রচনার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ হয়। কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

অনন্তর, যে সকল বন্ধু-রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহারা অমূল্য, অতুল্য, অবিরতই অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছেন। চক্ষের অন্তর হইয়াছেন, কিন্তু কেহই কখনো মনের অন্তর হইবেন না, যাবজ্জীবন তাঁহারদিগের সদগুণের ঋণে বদ্ধ থাকিব। এই ভ্রমণে নদ নদী পথে, কোন বনে কোন নগরে কোন জিলা বিশেষে, কোন পরগণা বিশেষে, কোন গ্রামে, অথবা কোন স্থল বিশেষে যাঁহার যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া বন্ধুত্ব বিষয়ক প্রণয় প্রঘটিত হইয়াছে, আমি অদ্য এই যন্ত্রালয়ের এই সভাতে এই স্থানে এই আসনে বসিয়া তাঁহারদিগ্যে পাত্র বিশেষে প্রণাম, নমস্কার, বিনয় ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলাম। যাঁহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তিনি সেই রূপ গ্রহণ করিবেন। আমাকে মনে রাখিবেন, যেন বিস্মৃত না হয়েন, আমাকে এবং মৎ প্রণীত পত্রদ্বয়কে নিতান্ত নিজ জিনিস মনে করিবেন।

সে সকল বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক এই পঞ্চম সংখ্যক ভ্রমণের ভ্রামক হইয়া কয়েকমাস প্রবাসিরূপে গণ্য ছিলাম ; অদ্য তাঁহাদিগের নিকট পুনরায় নিবাসী হইলাম। এইক্ষণে সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কৃপা বিতরণে যেন কৃপণতা না করেন। আমি পাত্রভেদে সকলকে যথাযোগ্য ও যথা কর্ত্তব্য যাহা তাহাই জানাইলাম, সকলে গ্রহণ করুন। যতদিন ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাবতের সমীপস্থ হইয়া সাক্ষাৎ করিতে না পারি ততদিন কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

অপিচ দূরদেশীয় মহাশয়দিগ্যে যতদিন পত্র লিখিতে না পারি ততদিন তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন, কারণ আমি একে পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তাহার উপর আবার ১২৬২ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন অতি নিকট হইয়াছে, সুতরাং এই উভয় কারণে কোন মহাশয় এ দোষ ধর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না।

আমি যে উৎকট সাংঘাতিক রোগ ভোগ করত তাহার প্রতীকার প্রার্থনায় এতদিন ভ্রামক হইয়াছিলাম, সংপ্রতি সেই রোগের অনেক উপশম হইয়াছে, জগদীশ্বরেচ্ছায় অনেক

আরোগ্যলাভ করিয়াছি। যে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে ভরসা করি শীঘ্রই তাহা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইব, তবে কি হয়, বলিতে পারি না, আমার সাধ্য কিছুই নাই, যিনি কুশলাকুশলের কর্ত্তা তাঁহার মনে যাহা আছে পরিশেষ তাহাই হইবেক।

পরন্তু আমার এই অনবস্থানে মদীয় সহকারী বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারিগণ এবং বিশেষ বিশেষ বন্ধুবৃন্দের সহায়তায় পত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে আমি সমূহ সন্তোষ সহযোগে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।*

* সংবাদ প্রভাকর ॥ ১ চৈত্র ১২৬১

ঈশ্বরোজয়তি।

প্রবোধপ্রভাকর।

প্রথম খণ্ড।

জ্ঞানগুরু সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ

শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায়

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগোলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ

মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন।

১ চৈত্র ১২৬৪।

প্রবোধপ্রভাকর।

অজ্ঞানধ্বান্ত বিভ্রান্তপ্রান্ত শান্তপ্রভাকরঃ।
উদিতো হৃৎকঞ্জমোদ কৃৎপ্রবোধপ্রভাকরঃ॥

মঙ্গলাচরণ

যে মহামঙ্গলময়-মহানন্দকর-মহেশ্বর! তোমার অপার কৃপার ব্যাপার আমি বিস্তার-রূপে কি বর্ণনা করিব? তুমি কি এক অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে এই অনন্ত রচনার সূচনা করিয়াছ, বিবেচনার আলোচনা দ্বারা তাহার নির্ণয় করণে কেহই সমর্থ নহেন।—তোমার সৃষ্টির কি আশ্চর্য্য তাৎপর্য্য! তোমার কীর্ত্তির কি বিচিত্র কৌশল! ধন্য ধন্য! এই ভূতময় সংসারে সকলি অদ্ভুত দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইতেছি।

যে দিগে অবলোকন করি, সেই দিগেই সমুদয় ব্যাপার অতি রমণীয় এবং অতি শোভনীয়ই দেখিতে পাই।—এই চরাচর বিশ্বে অধঃ উর্দ্ধে সকল পদার্থই নয়ন-প্রফুল্লকর, অতি মনোহর। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য তাৎপর্য্য অবধার্য্য করিয়া কি প্রকারে তোমার ভবরাজ্যের গুণ ব্যাখ্যা করিব?—আমার মনের সাধ্যই বা কি? এবং বুদ্ধির স্থিরতাই বা কি? আমি যৎকালে আকাশ দেখিতে দেখিতে ভাবের তুলি ধারণ করিয়া মানসাকাশে আকাশের বিচিত্র ব্যাপার ব্যূহ চিত্র করিতে থাকি, তৎকালে তোমার বিশ্ববাসের দৃশ্য বস্তুতে আর আমাকে মোহিত করিতে পারে না।—আমি নয়ন মুদ্রিত করিয়া অন্ধকারেই অন্ধকার সংহার করি। দিবাকর ও নিশাকরকে একত্রে হৃদয় মধ্যে উদয় করত অব্যক্ত-শোভাকরী দিবা ও বিভাবরীকে প্রকাশ করিয়া রাখি।—দিবসেই পৌর্ণমাসীর প্রচার হওয়াতে আর অমানিশার সঞ্চার হইতে পারে না। এই চমৎকারাকার চিত্তঘটিত চিত্রকল্পনা জল্পনা কালে কি অন্তরে কি বাহিরে এক পরম পুলককর আলোকময় বিনোদ-জ্যোতিঃ বিলকিত হইতে থাকে। সেই দীপ্তি দর্শনে তৃপ্তির কথা কি কহিব? কি কহিব?—

হে নাথ!—আমি বসুমতীর বক্ষঃস্থিত প্রকটিত পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া বিশেষ কি আমোদ প্রাপ্ত হইব? তোমার প্রেম-পুষ্পের সুসৌরভে আমোদিত হইয়া সময়ে সময়ে যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হই।—হে দয়াময়!—আমি তোমার বৃষ্টির সৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া বিশেষ কি তুষ্টি ভোগ করিব? শান্তিসলিলে আমার চিত্ত-চাতকের সকল তৃষাই যেন কৃশা হয়, আর যেন সেই চাতককে আশারূপ পাতক ভোগ করিতে না হয়।—হে কৃপানিধান!—আমি তোমার আজ্ঞাবহ-গন্ধবহ সমীরণের শীতল-স্পর্শে বিশেষ কি স্নিগ্ধ হইব? বিবেক-বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমার মন ও শরীরকে এককালেই সুশীতল করুক। হে পরম পূজ্য!—আমি তোমার বিরচিত বহ্নির ব্যাপারে বিশেষ কি চমৎকৃত হইব। তোমার করুণায় আমার অন্তঃকরণে যেন জ্ঞানের অনল প্রবল হইয়া পাপ-পর্ব্বত দগ্ধ করে, অজ্ঞানতিমির বিনাশ করে

পয়ার।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
সকলি অসার, আর, সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন, সকল সংহার॥
ইচ্ছাময়, ইচ্ছা তব, কে বলিতে পারে ?।
বর্ণহারে, বর্ণহারে, গুণ বর্ণিবারে॥
দেখে তব, অসম্ভব, এ ভব-বিভব।
যেরূপে, যে ব্যাখ্যা করে, সকলি সম্ভব॥
শিবরূপ, সর্ব্ববীজ, সর্ব্বমূলাধার।
আত্মারূপে বিরাজিত, দেহে সবাকার॥
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা, মৃগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, বিন্দু নাহি খায়।
বিষ খেতে, বিষধরী, ধরিবারে ধায়॥
অমূল্য রতন করে, না করে যতন।
কাঁচের কারণে করে, শরীর পতন॥
ঘোর দ্বন্দ্ব, ভ্রমে অন্ধ, অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি বিভু, তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে, কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়া॥
করুক্, ধরুক্ শিলা, যদি থাকে প্রেম।
তবজ্ঞানে মাটি ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয়, কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল, গন্ধপুষ্প আনে॥
অরূপ স্বরূপ, তুমি, কত রূপ বলে।
তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে ?॥
যোগ যাগ, ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে, পূর্ণ করে, আপন উদর॥
খায় খাক, যত পারে, অন্ন, জল, ফল।
তোমাতে থাকিলে মন, তবে পাবে ফল॥

হে নাথ, অনাথনাথ, দীনদয়াময়।
আমি দীন, বোধহীন, ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব, ভাব, না পাই ভাবিয়া
কৃপাকর কৃপ কর, নিজজ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে দেখি কিছু, সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা, কি আছে আমার॥
তুমি প্রভু, আমি দাস, তোমারি হোয়েছি।
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ, রেখেছ, রোয়েছি॥
আমারে করেছ দান, এই দেহ তুমি।
তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে 'আমি'
আমি আমি কই।
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আমি কই ?॥
আমি, আমি, নই, ফলে আর কেহ নই।
জগদাত্মা, পরমাত্মা তব সত্তা হই॥
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই।
সলিলের বিম্ব আমি, সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজপ্রভা, করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, হইবে মরণ॥
আকাশ রোয়েছে, এই, ঘটের আগারে।
এই ঘট, হোলে নাশ, মৃত্যু বলে তারে॥
শূন্য হোতে, পুণ্য পাপ, গণ্য করি লয়।
অথচ জানে না কেহ, মরিলে কি হয়॥
মোরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়।
তবে তো বলিতে পারি, মরিলে কি হয়॥
যে হয়, সে হয় মোলে, বিফল বিচার।
প্রভু হে, তোমার প্রতি, প্রণতি আমার॥
দাতার প্রধান তুমি, দয়ার-নিধান।
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান॥
দিয়ে প্রাণ, পুন লহ, করিয়ে হরণ।
তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন॥
উপকারী, দত্তহারী, দেহ কত শিব।
এ ভব বন্ধনদায়, মুক্ত হয় জীব॥
যত কাল এই দেহে, থাকিবে জীবন।
তত কাল তোমাতেই, থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা, কোথায় কি পাই।
চারিদিগে চেয়ে দেখ, কোনো দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প, শ্রদ্ধানীর, ভাব-বিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই পূজার সম্বল॥
শরীর-নৈবেদ্য মম, উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই, লহ, লহ, লহ॥

ছয়রিপু, ছাগ, মেষ অতি বলবান।
তোমার নিকটে বিভু, দিব বলিদান॥

*

দিয়েছ 'রসনা' তায়, পান করি রস।
দান করি প্রাণ, মন, গান করি যশ॥
ত্বকে করি অনুভব, শীত উষ্ম যত।
তোমার মহিমা তায়, প্রকাশিত কত॥
ক্ষুধাহরা, সুধাভরা, দয়াময় নাম।
রসভরে, রসনায়, জপি অবিশ্রাম॥
দিয়েছ নাসিকা চারু, গন্ধের আধার।
বলহারি, বলিব কি, কত গুণ তার॥
কাননে চরণ করে, পশুকুল যারা।
কিসে সুধা, কিসে বিষ, ঘ্রাণে জানে তারা॥
অহরহ গন্ধবহ, গন্ধ-সহকার।
দূরে হোতে নাসিকার, করে উপকার॥
প্রফুল্ল কুসুম করে, লইয়া আঘ্রাণ।
মোহিনী-মহীর মোহে, মুগ্ধ হয় প্রাণ॥
তাহাতে এমনি মনে, ভাবের বিভাস।
গন্ধরূপে দেহ তব, হোয়েছে প্রকাশ॥

*

পেয়েছি যে 'পদ' তাহা, সম্পদের পদ।
এ পদ না, পেলে হোতো, বিষম বিপদ॥
নাসা নেত্র, শ্রুতি, কর, থাকিতে বিফল।
কলে-গাঁথা-কলেবর, হইত অচল॥
পদে পদে, পদে আছি, পদ আছে তাই।
নদ, নগ, বন, গ্রাম, যথা তথা যাই॥
কতরূপ, অপরূপ, দেখি অহরহ।
সতত সাক্ষাৎ করি, সুজনের সহ॥
দিয়ে পদ দিলে পদ, করুণা অপার।
চরণের গুণে ধরি চরণে তোমার॥

*

গুণাতীত নির্গুণ, অথচ গুণাকর।
কৃপা করি দীন হীনে, দিয়েছ 'এ' কর॥
এই করে জগতের, উপকার করে।
এই করে দরিদ্রের, দুঃখ-রাশি হরে॥
এই করে করে, প্রিয়, পুত্রের পালন।
করে করে অধরেতে, আহার গ্রহণ॥
এই কর, কল্পতরু, শাখার সমান।
এই করে, করে 'বলি, ত্রিজগৎ দান॥
এই করে সরোবর, করিয়া খনন।
বাঁচায় জীবন দিয়া, তৃষির জীবন॥
করে করে, কত কীর্ত্তি, পৃথ্বীর ভিতর।
বৃথাই হইত সব, না থাকিলে কর॥
আছে শুধু বর্ণজ্ঞান, করের কারণে।
কর বিনা, যুক্তি, বিধি, থাকিত কেমনে॥
যদবধি আছে কর কর লহ তার।
রচনা করিব যত, রচনা তোমার॥

*

ভাবভরে গদ গদ, পেয়ে দুই আঁখি।
কত তুষ্টি, সৃষ্টিপানে, স্থিরদৃষ্টি রাখি॥
এক ভাবে দেখি সব, এক ভাবে থাকি।
মাঝে মাঝে, তোমারে হে, মনে মনে ডাকি॥
নদ, নদী, জলনিধি, গিরি আর বন।
যেরূপে যখন করি, যেখানে ভ্রমণ॥
সমভাবে করিয়াছ, সকল সূচনা।
সব ঠাই এক রূপ, তোমার রচনা॥
সব দেশে এক রবি, এক ছবি ধরে।
কবির মানসপদ্ম, প্রকটিত করে॥
যাহাতে ফিরাই আঁখি, দেখি অপরূপ।
বিরাজিত তুমি তায়, প্রকাশিয়া রূপ॥
ওহে জীব, ভ্রমিতেছ, ভবের গহনে।
কোথা সেই ভবধব, নাহি ভাব মনে?॥
হোতেছে ভবের কার্য্য, কেমন করিয়া।
স্থির হোয়ে দেখ দেখি, নয়ন ভরিয়া॥
ভাবের-ভবন-ভবে, প্রেমভাবে রও।
ভাব রে ভবের ভাব, ভাবিক যে হও॥

*

শ্রবণ কারণ প্রভু, দিয়েছ শ্রবণ।
শুনে গীত, হই প্রীত, পুলকিত মন॥
তরুগণ, প্রতিক্ষণ, সমীরণ ভরে।
হাত মুখ নেড়ে, কত, গুণ গান করে॥
ফুর্ ফুর্ ঝুর্ ঝুর্, অতি মনোহর।
শ্রুতিপথে, সুধা ঢালে সুমধুর স্বর॥

শুনি সব, ঝিঁঝিরব, তাহে কত ভাব।
কেমনে জানিল তারা, তোমার স্বভাব ? ॥
সহচরী সহ চরি, সুখ তায় কত।
গান করে, নিজ স্বরে, দ্বিজকুল যত ॥
কভু জলে, কভু স্থলে, কখনো আকাশে।
নানা রব, করি স্তব, মহিমা প্রকাশে॥
বিনোদ বিপিনে বসি, বৃক্ষের শাখায়।
বিরলে বিশ্রাম করে, বিচিত্র বাসায় ॥
পাখিতে প্রভাতি গায়, প্রভাত সময়।
ললিত রাগেতে করে, গলিত হৃদয় ॥
স্বভাব সম্বাদপত্রে, বিহঙ্গমগণ।
দিবসের সমাচার, করে বিজ্ঞাপন ॥
'তরুণ তপন তনু, প্রাচীতে প্রচার।
জাগৃহি জাগৃহি, গৃহি, ঘুমায়ো না আর' ॥
তখন উঠিয়া সব, নব-বিলোকন।
শরণ লইয়া করি, তোমায় স্মরণ ॥
তৃষাতুর চাতক, গগনপথে থাকে।
শুনা যায়, সঠিক্, ফটিক্-জল ডাকে ॥
পিপাসায় প্রাণ যায়, হইয়া কাতর।
আপনার দুঃখ করে, তোমার গোচর ॥
রোদনবদনে তার, করুণার ধ্বনি।
শুনে তুমি, আঁখিজলে, ভাসাও অবনী ॥
তোমার রোদন দেখে, প্রেমনীরে ভাসি।
প্রকৃতিরে সাক্ষি রেখে, কাঁদি আর হাসি ॥

*

স্বরূপ-স্বভাবে তুমি, বিরাজিত যথা।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, ভ্রম নাই, তথা ॥
সুখ নাই, দুখ নাই, নাই কোনো তাপ।
জাতি নাই, বর্ণ নাই, নাই পুণ্য পাপ ॥
দ্বিজ নাই, শূদ্র নাই, নাই ভেদাভেদ।
শাস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই তথা বেদ ॥
ক্ষত্রি নাই, বৈশ্য নাই, নাই হাড়ি মুচি।
রুচি কি অরুচি নাই, শুচি কি অশুচি ॥
তুমি নাই, আমি নাই, নাই অভিমান।
ছোট বড় ভেদ নাই, সকল সমান ॥
স্থূল নাই, কৃশ নাই, নাই গুণ রূপ।
স্বভাবে বিরূপ নাই, সবাই স্বরূপ ॥

কুল নাই, মেল নাই, নাই গোত্র গাঁই।
পাদরি গোঁসাই নাই, নাই কাজী শাঁই ॥
ভেক, ভক্তি নাই, নাই. সঙ্গত পঙ্গত।
গুরু নাই, শিষ্য নাই, নাই মতামত ॥
সবে মাত্র এক রথী, এক মাত্র রথ।
এক বিনা আর নাই, চলিবার পথ ॥
বিচার বিতর্ক নাই, নাই লোকাচার।
একাকার নাই, কিন্তু, সব একাকার ॥
নাহিক কুটুম্ব জ্ঞাতি, নাই পরিবার।
জ্ঞাতি বল, বন্ধু বল, তুমি সবাকার ॥
বিভু গোত্র, বিভু গাঁই, বিভু মেল, কুল।
এক মাত্র তুমি বিভু, সকলের মূল ॥
না জানিয়া আপনারে করে অহঙ্কার।
আমি আমি, এই আমি, আমার আমার ॥
আপনি পবিত্র, ভ্রমে, করে অনাচার।
এ আমি, কে আমি, তাহা, না করে বিচার ॥
এ আমি, কাহার আমি, জানিলে সন্ধান।
সহজেই ঘুচে যায়, আমি, অভিমান ॥
আমি, আমি, অভিমান, দূর যদি হয়।
আমার 'আমিত্ব' পাবে, তোমাতেই লয় ॥
পুর পেয়ে পুরঞ্জন, নিরঞ্জন ভুলে।
আপনি আঘাত করে, আপনার মূলে ॥
না চিনিয়া ভবধব, মায়াবশে রোয়ে।
বেড়াতেছে, ভব ঘুরে, ভবঘুরে হোয়ে ॥
আর কেন বাড়াবাড়ি, হইয়াছে ভোর।
ছাড়াছাড়ি নাহি আর, মিছা কেন শোর ? ॥
ভবঘোর ভেঙে দেও, চেতনে চেতন।
খেলুক্ শেষের খেলা, মেলুক্ নয়ন।
উপরোধ, অনুরোধ, আর নাহি সয়।
আর না করিতে পারি লোকাচার ভয় ॥
কারো সহ, আর কোনো, বিষয় না রাখি।
সর্ব্বত্যাগী হোয়ে শুধু, তোমা নিয়ে থাকি ॥
কেবল তোমার প্রেমে, মন হোক্ বশ।
মৌখিকে না গাই যেন, লৌকিকের যশ ॥
ভাবে যেন এক ভাব, সদা থাকে স্থির।
সমভাব কোরে দেও, অন্তর বাহির ॥
করিব না আলাপন, আর কারো সনে।
ডাকিব তোমায় শুধু, মুখে আর মনে ॥

একতান ভক্তিভরে জগদীশ্বরে চিত্তার্পণ করাই কর্ত্তব্য।

হে জীব! মনে কর, তুমি এক অনিত্য মানবদেহ ধারণ করিয়া আর কত দিন এই মোহকরী-মোহিনীর-মহীর হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করিবে? মনে কর তুমি মৃত্যুর গ্রাসেই পতিত রহিয়াছ। অতএব এতদ্রূপ অত্যল্প দিবসের নিমিত্ত জগতে আসিয়া যদি অনর্থক বিবাদ কলহ ও বিচার, বিতর্ক করিয়াই পরমরত্ন পরমায়ুকে বৃথা বিনষ্ট করিবে, তবে কোন্ সময়ে নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া পরমপুরুষের চিন্তা করত পরমপুরুষার্থ ও পরমার্থ লাভ করিবে। তুমি যত দিন বিবাদ করিবে, কলহ করিবে, বিচার করিবে, বিতর্ক করিবে, এবং অভিমান করিবে, ততদিন তোমার চিত্তের চাপল্য কিছুইতেই নিবারণ হইবে না।—এই চঞ্চলতার অন্যথা না হইলে কোনোক্রমেই তোমার অন্তঃকরণে প্রেম, ভক্তি, ভাব, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের স্থিরতা হইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত পক্ষে ব্যাঘাত হইলে কি প্রকারে প্রবোধের উদয় হইতে পারে? তুমি আর কেন চীৎকার কর? নীরব হও, মনকে নির্ম্মল কর।—সিদ্ধান্ত-স্বরূপ-সূর্য্যদেবের উদয় করিয়া মানসের অন্ধকার সকল মোচন কর।—ভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম এবং বিশ্বাসকে মনের মন্দিরে স্থাপিত করত সর্ব্বাধ্যক্ষ শিবময়কে মনোময় করিয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যান কর, ধ্যান কর।—মন যেন ক্ষণার্দ্ধকালের নিমিত্ত জগদীশ্বরের চিন্তা হইতে বিরত না হয়। মনকে বশ কর, মনকে বশ কর।—এই মনকে বশ করিতে পারিলেই জগৎকে বশ করিতে পারিবে এবং জগতের কর্ত্তাকেও বশ করিতে পারিবে।

মালতীলতা ছন্দ।

সুকৃতি-সাধন করিয়ে কতই,
হোলে তুমি জীব নর রে।
ইন্দ্রিয় সহিত সুখের সদন,
পেলে চারু কলেবর রে॥
যে কিছু দেখিছ এ ভবভবনে,
অতিশয় মনোহর রে।
সভাবে স্বভাব স্বভাব সাধিছে,
হোয়ে মহামোহকর রে॥
সতত হোতেছ মোহেতে মোহিত,
সমুদয় চরাচর রে।
নদ নদী কত বন উপবন,
জলনিধি জলধর রে॥
ফলফুলময় লতা তরুবর,
শোভে ধরা ধরাধর রে।
বিনোদ গগনে রাজিত সুচারু,
দিবাকর নিশাকর রে॥
ভূচর খেচর বায়ু বারিচর,
প্রাণি দেখ, বহুতর রে।
প্রকৃতি-প্রসাদে, পৃথক পৃথক,
প্রমোদিত পরস্পর রে॥
গুণগুণস্বরে কমল-কেশরে,
মধু পিয়ে মধুকর রে।
কমলে কমল কুমুদ-কুসুম,
সুশীতল-সরোবর রে॥
সুরভি-সুবাসে আমোদ বিতরে,
সমীরণ ফরফর রে।
শীতল-পরশ সরস-শরীর,
বাস নাসাবাসাচর রে॥
কানন কুটীরে কোকিল-কলাপ,
কুহরে মধুর স্বর রে।
নিজ নিজ ভাষে ভাষে দ্বিজ যত,
সহ প্রিয় সহচর রে॥
দেখ জল স্থল অনল আকাশ,
অনিল শীতলকর রে।
ভূতের ব্যাপার ভৌতিক সকলি,
পাঁচ-ভূতে এক ঘর রে॥
পিতা মাতা আদি জাতি জ্ঞাতি যত,
সুত সুতা সহোদর রে।
সম্পদ বিভব ভোগের বিষয়,
নহে কভু স্থিরতর রে॥
অনিত্য হইয়া কেমনে এ সব,

হবে চিরসুখকর রে।
এই এই এই সেই সেই সেই,
নেই নেই নেই স্বর রে॥
অতএব জীব শিব যদি হবে,
উপদেশ ধর ধর রে।
মায়া-জায়া-ছায়া ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
সর সর সর সর রে॥
অভিমান আদি লোভ মোহ যত,
ভ্রম হর হর হর রে।
শেষ জেনে এক শেষ করে সব,
দ্বেষজরে কেন জর রে॥
বোধের অসিতে ক্রোধের সংহার,
কর কর কর কর রে।
উলঙ্গ রয়েছ বিবেক-বসন,
পর পর পর পর রে॥
কাহার ভয়েতে কাতর হইয়া,
কাঁপিতেছ থরথর রে;
নিকটে অভয় ভয় তবে কিসে,
কার্ ডরে তুমি ডর রে ?॥
ত্রিতাপে তাপিত হোয়ে তুমি আর,
তাপ পেয়ে কেন মর রে ?।
অভয় অন্তরে আনন্দকাননে,
চর চর চর চর রে॥
ভাবের আকাশে নয়ন যুগল,
হয় যেন নীরধর রে।
হরিগুণগানে পুলকে প্রেমাশ্রু,
ফেলে যেন দরদর রে॥
সন্তোষসলিলে মানসসাগর,
ভর ভর ভর ভর রে।
বিষয়বাসনা-বিষম-বারিধি,
তর তর তর তর রে॥
ভাবনা কেন রে, ভাবনা কেন রে,
ভবের ভাবিকবর রে।
যাহারে ভাবিলে ভাবনা থাকে না,
ভাব ভাবে করি ভর রে॥
অরির করেতে শরীর সঁপোনা,
হরির ধারণা ধর রে।
ধ্যানে জ্ঞানে মনে জপ জপ জপ,
হর হর হর হর রে॥
সকলি অনিত্য নিত্য শুধু সেই,
পরমপুরুষ পর রে।
সদা সর্ব্বক্ষণ সেই নিত্যধন,
স্মর স্মর স্মর স্মর রে॥

*

পাঁচের বাঁধুনি এই, নবদ্বার বাস।
এতদিন যাহে আমি, করিলাম বাস॥
পড় পড় হইয়াছে, নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চুরে, হোলো চুরমার॥
কালের বরষা ইথে, ভরসা কি আছে ?।
খুঁটি খসা কাঁচাঘর, কেমনেতে বাঁচে ?॥
বাঁধন্ গিয়েছে খোসে, ছাঁদন্ ছাড়িয়া।
কাঁদুনি বাঁধুনি বৃথা, নাড়িয়া নাড়িয়া॥
কাঁদে মন, ঘন ঘন, শুনে ঘন ডাক্॥
যে দিগে চাহিয়া দেখি, সে দিগেই ফাক্॥
উড়িয়া চালের খড়, হোয়ে গেল ফাকা।
খুঁচি দিয়া কত দিন, যাবে আর রাখা ?॥
পবন পেছন্ থেকে, মারিতেছে ঢেকা।
বংশহারা হোতে হোলো, থাকে না কো ঠেকা
যে বংশের ঘর এই, সে বংশ কি রয় ?।
ঘুণ ধোরে একে একে, হোয়ে গেল ক্ষয়॥
হংসদেবী ভেঙে গেলে, ধ্বংস সব হবে।
অংশে গেলে অংশ মিশে, বংশ কোথা রবে ?
যখন 'ঘরামি' এসে, ঘর গেল গোড়ে।
'প্রকৃতি' বলিয়াছিল, এই যায় পোড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে, ঢুকিলাম একা।
এখন সে ঘরামির, নাহি পাই দেখা॥
ঘরামির ঘর কোথা, জানিনে রে ভাই।
মিছামিছি, এথা সেথা, খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও, বোলো তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে, সাধ্য তার আছে ?॥
একারণ মাড়াবে না, আমার এ ভূমি।
ভয় আছে, বলি পাছে, "কি করেছ তুমি"॥
এই হেতু মজুরির, কড়ি নাহি লয়।
সেরে দিতে, হেরে যাবে, মনে আছে ভয়॥

ঘর গোড়ে, মজুরি না, নিতে আসে আর। যে গড়েছে সে ভাঙিলে, কে রাখিতে পারে॥
মিছামিছি খেটে গেল, ভূতের-বেগার॥ যায় যাবে, যাক্ ঘর, না রয় না রয়।
বল নাই, বলিবার, বলি আর কারে?। আর যেন এই ঘরে, ঢুকিতে না হয়॥

ভূমিকা

বাক্যবাদিনী বর্ণচারিণী কণ্ঠবাসিনী ভ্রান্তিনাশিনী ভাব-অর্থ-অভিপ্রায়-প্রদায়িনী দ্বিদলকমলদল-বিহারিণী শ্রীশ্রীমতী দৈবশক্তি-দেবীর চরণ স্মরণ পূর্ব্বক এই "প্রবোধপ্রভাকর" পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্তিপরবশ হইয়া প্রচুর প্রয়াসপরিপূরিত পরিশ্রম ও প্রযত্ন পুরঃসর লেখনী ধারণ করিলাম। এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা তাহা অতি দুঃসাধ্য গুরুতর সুকঠিন ব্যাপার, অর্থাৎ "প্রাণিতত্ত্ব নিরূপণ" পূর্ব্বতন সর্ব্বজ্ঞকল্প জ্ঞানগুরু মহর্ষিগণ পরস্পর এই তত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যথাসাধ্য শক্তিক্রমে বিচার-দ্বারা তন্ন তন্ন তন্ন তন্ন করত সার-সিদ্ধান্ত সঞ্চয় পূর্ব্বক পরিশেষ এককালীন সংশয়শূন্য হইয়াছিলেন কি না তাহাতে সন্দেহ করিলেও করা যাইতে পারে। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে (এইটিই নিশ্চিত) স্বাধীনচিত্তে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি, আমার এমন ক্ষমতাই বা কি? পরম কারুণিক পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই ক্ষমতা এবং সেই শক্তি প্রদান করেন নাই, তবে তাঁহার অনুকম্পায় অধুনা যে দুই এক জন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সুবিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শি মহানুভব মহাপুরুষ এই অবনী-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন আমার মনে এরূপ বিবেচনার আলোচনা হইতেছে। যেমন পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘনের প্রার্থনা, যেমন অন্ধ বিচিত্র বিনোদ-বিশ্বাস বিলোকনের বাসনা, যেমন বধির সুধীর সাধু সুবক্তা ব্যক্তির বদনবিধুবিগলিত বচন-পীযূষ পানের প্রত্যাশা, যেমন ভেক কমলরাজিত অমল-কমল-মধু লাভের লালসা এবং যেমন বামন গগনশোভাকর সুধাধার সুধাকর ধরিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াই উপহাস প্রাপ্ত হয়, আমি সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য হইয়া বস্তুতত্ত্ব বিষয়ক-পুস্তক প্রচারার্থ সহসা এবম্প্রকার আশা ভরসা লালসা করাতে সেইরূপ দুরাশা-জনিত দুর্দ্দশা ভোগ করিব তাহাতে আর সংশয় কি? কারণ যে বিষয়টি যাহার পক্ষে সম্ভপর নহে, অসম্ভব হইলে কাজেকাজেই সেই বিষয়টি তাহার পক্ষে পরিহাসজনক হইতেই পারে, কিন্তু সাহসের মধ্যে সাহস এই এবং ভরসার মধ্যে ভরসা এই, যে, কাশীবাসি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সংশয়চ্ছেদক সন্তাপহারক জ্ঞানদাতা-গুরু শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি এইক্ষণে এতদ্দেশের অগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীশ্রীযুত বর্দ্ধমানাধিপতির আশ্রয়ে বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন, তিনি এই জ্ঞানান্ধ-অকিঞ্চনের প্রতি অনুকূল হইয়া করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক সমূহ সমাদর সহকারে গুরুতর পরিশ্রমে যতদূরপর্য্যন্ত উপদেশ ও আনুকূল্য করিতে হয় তাহাই করিয়াছেন।—আমি সেই পূজ্যপাদ মহাত্মা মহোদয়ের করুণা আশীর্ব্বাদ এবং প্রসাদ লাভ করিয়া স্বকীয় সাধ্য-সীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভিলাষের নিতান্তই বাধ্য হইয়া এই গ্রন্থখানি প্রকটন করিতেছি, ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ-বশতঃ কোনোরূপ দোষ হইলে সে দোষ আমারি হইবে, তদ্দ্বারা তাঁহার দোষ হইবে না, কারণ যাহার যেরূপ আধার তাহার অতীত আধেয়ের অবস্থান কখনই সম্ভাব্য নহে। যেমন স্বর্ণপাত্র ব্যতিরেকে সামান্য অপাত্রে সিংহীর দুগ্ধ ধারণ করিতে পারে না, সেই প্রকার তত্ত্বদর্শি পুরুষ ভিন্ন অতত্ত্বদর্শি জনেরা কোনোক্রমেই তত্ত্বতন্ত্রের তত্ত্বি হইতে পারেন না, যেমন জগতৃপ্তিকর-জলধর সমদর্শিতাভাবে সর্ব্বত্র সমানরূপে সুধাময়-বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই জল যেরূপ জলাগারে পতিত হয় সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। লবণসমুদ্রে পতিত হইলেই লবণাক্ত হয়। অতএব স্তায়রত্ন মহাশয়ের সুধাময়-তত্ত্ব-উপদেশ আমার বিষময়-আধারে পতিত হইয়া দোষাশ্রিত হইলে তজ্জন্য আমিই দূষণ-ভূষণ ধারণ করিব।

আমি যথাযোগ্য-যত্নযোগে আদর্শ-স্বরূপ এই প্রথমখণ্ড প্রকটন করিলাম, ইহাতে যদিস্যাৎ গুণগ্রাহক অনুগ্রাহক অনুরাগি-গ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের সম্ভাবিত আনুকূল্য এবং অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি, তবে খণ্ডখণ্ড করিয়া তিনচারি খণ্ডে এই গ্রন্থখানি শেষ করিব, নচেৎ খণ্ডখণ্ড করিয়া এই খণ্ডকেই একেবারে শেষ করিব।

আমি অতি যৎসামান্য জ্ঞানশূন্য এই নরদেহধারি একটি ক্ষুদ্রজীব, ইহাতে যদি এতদ্রূপ সাধ্যাতীত দুঃসাহসিক কার্য্য-সাধনে অনুরত হইয়া কোনোরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে কি পর্য্যন্ত সুখের বিষয় হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়। বিশেষতঃ "প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণ" প্রথমাবধি একাল পর্য্যন্ত যে বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় তত্ত্বদর্শি মহামহোপাধ্যায় মহানুভব মহাত্মা মহাশয় মানবমণ্ডলির মানসমন্দির ঘোরতর সংশয়-স্বরূপ-অন্ধক'রে আবৃত রহিয়াছে, তদ্বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব-নিরূপণরূপ-প্রদীপপ্রভায় সেই অন্ধকার সংহার হইলে বোধ করি সকলেই আমার প্রতি যথোচিত স্নেহ এবং কৃপা প্রকাশ করিতে পারিবেন।—এইস্থলে অতিশয় কাতর ও বিষমতর ব্যাকুল হইয়া অনুরোধ করিতেছি, হে পাঠকগণ। আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিশেষরূপ অভিনিবেশ পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করিয়া দেখুন, দোষগুণের যথার্থরূপ বিচার করুন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব। ইহাতে অনায়াসেই জানিতে পারিবেন, যে পূর্ব্বতন আচার্য্য মুনি সকল কতদুর পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে তত্ত্বনির্দ্দেশ পূর্ব্বক শিষ্য সমূহের সংশয়চ্ছেদন এবং সন্তাপ সংহরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারদিগের মুখের উচ্ছিষ্ট, আবার তাহার উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট, এইরূপে কত উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট লইয়া আপনারদিগের যথা-ক্ষমতা সাধ্যানুসারে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ জনগণের বিচারাধীনে অর্পণ করণার্থ এতদ্রূপ পুস্তক প্রকাশের প্রবৃত্তিপথের পথিক হইয়াছি।—বস্তুতস্তু আমরা, যে, এই বৃহদ্ব্যাপার সম্পাদন-সম্বন্ধে সংযোগ সূত্রে সংযুক্ত হইয়া একেবারেই ভ্রমের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, কখনই সাহস-পূর্ব্বক এরূপ কথা উল্লেখ করিতে পারিব না।—কারণ যখন সমস্ত জগৎকেই ভ্রমরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে তখন অল্পবুদ্ধি আমার দ্বারা তাহার নির্দ্দেশিত নিরূপণ যে, নিশ্চয়রূপে নির্ভুল হইবে, কিরূপে এরূপ শ্লাঘা করিব? তবে ঈশ্বর করুন, আমরা এবিষয়ে অভ্রম হই, যেন অভ্রম না হই।—আমারদিগের ভ্রম যাউক, কিন্তু ভ্রম থাকুক।—শাস্ত্রে কথিত আছে, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" যখন প্রদীপের পশ্চাতেই অন্ধকার, জীবনের পশ্চাতেই মৃত্যু, যৌবনের পশ্চাতেই বার্দ্ধক্য ও জরা, এবং সুখের পশ্চাতেই দুঃখ, তখন জ্ঞানের পশ্চাতেই ভ্রম থাকিবে আশ্চর্য্য নহে।—

প্রাণিতত্ত্বনির্দ্দেশ-বিষয়ে এই ভারতবর্ষের পুরাতন জ্ঞানমণ্ডিত-পণ্ডিতগণ যেপ্রকার সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি অদ্যাপি অন্যত্র ততদুর পর্য্যন্ত হয় নাই। সেই সকল জ্ঞানিপুরুষের প্রণীত জ্ঞান-গর্ভ-গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মর্ম্মানুবাদ-পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকটন করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে।—কিন্তু কতিপয় প্রবলতর প্রতিবন্ধকতা-প্রযুক্ত তাহাতে বিবিধপ্রকার ব্যাঘাত এবং বিড়ম্বনাই হইতেছে। প্রথমতই ক্ষমতা চাই, অনেকের সে বিষয়ে তাদৃশ ক্ষমতাই নাই, যে দুই এক ব্যক্তির যথার্থরূপ ক্ষমতা আছে, নানাপ্রকার ব্যাঘাতবশতঃ তাঁহারদিগের উৎসাহপথ ক্লেশরূপ-কণ্টকে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু

ঐ মহাশয়দিগের যথোচিত আনুকূল্য ভিন্ন সহজে অভিলাষ সিদ্ধ হওনের সম্ভাবনাই নাই। ইহাতে বিশিষ্টরূপেই ধনের প্রয়োজন করে, কিন্তু কি পরিতাপ! জগদীশ্বর যাঁহারদিগকে এ বিষয়ের অনুরাগ দিয়াছেন, তাঁহারদিগ্যে ধন দেন নাই। অপিচ আমার কিছু এমত বিভব সম্ভব নাই, যদ্দ্বারা ঐ সমস্ত মহাশয়কে পরিপূর্ণরূপে পূজা করিয়া প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি, কেবল একমাত্র মন আছে।— সেই মনের দ্বারা যতদূর হয় ততদূর করিতে ত্রুটি করিব না, এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরা আপনারা উদ্যোগি ও উৎসাহি হইয়া এই অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধন করিলে, যে, কি প্রকার সন্তোষের ব্যাপার হয় তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু কি আক্ষেপ! !—সেপথে তাঁহারদিগের প্রবৃত্তি কখনই চরণ করে না—ভাল যেন তাহাই না করুন, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তক-প্রকাশকদিগের প্রকাশিত পুস্তক গ্রহণ করিয়া উচিতমত উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অনেকাংশেই অভিলষিত-বিষয়ে সুফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, অধুনা আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের ভরসার উপর ভর করিয়াই এতৎ দুঃসাহসিককর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহাতে যদিস্যাৎ তাঁহারা বিহিতরূপ আনুকূল্য না করেন তবে কখনই আমারদিগের এই ব্যয় বাহুল্য ও শ্রম সাকল্য সাফল্য হইবে না। গ্রন্থ রচনা, ইহাতে শারীরিক-সুস্থতা এবং মনের স্থিরতা এই উভয় বিষয়ের তুল্যরূপ আবশ্যক করে, বিশেষতঃ দেহের অবস্থাদোষে অন্তঃকরণের অবস্থা কোনোমতেই উত্তম হইতে পারে না। কারণ মনেতে তাদৃশ স্ফূর্ত্তির উদয় হয় না। একে আমারদিগের শরীর তাদৃশ সবল ও সুস্থ নহে, তাহাতে আবার সর্ব্বতোভাবে স্বাবকাশের সুসার হয় না, যেহেতু দৈনিক ও মাসিক-প্রভাকর লিখিতে এবং তৎসংক্রান্ত আর আর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেই পরিশ্রমে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। তথাচ আমি এই সমস্ত যাতনাযুক্ত, দায়ভুক্ত এবং গুরুতর ভারগ্রস্ত হইয়াও এই প্রস্তাবিত মহদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে ক্ষণকালমাত্রই আলস্য করি না।—কিন্তু দুর্ভাগ্যদোষে সকল বিষয়ের সমান সঙ্গতি, সমান সংযোগ এবং সমান সংঘটনা না হওয়াতে প্রায় অনেক সংকল্প রাবণের সংকল্পের ন্যায় কল্পনা মাত্রই হইতেছে, সুতরাং মনোগত অভিপ্রায় সকল সুসিদ্ধ করিতে না পারাতে আন্তরিক আক্ষেপে জীবনযাত্রা যাপন করিতেই হইল।—যাহাহউক, সংপ্রতি গত বিষয়ের অধিক আন্দোলন করণের প্রয়োজন করে না।—সর্ব্বশুভকর শিবনিধান সদয় হইয়া ভবিষ্যতে শিব-বিধান করুন, তাহা হইলে এই আয়ুর অত্যল্প অবশিষ্টকাল অভিপ্রায় ও উৎসাহকে চরিতার্থ করিয়া পরিশেষ ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া পরমানন্দে পরলোকে প্রস্থান করিতে পারিব।

এই পুস্তক গদ্য পদ্যে পরিপূরিত হইল; একটী বিষয় দুই প্রকারে লিখিবার এই তাৎপর্য্য, একবার গদ্য পাঠ করিলে তাহার ভাব, অর্থ, অভিপ্রায়াদি অতি সহজেই পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হওনের সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যাঁহারা পদ্যপ্রিয়, তাঁহারা গদ্যের পর পদ্য দৃষ্টে আরো অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। এই পুস্তকে পিতা পুত্রের প্রশ্ন উত্তরচ্ছলে যে প্রবন্ধটী প্রকটন করিলাম, তাহার তাৎপর্য্যার্থ সাধারণের সাধারণ-বোধে সহজে সংগ্রহ হইবার নহে; ফলে শ্রীমান্ ধীমান্ পুমানপুঞ্জের পক্ষে কখনই কঠিন হইবে না। নচেৎ অপর সকলকে প্রকৃষ্টরূপ প্রণিধান পূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবেক। এই প্রস্তাবে কি গদ্য, কি পদ্য, যত দূরপর্য্যন্ত সহজ শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, উভয় বিষয়ে তাহাই করা হইয়াছে। আমরা এমত একটী কঠিন শব্দ ব্যবহার করি নাই, যাহা শুনিতে কর্কশ ও উচ্চারণ করিতে কণ্ঠের কষ্ট বোধ হয়। যে বিষয়টির সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া প্রকৃতরূপ বর্ণনায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা গদ্যেতেই কঠিন হইয়া উঠে, আমরা কিরূপ

ললিত চলিত সরল এবং সহজ ভাষায় কবিতায় সেই বিষয়টী বর্ণনা করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা তাহা দৃষ্টি করুন।

যে কোনো-দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তা যে কোনো দেশীয়ভাষায় যে কোনোপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করুন, কিন্তু তিনি সেই দেশীয় উৎসাহদাতা সাহায্যকারি সর্ব্বলোকের নিকট উচিতমত উৎসাহ, সম্ভাবিত সমাদর এবং সংপূর্ণরূপ সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে কোনোমতেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন না। আমরা এই দেশের মনুষ্য, এই দেশের ভাষায় এই দেশীয়-শাস্ত্রসম্মত-গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং এই দেশস্থ মনুষ্যের উপরেই এই সমস্ত বিষয়ের নির্ভর করিতে হইবেক, তবে যদি বিদেশীয় লোকের মধ্যে কোনো কোনো মহাত্মা এতদ্ব্যাপারে আমারদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতে সমূহ সম্মান এবং সম্যক্ প্রকারেই সৌভাগ্য স্বীকার করিব। যাহা হউক, অধুনা এতৎ বঙ্গদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশহিতার্থি বিদ্যাবন্ধু জ্ঞানোৎসাহি জনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, অতএব আমারদিগের আশা ভরসা নিতান্তই যে নিষ্ফলা হইবে এমত বোধ হয় না। সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে কখনই ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহী হইব না। রাজকীয় শিক্ষাসমাজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন এমত প্রত্যাশা করিতে পারি না, কারণ আমারদের তেমন সহায় নাই, সম্ভাবনা নাই, এবং উপায়ো নাই, সুতরাং কি প্রকারে তাঁহারদিগের সুগোচর করিয়া কৃপা লাভ করিব? এতদ্দেশীয় যে যে সুপণ্ডিত ক্ষমতাশালি ব্যক্তি তৎসংক্রান্ত সম্ভ্রান্তপদে অভিষিক্ত আছেন, তাঁহারা অস্মদাদির প্রতি কৃপাবিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াই থাকেন, আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া নিরাশজনিত ক্ষোভ ভোগ করিয়াছি। ঐ মহাশয়েরা কেন এরূপ ব্যবহার করেন তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না, অনুমান করি আমারদিগের প্ররচিত-প্রবন্ধ সকল তাঁহারদিগের মনোনীত হয় না, অথবা অপর কোনোরূপ বিশেষ কারণ থাকিতে পারে। যাহাহউক, আমরা যাঁহারদিগের আশা-তরুর আশ্রয় লইয়াছি, তাঁহারা যেন কৃপা এবং ফল প্রদানে কাতর না হন।

এই "প্রবোধপ্রভাকর" পুস্তক দুই শ্রেণীযুক্ত অর্থাৎ দুই কালামি আট-পেজি ফার্ম্মার সাড়ে-পনেরো ফার্ম্মায় সম্পন্ন হইল। অন্যান্য আট পেজি ফার্ম্মার অপেক্ষা এই ফার্ম্মা অনেক বড়, এবং কবিতাগুলীন ক্ষুদ্র অক্ষরে প্রকাশ হওয়াতে অধিক বিষয়েই গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ হইল। সকল প্রকার অবস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যূহের সুলভ-জন্য আমরা ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট করিলাম, এই মূল্য অত্যল্পই হইয়াছে, অনায়াসেই সকলে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে রচনাদি সমস্ত বিষয়ে যে সকল দোষ হইয়াছে, গুণগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা, প্রভাকর যন্ত্রালয়।
১ চৈত্র ১২৬৪ সাল

প্রভাকর সম্পাদক
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

যোভ্রান্তি বর্ণরচনার্থ গতোমহীয়ান্ দোষোবিচক্ষণ জনেষু বিরক্তিকারী।
স ক্ষম্যতাং নিজধিয়া গুণিভির্ভবদ্ভিঃ কৃত্বাকৃপামিহ মন্নীশ্বরচন্দ্র গুপ্তে॥

❀❀❀

প্রবোধপ্রভাকর

গ্রন্থারম্ভ।

পরমকারুণিক-পরমেশ্বর জীবের শিবের নিমিত্তে এই জগতীপুরে এত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যে, তাহার সংখ্যা করিতে হইলে সংখ্যারই সংখ্যা হয় না, তথাপি প্রায় সকল জীবই স্বভাবদোষে অভাবগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে, কেহই আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী বলিয়া পরিচয় দেয় না, সুতরাং লক্ষ্মীপুর নগরবাসি উঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণনন্দনের প্রথমাবস্থায় যে মানসী যাতনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অসম্ভাবিত বিষয় নহে, অর্থাৎ কোনো এক সময়ে এই বিশ্ব রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রালয় তুল্য লক্ষ্মীপুর নামক মহানগরে সকল শাস্ত্রতত্ত্বদর্শী মহর্ষিকল্প সাঙ্গ চতুর্ব্বেদবেত্তা এক মহামনা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ঐ মহানগরীয় অধন সধন সকলের নিকট দেববৎ মান্য ও পূজ্য হইয়াও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যাজনাধ্যাপন প্রতিগ্রহাদি কোনো উপায়াবলম্বন না করিয়া কেবল উঞ্ছবৃত্ত্যাবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাৎ ক্ষেত্রপতিগণ স্ব স্ব ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি শস্য গৃহে লইয়া গেলে অবশিষ্ট যাহা ক্ষেত্রে পতিত হইয়া থাকিত তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেবকৃত্য অতিথিসেবা সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু সন্তানের ভরণ পোষণ করিয়া যে দিনে যে পরিমিত অন্ন অবশিষ্ট হইত সেই দিনে তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেন, তাঁহার পবিত্র মনে কখনই কোনো দুঃখের সঞ্চার হয় নাই, স্বীয় স্বভাবগুণে অভাব যে কি বস্তু তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না, তাঁহার চিত্ত-ভৃঙ্গ নিয়তই শ্রীশ্রীজগদীশ্বর চরণারবিন্দ দ্বন্দ্ব ক্ষরিত-মকরন্দ-পানানন্দে পরিতৃপ্ত থাকত, যদিও তিনি আপনাকে সাংসারিক সকল সুখে সুসম্পন্ন পরম সুখী জ্ঞান করিতেন, তথাপি ঐ মহানগরীয় সধন মহাজনগণ তাঁহাকে অতি দরিদ্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ মোচন করিতে বিবিধ উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু ধনাঢ্যগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তাঁহারা কেহই ঐ সুশান্তমনা ব্রাহ্মণকে অবস্থান্তরিত করিতে পারেন নাই, কোনোমতেই তাঁহার মনে লোভের সঞ্চার হইল না; এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে ঐ শিশু সন্তানটি ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণও স্বীয় পুত্রের অবস্থানুসারে নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন-সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়া পুত্রটিকে যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত করিলেন, বিপ্রনন্দনও অল্পকাল মধ্যেই পিতার নিকটে বেদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পিতার সমধিক প্রিয়পাত্র হইলেন, এইরূপে যখন ব্রাহ্মণতনয়ের ক্রমে বিবাহযোগ্য-কাল উপস্থিত হইল তখন ব্রাহ্মণী পুত্রের বিবাহ জন্য ব্রাহ্মণকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ কহিলেন হে প্রিয়ে! তুমি কি জন্য এত ব্যগ্র হইতেছ? পুত্রটি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিলে অবশ্যই কোনো সুব্রাহ্মণ স্বয়ং আসিয়া এই সুপাত্রে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তজ্জন্য আমাদিগকে কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না।—স্বামিবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী যদিও পতিবাক্যের কোনো প্রত্যুত্তর করিলেন না কিন্তু তাঁহার মন পুত্রের বিবাহ দিতে এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে কোনোমতেই তদ্বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া গোপনে স্থানে স্থানে পুত্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময়গুণে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, ঐ মহানগরনিবাসী কোনো ব্রাহ্মণই তাঁহার পুত্রকে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু তাঁহারদিগের সাংসারিক অবস্থাকে সকলেই নিতান্ত দুরবস্থা বলিয়া জানিতেন, যখন ব্রাহ্মণী বিবিধ চেষ্টা করিয়া একেবারে হতাশা হইলেন, তখন তাঁহার চিরসঞ্চিত ধৈর্য্য ও মানসিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি একদিন

স্বীয় নন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুত্র। তুমি পিতৃ নিকটে বেদ, বেদান্ত পাঠ করিয়া কি সুখ-সম্পৎ লাভ করিবে? তোমার পিতা সকল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে উঞ্ছবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বুঝিয়াছেন, যাবজ্জীবন মধ্যে একদিনও উদরপূর্ণ করিয়া আহার হয় নাই, একখানি সমগ্র বস্ত্র পরিধান করেন নাই, এই মহানগরে আমারদিগের তুল্য দুঃখী ও দরিদ্র একটিও নাই, সকলেই আমাদিগকে দীন দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে, দেখ, তোমার যথার্থ যৌবনকাল উপস্থিত, বরং বিবাহের সময় অতীত হইতেছে, আমাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া কেহই তোমাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হয় না, যদি বিদ্যাভ্যাস করিয়া এইমাত্র ফল হয়, তবে এবিদ্যা অপেক্ষায় অবিদ্যাকেই শতগুণে ভালো বলিতে হয়। ব্রাহ্মণনন্দন জননীর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুকাল বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার মন বিষয়-প্রবৃত্তির বশীভূত হইল, যত প্রবৃত্তি রাক্ষসী মনকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, ততই তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেকাদি অন্তর্হিত হইয়া একেবারে বৈষয়িক মনোরাজ্যই প্রবল হইয়া উঠিল, সুতরাং পূর্ব্বতন শান্তিজন্য সুখসিন্ধুর এক বিন্দুও অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি ঐ মহানগরীয় যে বস্তুর প্রতি নেত্রপাত করেন তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম-ক্ষণে অতি রমণীয় ও চিত্তাহ্লাদকররূপে প্রতীয়মান হয়, আবার পরক্ষণেই সেই সেই বস্তুর অভাবঘটিত যাতনাগ্রস্ত হইয়া একেবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়েন, ফলতঃ বিপ্রনন্দন এমত দুরবস্থ হইলেন যে তিনি স্বীয় অভিনব অবস্থা গোপন করিতে পারিলেন না, অচিরেই স্বীয় পিতার নিকটে গিয়া সন্তাপ নাশের উপায়ান্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম জগদীশ্বর জগতীপুরে যত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলই আমারদিগের পরম হিতকর, এক্ষণে দেখিতেছি তাহা নহে, যখন তিনি দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তাঁহার সৃষ্ট সকল বস্তুই কেবল দুঃখের ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে, এমত কোনো একটি বস্তুও দেখিতে পাই না, যাহা আমারদিগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সুখের সাধন করে, সকল বস্তুই একাংশে সুখ একাংশে দুঃখ প্রসব করে, বরং সুখাপেক্ষায় দুঃখের ভাগই অতিরিক্ত বোধ হয়, অতএব জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিরূপেই বা জীবগণ একেবারে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তাহার উপায় উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

পিতা। উত্তর॥ হে পুত্র! যদি জগদীশ্বর দুঃখের সৃষ্টি না করিতেন, ও এই জগতে দুঃখ না থাকিত কিম্বা উহা জীবের প্রতিকূল না হইত, অথবা জীব সকল প্রতিকূল দুঃখকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিত, ইচ্ছা করিলেও যদি দুঃখ চিরস্থায়ি নিত্যই হইত, কিম্বা তাহার নাশের কোনো উপায়ই না থাকিত, তবে সাংসারিক নিয়ম একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিত, বরং ক্ষণকালের মধ্যেই এই সুদৃশ্য বিশ্ব জলহীন মীনের ন্যায় শোভাবিহীন অতি মলিন হইয়া অকস্মাৎ বিলীন হইয়া যাইত, দুঃখের ভয়েই জীব সকল নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, যদি জীবের শারীরিক-পীড়া জন্য দুঃখানুভব না হইত তবে তাহারা কখনই যত্ন পূর্ব্বক ঔষধ সংগ্রহ করিয়া শরীর রক্ষা করিত না, অকালেই কালের সহিত সাক্ষাৎ করিত, ফলতঃ বিনা প্রয়োজনে জীবের কোনো একটি বিষয়েও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, সেই প্রয়োজন দুই প্রকার, সুখ ও দুঃখাভাব, অধিকাংশ বিষয়ে দুঃখ নাশের উদ্দেশেই জীবের প্রবৃত্তি হয়, কোনো কোনো বিষয়ে সুখ-লাভের উদ্দেশেও জীবের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যদি জীব সুখের বিচ্ছেদ সময়ে দুঃখ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইত তবে সুখও প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত হইত না,

সুতরাং সুখোদ্দেশে প্রবৃত্তিরও সম্ভাবনা থাকিত না, অতএব দুঃখকেই জীব-প্রবৃত্তির মূলকারণ ও জীব প্রবৃত্তিকে বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের এক মাত্র সংস্থিত-হেতু বলিতে হইবে। উপরি উক্ত প্রকারে যেমত এক মাত্র দুঃখের অভাবে সাংসারিক সকল বিষয় পরস্পর অসম্বদ্ধ হইয়া জগৎপতির সৃষ্টিক্রম ও সংস্থিতি-নিয়ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তদ্রূপ যদি জীব কোনো কালেই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয়ে সন্তপ্ত না হইত, তাহা হইলে কেহই ত্রিতাপ নাশের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সদ্গুরু সন্নিধানে গমন করিত না, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানাভাবে কোনো একটি জীবও চরমে পরম শিবলাভ করিতে পারিত না, কখনই কেহ নিত্য-সুখের অধিকারী হইত না, সকলেই ভ্রান্তি বশতঃ অসার সংসারকেই সার ভাবিয়া অনিত্য-সুখেই নিমগ্ন থাকিত, যেহেতু শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিত্য-সুখ লাভের অন্য কোনো উপায়ই নাই, অতএব পরমেশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারি করিতেই দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন, হে প্রিয়তম! যেমত দুঃখের সৃষ্টি না হইলে ঐ সকল অনিষ্ট ঘটিত, তদ্রূপ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াও যদি দুঃখ আমারদিগের প্রতিকূল না হইত ও আমরা তাহার নাশোপায়ের অনুসন্ধান না করিতাম কিম্বা দুঃখই অবিনাশি নিত্য হইত, অথবা দুঃখনাশের কোনো উপায় না থাকিত, তাহা হইলেও আমাদিগের লৌকিক পারলৌকিক কোনো প্রকার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! আমি বিশেষরূপে চিত্তবৃত্তি চালনা করিয়া দেখিলাম যে যদি এই জগতে দুঃখের সৃষ্টি না হইত তবে সাংসারিক সকল নিয়মই বিরূপ হইয়া উঠিত, কোনোমতেই লোকের লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না, কিন্তু আপনি যে, কহিতেছেন, শাস্ত্রীয় বস্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই ত্রিবিধ সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, এতদ্বিষয়ে আমার কতগুলি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ক্রমে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ, জ্ঞান, অজ্ঞানের বিরোধী, অবশ্য অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারে, তদ্ভিন্ন কোনো বস্তুই জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইতে পারে না, যে জ্ঞান সকল বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া থাকে সে কিরূপে কোনো বস্তু বিশেষ অর্থাৎ দুঃখকে বিনষ্ট করিবে?

পিতা। উত্তর॥ হে পুত্র! সত্যই জ্ঞান অজ্ঞানমাত্রের বিরোধী, অজ্ঞানকেই নষ্ট করিতে পারে, অজ্ঞান ভিন্ন কোনো বস্তু নাশ করিতে পারে না, কিন্তু যখন জ্ঞান স্ববিরোধি অজ্ঞানকে নষ্ট করে তখন ঐ অজ্ঞানের কার্য্য সকল আপনিই নষ্ট হইয়া যায়, যেহেতু কারণ বিনাশ হইলে কার্য্যের ক্ষণকাল স্থিতিরও সম্ভাবনা নাই, যেমত রজ্জুখণ্ডে সর্পভ্রম' হইলে, পরে যখন রজ্জুতত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন যেমত রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান-জন্য সর্প ও ভয় কম্পাদি-জনিত দুঃখেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং যখন জীব স্বপ্নাবস্থাপন্ন হইয়া অজ্ঞান বশতঃ মায়া-কল্পিত-ইষ্টবিয়োগ অনিষ্টসংযোগ-জনিত বিবিধ দুঃখ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবোধোদয় না হইবে ততক্ষণ স্বপ্নে মিথ্যা সুখ দুঃখানুভব করিয়া কখনো হর্ষ কখনো বা বিষাদ লাভ করিতে থাকে, পূর্ব্বে জাগ্রদবস্থাতে যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহার সহিত স্বপ্নের সুখ দুঃখের কি বৈষম্য আছে? তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না, তৎপরে যেমত প্রবোধোদয় হইয়া স্বাপ্ন-অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তদ্রূপ ঐ অজ্ঞানের কার্য্যভূত সকল স্বাপ্ন বস্তুও নষ্ট হইয়া থাকে, অতএব হে প্রিয়তম! যখন তুমি প্রতিদিন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ে

প্রত্যক্ষেই জ্ঞান দ্বারা বহুশত বস্তুর বিধ্বংসানুভব করিতেছ তখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি হইবে ইহাতে সংশয়ের বিষয় কি আছে ?।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! যদিও তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক দুঃখ-নিবৃত্তির কারণ হয়, হউক, কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়া জীবের পক্ষে সুসাধ্য বিষয় নহে, জীবের বহুজন্ম-সঞ্চিত-পুণ্য পরিপাক বশতঃ চিত্তশুদ্ধি ও শমাদি সাধন-সম্পত্তি হইয়া জ্ঞানোদয় যে, কবে হইবে তাহা বলা যায় না, অথচ দুঃখ প্রতিক্ষণেই অনুভূত হইতেছে, সুতরাং কিরূপে দুঃখ-নিবৃত্ত্যর্থ তত্ত্বজ্ঞানোদয় কালের অপেক্ষা করা যাইতে পারে ? ইহা কখনই সম্ভব হয় না, যে, অদ্য রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করিতেছে সহস্র বৎসর পরে ঔষধ সেবা করা যাইবে, বিশেষতঃ কোনো বিষয়েই হউক, যতক্ষণ তাহার কোনো সুলভ উপায় পাওয়া যায় ততক্ষণ কষ্টসাধ্য উপায়াবলম্বন করিতে কখনই জীবের প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং যখন জীব ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত হইবে তখন ঐ সকল তাপ নাশের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট যে সকল কারণ বিদ্যমান আছে তাহাই অবলম্বন করিবে কখনই তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ লইতে অগ্রসর হইবে না, অর্থাৎ যখন বাত, পিত্ত, কফের বৈষম্য নিমিত্ত শারীর জরাদি রোগাক্রান্ত হইবে, তখন ঐ সকল রোগ নিবৃত্তির প্রতি চরক, সুশ্রুত, নিদানাদি বৈদ্যশাস্ত্রে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে উপযুক্ত বৈদ্য দ্বারা সকল ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিয়া রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে, এবং যখন কাম ক্রোধ লোভ ও অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণবশতঃ মানস-দুঃখের উৎপত্তি হইবে তখন প্রিয়তমা-কামিনী, দণ্ড বিধান, যাত্রা, কৃষি, বাণিজ্য, রাজ-সেবাদি লোক-প্রসিদ্ধ উপায়াবলম্বন করিয়াই ঐ মানস দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং যখন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সর্প দংশনাদি কারণজনিত কোনো আধিভৌতিক দুঃখগ্রস্ত হইবে, তখন তদুপযুক্ত ঔষধ সাবধানতাদি রূপ লৌকিক উপায়াবলম্বন করিয়াই ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং যখন বিনায়ক মাতৃকা-গ্রহাদি বৈগুণ্যরূপ দৈব কারণ বশতঃ আধিদৈবিক দুঃখাভিভূত হইবে তখন মণিমন্ত্র মহৌষধ স্বস্ত্যয়নাদি রূপ লৌকিক কারণ দ্বারা ঐ দুঃখের নিবৃত্তি করিবে, এইরূপে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয় নাশের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বহুসংখ্যক লৌকিক উপায় বিদ্যমান থাকিতে বহু জন্ম পরম্পর আয়াস-সাধ্য তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে জীবের কিরূপে প্রবৃত্তি হইতে পারে ?

পিতা। উত্তর॥ হে পুত্র! তুমি ত্রিবিধ সন্তাপনাশের প্রতি লৌকিক যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলে ইহার একটিও যথার্থরূপে দুঃখ নাশের প্রতি-কারণ নহে। ইহার কোনো কারণ দ্বারাই নিশ্চিত রূপে যে দুঃখ নাশ হইবে এমত সম্ভাবনা নাই, কিছু কালের নিমিত্তে দুঃখ নাশ হইলেও যে আর সেই দুঃখের পুনরুৎপত্তি হইবে না এমতও হইতে পারে না, তুমি কি কখনো এমত ঔষধ দেখিয়াছ যে তদ্দ্বারা রোগের শান্তি হইবেই হইবে, অবশ্য কেহ এক ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছে, কেহ বা রোগ-মুক্ত না হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, যদি পৃথিবীতে এমত ঔষধ-থাকিত যে তদ্দ্বারা নিশ্চিত-রূপেই রোগশান্তি হইবে তাহা হইলে একটি জীবও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিত না, এবং এমত ঔষধও কি জগতে আছে ? যে, তাহা সেবন করিয়া একবার রোগমুক্ত হইলে আর কখনই সেই রোগের পুনরুৎপত্তি হয় না ; যদি তাহা না হইল তবে কিরূপে তাহাকে দুঃখ নিবৃত্তিকর বলা যাইতে পারে ? তবে ঔষধাদি দ্বারা অল্পকালের নিমিত্তে কোনো কোনো দুঃখ অবিভূত হইয়া থাকে আবার ক্ষণকাল পরেই

প্রকাশ পায়, অতএব যাহার কিছু মাত্র বিবেকশক্তি আছে সে ব্যক্তি কদাচই তোমার প্রদর্শিত লৌকিক উপায়াবলম্বন করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবে না, অবশ্যই নিশ্চিতরূপে ও সমূলে দুঃখ-নাশ করিতে যাহার সামর্থ্য আছে এমত তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস করিতেই সচেষ্ট হইবে।

পুত্র। প্রশ্ন।। হে পিতঃ! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সংসারে এমত কোনো উপায় নাই যাহা অবলম্বন করিলে নিশ্চিতরূপেই দুঃখ নষ্ট হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়, এবং কোনো উপায়াবলম্বন করিয়া একবার দুঃখনাশ হইলে যে আর কখনই সেই দুঃখের উৎপত্তি হইবে না এমত সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং যদি লৌকিক কোনো উপায়ই দুঃখ নাশের প্রতি যথার্থ কারণ না হইল, না হউক, কিন্তু বেদ-বিহিত অশ্বমেধ, বাজপেয়, এবং রাজসূয় যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম সকল নিশ্চিতরূপেও সমূলে দুঃখ নাশ করিতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ করা যাইতে পারে না। যেহেতু বেদে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে, যে, ঐ সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে জীব একেবারে দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গীয়-পরমানন্দ অর্থাৎ যে সুখ কোনো দুঃখের সহিত সংস্রব রাখে না, কিছুকাল পরেও যাহাকে দুঃখ আসিয়া আক্রমণ করে না, অভিলাষ না করিতেই যাহা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত থাকে, এমত স্বর্গীয় সুখসম্ভোগ করেন। হে গুরো। যখন এই বেদ-প্রসিদ্ধ এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই সংপূর্ণ-রূপে দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে তখন তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস করিতে কখনই জীবের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসাপেক্ষায় ঐ সকল কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান করা যে সহস্রগুণে সুসাধ্য বিষয় তাহাতে কোনো সংশয়ই নাই, অথচ সুসাধ্য উপায় বিদ্যমান থাকিতে কষ্টসাধ্য উপায়াবলম্বন করিতে কখনই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অগ্রসর হয়েন না।

পিতা। উত্তর।। হে প্রাণাধিক প্রিয়তম! তুমি যে বেদ-বিহিত কর্ম্মকলাপকে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রতি-কারণ রূপে বিবেচনা করিয়াছ ঐ সকল কর্ম্মকলাপও তোমার পূর্ব্ব-প্রদর্শিত লৌকিক ঔষধাধির ন্যায় সমূলে দুঃখ নাশ করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা অবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়রূপ ত্রিদোষগ্রস্ত, অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেমত দেব ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি বিবিধ সৎকৃত্যজনিত পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ অশ্বাদি পশু-হিংসা ও জীববিধ্বংসজনিত অল্প পরিমিত পাপও সঞ্চিত হইয়া থাকে, সুতরাং যজমান পুরুষ, ফল পরিপাক সময়ে যেমত ঐ মহাপুণ্য-জন্য স্বর্গীয় পরমানন্দ লাভ করিবে, তদ্রূপ তাহাকে ঐ আংশিক অল্প পরিমিত পাপজনিত নরক-যাতনা সম্ভোগও করিতে হইবে, এবং ঐ সকল যাগাদি কাম্য-কর্ম্মের মধ্যে কোনো একটি কর্ম্মও নিত্যফল প্রসব করে না, উহারা সকলেই অনিত্য ফল জন্মাইয়া থাকে, 'কর্ম্মবিশেষে ফলভোগের কাল বিশেষরূপে নিরূপিত আছে, সকল কর্ম্মেরই নিরূপিত কালপর্য্যন্ত ফলভোগ করিয়া ভোগাবশেষ হইলে স্বর্গ হইতে পতিত হইতে হয়, এবং ঐ সকল যাগাদি কর্ম্মের ফল একরূপ নহে, পরস্পর ফলের অনেক তারতম্য আছে, ফলগত-তারতম্য থাকিলেই ফলভোগ-কালে জীবের মনে দুঃখলেশের সঞ্চার হইয়া থাকে, যখন আপনা হইতে অন্যের সুখ সম্পত্তির আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয় তখন প্রায় সকলেই স্বীয় হীনতরাবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মানসদুঃখ বিশেষ সম্ভোগ করিয়া থাকে, যদিও কোনো কোনো মহাত্মা পুরুষের মনে ঈর্ষাদি দোষ জনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না, তথাপি ঐ সমধিক সুখ সম্পৎ লাভের উপযুক্ত সাধন সঞ্চয় না করাতে বর্ত্তমান সুখ সম্পত্তির ন্যূনতা প্রযুক্ত আক্ষেপ

উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রিয়তম! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যে সকল বৈদিক-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেই মহায়াস-জন্য দুঃখভোগ করিতে হয় ও ফলভোগ কালে ফলগত তারতম্য থাকাতে মনের ক্লেশ উপস্থিত হইয়া ফলভোগাবসানে পুনরায় সুখান্তে দুঃখভোগ স্বরূপ বিষময় সাংসারিক ক্লেশানুভব করিতে হয়, সেই সকল কাম্য-কর্ম্মও কি কখনো আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ হইতে পারে? তবে তুমি, যে, কোনো কোনো শাস্ত্রে স্বর্গসুখের নিত্যত্ব শ্রবণ করিয়াছ তাহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে, স্বর্গসুখ একেবারে ত্রিকালস্থায়ি, কখনই তাহার নাশ হইবে না, তাহার মর্ম্ম এইমাত্র, যে, সাংসারিক সকল সুখাপেক্ষায় স্বর্গীয়-সুখ বহুকাল স্থায়ি, শীঘ্র বিনষ্ট হয় না।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! আমি শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলাম, যে, বৈদিক-কাম্য-কর্ম্ম দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে না, কর্ম্মের ফলও একরূপ নহে, যখন প্রত্যেক কর্ম্মই পরস্পর বিভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে তখন, যে, তাহারা একরূপ নিত্যফল প্রসব করিবে এমত সম্ভাবনাই নাই, এবং যখন পৃথিবীতে জীব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন গমনাদি ক্রিয়ামাত্রেই অনিত্য ফলোৎপাদন করে, তখন কেবল যজ্ঞসম্বন্ধিনী-ক্রিয়াটিই যে নিত্য-ফলোৎপাদন করিবে এমত প্রত্যাশা কি আছে? সুতরাং এ সকল বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি যে কহিলেন, যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আংশিক পাপ সঞ্চয় হয়, ইহাতেই আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, যদি যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেও পাপের ও পাপ জন্য দুঃখ লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তবে কোনো একটি জীবেরও ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইত না, যেহেতু জীব-মাত্রেরই দুঃখ অনিষ্টকর, কেহই চেষ্টা করিয়া দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, বিশেষতঃ যে ধার্ম্মিক পুরুষ প্রাণপণে বহুবিত্ত ব্যয় ও বিবিধায়াস স্বীকার করিয়া যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি যজ্ঞাদিতে পাপের সংস্রব আছে, ইহা শ্রবণমাত্রেই বিরত হইবেন, ইহাতে সংশয় কি আছে? তাহা হইলেই পুরুষের প্রবৃত্তির অভাবে যজ্ঞাদি-বিধায়ক-বেদবিধি সকল নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া একেবারে কর্ম্মকাণ্ড বিলোপ হইয়া যাইত।

পিতা। উত্তর॥ হে পুত্র! বেদ বিহিত কর্ম্ম-কলাপ এমত নহে, যে, তাহাতে জীবের অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, যদিও তাহাতে আংশিক অল্প পরিমিত পাপের সংস্রব আছে, তাহা শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পরিহৃত হইতে পারে, যদি বা প্রায়শ্চিত্ত না করা যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, যেহেতু যখন জীব সুকৃত সমূহোপার্জ্জিত স্বর্গ-সুধা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তখন কি তাহার শরীরে দুঃখাগ্নি কণার যৎকিঞ্চিৎ উত্তাপ সহ্য হয় না?—হে প্রিয়তম! যদি ক্রিয়া জন্য ফলে আংশিক দুঃখ সংস্রব থাকিলেই জীব প্রবৃত্তিপরবশ না হইয়া নিবৃত্তির অধীন হইত, তাহা হইলে এই সংসারে কোনো একটি বিষয়েও জীবের প্রবৃত্তি হইত না, কখনই জীব এমত সুখ সম্ভোগ করে নাই যাহাতে দুঃখের সংস্রব নাই, বরং যখন যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাতেই অধিকাংশ দুঃখ সম্ভোগ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সুখলাভ করিয়া থাকে, সাংসারিক সকল সুখই সন্দাংশ ন্যায় দুঃখ কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া রহিয়াছে, বিনাদুঃখে কোনো সুখ লাভেরই সম্ভাবনা নাই, অতএব যখন জীব অত্যল্প সুখের প্রত্যাশায় সমধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে তখন যে তাহারা যৎসামান্য কষ্টের ভয়ে স্বর্গীয় মহাসুখের উপেক্ষা করিবে এমত কখনই হইতে পারে না।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! যদি সুখের আধিক্য ও দুঃখের অল্পতা-প্রযুক্ত যাগাদি

কাম্য-কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি হয়, হউক, কিন্তু আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, যে যদি ঐ সকল কর্ম্ম কোনোমতেই আমাদিগের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে পারে না, তবে মহাপ্রমাণীভূত-বেদের প্রায় সমুদায়াংশেই কি জন্য ঐ সকল কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা পুনঃ পুনঃ বিহিত হইয়াছে? কর্ম্মকাণ্ড বিস্তার করিতে বেদের যে পরিমাণে আগ্রহাতিশয্য দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত তুলনা করিলে লক্ষাংশের একাংশও আগ্রহাতিশয্য জ্ঞানকাণ্ডে দৃষ্ট হয় না—আহা! যদি জ্ঞানই আমারদিগের সকল দুঃখ-নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম সুখলাভের মুখ্য কারণ, তবে বেদের উচিত ছিল, যে, কর্ম্মকাণ্ডে বৃথা পণ্ডশ্রম না করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে বাহুল্য-রূপেই জ্ঞানোপদেশ দিতেন, যাহাতে জীব সকল অনায়াসে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিত, কেবল বেদের প্রলোভ প্রদর্শনেই জীব সমূহ কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে, কেহই নিত্যসুখের অধিকারী হইতে জ্ঞানোপদেশ লইতে যত্ন করে না!

পিতা। উত্তর॥ হে পুত্র! কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি বেদের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে তোমার মনে আশ্চর্য্য রসাভিভূত হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যদি বেদে গুরুতর আয়াস সহকারে বাহুল্যরূপে কর্ম্মকাণ্ড কথিত না হইত তবে মনুষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পশ্বাদি-বৎ ব্যবহারেই নিযুক্ত থাকিত, এই মহারমণীয় লোকালয় হিংস্র-পশুপুঞ্জ-সমাকীর্ণ ভীষণ-অরণ্যের ন্যায় ভয়ানক স্থান হইয়াই উঠিত, জীব-নিবহ যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত অসৎকৃত্যানুষ্ঠান করিয়া চরমে দুঃসহ নরক-যাতনা সম্ভোগ করিত, ইহারা এই ক্ষণভঙ্গুর স্থূল-দেহে আত্মত্ব নিশ্চয় করিয়া দেহের পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য জন্য নির্ভয়ে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইত, যে কোনো কর্ম্ম করিয়াই হউক, ইহলোকে সুখ লাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইয়া কখনই পরলোক ভয়ে ভীত হইত না, সুতরাং ঐ সকল প্রাকৃত-বুদ্ধি পশুবৎ মনুষ্যের ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানসক্ষেত্রে কৃপা-বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমশই জ্ঞান-বীজ বপন করিলে কোনো একটি বীজও অঙ্কুরিত হইত না, হে প্রিয়তম! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যাঁহারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বিবিধ সৎকৃত্য ও নিয়ত সৎসঙ্গ-লাভ করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারাও যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কোনো একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত হয়েন তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানাদি ক্ষণকালের মধ্যেই লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং যাহারা নিতান্তই স্বাভাবিক নীচপ্রবৃত্তির অধীন লইয়া স্বেচ্ছাচারে রত থাকিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া মানিতেছে, পরলোক ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহাদিগের অপবিত্র চিত্তক্ষেত্রে অকস্মাৎ জ্ঞান-বীজ বপন করিলে তাহাও কি কখনো অঙ্কুরিত হইতে পারে? অতএব পরম কারুণিক-বেদ জীবের হিত-বিধান করিতে প্রথমতঃ মহায়াস পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম বিধান করিয়াছেন, ঐ সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে জীবের দেহাত্মমতি ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, ক্রমেই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব-বোধ প্রবল হইয়া পরলোকে সমধিক সুখ লাভের প্রত্যাশা জন্মিয়া নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই নিযুক্ত থাকে, এবং পারলৌকিক নরক যন্ত্রণা ভয়ে ভীত হইয়া কখনই অসৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না, ক্রমে ক্রমে কাম, ক্রোধাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকল অভিভূত হইতে থাকে, যতই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির শৈথিল্য হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বর্দ্ধমানা হয় ততই জীবের মন নির্ম্মলাদর্শ-তলবৎ অতি স্বচ্ছ ও পবিত্র হইয়া উঠে, এইরূপে যখন যে পরিমাণে জীবের চিত্ত পবিত্র হয়, তখন সেই পরিমাণে তাহাতে চেতনা-শক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিবেক ও বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইতে থাকে, ঐ জীব পূর্ব্বে যতদিন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

মাত্রের অধীন ছিল ততদিন দেহাতিরিক্ত যে, একজন অজর, অমর, আত্মা আছেন তাহা কখনই বিবেচনা করিত না, এবং দেহাতিরিক্ত আত্মবোধের কোনো প্রয়োজনও ছিল না, কেবল পুত্র-মিত্র-কলত্র-ধনজন-জনিত সাংসারিক সুখেই নিমগ্ন ছিল, তদতিরিক্ত স্বর্গীয় কোনো সুখের প্রত্যাশাই করিত না, পরে ঐ সকল বিহিত কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন নিশ্চিত হইল, যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এবং তিনি পরকালে এমত স্বর্গীয় পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে সাংসারিক বিবিধ দুঃখাক্রান্ত বিষয়জন্যানন্দ আনন্দ মধ্যেই গণ্য হয় না, তখন ঐ জীব ক্রমে বৈষয়িক-আনন্দে বিতৃষ্ণ হইয়া স্বর্গীয় সমধিকানন্দ লাভ করিতেই যত্ন করিতে থাকে, সুতরাং স্বর্গীয় আনন্দ লাভের হেতুভূত বৈদিক কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ও মঙ্গলময় প্রতীয়মান হয়। তৎপরে ঐ সকল কাম্য-কর্ম্ম-জন্য পুণ্য-ফলে স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে ভুক্তবৈরাগ্য প্রাদুর্ভাবে ক্ষয়াতিশয়-দোষগ্রস্ত দুঃখ-সংস্রব দূষিত স্বর্গীয় সুখেও আর সুতৃপ্ত থাকে না, একেবারে সকল দুঃখ সংস্রব-রহিত নিত্য নিরতিশয়ানন্দ লাভ করিতে ব্যগ্রচিত্ত হয়, সুতরাং যখন যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তখন সেই কর্ম্মই অনায়াসে নিষ্কামরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে, কোনো কর্ম্ম করিতেই তাহার মন আর কামনার অধীন হয় না, যখন কামনা-শূন্য হইয়া বৈধকর্ম্ম করিতে করিতে মনের কামাদি দোষ একেবারে দূর হইয়া যায় তখন পরাৎপর পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতিবৃত্তির আতিশয্য হওয়াতে জীব নিয়তই শ্রীশ্রীজগদীশ্বরোপাসনা করিতে নিযুক্ত হইয়া ভজনানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে, এইরূপে সেব্য সেবকভাবে ঈশ্বরাধনা করিতে করিতে ঐ ঈশ্বর প্রবণচিত্ত রজস্ত-মোভিভূত হইয়া সত্ব সমুদ্রেক হইলে বিশেষ রূপে বিবেক-শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলেই ঐ বিবেকী জীব স্বীয় যথার্থ স্বরূপ কি তাহা জানিতে ও নিরতিশয়ানন্দ লাভের উপায়ান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালীন তাহাকে জ্ঞানোপদেশ করিলে সেই জ্ঞান দ্বারা মূলাজ্ঞানের সহিত আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ-ফল প্রসূত হয়, তদ্ভিন্ন কামাসক্ত বিষয়-লম্পট স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি-কলুষিত-চিত্তে বহু যত্নে জ্ঞান-বীজ বপন করিলেও তাহার অমৃতময় ফলের পরিবর্ত্তে কেবল বিষফল মাত্র লাভ হয়, অতএব হে প্রিয়তম! এই অভি-প্রায়েই বেদে কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্যরূপে কথিত হইয়া জ্ঞানকাণ্ড অতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে কালক্ষেপ করিতে পারিলেই চরমে জ্ঞানলাভ করিয়া পরম শিবলাভ করিতে পারা যায় তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

পুত্র। প্রশ্ন॥ হে পিতঃ! যদি কাম, ক্রোধাদি স্বাভাবিক বৃত্তি সকলই আমাদিগের নিরতিশয়ানন্দ লাভের প্রতিবন্ধক হইল, এবং ঐ সকল বৃত্তি বিধ্বংস না হইলে কোনোমতেই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তবে জীব কিরূপে সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চরমে পরম-শিব লাভ করিতে পারে? জগদীশ্বর প্রাণি মাত্রকেই কামাদি-বৃত্তি বন্ধনে এমত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যে, ক্ষণকালের জন্যও ঐ বন্ধের বিশ্লেষ হয় না, হইবার কোনো কিছু উপায়ও নাই, যেহেতু বিশ্বধাতা যেমত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, চতুর্বিধ প্রাণির সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগকে কামাদি পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, তদ্রূপ ক্ষিতি, সলিল, অনল, অনিল, গগণাত্মক পঞ্চমহাভূত ও তৎকার্য্য ভৌতিক-প্রপঞ্চ-জাত সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেও ঐ সকল প্রাণির উপভোগ্যরূপে সম্বদ্ধ ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, ফলতঃ বিশ্বপতির বিশ্বসৃষ্টিক্রম ও সংস্থিতি নিয়মানুসারে এই বিশ্ব মধ্যে কি চেতন কি অচেতন সকল বস্তুই পরস্পর এমত এক অভেদ্য সম্বন্ধে

সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, যে, তাহার কিছু মাত্র অন্যথা হওনের সম্ভাবনা নাই। জীব মাত্রেই যখন কোনো সুরূপ বস্তু সন্দর্শন করে তৎক্ষণাৎ মনো-নয়নের পরস্পর সংযোগে অকস্মাৎ কামনার সঞ্চার হয়, কামনা-সঞ্চার হইলেই জীবকে ঐ বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি নিমিত্তক সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, যেমত সুরূপ বস্তু দর্শনে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিরূপ বস্তু সংযোগে তদ্বিপরীতে বিদ্বেষও উপস্থিত হইয়া থাকে, এইরূপে সুশ্রাব্য-শব্দ, সুগন্ধি পুষ্পাদি, সুরস অন্ন, সুস্পর্শ বস্তু, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হইলেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়যোগে মনে কামাদি সঞ্চার হইয়া পূর্ব্ববৎ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অতএব হে গুরো! আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত যিনিই হউন, কোনোমতেই তাঁহার দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ দূর হইবে না, দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ থাকিলেই, যে, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ ঘটিয়া কামাদি বৃত্তির উদ্ভব হইবে, তাহাতেও কোনো সংশয় নাই, দেহেন্দ্রিয় মনোরহিত হইয়া যে আত্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন এমতও বোধ হয় না, বরং যেমত অন্ধব্যক্তি এই পরম রমণীয় বিশ্বমন্দিরের মনোহর রূপ সন্দর্শন করিতে পারে না, বধিরপুরুষ সুশ্রাব্য সঙ্গীত রসাস্বাদে অক্ষম হয়, ঘ্রাণহীন পুরুষ সুগন্ধ পুষ্পনিচয়ের আঘ্রাণ গ্রহণে অযোগ্য হয়, তদ্রূপ ঘটনাই ঘটিতে পারে। যদিও আত্মা কোনো উপায়ে একেবারেই দেহেন্দ্রিয় মনোরহিত হইতে পারেন, হউন, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে জড়ভরতের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানোদয় হওয়া দূরে থাকুক, কোনো একটি যৎসামান্য বিষয় জ্ঞানোদয়েরো সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যখন বিষয়েন্দ্রিয় মনোদেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিলেই কামাদি বৃত্তির উৎপত্তি হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার সম্বন্ধও অপরিহার্য্য, পরিহার্য্য হইলেও ইন্দ্রিয়াদি রহিত কেবল আত্মস্বরূপে কোনো প্রকারে জ্ঞানেরই উদয় হইতে পারে না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনাও নাই, প্রত্যুত বিশ্বপতি যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতেও জীবের কতগুলি প্রিয়, কতগুলি অপ্রিয় বস্তু সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহারাও বিলুপ্ত হইবে না, অথচ প্রিয় সন্নিকর্ষে কামনা, অপ্রিয় সংযোগে বিদ্বেষ উপস্থিত হওয়া জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, স্বভাবের অন্যথাচরণ করিয়া জগদীশ্বরীয় নিয়মোল্লঙ্ঘন করিতেও জীবের সামর্থ্য নাই, তবে কিরূপে এমত প্রত্যাশা করা যায়, যে, জীব এই সংসারে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী হইবে?

পিতা। উত্তর॥ হে প্রাণাধিক প্রিয় শিশো! যে অপরিসীম-মহিম-পুরুষের অচিন্ত্য-রচনা-কৌশল-নিষ্পাদিত নিয়মানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডল নিয়মিতরূপে সঞ্চরণ করিতেছে, কখনই উহাদিগের স্থিতি গতি প্রভৃতির কোনো অন্যথা হয় না, যে অঘটন-ঘটনা-চারুচতুর-চেতন-পুরুষের চেতনা-শক্তিপ্রভাবে অচেতন ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, গগন, পরস্পর মহাবিরুদ্ধ-স্বভাব হইয়াও একত্র থাকিয়া চেতনের ন্যায় সামঞ্জস্যরূপে চিত্র-বিচিত্র কার্য্যরাশি প্রসব করিতেছে, সেই স্থিরসঙ্কল্প মহাপুরুষের সঙ্কল্পিত বিষয় কখনই অন্যথা হয় না। কি চেতন, কি অচেতন, কেহই তাঁহার কোনো একটি নিয়মেরো অণুমাত্র অন্যথা করিতে পারে না, তিনি যদি আমাদিগকে কামাদি-বৃত্তি-বন্ধনে পশুবৎ বন্ধন করিয়া রাখিতেন, অথবা তাঁহার নির্ম্মিত এই বিশ্বই আমাদিগের বাস্তবিক বন্ধনের কারণ হইত, তবে কখনই আমরা নিরতিশয়ানন্দ লাভের অধিকারি হইতাম না, বিশ্ববিধাতা এমত এক অনির্ব্বচনীয় কৌশলে বিশ্ববিধান করিয়াছেন, যে, আমাদিগকে পদে পদে বিপদের পদে পতিত হইয়া অশেষবিধ দুঃখভোগ করিতে হইলেও তাঁহার অথবা তাঁহার নিরূপিত কোনো নিয়মের প্রতি দোষারোপ

করা যায় না, বস্তুতঃ তাঁহার নির্ম্মিত সকল বস্তুই আমাদিগের অপরিমিত হিত-বিধান করণের উপযুক্ত-রূপে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিয়ম ও অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে পারিলে কখনই কোনো-রূপ দুঃখের গ্রাসে পতিত হইতে হয় না। সকল অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত-বৎ পরমানন্দে কাল হরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা অল্পজ্ঞতা-প্রযুক্ত ঐ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অপরিসীম-জ্ঞানশক্তি-সম্পাদিত-সূক্ষ্মাভিপ্রায় নিরূপণে অক্ষম হইয়া সুখময়-সংসারে অশেষ দুঃখভোগ করিয়াই থাকি। হে প্রিয় দর্শন! তুমি কি নিশ্চয় করিয়াছ, যে, যেমত কোনো পশুস্বামী কতকগুলি পশুকে একত্র বন্ধন করিয়া তৃণাদি ভোজ্য-বস্তু সমর্পণ করিয়াই পশুপতি নামে খ্যাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগদীশ্বরও আমাদিগকে মহামোহস্তম্ভে কামাদি-বৃত্তি-পাশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া কতকগুলি উপভোগ্য প্রিয়া-প্রিয়-বস্তু সমর্পণ করিয়াই জগৎপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন? তাহা নহে, বিবেচনা করিয়া দেখ জগদীশ্বর জগতীপুরে যত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে কোনো একটি বস্তুকেও প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, যেহেতু তোমরা তাহাকেই প্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ কর, যে বস্তু তোমাদিগের হিত-বিধান করে, সেই বস্তুই অপ্রিয়, যাহাতে তোমাদিগের কোনো অহিত ঘটনা হয়। যদি হিতজনক বস্তুই প্রিয় ও অহিত জনক বস্তুই অপ্রিয় হইল, তবে ঈশসৃষ্ট দুগ্ধ একটি বস্তু, যাহাকে তুমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছ, যাহার অভাবে তোমার অশক্ত-কোমল-শরীর ক্ষণকালমাত্র সজীব থাকিত না, যে বস্তুকে তুমি সর্ব্ব প্রথমেই মদীয় ও প্রিয় বলিয়া গণ্য করিয়াছ, যাহা দর্শনমাত্রেই তোমার মনে কামনার সঞ্চার হয়, দ্বিতীয় বস্তু, বিষ, যাহা তোমার নিতান্তই অপ্রিয়, যাহাকে দেখিলেই তোমার বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, যাহার সহিত সংস্রব হইলে ক্ষণকাল মধ্যে তোমার শরীর বিবর্ণ ও অবশ হইয়া জীবশূন্য হইবার সম্ভাবনা, এই দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু যথার্থ বিচারে ঈশ্বর-কর্ত্তৃক তোমার হিত-বিধান করিতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে বিবেচনা করিতে হইবে, যদি দৈবাৎ কোনো সময়ে তোমাকে জ্বর-বিকারাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু-দশাপন্ন হইতে হয় তখন ঐ দুগ্ধ, যাহাকে তুমি মহাহিতকর ও অমৃত বলিয়া প্রিয়রূপে-বোধ করিতেছ তাহা পান করিবামাত্র তোমার শরীরের সহিত জীবের বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ঐ বিষ, যাহাকে তুমি চিরকাল অপ্রিয় বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষ করিতেছ, তাহাকেই ঔষধস্বরূপে পান করিলে অনায়াসে প্রাণনাশক ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ সবল ও স্বচ্ছন্দ-শরীরে-সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। যদি বিবেচনা কর, যে দুগ্ধ তোমার নিয়ত হিত-বিধান করে কদাচিৎ কোনো সময়ে অহিত করিলেও তাহাকে অনিষ্টকর বা অপ্রিয় বলা যায় না, বিষ নিয়তই অহিত করিয়া থাকে, কদাচিৎ হিত-বিধান করিলেও তাহাকে হিতকর বা প্রিয় বলিয়া গণ্য করা যায় না, তাহা হইলে যদি দুগ্ধ তোমাকে প্রতিপালন করিয়াই প্রিয়-পদবাচ্য হইল, তবে বিষও বিষ-কীট নামক জন্তু বিশেষকে প্রতিপালন করিয়া কি জন্য প্রিয়-নির্দ্দেশের যোগ্য না হইবে? অতএব পরমেশ্বর কোনো বস্তুকেই প্রিয় অথবা অপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই, তাঁহার নির্ম্মিত সকল বস্তুই একরূপ সমভাবে শোভা বিকাশ করিতেছে, মনুষ্যের মনঃকল্পিত বিবিধ বৃত্তি দ্বারা উহারা সময়, অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে প্রিয়, অপ্রিয়, বা উপেক্ষ্য হইয়া থাকে, কেহ কোনো একটি বস্তু দর্শন করিয়া পরম-প্রীতি লাভ করে, কেহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে, কেহ বা তৃণাদি-বৎ উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া যায়, কিন্তু যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোনো বস্তু প্রিয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইত, তবে সেই বস্তু কখনই কাহারো

অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য হইত না। হে প্রিয়! যেমত পরমেশ্বর প্রিয়াপ্রিয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোনো বস্তুরি সৃষ্টি করেন নাই, তদ্রূপ তাঁহার নির্ম্মিত এই মনোহর বিশ্বও আমারদিগের বন্ধের কারণ নহে, আমরা ঈশ্বর-সৃষ্ট-দৃশ্য-বিশ্বের অপেক্ষা না করিয়া মনোময়-বিশ্ব-দ্বারাই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, যদি বিশ্বেশ-বিনির্ম্মিত বাহ্যবস্তু রাশিই আমাদিগের বন্ধের কারণ হইত, বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার করিতে না পারিতাম, তবে আমাদিগের স্বপ্নাবস্থাতে সুখ দুঃখ সম্ভোগের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, যেহেতু স্বপ্নাবস্থাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ নিশ্চেষ্ট হইয়াই থাকে, তাহারা অতি সন্নিকৃষ্ট স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয় না, চক্ষুর্নিকটে নানাবিধ সুরূপ বস্তু উপস্থিত হইলেও দৃষ্টিগোচর হয় না, কর্ণের নিকটে বিবিধ ধ্বনি ধ্বনিত হইলেও তাহা শ্রুতিগোচর হইতে পারে না, এইরূপে দশ ইন্দ্রিয়ই তৎকালে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে অসমর্থ হয়, কোনো বাহ্যবস্তুও নিকটে থাকে না, অথচ স্বপ্নাবস্থাপন্ন জীব কখনো কামিনী-সম্ভোগ-জন্যানন্দ লাভ করিতেছে, কিন্তু কামিনীর সহিত কোনো ইন্দ্রিয় সম্বন্ধই নাই, কামিনী বিদ্যমানো নাই, কখনো বা সর্প-দংশন-জন্য যাতনা-ভোগ করিয়া চীৎকার করিতেছে, অথচ সর্পের সহিত কোনো সম্বন্ধই নাই, সর্পও বর্ত্তমান নাই, কেবল এক মাত্র মন ও মনোময় সংস্কার বর্ত্তমান থাকাতেই জাগ্রদবস্থার তুল্যরূপে স্বপ্নেও সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব জীবের মনঃকল্পিত মনোময় সংসারই সুখ দুঃখ ভোগের কারণ হইয়াছে। হে প্রিয়! যদি তোমার এমত বোধ হয়, যে, যদিও জীব স্বপ্নাবস্থাতে বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই বৈষয়িক সুখ দুঃখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়, হউক, তথাপি তৎকালে বাহ্যবস্তু বা ইন্দ্রিয় সমূহের একেবারে অভাব হইয়া যায় এমত নহে, তাহারা সকলেই বিদ্যমান থাকে, বরং জীব জাগ্রদবস্থায় যে সকল বিষয় সম্ভোগ করিয়াছে তজ্জন্য সংস্কার-রাশি প্রচ্ছন্ন-ভাবে জীবের মনে থাকাতেই স্বপ্নে মনোময় ইন্দ্রিয় ও সংসার সমুৎপন্ন লইয়া সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে মনোময় সংসারকে বন্ধের প্রতি-কারণ না বলিয়া বাহ্যবস্তু সমূহকেই বন্ধের প্রতি-কারণ বলিতে হইবে, তাহা নহে,—যদি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হইয়া বাহ্যবস্তু বিদ্যমান থাকিলেই মনোনিষ্ঠ-বিলীন-সংস্কার-দ্বারা স্বপ্নে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হইত, তবে যেমত সংস্কার বশতঃ জাগ্রদবস্থাতে কোনো পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বপ্নেও সকল বস্তুর স্মৃতিই হইতে পারিত, কোনোমতেই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার হইত না, বিশেষতঃ যখন জীব সুষুপ্তি কালে প্রগাঢ় নিদ্রার বশীভূত, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হয়, তখনও মনোনিষ্ঠ সংস্কারের সহিত বাহ্যবস্তু বিদ্যমান থাকে, কোনো বস্তুরি একেবারে অত্যন্তাভাব হয় না, সুতরাং সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থাতেও সুখ দুঃখ সম্ভোগ হওনের কোনো বাধা ছিল না, অথচ তাহা কখনই হয় না, অতএব মনোময়-জগৎকেই সুখ দুঃখ সম্ভোগের প্রতি-কারণ বলিতে হইল, যাহার অভাবে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থাতে সুখ দুঃখানুভব হয় না, ও যাহার বিদ্যমানতাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে সমানরূপে সুখ দুঃখ বোধ হইয়া থাকে। হে পুত্র! এই স্থলে তোমার এমত তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, যে, স্বপ্নাবস্থাতে বাহ্যবস্তু নিকটে না থাকাতে মনোময় বস্তুর দ্বারাই বিষয়-ভোগ হয়, হউক, কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে বাহ্যবস্তু ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্যমান থাকাতে সে স্থলে কোনো-মতেই মনোময় জগৎ সুখ দুঃখ ভোগের কারণ হইতে পারে না, তাহাও নহে, যদি জাগ্রদবস্থাতে মনোময় জগৎকেই বন্ধের প্রতি-কারণ না বলা যায় তাহা হইলে মনোরাজ্য-কালে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে না, যেহেতু তৎকালে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ থাকে না, অথচ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জনিত-সুখ-ভোগ হইয়া থাকে, মনোরাজ্য ব্যতীত অন্য সময়েও কোনো ইন্দ্রিয়ের

সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগ হইলেই, মন সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়, যে পর্য্যন্ত পুরুষের অন্ত-মনস্কতা প্রযুক্ত মন, বিষয়াকারে পরিণত না হয়, ততক্ষণ শতবার বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হইলেও সুখ দুঃখানুভব হয় না, বিশেষতঃ যদি সুখ দুঃখ ভোগের প্রতি মনোময় জগৎকে কারণ না বলিয়া ঈশ-সৃষ্ট বাহ্যবস্তুকেই কারণ বলা যায়, তাহা হইলে যখন কোনো পুরুষের প্রিয়তম পুত্র বিদেশে দেহান্তরিত হয়, তৎক্ষণাৎ পিতার পুত্রশোক উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু পুত্ররূপ বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার যে সম্বন্ধ ছিল তাহা পুত্র মরণের পরক্ষণেই লোপ হইয়াছে, সুতরাং ইষ্ট-বিয়োগ-জনিত শোক উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই হয় না, যেপর্য্যন্ত পিতার মনোময় পুত্র জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাহার শোকোদয়ের সম্ভাবনা নাই, যখন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া মনোময় পুত্রের নাশ হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ ঐ পিতা পুত্রশোকাকুল হইয়া হাহাকার করিতে থাকে, এবং যেমত মৃতপুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শোকাচ্ছন্ন হয় তদ্রূপ কোনো প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত বিশ্বাসি লোকের মুখে জীবিত পুত্রের মিথ্যা-মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলেও মনোময় পুত্রের বিনাশে শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকে, অথচ তাহার ঈশ্বর প্রদত্ত পুত্র স্বচ্ছন্দ-শরীরে জীবিত আছে, তাহার সহিত পিতার যে সম্বন্ধ ছিল তাহাও পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধের কিছুই অন্যথা হয় নাই, অতএব মনোময় বিশ্বই যে জীবের সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের অগ্রগণ্য কারণ তাহাতে আর কোনো সংশয় করা যাইতে পারে না। হে প্রিয়তম! যখন নিশ্চিত হইল, যে, পরমেশ্বর কোনো বস্তুই প্রিয় বা অপ্রিয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই, তখন প্রিয়বস্তু সংযোগ হইলেই আমাদিগের কামনার উদয় হয়, ও অপ্রিয় বস্তু সংযোগে ক্রোধের উদয় হয় বলিয়াই, যে, তিনি আমাদিগকে কামাদি-বৃত্তি প্রদান ও বিবিধ কাম্যবস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কখনই নহে, ফলত অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত এই সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য্য সহজে কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, এই সুপবিত্র দোষহীন নির্ম্মল সৃষ্টি যে তাঁহারি সৃষ্টি তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই, কিন্তু আমরা যে, কামাদি-পাশে বদ্ধ হইয়া অনবরত দুঃখভোগ করি, তাহা কদাচই তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তিনি যে অভিপ্রায়ে যে বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন ও যে সকল শুভ-কার্য্যোদ্দেশে আমাদিগকে কামাদি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যদি আমরা সেই নিয়মানুসারে বিষয় ব্যবস্থা ও মনোবৃত্তি চালনা করিতে পারি, তবে আমাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না, কখনই কোনো দুঃখ বা অভাবগ্রস্ত হইতে হয় না, দেখ, তিনি জীবের উপভোগ্য বিবিধ-সামগ্রী সঞ্চয় ও শত্রু হইতে রক্ষার উদ্দেশে অস্ত্রশস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় নিশ্চয় করিয়া জীবের রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অস্ত্র ও ক্রোধাদি বৃত্তির চালনা করেন, তাঁহারা ইহলোকে যশস্বি ও পরম সুখি হইয়া পরকালেও ঐ পুণ্য-জন্য স্বর্গ-সুখ-ভোগ করিয়া থাকেন, যাহারা তদ্বিপরীতে কোনো জীবের নাশাভিপ্রায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ অস্ত্রাদি চালনা করে, তাহারা যে, কেবল ইহকালেই নিন্দনীয় ও অশেষ কষ্টভোগ করে এমত নহে, পরকালেও তাহাদিগকে দুঃসহ নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়, যেমত এক বৃহদ্দল দস্যু কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন ও প্রাণনাশের উদ্দেশে তদীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া কোনো এক ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিলে তাহারা সকলেই মহাপরাধি, পাপিষ্ঠ, নিন্দনীয় ও রাজদণ্ড এবং ধর্ম্মদণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ ধনপতির কোনো একটি দ্বাররক্ষক প্রভুভক্ত-ভৃত্য, স্বীয় বিপন্ন-প্রভুর ধন প্রাণ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ দস্যু-দলের বহুসংখ্যক প্রাণি-নাশ করিয়াও ইহলোকে পরমধার্ম্মিক বলিয়া প্রশংসনীয় হয়, ও অনেকের প্রাণ নাশ করিয়াও রাজদণ্ডের যোগ্য না হইয়া বরং রাজদ্বার হইতে মহাপ্রসাদ ও

পুরস্কার লাভ করে, এবং ঐ পুণ্যফলে পরলোকে স্বর্গীয় পরমানন্দ-ভোগ করিয়া থাকে, তাহার তাৎকালিক হিংসা দ্বেষ ক্রোধ নর-হত্যাদি সকল দুষ্ক্রিয়াই সৎক্রিয়া মধ্যে গণ্য হইয়া যায়, কথনই ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া-জন্য দুঃখ-ভোগ করিতে হয় না, এইরূপে যে কোনো মহাত্মা-পুরুষ প্রত্যেক বিষয়ে পরমেশ্বরাভিপ্রায়ানুসারে মনোবৃত্তি চালনা করিয়া বিষয় ব্যবহার করিতে পারেন তাঁহার সুখের সীমা কি? বা তাঁহার সুখের বর্ণনা কে করিতে পারে? তিনি অতি জীর্ণ পর্ণকুটীরে কিম্বা সুবর্ণমণ্ডিত মন্দিরে যেখানে যখন বাস করেন, সেইখানেই বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ত্রিবিধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। হে পুত্র! কামাদি বৃত্তি সমূহ তাহাদিগের পক্ষেই বন্ধনের কারণ হয়, যাহারা অজ্ঞানোন্মত্ততা-প্রযুক্ত পরমেশ্বরাভিপ্রায় নিশ্চয় না করিয়া তাঁহার অনভিপ্রেত বিষয়ে ঐ শুভকরীবৃত্তির চালনা করিয়া সুখের বিনিময়ে নিরর্থক দুঃখভোগ করে। পরমেশ্বর আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত দুঃখের সৃষ্টি করেন নাই, কেবল আমরা যে আগন্তুক দুঃখের ভয়ে দুঃখজনক অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া নিয়ত সুখ-সাধনীয় সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিব এই অভিপ্রায়েই তিনি দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি এই বিশ্ব-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বস্তুকেই বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত ও বিচিত্র শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সকল বস্তুতেই সেই আনন্দময়ের স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অবিনাশি-সত্তা দ্বারাই এই বিশ্ব সদ্বৎ প্রতীত হইতেছে, তদীয় অপ্রতিহত-প্রতিভা দ্বারাই এই জগৎ প্রতিভাত হইয়া শোভা বিকাশ করিতেছে, সুতরাং আমরা যখন যেরূপ আনন্দ ভোগের অধিকারি হইতে পারি তখন তাহাই আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার স্বরূপানন্দ যাহাকে নিরতশয় ব্রহ্মানন্দ বলা যায়, তাহা দূরে গোপন করিয়া রাখেন নাই, আমাদিগের অতি নিকটেই বিদ্যমান আছে, ঐ আনন্দভোগের উপযুক্ত সাধন সঞ্চয় করিয়া অনুসন্ধান করিলে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে, এই জগতে উপযুক্ত সাধন সঞ্চয় না করিয়া কোনো প্রকার আনন্দ ভোগের প্রত্যাশা করিলেই তাহাকে নৈরাশ্য ও অভাবের হস্তে পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, যদি সকলেই স্ব স্ব অবস্থা ও সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া স্ব-সঞ্চিত সাধনানুসারে সুখভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকে তাহা হইলে কখনই দুঃখ-ভোগ করিতে হয় না, তাহা না করিয়া যাহারা অগ্রে সোপান নির্ম্মাণ করিবে না, অথচ অতি উচ্চানন্দ লাভের প্রত্যাশায় উচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে ব্যগ্র হইবে, সুতরাং তাহারদিগের অধঃপতন ব্যতীত কি অন্য কোনো ফললাভ হইতে পারে? যদিও জগদীশ্বর এই জগতে উচ্চ বা নীচরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোনো বস্তুরই সৃষ্টি করেন নাই, উচ্চ নীচ ব্যবহার আপেক্ষিক ও মনুষ্য মনঃকল্পিতমাত্র, অর্থাৎ সকল বস্তুই কোনো এক বস্তুর অপেক্ষায় উচ্চ হইয়া অন্য বস্তুর অপেক্ষায় নীচ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, ঐ ব্যবহার ও নিয়মো একরূপ নহে, যে ব্যক্তির যেমত রুচি সেই ব্যক্তি স্বীয় রুচির অনুসারেই উচ্চ নীচ ব্যবহার করিয়া থাকে, তথাপি যে সুখে যে পরিমাণে দুঃখ সংস্রবের অল্পতা আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে উচ্চ বলা গিয়া থাকে, সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে ইহা অতি আবশ্যক, যে, যে পর্য্যন্ত কোনো উচ্চানন্দ ভোগের উপযুক্ত সামগ্রী সঞ্চয় করিতে না পারে, ততক্ষণ স্বীয় বর্ত্তমানাবস্থাতে সর্ব্বোতোভাবে পরিতৃপ্ত থাকিয়া চেষ্টা করিতে থাকে, তাহা হইলে সাধন-সামগ্রীর উন্নতি সহকারে কামাদি বৃত্তির ক্রমোন্নতি হইয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, আনন্দ ভোগ করিয়া পরিশেষে একেবারে সকল দুঃখ সংস্রব-রহিত নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারে, নচেৎ সাধন বিরহে

স্বীয় বর্ত্তমানাবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উচ্চানন্দ সম্ভোগের প্রত্যাশা করিলেই "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়, অতএব হে প্রিয়তম! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, জগদীশ্বর, যে, আমাদিগকে কামাদি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সকল বৃত্তি ক্রমেই উন্নত হইয়া থাকে, ইহাতেই আমরা তাঁহার স্বরূপনান্দ লাভের যোগ্য হইয়াছি, উহারা কেহই আমারদিগের কল্যাণপথের প্রতিবন্ধক নহে, বরং আমাদিগের মনে কামাদি বৃত্তির সঞ্চার হইয়া ক্রমোন্নতি না হইলে আমরা কখনই পরমেশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার অভিপ্রেতরূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিতাম না, সুতরাং নিরতিশয়ানন্দ লাভ দূরে থাকুক্ কেবল নিরানন্দেই কাল হরণ করিতাম।

পুত্র। প্রশ্ন।

পদ্য।

জগদীশ করিলেন, জগৎ সৃজন।
যত কিছু বস্তু সব, সুখের কারণ॥
"সুখময়" যিনি, তাঁর, কার্য্য সুখময়।
সুখের বিষয়ে কভু, দুঃখ নাহি রয়॥
এতদিন স্থিরতর, ছিল অনুভব।
সুখের সংসারে এসে, সুখী হোয়ে রব॥
তাত-তাত, কারো ভাগ্যে, কখনো না হয়
ব্যবহারে পেয়েছি, বিশেষ পরিচয়॥
সংসারেতে কিছু নাই, সুখের ব্যাপার।
দুখের আধার সব, দুখের আধার॥
সুখ সুখ, এই কথা, সকলেই কয়।
দুখের আগারে, বল সুখ কোথা রয়?॥
কোন্ বস্তু ভোগ করি, কারে বলি সুখ?।
যাতেই সুখের ভোগ, তাতেই তো দুখ॥
ভাবিয়া ভবের ভাব, ভাবনা, যে, ভারি।
বিশেষ ব্যাপার কিছু, বুঝিতে না পারি॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, ঈশ্বরের মনে।
"নশ্বর" হইয়া আমি, জানিব কেমনে?॥
সুখেতে করেন্ কেন, দুখের বিধান?।
কেনই হাসান্ তিনি, কেনই কাঁদান?॥
সুখে দুখে, জড়িত, হইয়া এই ভব।
ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুখ, করিছে প্রসব॥
বরম্ দুখের ভাগ, অধিক প্রকার।
কাজেই সুখের ভাগ, করিনে স্বীকার॥
সুখের পরেতে দুখ, কত দুখময়।
ফুটিবার নয়, তাহা, ফুটিবার নয়॥
যে জানে, সে মনে জানে, মনে মোরে রয়।
বিষাদে বিশীর্ণ বপু, ব্যাকুল হৃদয়॥
উপদেশে, কর কর, করুণা প্রকাশ।
তাপভোগ. একেবারে, কিসে হয় নাশ?॥
কেবল অন্তরে হবে, সুখের উদয়।
দুখের মুখের গ্রাসে, না পড়িতে হয়॥

পিতা। উত্তর।

পদ্য।

ফুটে তবে বলি, যদি, ফুটাইলে মুখ।
কারে তুমি সুখ বল, কারে বল দুখ?॥
ওরে বাপু, মিছে হাপু, গুণ না কো আর।
যত কিছু জানো সব, সুখের ব্যাপার॥
ভ্রমে তুমি বলিতেছ, দুখ-দুখ-দুখ।
আমি বলি, দুখ নয়, সুখ-সুখ-সুখ॥
এই দুখ, দুখ নয়, সুখের আধার।
বিনা দুখে সুখ লাভ, কবে হয় কার?॥
এ জগতে না থাকিলে, দুখের প্রচার।
সুখের সম্মান তবে, কে করিত আর?॥
এই দেহ না, হইলে, অসুখের ধাম।
সুখভোগে, কে লইত, ঈশ্বরের নাম?॥
সুখে দুখে, যুক্ত দেহ, সেরূপ প্রকার।
প্রদীপের পশ্চাতে, যেরূপ অন্ধকার॥
সুখের যে, মর্ম্ম, তাহা, দুখেই প্রকাশ।
দুখেই শেষেতে হয়, দুখের বিনাশ॥
দুখভোগ হোলে আর, দুখ নাহি রয়।
বিষের ঔষধ বিষ, যে প্রকার হয়॥
জগতে দুখের সৃষ্টি, করিলেন যিনি।
ভেবে দেখ, কত্তবড়, জ্ঞানগুরু তিনি॥

দুখ-লাভে অভিলাষ, কেহ নাহি করে।
সুখের সম্ভোগ আশা, সকলেই ধরে॥
সেই সুখ সঞ্চয়ের, সদুপায় চাই।
বিনা কষ্টে, সহজেতে, কোথা তারে পাই?॥
বিনা সুখে নাহি হয়, দুখের সংহার।
কাজেই করিতে হয়, অন্বেষণ তার॥
বিদ্যা বিনা জ্ঞান লাভ, কখনো না হয়।
বিনা শ্রমে সেই বিদ্যা, কে করে সঞ্চয়?॥
সেই শ্রম সহকারে, কষ্ট-ভোগ কত।
কিন্তু তায়, কষ্ট যায়, জনমের মত॥
যে দুখেতে জ্ঞান পাই, শ্রমের কৃপায়।
এখানে কি, সে দুখেরে, দুঃখ বলা যায়?॥
বিদ্যার অভ্যাসে ক্লেশ, ক্লেশ কভু নয়।
একেবারে ক্লেশ শেষ লেশ নাহি রয়॥
মূঢ়তার অন্ধকার বিদ্যা করে নাশ।
এই হেতু বিদ্যা-লাভে, সবারি প্রয়াস॥
বিদ্যায় না হোতো যদি, দুঃখ নিবারণ।
বিদ্যায় না হোতো যদি, সুখের সাধন॥
বিদ্যালাভে অনুরাগি, কে হইত তবে?।
মূর্খ হোয়ে দুঃখ ভোগ, করিতই সবে॥
ন্যায়মত কার্য্য করি, অর্থ উপার্জ্জন।
বিনা দুখে, বিনা শ্রমে, কে পেয়েছে ধন?॥
বিনা ধনে সংসারেতে; কেবা পায় সুখ?।
ধনহীন জনে হয়, সবাই বিমুখ॥
দারা সুত, আদি করি, তুষ্ট নহে কেহ।
দুখি বোলে জ্ঞাতিগণে, নাহি করে স্নেহ॥
রীতিমত দুখভোগ, ধন উপার্জ্জনে।
সে দুখেরে, দুখ আমি, কহিব কেমনে?॥
বাপধন, দিয়ে মন, কর প্রণিধান।
আহার বিরহে দেহে, নাহি রয় প্রাণ॥
ধনী হও, দীন হও, যত দিন রবে।
আহারের আহরণ, করিতেই হবে॥
রন্ধনাদি আহরণে, কষ্ট কিছু বটে।
ভেবে দেখ শেষে তায়, কত সুখ ঘটে॥
সেই অন্ন যদি তুমি, না দেও উদরে।
কঠোর জঠর জ্বালা, বারণ কে করে?॥
সাধুভাবে সদালাপ, সুজনের কাছে।
অবশ্যই তথা যেতে, পথক্লেশ আছে॥
যদি তুমি, সেই ক্লেশ, না লও চরণে।
সাধুসঙ্গ-স্বর্গসুখ, পাইবে কেমনে?॥
নীতি, ইতিহাস-কাব্য, গ্রন্থ জ্ঞানময়।
এ সকল রচনায়, বহু কষ্ট হয়॥
চিন্তায় ব্যাকুল হোয়ে, দিবানিশি শ্রম।
নিদ্রা আর আহারের, থাকে না নিয়ম॥
কিন্তু সেই, গ্রন্থ-গুলি, প্রকাশিত হোলে।
কীর্ত্তির কুটীরে বাস, নাশ নাই মোলে॥
যতকাল, রবি-শশী, হইবে উদিত।
সজীব রহিবে তুমি, নামের সহিত॥
রচনার কালে বটে, নানামতে দুখ।
মনে কর, সাঙ্গ হোলে, সে সুখ, কি সুখ॥
শরীরে যখন হয়, রোগের সঞ্চার।
সে সময়ে কেন কর, ঔষধ ব্যাভার?॥
ঔষধ সেবন কর, এই উপদেশে।
খেলে পরে সুস্থ হোয়ে, সুখ পাবে শেষে॥
তখন ভেষজ বিনা, বাঁচিতে কে পারে?।
প্রাণের পীড়ন হয়, পীড়ার প্রহারে॥
দুখের না হোলে জন্ম, এ তিন ভুবনে।
সুখের প্রবৃত্তি তবে, হইত কেমনে?॥
সাধুকর্ম্মে, সুখ লাভ, নিশ্চয় জানিয়া।
সাধু হোয়ে করে জীব, যত সাধু ক্রিয়া॥
পাপকর্ম্মে পরীবাদ, ঘটে তাপ শোক।
সাবধান হোয়ে তায়, ক্ষান্ত পায় লোক॥
বিষয়েতে এই দুখ, হয়, দুপ্রকার।
"শ্রমাধীন" "কর্ম্মফল" দুই নাম তার॥
শ্রমাধীন দুখ যাহা, দুখ সে তো নয়।
পরিণামে অতিশয়, সুখকর হয়॥
ফলত সে সুখকর, সুকর্ম্ম সাধিলে।
সুখময়, নাহি হয়, কুকর্ম্ম করিলে
সুখ নষ্ট, কত কষ্ট, পরিশ্রম সার।
কুকর্ম্মের ফল পায়, অশেষ প্রকার॥
শ্রমাধীন দুখযোগে, সদা হিত কর।
হাতে হাতে ফল পাবে, অতি হিতকর॥
সুফল, কুফল, কিছু, না হয় বিফল।
যেরূপ করিবে কর্ম্ম, সেইরূপ ফল॥

সম্ভাবিত সুখকর, কার্য্য কর সুখে।
তাহাতে কখনো তুমি, পড়িবে না দুখে॥
অসম্ভব আশা হয়, দুখের কারণ।
সুখ-সহ, কিসে তার, হইবে মিলন?॥
অবস্থার দাস হোয়ে, বাস কর ভবে।
কিছুতেই তবে আর, অসুখ না হবে॥
কৃপানিধি, কৃপা-নিধি, করিবেন দান।
কোনো ধন বড় নহে, সুখের সমান॥
সেই সুখ, সেই দুখ, অধীন তোমার।
মনের ভিতরে থাকে, মনের ব্যাপার॥
মনেতে সন্তোষ যদি, স্বভাবে সঞ্চারে।
তার কাছে দুখ তবে, আসে কি প্রকারে?॥
দুখের কারণ যত, কর পরিহার।
কারণে না হয় যেন, কার্য্যের সঞ্চার॥
"কর্ম্ম" হোলে, কিছুতে, না, যায় যোগাযোগ।
হবেই হবেই হবে, ভুগিতে সে ভোগ॥
এ সুখের বাক্যে আর, নাহি প্রয়োজন।
"নিত্যসুখ" কারে বলে, করহ শ্রবণ॥
যে সুখের নাশ নাই, নিত্য বলি তারে।
অবিনাশি সেই সুখ, মনের আগারে॥
ওরে বাপ্, সে, যে, বড়, বিষম ব্যাপার।
সহজে সে সুখ লাভ, কবে হয় কার?॥
ত্রিতাপে তাপিত জীব, দুখি নিরন্তর।
সে সুখ কিরূপে হবে, তাদের গোচর?॥
সন্ধানেতে প্রাপ্ত হোয়ে, শান্তি-সরোবর।
যদ্যপি প্রবেশ করে, জলের ভিতর॥
তবেই ত্রিতাপ-জ্বালা, দূর তার হয়।
সন্তোষের সলিলেতে, তৃপ্ত হোয়ে রয়॥
বাস্তবিক, কে করিবে, বস্তুর নির্ণয়।
শাস্ত্রের সন্ধান বিনা, সন্ধান কি হয়?॥
শাস্ত্র পাঠে, গুরুমুখে, উপদেশ লও।
বস্তুতত্ত্ব তত্ত্ব পেয়ে, সুখী হোয়ে রও॥
যে, গুরুর, প্রথমেতে, উকার না আছে।
যেয়ো না, যেয়ো না, কভু, সে গুরুর কাছে॥
তারে তুমি গুরু বল, শাস্ত্রজ্ঞানী যেই।
শাস্ত্রতত্ত্ব-নেত্রহীন, গুরু নয় সেই॥
কি দিতে, কি দেবে শেষ, সঙ্গতি কি তার?।
হিতে হবে বিপরীত, একে হবে আর॥
দুখের মুখেতে যদি, না হবে পতন।
শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান তবে, কর আলোচন॥
সে তত্ত্বের তত্ত্ব নিতে, ভেব না কো দুখ।
চরমে পরমফল, অবিচ্ছেদে সুখ॥
পরীক্ষায় প্রাপ্ত হবে, প্রমাণ তাহার।
সুখ সুখ, দুখ দুখ, করিবে না আর॥
এখনি মনের ভ্রম, সব যাবে মিটে।
আগে বাপু 'তেতো' খেয়ে, শেষে খাও মিটে॥
সরু, মোটা, চাল্ ভেদে, চল ভাল চেলে।
পুলিপিটে, কোথা মিটে, শুক্তনী না খেলে॥

পুত্র। প্রশ্ন।

ত্রিপদী।

যে কথা কহিলে তাত, মানিলাম আমি তাত
দুখ বিনা সুখ নাহি হয়
এই দুখ না থাকিলে, ঈশ্বরের এই লীলে,
স্থিরভাবে কেমনেতে রয়?॥
ভুগিবে না কোন দুখ, কেবল লইতে সুখ,
শিবলোভি যত জীবগণ।
ঈশ্বরের আজ্ঞামত, নিয়মিত কার্য্য যত,
অবিরত করিছে সাধন॥
দোষ ক্ষমা কর পিতে, কিন্তু এই কিন্তু চিতে,
হয় হয় বাঁধার আঁধার।
শাস্ত্রজ্ঞানে দুখ যায়, সন্দেহ হোতেছে তায়,
কিসে তাহা করিব স্বীকার?॥
যে যার বিরোধী হয়, সেই তারে করে ক্ষয়,
জ্ঞানে হয়, অজ্ঞান সংহার।
বস্তুর করিবে ভেদ, দুখের হইবে ছেদ,
এপ্রকার শক্তি কোথা তার?॥
প্রকাশের শক্তি যার, প্রকাশে প্রকাশ তার,
অপ্রকাশ রাখে না কখন্।
তিমিরের অরি রবি, প্রকাশিয়ে স্বীয় ছবি,
করে শুধু তিমির হরণ্॥
প্রভাকর, প্রভাকর, স্বভাবেই মনোহর,
কারণ সে নিজে তেজোময়।
প্রকাশেই প্রকাশিত, সমুদয় সমুদিত,
বস্তুর বিনাশ নাহি হয়॥

শাস্ত্রবোধ-সুধাকরে, অজ্ঞান-তিমির হরে,
কোথা তায় সুখের সম্বন্ধ ?।
সুবাসেতে সুব্যাপিকা, বিনা-সুখশেফালিকা,
কে নাশিবে দুখের দুর্গন্ধ ?॥

পিতা। উত্তর।
পদ্য।

কথাগুলী, পাকা পাকা, কহিতেছ বাছা
এখনো তোমার দেখি, বুদ্ধিটুকু কাঁচা ॥
তুমি যাহা কহিতেছ, স্বীকার তা করি।
বটে বটে, এই জ্ঞান, অজ্ঞানের অরি ॥
কাজেই সে অজ্ঞানেরে, করিবে সংহার।
অন্য কিছু বিনাশের, শক্তি নাই তার॥
কিন্তু বাবা, কিন্তু যাবে, এখনি তোমার।
মনে মনে স্থির হোয়ে, করিলে বিচার॥
জ্ঞানেতে অজ্ঞান যায়, এ কথা তো মানো ?।
অথচ নিগূঢ় ভাব, কিছু নাহি জানো॥
শুনি, আমি, বল বল, সুমধুর-ভাষে।
"আধেয়" কোথায় থাকে, আধারের নাশে ?॥
যখন তপন করে, লপন প্রকাশ।
গোপন না রাখে আর, আপন আভাস॥
বিভাকরে, বিভা করে, হরে অন্ধকার।
তার সহ নাশ পায়, কার্য্য যত তার॥
সেরূপ, সে, জ্ঞান নিলে, অজ্ঞানেরে হোরে।
অজ্ঞানের কার্য্য যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মোরে॥
নিশ্চয় নিশ্চয়, বাপু, নিশ্চয় নিশ্চয়।
কারণ হইলে নাশ, কার্য্য নাহি রয়॥
অজ্ঞান আপনি প্রাণে, মরিবে যখন।
আর তার কার্য্যগুলি, রবে না তখন॥
সামান্য জ্ঞানের কর্ম্ম, কর দরশন।
প্রতিক্ষণ হয় তায়, ভ্রমের ভঞ্জন॥
এক বস্তু অন্যরূপে, বিলোকিত হয়।
তখনি জানিবে মনে, ভ্রমের উদয়॥
অজ্ঞানের সেই ভাব, যতক্ষণ থাকে।
ততক্ষণ সমভাবে, সেই ভ্রম রাখে॥
বোধোদয়ে সেই ভ্রম, নাহি থাকে আর।
স্বরূপে, বিরূপরূপে, না হয় বিকার॥
স্বরূপে, বিরূপ বোধে, বিপরীত করে।
ছায়া দেখে, ভূত ভেবে, ভয় পেয়ে মরে॥
স্বরূপে, স্বরূপ বোধ, হইলে উদয়
ছায়া দেখে, ভূত ভ্রমে, কেন পাবে ভয় ?॥
তার কাছে মায়া আর, কি করিবে মায়া ?।
ছায়ারে, সে, চোখে দেখে, যে ছায়া, সে ছায়া
স্বপনের সুখ দুখ, স্বপন সময়।
স্বপন ভাঙিলে আর, সে ভাব কি রয় ?॥
নাহি থাকে কল্পনার, শয্যা আদি ভূমি।
জাগরণে কেবা কোথা, যে তুমি, সে তুমি॥
অতএব প্রাণধন, শুন মন দিয়া।
তিনরূপ অবস্থার, দেখিতেছ ক্রিয়া॥
সাধারণ জ্ঞানযোগে, হও অবগত।
বিনাশ হতেছে কত, বস্তু শতশত॥
সামান্য জ্ঞানের কার্য্য, দেখিছ প্রচুর।
তত্ত্বজ্ঞান তার চেয়ে, বড় কত দূর ?॥
অজ্ঞানের কার্য্যে হয়, দুখের সম্ভোগ।
সে মরিলে কোথা রবে, দুঃখরূপ রোগ !॥
তত্ত্বজ্ঞানে সাংসারিক, দুঃখ দূর হয়।
ইথে কেন করিতেছ, এতই সংশয় !॥

পুত্র। প্রশ্ন।
পদ্য।

পাদপদ্মে প্রণিপাত, পেয়ে উপদেশ।
তত্ত্বজ্ঞান একেবারে, ক্লেশ হয় শেষ॥
কালক্রমে, সেই জ্ঞান, লাভ হয় যার।
সংসারের কোন দুখ, নাহি থাকে তার॥
সহজে যেরূপ তার, দেন পরিচয়।
সেরূপ সহজ, সে তো, কখনই নয়।
সকলেই সমভাবে, ভ্রমিতেছে ভবে।
কোন্‌কালে তত্ত্বজ্ঞান, কে পেয়েছে কবে ?॥
অতিশয় সুকঠিন, হবার যা নয়।
কেমনে তাহার লাভ, সম্ভাবনা হয় ?॥
বহু জন্ম-সঞ্চিত, পুণ্যের পরিপাকে।
মনের মন্দিরে যার, মলা নাহি থাকে॥
শম-দম সাধনাদি, হইয়া সঞ্চয়।
ধ্যান-ধারণায় যার, মন পায় লয়॥

সেই তো হইতে পারে, অধিকারী তার।
এই তো রয়েছে লেখা, শাস্ত্রে আপনার ॥
কতকালে পাব তাহা, নিরূপণ নাই।
তবে কেন তার লোভে, মিছে কষ্ট পাই ?॥
হবেই নিশ্চয় হবে, কে কহিতে পারে ?।
তবে কেন ক্রিয়া কাণ্ড, দিই ছারেখারে ?॥
কদাচই ক্রিয়া কাণ্ড, পণ্ড নাহি হয়।
ফলের সম্ভোগ তার, খণ্ডনীয় নয় ॥
কোথা তত্ত্ব, তার তত্ত্বে, কোথা আমি যাবো
ফলহীন পোড়া-গাছে, ফল কিসে পাবো ?॥
তত্ত্বভেবে, মত্ত হোয়ে, হইলে ব্যাকুল।
একূল ওকূল শেষ, হারাব দুকূল ॥
প্রতিকাল, করে কাল, পরমায়ু গ্রাস।
একাল কেমনে করি, বৃথায় বিনাশ ?॥
সঞ্চিতে বঞ্চিত হোয়ে, অসঞ্চিতে আশা।
সহজে কি করা যায়, এ বড় দুরাশা ॥
উপস্থিত শাক-অন্নে, ভরিবে উদর।
তাহা ছেড়ে কেন হই, ক্ষুধায় কাতর ?॥
কবে পাব পরমান্ন, স্থিরতা কি আছে ?।
শাক-অন্ন-না খেলে তো, প্রাণ নাহি বাঁচে ॥
শরীরে রয়েছে রোগ, এখন আমার।
এখনি করিতে হবে, ঔষধ আহার ॥
ঔষধ বিরহে প্রাণি, এখনিই মরে।
প্রতীকার কি হইবে, শতবর্ষ পরে ?॥
সুলভ সুসাধ্য যাহা, আছে এ ভুবনে।
তাতেই প্রবৃত্তি হয়, মানবের মনে ॥
সুগম সুযোগ-পথে, সকলেই চরে।
অসুলভ, অসাধ্যের, সাধনা কে করে ?॥
ঔষধ দেহের রোগ, করে প্রতীকার।
মানসের রোগ হয়, উপায়ে সংহার ॥
যখন যাহার যাহে, হয় প্রয়োজন।
তখনিই পেলে তাহা, ব্যাধি বিমোচন ॥
সে বিষয়, বড় নয়, বিশেষ ব্যাপার।
উপায় যখন আছে, ভাবনা কি তার !॥
লৌকিক উপায়ে যাহা, সহজেই হয়।
অলৌকিক, উপায়েতে, নাহি ফলোদয় ॥
পশু, কীট, নাগ, আদি, করিলে দংশন।
"আধিভৌতিকে"র তাপ ঘটিবে যখন ॥
তখন করিব তাহা, যা করিতে হয়।
সাবধান হোলে তার, ঘটনা কি হয় ! ॥
গ্রহাদি বিগুণ দোষে, যে তাপ ঘটায়।
"আধিদৈবিকে"র তাপ, তারে বলা যায় ॥
গ্রহযাগ, স্বস্ত্যয়ন, লৌকিক আচার।
মণিমন্ত্র, মহৌষধ, কত আছে তার ॥
এ সব উপায়ে হোলে, দুখের নিবৃত্তি।
তত্ত্বজ্ঞানে বল তবে, কে পাবে প্রবৃত্তি ?॥

পিতা। উত্তর।

ত্রিপদী।

বলি বলি, ওরে বাছা, কথা কও বাছা বাছা,
কাঁচা-কথা করিনে শ্রবণ।
প্রস্তাব করিছ যাহা, বালকে খণ্ডিবে তাহা,
এ কথা কি-কথার মতন ?॥
কর্ম্মই দুখের ভার, সম্ভাবনা কোথা তার,
সে করিবে দুখের দমন ?।
উপদেশ বাক্য ধর, ছি ছি বাবা, চুপ্ কর,
কারো কাছে বোলো না অমন ॥
ত্রিতাপ করিতে হত লৌকিক উপায় যত,
কিছু তার সদুপায় নয়।
তারে যে ক্ষণিক কই, চিরকাল থাকে কই,
একেবারে নষ্ট নাহি হয় ॥
এই এই, সেই সেই, সেই সেই, এই এই,
এই সেই প্রচুর প্রকার।
এই এই, সেই সেই, ছাড়াবার সাধ্য নেই,
এইরূপ অখিল সংসার ॥
এই সুখ, এই দুখ, এই দুখ, এই সুখ,
কিছুতেই নিবারণ নাই।
দুখের পরেতে সুখ, সুখের পরেতে দুখ,
চক্রবৎ ঘুরিছে সদাই ॥
যেমন বরষাকালে, জলদ জলদজালে,
নভো ঢাকে এক একবার।
এক একবার রবি, প্রকাশ করিয়া ছবি,
নাশ করে সেই অন্ধকার ॥
তোয়ধি-তরঙ্গভরে, সময়ে যেরূপ ধরে,
বৃদ্ধি, হ্রাস, জোয়ার, ভাঁটায়।

মায়ার-সাগর-নীরে সুখ দুখ ফিরে ফিরে,
সেইরূপ সংসার-দশায় ॥
লৌকিক উপায় করি, কোন্ প্রকরণ ধরি,
কোনো তাপ হোলে নিবারণ।
একেবারে কষ্ট যায়, নাহি আসে পুনরায়,
কোথায় করেছ দরশন ? ॥

ক্রিয়াধীন-সুখ যত, চপলা-খেলার মত,
বায়ুবৎ স্বভাব তাহার।
ক্ষণে মৃদু, ক্ষণে জোর, ক্ষণে চুপ, ক্ষণে শোর,
একরূপ নহে একবার ॥

ক্রিয়ার যেরূপ ধর্ম্ম, সেরূপ সে করে কর্ম্ম,
কর্ম্মেতেই মর্ম্ম তার রয়।
যে সুখের নাশ নাই, সে সুখ কি কর্ম্মে পাই,
বিনা জ্ঞানে পাইবার নয় ॥

লৌকিক উপায়ে ভবে, হবেই হবেই হবে,
কোনোরূপ তাপের খণ্ডন।
স্থির যদি জানিতাম, তর্ক কেন আনিতাম,
মানিতাম তোমার বচন ॥
ঔষধ এমন কই, নিশ্চয় করিয়া কই,
হবেই রোগের প্রতীকার।
প্রতীকার যদি হয়, চিরস্থায়ি তাহা নয়,
সে রোগ তো ঘটে পুনর্ব্বার ॥
কারো ভাগ্যে নহে হিত, হিত ঘুচে বিপরীত,
কিছুই না হয় উপকার।
অবসান, ম্রিয়মাণ, নিয়া প্রাণ, পড়ে টান,
একেবারে, একে করে আর ॥
ঔষধাদি প্রকরণ, গ্রহযাগ, স্বস্ত্যয়ন,
হোলে পরে চিরতাপহর।
দুখে কাল হরিত না, কেহ আর মরিত না,
সকলেই হইত অমর ॥
হইবার নহে যাহা, মিছে মিছি কেন তাহা,
বার বার কর আলোচন ?।
ত্রিতাপতিমির নাশ, করে যেই বোধভাস,
শুধু তার কর আলোচন ॥
প্রবোধের পেলে তাপ, সমূলে মরিবে তাপ,
কিছু আর যাতনা রবে না।
নিত্যসুখ, সুখে ভোগ, কোনোরূপ দুখরোগ,
পুনরায় হবে না হবে না ॥

পুত্র। প্রশ্ন।

গদ্য।

তোমার সন্তান আমি, তুমি হও "বাবা"।
তুমি যত, মনে ভাবো, তত নই "হাবা" ॥
যে আঁটির চারা এই, শরীর আমার।
আঁটির যে গুণ হবে, ফলেই প্রচার ॥
ফলে, ফলে পরিচয়, বিফল বিচার।
করুন্ করুণ হোয়ে, সংশয় সংহার ॥
এমন না দেখি, কিছু লৌকিক উপায়।
সংসারের যত দুখ, একেবারে যায় ॥
সুখের পরেতে দুখ, পুনরায় হয়।
নিশ্চয় বিনাশ হবে, কে করে নিশ্চয় ? ॥
এরূপে দুখের নাশ, না হয় না হয়।
প্রস্তাবেতে তবে আর, নাহি ফলোদয় ॥
ফলে গুরু, আমি লঘু, গুরু বোধ নাই।
শাস্ত্র পাঠে লঘু মনে, গুরু বোধ পাই ॥
বেদ, নন মিথ্যাবাদী, সত্য কথা কন।
কাজেই কাজের কথা, ব্যক্ত করে মন ॥
'অশ্বমেধ' 'বাজপেয়', 'রাজসূয়' আর।
যাগ-যজ্ঞ, কাম্যকর্ম্ম, অশেষ প্রকার ॥
যে করে এ সব ক্রিয়া, যায় স্বর্গপুর।
সমূলে নিশ্চয়রূপে, দুঃখ হয় দূর ॥
করিয়া এ সব ক্রিয়া, স্বর্গে যদি যাই।
তাপ তথা, তৃণবৎ, পুড়ে হবে ছাই ॥
না করিতে অভিলাষ, না চাহিতে হিত।
পরম আনন্দ হবে, নিজে উপস্থিত ॥
জীবের শিবের হেতু, ভেদ করি ক্রিয়া।
বলেছেন নিজে বেদ, 'মাথাদিব্য' দিয়া ॥
বেদের এ মত যদি, না করি ধারণ।
তবে কি বেদের মত, করিব গ্রহণ ? ॥
বিধির, এ বিধি, বেদে, দোষ নাহি রায়।
সমুদয় শুভময়, সহজ উপায় ॥
এই পথে সাধে হয়, জীবের প্রবৃত্তি ?।
বিনা দুখে, একেবারে, দুখের নিবৃত্তি ॥

পরীক্ষায়, যার গুণ, গোচর না হয়।
প্রমাণের যোগ্য সে তো, কখনই নয়॥
গুণ যার নাহি দেখি, মিছে তার নাম।
বিনা গুণে কেমনে, সে, হবে গুণগ্রাম॥
বেদ বিধি, ক্রিয়াকাণ্ড, অমল কমল।
মধুভরে বিকসিত, সদা ঢল ঢল॥
তত্বজ্ঞান কাঁটাময়, কেতকীর প্রায়।
'নামরূপ গন্ধ' শুধু, মধু নাই তায়॥
মধুমতী কমলিনী, করি পরিহার।
কোথা যাব, কোথা পাব, সে মধুর তার॥
এই ভয়, মনে হয়, তত্ব উপদেশে।
গন্ধে ভুলে, ধন্ধ দেখে, অন্ধ হব শেষে॥
সহস্র প্রণাম প্রভু, চরণে তোমার।
তত্বজ্ঞানে মতি যেন, না হয় আমার॥

পিতা। উত্তর।

ক্রিয়ায় নাশিতে চাও, ক্রিয়াফল-তাপ।
ভাল কথা বলিয়াছ, 'ভ্যালা মোর বাপ'॥
অশ্বমেধ যাগ আদি, কর্ম্ম যত হয়।
ঔষধ সেবন সম, সেই সমুদয়॥
রোগেতে ভিষক করে, ভেষজ প্রয়োগ।
ঔষধের গুণে বটে, ভাল হয় রোগ॥
'আয়ুর্ব্বেদে' লেখা নাই, এমন বচন।
একবার যদি করে, ঔষধ সেবন॥
তার গুণে পুন আর, হইবে না রোগ।
চিরকাল স্বাস্থ্য লাভে, সুখের সম্ভোগ॥
"বেদবিধি কর্ম্মভোগ" কর্ম্মভোগ সার।
ভোগের হইলে শেষ, থাকে না তো আর॥
যতদিন ভোগ থাকে, তত দিন ভোগ।
আমি বলি ভোগ নয়, সে যে, ঘোর রোগ॥
"উপসর্গ" ভরা স্বর্গ, বর্গ কোথা তার?।
আমি বলি সেই স্বর্গ "বিসর্গের দ্বার"॥
নিত্য নয়, নিত্য নয়, স্বর্গের সে সুখ।
"গোদের উপরে ফোড়া" নিদারুণ দুখ॥
"ঊর্দ্ধগামি" দেখিতেছ, মিছে সেই মিছে।
যেজন উপরে চড়ে, সেই পড়ে নীচে॥
মই দিয়ে উঠে বটে, স্বর্গের সে "চালে"।
সেই মই থাকে না কো, নাবিবার কালে॥

চপ্‌কোরে নীচে পড়ে, এরূপ প্রকার।
হাড়্‌গোড়্‌ ভেঙে গিয়ে, হয় চুরমার॥
উঠিবে উপরে তুমি, বিরোধী কে হয়?।
কিন্তু বাপু মনে কর, পতনের ভয়॥
এ জগতে, কর্ম্ম হয়, যেন "কুম্ভকার"।
"উঠাপড়া, পড়াউঠ" চক্রখানি তার॥
দিয়ে পাক, সেই চাক, কেবল ঘুরায়।
ঘোরে ঘোরে ঘোরে সদা, ঘোর কি ফুরায়?
তখন সে ঘোর যায়, দড়ি গেলে ছিঁড়ে।
মৃত্তিকা না পায় আর, প্রহারের পীড়ে॥
ঘোরারোগ বিনাশিতে, যদি থাকে মন।
কেটে ফেলো, কেটে ফেলো, দড়ির বন্ধন॥
পিঞ্জরে পুষিলে পাখি, বিশেষ যতনে।
আশ করে, পাশ কেটে, বাস করে বনে॥
পাখি যদি পাশ কেটে, উড়ে যেতে চায়।
নর হয়ে কেন থাকো, বন্ধন-দশায়?॥
"অশ্বমেধ যাগ" আদি সুখের নিধান।
কিরূপেতে আমি তাহা, করিব বিধান?॥
"অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয়" আর।
যাগের বিধান হয়, বিবিধ প্রকার॥
"জাগদেয়া, যাগফল" গাচপাকা নয়।
কাঁচায় যে পাকে সে, কি, মিষ্ট কভু হয়?॥
ফোড়ের ফড়েতে পাকা, নাহি তার চারা।
সে ফলের আঁটিতে কি, হোয়ে থাকে চারা?
দেবোদ্দেশে, যজ্ঞ যাগ, নানা প্রকরণ।
ভূরি ভূরি দান সহ, ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
ইহাতে কর্ত্তার বটে, পুণ্যের সঞ্চয়।
সেই পুণ্য প্রতাপেতে, স্বর্গভোগ হয়॥
একদিগে পুণ্য যথা, দেখিতেছ "বাপ"।
বিপরীত দেখ তার, আরদিগে পাপ॥
যাগেতে কেবল পুণ্য, কে বলে তোমায়?।
পশুহত্যা পরদ্বেষ, হিংসা কত তায়॥
হবেই নরকভোগ, সে পাপের ফল।
তখন কোথায় রবে, স্বর্গের সম্বল?॥
নরলোক, পরলোক, করে না বিচার।
ভবঘোরে পোড়ে শুধু, দেখে অন্ধকার॥
কারে বলে "শর্ম্ম" তার মর্ম্ম নাহি জানে।

কর্ম্ম কর্ম্ম কোরে সদা, মরে অভিমানে ॥
ভোগ গেলে, স্বর্গসুখ, কোথায় তখন্।
সেই তো শেষেতে হয়, নরকে গমন্ ॥
"ফলশ্রুতি 'পোড়ে পোড়ে, বাঁধিয়াছে গোল।
ক্ষীর ফেলে তাই তুমি, খেতে চাও ঘোল ?॥
প্রভেদ প্রভেদ ক্রিয়া, দেখিছ যে সব।
"নিত্যফল" কেহ তারা, করে না প্রসব ॥
"নিত্যসুখরূপ" এক, ফল' যাহা আছে।
সে ফল কেবল ফলে, জ্ঞানরূপ গাছে ॥
"বেদ নন মিথ্যাবাদী" করিব স্বীকার।
বেদের ভেদের কথা, কি বুঝেছ সার ?॥
"কর্ম্মকাণ্ড বেদে" নাহি, করি অনাদর।
থাকুন আমার তিনি, মাথার উপর ॥
যে বেদের, গুণ যারা, বেড়াতেছে গেয়ে।
তারা তো অনেক ভাল নাস্তিকের চেয়ে ॥
করুক্ করুক্ ক্রিয়া, ঘুরুক্, ঘুরুক্।
ভ্রমণের সীমাপথ, ফুরুক্ ফুরুক্ ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে ঘোর, ভাঙিবে যখন।
ঘোরাঘুরি, আর তার, রবে না তখন ॥
"ফলশ্রুতি" শুন যাহা, বেদের বচনে।
প্রবৃত্তির পথ সেটা, সুকার্য্য সাধনে ॥
না থাকিলে এ প্রবৃত্তি, কে হোতো প্রবৃত্ত।
পাপকূপে ডুবে যেতো, সকলেরি চিত্ত ॥
অতএব বেদবিধি, বিহিত বিধান।
"অবিধান" রূপে তার, নহে "অভিধান"॥
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কোরে, জ্ঞান পায় যেই।
দুখপাশ কেটে ফেলে, মুক্ত হয় সেই ॥
কর্ম্ম করি সমূলে, দুখের নাশ হয়।
বেদের এরূপ বাপু, অভিপ্রায় নয় ॥
এইরূপে বেদ দেন, স্বর্গসুখ গেয়ে।
বহুকাল স্থায়ি সেই সকলের চেয়ে ॥
কিন্তু তায় একেবারে, তাপ নাহি যায়।
ভোগের হইলে শেষ, কষ্ট পুনরায় ॥
এই উপদেশগুলি, অন্তরেতে রেখে।
ক্রিয়া-ফল ভেদ কর, ছোটো বড় দেখে ॥
বিচারে করিলে ভেদ, পাইবে প্রমাণ।
সকল ক্রিয়ার ফল, না হয় সমান ॥
ক্রিয়ার অতীত ফল, কে কেরে নিয়োগ ?।
যাহার যেমন ফল, সেইরূপ ভোগ ॥
ঘুরে ঘুরে দেখে এসো, সকল সংসারে।
ক্রিয়াধীন ফলভোগে, সুখি পাবে কারে ? ॥
কারাগারে "বন্দি" যত, সকলেই দুখী।
যার পায়ে বেড়ি নাই, সেই কিছু সুখী ॥
ছড়ি নিয়ে ফেরে যেই, চোরেদের হাটে।
শুধু, সে, খাটায় নাকো, আপনিও খাটে ॥
দাস, প্রভু, যত দেখ, সেরূপ প্রকার।
পরস্পর সকলেই, অধীন, সবার ॥
ভ্রমে তুমি দেখিতেছ, যার যত সুখ।
নশ্চয় জানিবে বাপু, তার তত দুখ ॥
পরস্পর বড় হোতে, অভিলাষ করে।
আপনি মরিছে জীব, আশা, নাহি মরে ॥
পরস্পর দ্বেষ, রাগ, অভিমানে জলে।
নরকের ভোগ বল, কারে আর বলে ? ॥
প্রতিক্ষণ, পোড়ে মন, দ্বেষের অনলে।
ক্রিয়াফলে স্বর্গভোগ, এরেই কি বলে ?
কোনো সাধু সদাশয়, আছেন এমন।
কিছুতেই বিচলিত, নাহি হয় মন ॥
সুখেতে করেন, স্বীয় "ভাগ্যফল" ভোগ।
উদয় না হয় মনে, পরদ্বেষ রোগ ॥
আছেন ধরণীধামে, এমন্ যে জন।
সাধু বোলে, আমি তাঁর পূজিব চরণ ॥
নিশ্চিত জেনো না তাঁরে, সুখেতে স্বাধীন,
কিছু না, কিছুতে, তিনি, দুখের অধীন ॥
ক্রিয়ার অধীন সুখ, দুখের আলয়।
কিছুকাল স্থিত মাত্র, অবিনাশি নয় ॥
করি তাই, বারবার, বোধের বিধান।
বোধ বিনা, কিছুতেই, নাহি পরিত্রাণ ॥

পুত্র। প্রশ্ন।

পদ্য।

বেদ-বিধি ক্রিয়াকাণ্ড, করিয়া বিস্তার।
একেবারে নাহি হয় দুখের সংহার ॥
শাস্ত্রপাঠে, যুক্তিযোগে, পেলেম প্রমাণ।
এখন্ এ কথা বটে, বিশ্বাসের স্থান ॥

আপনার উপদেশে, হইল প্রত্যয়।
মনে আর রহিল না, কিছুই সংশয়॥
পৃথক ক্রিয়ার ফলে, পৃথক বিধান।
ছোটো বড়, ভেদে তাগ, না হয় সমান॥
সুখের সম্ভোগ হয়, ফল পরিমাণ।
সে ফলেতে, নিত্যফল, করে না প্রদান॥
ভবের ভবনে দেখি, জীব আছে যত।
গমনাদি ক্রিয়া তারা, করিতেছে কত॥
সে সব ক্রিয়ার ফল, ভুগিছে সবাই।
নিত্যফল দিতে পারে, শক্তি কারো নাই
এ ফল অনিত্য যদি, স্বভাবে স্বস্তবে।
বৈদিক-ক্রিয়ার-ফল, নিত্য কিসে হবে?॥
তবু এক সংশয়, উঠিল পুনর্ব্বার।
বলুন্ বিশেষরূপে, করিয়া বিচার॥
যাগ আদি কর্ম্ম যদি, পাপযুক্ত হয়।
সে পাপের ফল যদি, ফলে, ফলে রয়॥
কোনো জীব, কষ্টের, কামনা নাহি করে!
তবে কেন কষ্ট পেতে, যাগ কোরে মরে?॥
এতকোরে, নিত্যসুখ, যদিই না হবে।
কর্ম্মকাণ্ড ভ্রমভাণ্ড, ভেঙে যাক্ তবে॥
পাপের সংশ্রব দোষ, দেখা যায় যায়।
একেবারে কেন তাহা, উঠে নাহি যায়?॥
যাগেতে পাপের ভাগ, রয়েছে নিশ্চিত।
পুনপুন, কেন জীব, হয় তায় প্রীত?॥
যাগেতে থাকিলে পাপ, যত সব শুচি।
সে যাগ সাধনে কেন, করিবেন রুচি?॥
পরিণামে সুখ সহ, দুখ লাভ যায়।
ইচ্ছা করি কেন লোক, সেই পথে যায়?॥

পিতা। উত্তর।

পদ্য।

সেরূপ হইল বাবা, তোমার বিচার।
"অলাভ বাণিজ্যে" যথা, কচ্‌কচি সার॥
পারিনে করিতে ক্ষান্ত, এত কোরে কোরে।
বাপ্‌বাপ্, বোকে বোকে, মাথা গেল ধোরে
বুঝে যদি বুঝিবে না, কি আছে উপায়?।
মেটাও মনের দ্বিধা, ঘেঁটাও আমায়

শাস্ত্রদধি মথনেতে, আগে উঠে "ঘোল"
নবনী উঠিলে শেষ, মিটে যায় গোল॥
মথন করিতে হয়, আছে যথা বিধি।
সহজে কি সুধাদান, করে "জলনিধি"?॥
"বৈদিক-কর্ম্মের বিধি" সকামের কাছে।
প্রবৃত্তির প্রতি তার, ব্যাঘাত কি আছে?
যজ্ঞ-দানে যে প্রমাণে, পুণ্য লাভ হয়।
হিংসা-দোষে পাপভাগ, তত কিছু নয়॥
ক্ষুদ্র-পরিমিত পাপ, ভাবনা কি তায়?।
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই, সে পাপ তো যায়॥
না করিলে প্রায়শ্চিত্ত, কিছু নাই হানি।
এখানেতে পুণ্যেরেই, বড় বোলে মানি॥
স্বর্গসুখ সুধাসিন্ধু, সলিলে যে ভাসে।
পাপের তাপের কণা, সয় অনায়াসে॥
তোমার মনেতে যত, হতেছে উদয়।
সেই তাপ, তত কিছু, কষ্টকর নয়॥
সুখের প্রবৃত্তি করে, অন্তরে চরণ।
কেন লবে নিবৃত্তির, চরণ স্মরণ?॥
সাংসারিক সুখে দেখ, দুঃখ আছে কত।
জেনে শুনে জীব তাহে, সদা অনুরত॥
কিঞ্চিৎ সুখের লোভে, দেহি সমুদয়।
ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হোয়ে, কত কষ্ট লয়॥
যখন লৌকিক-সুখে, এরূপ ব্যাপার।
তখন স্বর্গের সুখে, কথা নাই আর॥
করিবে অদৃষ্ট লাভ, ক্রিয়াফল-যোগে।
বিরত হবে না কেহ, স্বর্গসুখ ভোগে॥

পুত্র। প্রশ্ন

পদ্য।

গোছাইয়া আমি যত, যোগাতেছি "গুছি"
তাই নিয়ে দেও তুমি ভাঙাঘরে "খুঁচি"
খোঁচায়েছি আগে আমি, গোছা যোগাইয়া
সারো সারো, যত পারো, খোঁচাখুঁচি দিয়া
বেদ-শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে, সংশয় যে "ভারি"
ছাড়িব না ততক্ষণ, যতক্ষণ পারি॥
মিটাবো সংশয় যত, রয়েছে অন্তরে।
না ঘষিলে চন্দন, কি, গন্ধ দান করে?

যাগ, যজ্ঞে, যদি বহু, সুখের সঞ্চার।
সুখের সমান নহে, দুখের ব্যাপার॥
এই হেতু এ জগতে ক্রিয়াশীল যত।
স্বর্গ সুখলাভ আশে, কর্ম্মে হয় রত॥
এখন সে কথা নিয়ে, নাহি প্রয়োজন।
আর তার করিব না, কিছু আন্দোলন॥
হায় হায়, কি আশ্চর্য্য, হতেছে বিস্ময়।
মিছে কথা কয়, বেদ, মিছে কথা কয়॥
কর্ম্মের ক্ষমতা যদি, নাই এপ্রকার।
একেবারে সব দুখ, সে করে সংহার॥
বিধি দিয়া ফলশ্রুতি, বিধান বিস্তার।
এত কেন মাথাব্যথা, হোয়েছিল তার ?॥
পুন পুন, কহিতেছে, এরূপ বচন।
"কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, যত জীবগণ"॥
"মাথা খাও, মাথা খাও, তোমরা সকলে"।
"নিত্যসুখভোগ কর, যাগ, যজ্ঞ-ফলে"॥
এরূপ প্রবৃত্তি পেয়ে, হোয়ে পরবশ।
কেহ আর নাহি পায়, নিত্যানন্দরস॥
বার বার কহিলেন, ভোগ ভোগ "ভোগ"
সে ভোগের শেষে কেন, "আকারের" যোগ॥
এমন ভোগের ভোগ, যে করে বিধান।
কোন্‌দিগ, সত্য তার, করিব প্রমাণ ?॥
ক্রিয়াকাণ্ড দেখি যার, ভোগার বাজার।
জ্ঞানকাণ্ড কিরূপেতে, সত্য হবে তার ?॥
সত্য হয় জ্ঞানকাণ্ড, ভালই সে বটে।
আপাতত ক্রিয়াকাণ্ডে, সর্ব্বনাশ ঘটে॥
যেরূপে সে কর্ম্মভাগ করেছে প্রচার।
জ্ঞানভাগ, কোটিভাগে, তুল্য নয় তার॥
শুধু যদি "জ্ঞানকাণ্ড" করিত বিস্তার।
অনাসেই যত জীব, পাইত নিস্তার॥
ত্রিপাতের ভোগ তায়, হোতো না হোতো না।
বার বার যাতায়াতে, যাতনা পেতো না॥
জ্ঞান বিনা যদি নাই ত্রাণের উপায়।
কর্ম্মঘোরে কেন ঘোরে, হায় হায় হায়!॥
কখনই ঘুচিবে না, মনের এ খেদ।
মাথা মুণ্ড কি বকেছে, মিথ্যাবাদী বেদ॥

পিতা। উত্তর।

পদ্য।

ওরে বাপু, মিছামিছি, কেন কর রোষ ?।
জান না ভেদের ভেদ, বেদের কি দোষ ?॥
মোটামুটি ভেবে তুমি, বুঝিয়াছ স্থূল।
বেদ-বাক্যে ভুল নাই, তোমারি সে ভুল॥
কিছুমাত্র দোষ নাই, বেদের বচনে।
কন্ নাই কোনো কথা, বিনা প্রয়োজনে॥
না করিলে ক্রিয়াকাণ্ড, এরূপ বিস্তার।
কিছুতেই হইত না, জীবের নিস্তার॥
স্বভাবের ধর্ম্মে সবে, হোয়ে অনুরত।
করিত অনর্থকর, কর্ম্ম শত শত॥
সেই তাহা করিতই, ইচ্ছা যার যাতে।
আচার বিচার সব, যেতো অধঃপাতে॥
স্বেচ্ছাচার সাধনেতে, কে দিতো ব্যাঘাত ?।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হোয়ে যেতো, সমূলে নিপাত॥
রীতি, নীতি, সমুদয়, যেতো ছারখার।
সংসার কেবল হোতো, পাপের ভাণ্ডার॥
লঘু গুরু, ভেদাভেদ, থাকিত না আর।
সেজন প্রবল হোতো, শক্তি আছে যার॥
দুর্ব্বলের দুর্গতির, থাকিত না সীমা।
প্রকাশ হোতো না, কভু, বিভুর মহিমা॥
কেহ কারে করিত না, সমুচিত স্নেহ।
"ঈশ্বর" আছেন বোলে, মানিত না কেহ॥
কেহ আর সাধিত না, সুখের সুকৃতি।
বিষম বিকৃতি হোতো, মানব-প্রকৃতি॥
কোথায় থাকিত তবে, ভবের মঙ্গল।
পশু হোতে, নীচ হোতো, মানুষ সকল॥
পরস্পর সুপাদ, সম্পর্ক, যেতো সব।
ভবময় ভরা হোতো, ভয়ানক রব॥
নিকৃষ্ট নিকর কর্ম্মে, নিরন্তর আশ।
নরকের নিকেতনে, নিয়ত নিবাস॥
এইরূপে কষ্ট পেতো, যত আছে নর।
সত্য-সুখ, কভু কারো, হোতো না গোচর॥
মানবের কর্ম্ম যাহা, না জেনে যথার্থ।
কেবল করিত সবে, রিপু চরিতার্থ॥
সতত হইত রত, রিপু অনুকূলে।

একবার ধর্ম্ম কেহ, ভাবিত না ভুলে ॥
এই মত যথাচারি হইলে সবাই।
নরকে হোতো না তবে, নিবাসের ঠাঁই ॥
দেহে কবি আত্মবোধ, ঘটিত বিকার।
কেবল করিত মুখে, আমার আমার ॥
ছেড়ে তত্ত্ব, মদে মত্ত, দেহ অনুরাগে।
অহঙ্কারে ফুলে ফুলে, ফেটে যেতো রাগে ॥
গুরু হয়ে কে কারে, করিত উপদেশ?।
কেবল প্রবল হোতো, হিংসা, রাগ, দ্বেষ ॥
ক্রোধের প্রভাবে হোতো, বোধের বিনাশ ॥
কখনই হইত না, ক্ষমার প্রকাশ ॥
লোভ, হোতো প্রভাবেতে, এমন প্রধান।
সন্তোষ কাহারো মনে, পেতো না কো স্থান ॥
কাম হোতো বলবান, এরূপ প্রকার।
ভ্রমে কেহ করিত না, বস্তুর বিচার ॥
বলেতে করিত ভোগ, যাহা রমণীয়।
কখনই ব্যছিত না, স্বীয় পরকীয় ॥
পূরাইত মনোরথ, দিবস যামিনী।
হরিত পরের ধন, পরের কামিনী ॥
অভিমানে রেখে দিত, জ্ঞানচক্ষু ছেয়ে।
সকলে দেখিত ছোট, আপনার চেয়ে ॥
মোহমেঘে কোরে দিতো, এপ্রকার কালো।
প্রকাশ পেতো না আর, বিবেকের আলো ॥
মায়াঘোরে করিত, এরূপ অন্ধকার।
বোধ-বিধু হইত না, কখনো প্রচার ॥
খেলিত বিষয়-নদে, বাসনার ঢেউ।
কেমন 'বৈরাগী' তাহা জানিত না কেউ ॥
শ্রদ্ধা, ভক্তি, শান্তি, মৈত্রী, লজ্জা আর দয়া।
একেবারে সকলেরি, হোয়ে যেতো গয়া ॥
সত্যের সাধনে তবে, কে হইত প্রীত?।
হিত ঘুচে সমুচয়, হইত অহিত ॥
কেহ আর করিত না পরলোক ভয়।
নানা সূত্রে, পিতা পুত্রে, ঘটিত প্রলয় ॥
বেদের এ বিধি যদি, না থাকিত ভবে।
'বাপ' বোলে সম্বোধন, করিতে কি তবে? ॥
বাপ্ বোলে ডাকিতে না, কখনো আমায় ॥
আমারো সেরূপ ভাব, হোতো না তোমায় ॥

বেদের সুবিধি পেয়ে, ঘুচিয়াছে সেটা।
তুমি বল বাপ্ বাপ্, আমি বলি বেটা ॥
এই ক্রিয়া-কাণ্ডে হোলে, মতি একবার।
যথাচারি নাস্তিক, হবে না কেউ আর ॥
করিবে আস্তিক হোয়ে, ধর্ম্মের যাজনা।
উপাসনা প্রভেদে, উপাস্য-উপাসনা ॥
বিস্তারিত মর্ম্ম তার, ব্যক্ত আছে বেদে।
ক্রমে হয় অধিকারি, অধিকার ভেদে ॥
নিশ্চয় রূপেতে বাপু, কর প্রণিধান।
কর্ম্ম হয় জ্ঞানরূপ, গৃহের সোপান ॥
কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম চাই, ভেবে দেখ মনে।
সিঁড়ি ছেড়ে সে ঘরেতে, ঢুকিবে কেমনে?।
করিতে করিতে কর্ম্ম, শুদ্ধ হয় মন।
তখন সুকর্ম্ম হয়, মনের মতন ॥
বিবেক, বৈরাগ্য আদি, না হোলে প্রকাশ।
কাম আদি বৃত্তি-পাশ, কে করিবে নাশ? ॥
বিবেক, বৈরাগ্য-বল, হোলে বলবান।
দেহে আর থাকিবে না, আত্ম-অভিমান ॥
আত্ম-অভিমান গেলে, ভ্রম নাহি রয়।
তখন সে জীব পায়, আত্ম-পরিচয় ॥
সেই আত্ম-পরিচয়, বিবেকের বলে
শাস্ত্রমতে তারেই তো তত্ত্বজ্ঞান বলে ॥
সেই জ্ঞান একেবারে, সর্ব্ব দুঃখ হরে ॥
বাসনা বাস না করে, জীবের অন্তরে ॥
সমূলে মনের বৃত্তি, নষ্ট হোয়ে যায়।
তখন সে স্বর্গ সুখ, সে কি আর চায়? ॥
মূল কথা বোলে দিই, জেনো বাপু সার।
এক বিনা এ জগতে, দুই নাই আর ॥
দেহাতীত, ক্রিয়াহীন, পরমাত্মা যিনি।
স্বরূপ, চৈতন্য-সাক্ষী, নিত্য হন তিনি ॥
সকল ক্রিয়ার সাক্ষী, সেই ভগবান্।
জীবেরে করেন যিনি, কর্ম্মফল দান ॥

পুত্র। প্রশ্ন।

পদ্য।

কাম আদি স্বাভাবিক, বৃত্তি সমুদয়।
নিত্য-সুখ লাভের, বিরোধি যদি হয় ॥

যত দিন দেহে এরা, থাকিবে প্রবল।
তত দিন হবে না কো, মুক্তির সম্বল ॥
স্বভাবত যারা করে, স্বভাবে বিহার।
তাদের সংহার করে, সাধ্য আছে কার ? ॥
কিছুতেই স্বভাবের অভাব না হয়।
স্বভাবেতে জাত যত, স্বভাবেরই রয় ॥
চিরকাল স্বভাব, সভাবে, বলবান্।
মানসের ধর্ম্ম কভু, নহে ম্রিয়মাণ ॥
কাজেই কামাদি রিপু, হইলে প্রধান।
সংসার-বন্ধনে জীব, কিসে পাবে ত্রাণ ? ॥
বিষয়বাসনা-হীন, করিবে কে মনে ?।
বিবেক, বৈরাগ্য মনে, আসিবে কেমনে ? ॥
আশার অধীন সবে, এই চরাচরে।
মনেতে আশার বাসা, সে আশা কি মরে ?।
প্রবৃত্তি-প্রয়াসে মন, অতি অনুরত।
দিবানিশি সমভাবে, সদা পদানত ॥
কেবলি ভোগের আশা, জীবের অন্তরে।
প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি তার, নিবৃত্তি কে করে ? ॥
ধাঁধাসূত্রে বাঁধা সে, যে, শক্ত অতিশয়।
কখনই সেই গেরো, খুলিবার নয় ॥
কোথায় পাশের ফাঁস, কোথা তার থাই।
কেমনে দিয়েছে গেরো, দেখিতে না পাই ॥
জরায়ুজ, স্বেদজাদি, উদ্ভিজ, অণ্ডজ।
চতুর্বিধ প্রাণি সৃষ্টি, এ নহে সহজ ॥
কামাদি বৃত্তির পাশে, বদ্ধ সমুদয়।
বেড়ির বন্ধন হোতে, মুক্ত কেহ নয় ॥
আকাশাদি বায়ু বারি, পঞ্চ মহাভূত।
এ ভূতের সৃষ্টি দেখ, কেমন অদ্ভুত ॥
ভৌতিক প্রপঞ্চজাত, কার্য্য তায় কত।
পরস্পর মুগ্ধ তাহে, প্রাণি আছে যত ॥
তাদের সম্বন্ধে কিছু, চলে না বিতর্ক।
উপভোগ্য উপভোক্তা, এরূপ সম্পর্ক ॥
অচেতন, সচেতন, বস্তু যত হয়।
অভেদে আবদ্ধ হোয়ে, পরস্পর রয় ॥
নিয়মাদি ক্রম তায়, এরূপ প্রকার ॥
অনিয়ম ব্যতিক্রম, নাহি হয় আর ॥
প্রতিক্ষণ পরীক্ষায়, পরিচয় পাই।
প্রমাণ প্রয়োগে আর, প্রয়োজন নাই ॥
নয়ন যখন করে, প্রিয়-দরশন।
তখনিই হয় তায়, বিচলিত মন ॥
ভোগের কামনা হয়, এমন প্রবল।
ভোগাভাবে নিয়তই, মানস চঞ্চল ॥
সে ভোগে রোগের নাশ, নহে, একেবারে।
বরং কামনা বাড়ে, অশেষ প্রকারে ॥
সুরূপেতে সুখোদয়, যেরূপ প্রকার।
কুরূপ দেখিলে হয়, বিপরীত তার ॥
তখনি তখনি মনে, দ্বেষের উদয়।
প্রিয়-বোলে তাহাতে, প্রবৃত্তি নাহি রয় ॥
শ্রুতিপথে প্রিয় কথা, করিলে প্রবেশ।
তখনি তাহাতে হয়, মনের আবেশ ॥
কটু কথা কালকূট-বিষ লাগে গায়।
শ্রবণ শ্রবণে তাহা, প্রেম নাহি পায় ॥
যে বিষয় ইন্দ্রিয়ের, নহে অনুকূল।
কাজেই তাহাতে হয়, মন প্রতিকূল ॥
নাসিকা সুবাস পেয়ে, আমোদিত হয়।
কাজেই তাহাতে মন, অনুরত রয় ॥
রসনায় তৃপ্তি হয়, সুরস সেবনে।
তাহাতেই প্রেমোদয়, কাজে কাজে মনে ॥
সুখসেব্য সমীরণে, ত্বকের প্রণয়।
কাজেই তাহাতে মন, অনুকূল হয় ॥
জ্যোতির আধার নেত্র, স্বভাবত হয়।
জ্যোতির যে ধর্ম্ম, কাজে, নয়নেই রয় ॥
শব্দের আধার শ্রুতি, স্বভাবত হয়।
শব্দের যে ধর্ম্ম, কাজে, শ্রবণেই রয় ॥
রসনা রসিক রসে, রই তাই লয়।
রসের যে গুণ তাহা, রসনায় রয় ॥
নাসাই বাসের বাসা, স্বভাবত হয়।
বাসের যে গুণ, কাজে, নাসাতেই রয় ॥
স্পর্শের আধার ত্বক, স্বভাবত হয়।
স্পর্শের যে গুণ, তাহা, ত্বকেতেই রয় ॥
ভিতর বাহিরে এই, ভূতের ব্যাপার।
পরস্পর ভোগাভোগ, অতি চমৎকার ॥
অভেদে সম্বন্ধ যোগ, খণ্ডন কি হবে ?।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সবে ॥

যার যাহা ধর্ম্ম হয়, তাই আছে তায়।
ফলে তারা প্রিয় বিনা, অপ্রিয় না চায়॥
অধিক কথার আর, নাহি প্রয়োজন।
এখন্ করুন্ তবে, সংশয়চ্ছেদন॥
প্রিয়াপ্রিয় যত কিছু, আছে এই ভবে।
চিরকাল তারা সবে সমভাবে রবে॥
সকল প্রাণির রুচি, ভালতেই হবে।
ইচ্ছা করি কেহ আর, মন্দ নাহি লবে॥
স্বভাবে এরূপ হবে, কার্য্যের সাধন।
ঈশ্বরের এ নিয়ম, কে করে লঙ্ঘন ?॥
অতএব কিসে করি, এমন প্রত্যয়।
দেহধারী আত্মা কভু, হবে ব্রহ্মময়॥
এ, যে, বড়, অপরূপ, দেহে রন যিনি।
দেহ আর ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধহীন তিনি॥
সেই আত্মা কোনকালে, দেহহীন নয়।
কি আছে সংশয়, তাতে, কি আছে সংশয় ?
দেহেন্দ্রিয় সহিত, সম্পর্ক রাখে যেই।
বিষয়েন্দ্রিয়ের বশ, অবশ্যই সেই॥
নিরন্তর বদ্ধ যিনি, এমন বন্ধনে॥
দেহেন্দ্রিয়-মন-হীন, হবেন কেমনে ?॥
পরস্পর এ সম্বন্ধ, স্বভাবে সম্ভবে।
কামাদির বশ তাঁরে, হোতেই তো হবে॥
স্বরূপ দেখিত যদি, আঁখি-হীন জন।
বধির করিত যদি, সুকথা শ্রবণ॥
ঘ্রাণ-হীন পেতো যদি, আমোদীয় বাস।
আপনার বাক্যে তবে, হইত বিশ্বাস॥
দেহেন্দ্রিয় মনোনীত, আত্মা যদি হন।
হন্, হোন্, হলেনি বা, ফলে তো, তা নন॥
ফলেই হলেন যেন, ফল কিবা তায়।
অজ্ঞানে কিরূপে হয়, জ্ঞানের উপায় ?॥
তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাক্, কোথা তারে পাই ?।
সামান্য জ্ঞানের তায়, সম্ভাবনা নাই।
জড় ভরতের মত, স্বভাবে যে হয়।
বল দেখি, তাহে আর পদার্থ কি রয়!॥
তাহার উপমা দিতে, উপমেয় নাই।
যদ্যপি তাহারে বলি, পাতরের চাঁই॥
এ উপমা বিচারেতে, না হয় সঙ্গত।
তুমি যারে "আত্মা" বল, সে, যে অসঙ্গত॥
পাতরে কিছু না কিছু, উপকার পাই।
নির্গুণ আত্মাতে কিছু, উপকার নাই॥
'মরুভূমি' যারে বল, সহজে অসার।
আত্মার অপেক্ষা তায়, দেখি উপকার॥
সেতো, হয়, অনেকের দাঁড়াবার স্থল।
গুণহীন হোলে আত্মা, কি হইবে ফল ?॥
স্থিররূপে দেখিলাম, করিয়া বিচার।
তত্ত্বজ্ঞান কারে বলে, সে যে, ফক্কিকার॥
দেহ হোতে স্বতন্ত্র, কখনো নন যিনি।
কিরূপেতে আত্মজ্ঞান, পাইবেন তিনি!॥
নিত্যসুখ কোনোমতে, হইবার নয়।
এই জীব কখনই, শিব নাহি হয়॥
দরশনে দরশন, কবে হয় কার!।
খটমট, ঘট-পট, ভজ-কট সার॥
কর্ম্মকাণ্ড বেদ নিয়া, ফেলে দেও 'চুলা'।
জ্ঞানকাণ্ড বেদ শুধু, চোখে দেয় ধূলা॥
কেহ না করিতে পারে, স্থির নিরূপণ।
মিছামিছি, বোকে মরে, অন্ধের মতন॥

পিতা। উত্তর।

পদ্য।

বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বকর্ম্মা, কীর্ত্তিকর কারু।
সে চতুর চেতনের, চতুরালি চারু॥
সকলেই মুগ্ধ আছে, অখিল সংসারে।
করুণার কার্য্য তাঁর, কে বুঝিতে পারে ?॥
যেরূপ কৌশল ইথে, কহিবার নয়।
মানবের বুদ্ধি-পথে, প্রবেশ কি হয়!॥
সহজ ব্যাপার, নহে, সহজ ব্যাপার।
সহজে বুঝিতে পারে, হেন ভাগ্য কার ?॥
স্বভাবেই সুনিয়ম, সম্পাদিত ভবে।
নিয়মের অন্যথা, কি, কিছুতেই হবে ?॥
স্বভাবত যিনি হন, শিবের আধার।
শিবময়, সমুদয়, কার্য্য হয় তাঁর॥
অজ্ঞান যে সব জীব, মত্ত মোহমদে।
পদে পদে, পড়িতেছে, বিপদের পদে॥
আপন বিপদ তারা, আপনারা আনে।
কেন সে বিপদ হয়, কিছুই না জানে॥

ক্রিয়া-দোষে, বুদ্ধি দোষে, বিপদ ঘটায়।
ঈশ্বরের দোষ দিয়া, কুরব রটায়॥
হায় হায়, কারে বলি, মিছে করি রোষ।
হাঁটিতে না জেনে দেয়, উঠানের দোষ॥
দোষহীনে দোষ গিয়া, কোথা পাবে ঠাঁই।
ক্রিয়াদি নিয়মে তাঁর, কোন দোষ নাই॥
অপরূপ দেখ দেখ, মানব সকল।
রবি, শশি, তারা আদি, জ্যোতির মণ্ডল।
কেমন কৌশলে দেয়, কার্য্য-পরিচয়।
পরস্পর কখনো, না, গণ্ডগোল হয়॥
যুগ, বর্ষ, অয়নাদি, তিথি, পক্ষ, রাশি।
কালভেদে, যাতায়াত, করে রাশি রাশি॥
এক সূত্রে বদ্ধ হোয়ে, রয়েছে সকলে।
নিয়মিত, নিরূপিত, নিয়মেতে চলে॥
কত দিন এজগৎ, কে কহিতে পারে।
সংসারের জন্ম-কথা, নাহি কো সংসারে॥
কত-কেলে সৃষ্টি এই, সভাবে রয়েছে।
নিয়মের অন্যথা, কি কখনো হয়েছে ?॥
চেতনের শক্তি পেয়ে, অচেতন যত।
অবিকল কার্য্য করে, চেতনের মত॥
স্থল, জল, অনল, গগন, সমীরণ।
পাঁচভূতে পরস্পর, সংযোগ কেমন ?॥
বিরোধি হইয়া কেহ, বিরোধ, না করে।
পরস্পর এক হোয়ে, এক ধর্ম্ম ধরে॥
এক হোয়ে ধরে বটে, এক অভিপ্রায়;
পৃথক্ পৃথক্ গুণ, অথচ জানায়॥
যত কিছু, যত কিছু, এই পাঁচ নিয়া।
নিয়মে নির্ব্বাহ হয়, এপাঁচের ক্রিয়া॥
কোথা বিভু, কৃপাময়, করি নমস্কার।
মরি মরি, আহা, কিবা, কৌশল তোমার!॥
করিতেছি, নাথ তব, রচনা, রচনা।
কেমন রচিব নাই, শক্তির সূচনা॥
তোমায় তোমার ধন, দিলাম এ দেহ।
দয়া করি, দয়াময়, দেবার, যা, দেহ॥
প্রাণাধিক, প্রিয়তম, কি কর সংশয় ?।
সর্ব্বমতে এ সংসার, সর্ব্ব-সুখময়॥
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন, অভিপ্রায় যাহা।
নিয়মের পথে চোলে, রক্ষা কর তাহা॥
তাহে আর কোনো দুখ, হবে না হবে না।
সদাকাল সমসুখ, অসুখ, রবে না॥
অসুখের কর্ম্মের কোথা, সুখের সঞ্চার ?।
করিলে পাপের কর্ম্ম, পুণ্য হয় কার ?॥
অতএব, বাপু তুমি, দূর কর ভ্রম।
'ভবপাল' কভু নন, পশুপাল সম॥
পশুপাল, পশুপাল, পুষে যে প্রকার।
ঘাস আর জল দেয়, করিতে আহার॥
বেঁধে রাখে, দড়ি দিয়া, পশুর গলায়।
আপনার, উপকার, কত তায় পায়॥
জগতের কর্ত্তা যিনি, এ জগৎ যাঁর।
সেরূপ তো, অভিমত, কভু নয় তাঁর॥
তিনি হন সমুচয়, সুখের নিধান।
আমাদের সুখ শুধু, করেন বিধান॥
আপনাব উপকার, কিছু নাই তায়।
অযাচক দাতা, সে কি, দান কভু চায় ?॥
নিরপেক্ষ, নিরাময়, বদ্ধ নন যিনি।
কামাদি বৃত্তির-পাশে, বাঁধেন্ কি তিনি ?॥
না জানিয়া কেন কর, তাঁর প্রতি দ্বেষ।
কেনই অমান্য কর, জ্ঞান উপদেশ ?॥
যার কাছে ভেদ নাই, ইতর বিশেষ।
প্রিয়াপ্রিয় উপভোগ, সে করে নির্দ্দেশ ?॥
কার কাছে, শুনিয়াছ, এরূপ বচন ?।
ভ্রান্ত আছ, শান্ত হও, শান্ত কর মন॥
প্রিয়াপ্রিয়, কিছু নয়, কল্পিত তাঁহার।
বন্ধের কারণ নয়, ভৌতিক-সংসার॥
প্রিয়াপ্রিয় কল্পনা, কেবল করে মন।
মনোময় বিশ্ব হয়, বন্ধের কারণ॥
যা, তুমি না ভালবাস, তারে বল "হেয়"।
যারে তুমি ভালবাস, তাই "উপাদেয়"॥
এমন কি বস্তু আছে, শুধু তায় হিত।
একেবারে সমুদয়, অহিত রহিত।
কেবলি দোষের হবে, অশেষ প্রকারে।
ওরে বাপু, এমন্ তো, হোতে নাহি পারে॥
কখনো করে না কেউ, বস্তুর বিচার।
না জেনে বিশেষ মর্ম্ম, একে আর॥

এক দ্রব্যে সকলের, নহে পরিতোষ।
তুমি যার গুণ গাও, অন্যে গায় দোষ ॥
জীবের না হয় যায়, শিবের সাধন।
অকারণে কেন তাহা, হইল সৃজন ? ॥
কারণের কার্য্য কভু, অকারণ নয়।
কিছুই না কিছু তায়, উপকার হয় ॥
যে জেনেছে ব্যবহার, তারে, গিয়ে সুধা।
তুমি যারে বিষ দেখ, সে দেখিবে সুধা ॥
যদি কর কাল, পাত্র, অবস্থার ভেদ।
তবে আর কিছুতেই, নাহি থাকে খেদ ॥
কাল, পাত্র, অবস্থায়, ভেদাভেদ কত।
প্রিয়াপ্রিয়, হোয়ে পড়ে, প্রিয়াপ্রিয় যত ॥
যখন জীবের হয়, অবস্থা যেমন।
ভোগের বিধান হয়, তখন তেমন ॥
যে, যেমন, পাত্র তার, সেইরূপ ভোগ।
সকল কালেতে, তার, সমান সংযোগ ॥
তুমি যারে, সুধা বল, সুধাই সে হয়।
তোমারি অবস্থাভেদে, সুধাই সে, নয় ॥
ভ্রমাধীন বোধে তব, সুধাছিল যেই।
কালক্রমে কালকূট-বিষ হবে সেই ॥
জননী-জঠরে ছিলে, করিয়া শয়ন।
মায়াময় মহীতলে, পড়িলে যখন ॥
দিন দিন, দুগ্ধপানে, হয়েছ সবল।
সেই দুধ হয়, তব, দেহের সম্বল ॥
দুগ্ধ বিনা, বাঁচিবার, সম্ভাবনা নাই।
দুগ্ধপ্রেমে মুগ্ধ তুমি, চিরকাল তাই ॥
বিষেতে জীবন নাশে, আছে চিরবোধ।
এই হেতু, তার প্রতি, কর তুমি ক্রোধ ॥
ওরে বাছা, বুদ্ধি কাঁচা, তাই এত ভ্রম।
জান না অবস্থাভেদে, বস্তুর কি, ক্রম ? ॥
যে তোমার প্রতিদিন, রেখেছে জীবন।
সে তোমারে পাঠাইবে, শমনসদন ॥
যখন করিবে রোগ, দেহ অধিকার।
স্বাভাবিক শরীরেতে, ঘটিবে বিকার ॥
সে সময়ে যদি তুমি, দুগ্ধ কর পান।
ক্ষণমাত্র দেহে আর, থাকিবে না প্রাণ ॥
রোগের সময়ে বিষ, হয় সুধাময়।
সেবনেতে নাহি থাকে, প্রাণের সংশয় ॥
বিষ-বিষ, হোতো মন, যে বিষের নামে।
সে বিষ রাখিবে প্রাণ, কলেবর ধামে ॥
যাহারে অমৃত তুমি, ভাবিয়াছ বাপ্।
কাল-ভেদে, বিষ হোয়ে, সেই দেয় তাপ্ ॥
বাপ্‌ধন, যদি বল, এরূপ প্রকার।
চিরকাল, সুধা, করে, সম উপকার ॥
বিষ শুধু সু । হয়, রোগের সময়।
এ কারণে, কোনোরূপে, প্রিয় সেই নয় ॥
একথা বলো না তুমি, অপরের কাছে।
শুনিলেই, সে হাসিবে, জ্ঞান যার আছে ॥
সদা তুমি মিষ্ট-রসে, তুষ্ট অতিশয়।
এই হেতু, সেই রস, প্রিয় তব হয় ॥
যার যাহে রুচি, তার, প্রিয় তাই হয়।
পায়সেতে, যে প্রকার, তোমার প্রণয় ॥
বিষকৃমি সে প্রকার, প্রেম পায় বিষে।
তোমাতে, কৃমিতে, আর ভেদ তবে কিসে ?
যাতে তুমি পাও বাপু, বহু উপকার।
হয় যদি প্রেমকর, তাহাই তোমার ॥
ছোটো বড়, যত কিছু, বস্তু আছে ভবে।
ভাল, মন্দ, মন্দ ভাল, বলো না কো তবে ॥
স্বর্গবাসে ইন্দ্রদেব, প্রেম যথা পান।
শূকরের প্রিয় তথা, মলময়-স্থান ॥
বাসব আসব পানে, তৃপ্ত যে প্রকার।
মল-ভোজে শূকরের, তৃপ্তি সে প্রকার ॥
বস্তু সব সমভাবে, হতেছে বিকাস।
যার যাহা, গুণ তাহা, তাতেই প্রকাশ ॥
সংসারেতে, কত জীব, সংখ্যা তার নাই।
নিজ নিজ ভাবে হয়, প্রধান সবাই ॥
ভোগি আর ভোগ্য যিনি, করেন নির্ম্মাণ।
তাঁর কাছে ভাল মন্দ, সকলি সমান ॥
রুচি, আর অরুচি, সে, মনের ব্যাপার।
ভ্রমে তাই, ভাল মন্দ, করিছ বিচার ॥
চোরের প্রবৃত্তি সদা, চুরি করা-রোগে।
কামুকের ইচ্ছা সদা, কামিনী-সম্ভোগে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা, হয় তায় হত।
পরনারী হরণেতে, কেবলি সে রত ॥

ক্রোধির চলিছে মন, এরূপ প্রকারে।
যারে তারে, কাটে, মারে, ইচ্ছা অনুসারে॥
চোরের চুরিতে যদি, এত রুচি হয়।
এ বোলে তো, চুরি করা, বিধি কভু নয়॥
কামুকের পরদার, ভোগে রুচি হয়।
এ বোলে তো, পরদার, ভোগ বিধি নয়॥
মারে, কাটে, ক্রোধির, কামনা যদি হয়।
এ বোলে তো, মারা, কাটা বিধি কভু নয়॥
প্রবৃত্তির পরবশ, নর যদি হবে।
নরে আর পশুতে, প্রভেদ কেন তবে?॥
স্বভাবেই পূর্ণ আছে, পশ্বাদি সবাই।
স্বভাব সাধিয়া তারা, কর্ম্ম করে তাই॥
অভাবেতে পূর্ণ এই, নরলোক সবে।
সভাবে স্বভাব রেখে, চলিতেই হবে॥
অভাবে স্বভাব সাধা, সহজ তো নয়।
স-ভাবে স্বভাব হোলে, স্বভাবেই হয়॥
স্ব-ভাবেই হয় বাবা, অভাব অভাব।
স্ব-ভাব জেনেছে যেই, সে পায় স্বভাব॥
স্বভাব দেখিয়া সাধো, আপন স্বভাব।
তবে আর রহিবে না, কিছুর অভাব॥
পরীক্ষা প্রদান হেতু, পাইয়াছ দেহ।
পরীক্ষা না দিলে, কিরে, পার পায় কেহ?॥
সাক্ষীরূপে আছে এক, পরীক্ষক যেই।
প্রতিক্ষণে ক্রিয়ার, পরীক্ষা করে সেই॥
পরীক্ষা করেন, যার, যেরূপ প্রকার।
তারে তিনি সেইরূপ, দেন পুরস্কার॥
কে দেয় পরীক্ষা আর, পরীক্ষা কে করে।
এ বোধ যখন হবে, উদয় অন্তরে॥
পড়িবে না আর তুমি, এ পাঠ, ও পাঠ।
পাঠ সাঙ্গ হোয়ে শেষ, হইবে নপাঠ॥
ঠাটের পাঠের পাটে, উঠিতে না হবে।
যে তুমি, যে তুমি, ছিলে, সে তুমি, সে হবে॥

ত্রিপদী।

বাহিরে যে সমুদয়, বিশ্বরূপে দৃশ্য হয়,
তাহা নয়, বন্ধের কারণ।
মনোময় বিশ্ব যাহা, বন্ধের কারণ তাহা,
জেনো এই নিশ্চয় বচন॥

মনের এ ঘোর রোগ, মনেতেই হয় ভোগ,
মন ছাড়া কিছু নাই আর।
এই মন অবিরত, কল্পনা করিয়া কত,
মনেতেই পাতায় সংসার॥
যখন যে দিগে ঝোঁকে, মাতে শুধু সেই রোকে,
সেই ধ্যান কেবলি অন্তরে।
রাজা হোয়ে একাদশ, ইন্দ্রিয়ের এত বশ,
বাহ্য সে তো গ্রাহ্য নাহি করে॥
সৃষ্টিতে না দৃষ্টি হয়, সৃষ্টি ছাড়া সমুচয়,
অনাসৃষ্টি, সৃষ্ট করে মন।
আকার নাহিক তার, লোয়ে মাত্র সমস্কার,*
কতরূপ করিছে সৃজন॥
প্রকাশিত এই ভবে, বন্ধ, মুক্ত, কেবা কবে,
সে তো কভু, হোতে নাহি পারে।
সুখ, দুখ, শোক, তাপ, নিতান্ত জানিবে বাপ,
ভোগ হয়, মনের সংসারে॥
বাহিরের বস্তু সহ, দেখিতেছ অহরহ,
ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ যোগাযোগ।
সে যোগ তেমন নয়, তাতে কি কখনো হয়,
সুখ আর দুখ, ভোগাভোগ?॥
দিবা কিম্বা নিশাকালে, ঘোরালো ঘুমের জালে
নেত্র দ্বার করে আচ্ছাদিত।
চেতনা রহে না আর, তখন সম্বন্ধ তার,
কোথা থাকে, বাহের সহিত?॥
বাহিরে যে কিছু আছে, সকলি তো থাকে কা
হাত, মুখ, সকলি তো রয়।
হায় কি ঐশিক মর্ম্ম, অবস্থার হেন ধর্ম্ম,
কিন্তু তাহা ভোগ নাহি হয়॥
মরি মরি কি আশ্চর্য্য, কে করিছে পরিচর্য্য,
কিছু তার বুঝিবার নয়।
বলিহারি, ওরে মন, ভাল তোর প্রকরণ,
দেখে দেখে হতেছে বিস্ময়॥
জাগরণে যে প্রকার, হোয়ে থাকে ব্যবহার,
এই মন সেরূপ করায়।

* সমস্কার।—সংস্কার এই শব্দ ভাষা কবিতায় শ্রুতিকটু হয় এবং ছন্দ থাকে না, এজন্য "সমস্কার" শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।

স্বপন-শরীর দিয়া, সুখ দুখ ভোগাইয়া,
ক্ষণমাত্রে হাসায় কাঁদায় ॥
কখনো বা, হেন ভয়, হৃদয়-কম্পিত হয়,
মনে ভাবি মলেম মলেম।
নাহি থাকে কোন দুখ, কখনো বা, হেন সুখ,
স্বর্গারোহী হলেম হলেম ॥
মনোযোগে হয় যাহা, মনোযোগে শুন তাহা,
মনের বিষয়ে দেও মন।
স্বপনের মর্ম্ম লও, কিন্তু সাবধান হও,
জেগে থেকে, দেখো না স্বপন ॥
সুখ, দুখ, ভোগাভোগ, কেবল মনের রোগ,
মন করে এ সব প্রসব।
যত দিন মন রবে, তত দিন আছে সবে,
মন মোলে ফুরাইবে সব ॥
পূর্ব্ব সমস্কার মত, সকলেই ভোগে রত,
ক্রিয়া নাশ করে না করে না।
যতদিন ক্রিয়া রবে, ততদিন এই ভবে,
এই মন মরে না মরে না ॥
হইলে মনের নাশ, সমূলে দুখের পাশ,
একেবারে কেটে যায় তবে।
আত্মবোধ-অস্ত্র চাই, অবিবেকে কোথা পাই,
সহজে কি সে ঘটনা হবে ? ॥

পয়ার।

করিতেছ যত সব, বস্তু দরশন।
বিচারেতে জানো তার, বিশেষ কারণ ॥
কাম, ক্রোধ, আদি যত, রিপু আর আর।
সমভাবে, করে সবে, কল্যাণ তোমার ॥
শুভকর্ম্মে কামনা, করিবে তুমি যত।
ততই ক্রমেতে তুমি হইবে উন্নত ॥
কুকর্ম্মে হইলে কামি, অধোগামি হবে।
পূর্ব্বের সঞ্চিত যত কিছু নাহি রবে ॥
ধর্ম্ম-কর্ম্মে লোভ যত, হইবে প্রবল।
ক্রমেই তোমার তত, হইবে মঙ্গল ॥
অধর্ম্মে করিলে লোভ, নরকে গমন।
কিছু আর থাকিবে না, সঞ্চিত সাধন ॥
ক্রোধেতেই রক্ষা হয়, মান, প্রাণ, ধন।
এই হেতু এ ক্রোধের, হয়েছে সৃজন ॥
অত্যাচারি, হত্যাকারি, আসিবে যখন।
সে সময়ে বাহুবলে, করিবে শাসন ॥
হন্তা আর দস্যু নাশে, পাপ নাহি হয়।
ইহকাল, পরকাল, দুইকালে জয় ॥
ক্রোধের অধীন হোয়ে, অনিষ্ট যে করে।
তার মত পাপি নাই ভবের ভিতরে ॥
অস্ত্রবলে আপনার, প্রাণ রক্ষা হয়।
সে অস্ত্রে তো নিজ গলা কাটা বিধি নয় ॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, যেরূপ প্রকার।
তাই বুঝে কর্ম্ম কর, ভাবনা কি আর ॥
পাইবে বিমল সুখ, দুখ নাহি রবে।
"ত্রিবিধ আনন্দ"* ধন, ভোগ হবে তবে ॥
"বিষয়-আনন্দ" আর "বিদ্যানন্দ" যাহা।
সুকার্য্য-সাধন গুণে, প্রাপ্ত হবে তাহা ॥
ব্রহ্মানন্দ পাইবার, উপায় যা হয়।
সাধন-সামগ্রী তার করহ সঞ্চয় ॥
দেখিবার বস্তু নয়, দেখ আঁখি মেলে।
না হোলে সাধন ধন, সে ধন কি মেলে ? ॥
ক্রমে ক্রমে উঁচু হোয়ে, উঁচু যেতে হয়।
একেবারে লাফ মেরে, উঠিবার নয় ॥
যখন হইবে তার, সঙ্গতি তোমার।
অধিকারী হোয়ে পাবে, সেই অধিকার ॥
একেবারে দুঃখ নাশ, বলিতেছ যারে।
ওরে বাপু, "ব্রহ্মানন্দ" বেদে বলে তারে ॥
শুন বাছা, যিনি সেই, সত্য সনাতন।
রাখেন্ কি সে আনন্দ, করিয়া গোপন ? ॥
অতিশয় নিকটেই, আছে বাপু তাই।
জ্ঞাননেত্র নাই বোলে, দেখিতে না পাই ॥
সে প্রকার কর তুমি, করিতে যা হয়।
অবশ্য পাবেই পাবে, পাবার সময় ॥

পুত্র। প্রশ্ন ॥ হে পিতঃ ? যদি ইহাই নিশ্চিত হইল, যে, জগদীশ্বর প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কোনো বস্তুরই সৃষ্টি করেন নাই, এবং কাম ক্রোধাদি বৃত্তিপাশেও আমারদিগকে

* ত্রিবিধ আনন্দ।—বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ।

বন্ধন করিয়া রাখেন নাই, সকল দুঃখ সম্বন্ধরহিত ব্রহ্মানন্দও আমারদিগের অতি নিকটেই বিদ্যমান আছে, আমরা চেষ্টা করিলে অনায়াসেই ঐ মহানন্দ ভোগের অধিকারী হইতে পারি, তবে কি জন্য প্রায় সকল জীবই অশেষ দুঃখসংসর্গ-দূষিত-ক্ষণিক-সাংসারিক-সুখ ভোগ-প্রত্যাশায় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বিবিধোপায়াবলম্বন পূর্ব্বক মহায়াসজন্য শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছে ? কি জন্যই বা ইহারা সকলে একবাক্য হইয়া নিরতিশয়ানন্দলাভ করিতে চেষ্টা করে না ? ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, জীবমাত্রেই সুখি হইতে প্রার্থনা করে, কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং যে উপায়াবলম্বন করিলে একেবারে দুঃখ-সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া চরমে পরমসুখ লাভ হয়, তাহাতে সকলেরই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, অথচ একটি জীবও এমত দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি বিষ-মিশ্রিত অমৃতের ন্যায় দুঃখ-সংস্রব দূষিত-সাংসারিক-সুখে সর্ব্বতোভাবে বিতৃষ্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে নিয়মিতরূপে চেষ্টা করিতেছে, অতএব অবশ্য জীবের নিরতিশয়ানন্দ লাভে কোনো গুরুতর প্রতিবন্ধক বা অনির্ব্বচনীয় দৈববিড়ম্বনা থাকিতে পারে, তাহা না হইলে কখনই আমারদিগের এমত দুর্দ্দশা ঘটিত না, যদিও আমি ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতেছি, যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর কখনই আমারদিগকে দুঃখি করিতে ইচ্ছা করেন না, সর্ব্বপ্রকারেই যে আমরা সুখি হই ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং আমরা স্বভাব-দোষেই নিরর্থক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে তাঁহার কোনো দোষ নাই, তথাপি ইহাও বলিতে পারি না, যে, আমরা বিনা কারণেই সুখজনক বিষয়ে বিরত হইয়া দুঃখকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। হে গুরো! দুঃখের কথা কি কহিব ? আমরা কোনো কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অনবরত দুঃখভোগ করিয়া এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকি, যে, আর কখনই এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না, আবার যেন কেহ আমারদিগের কেশাকর্ষণ করিয়া সেই বিষয়ে প্রবর্ত্ত করে, আমরা অনিচ্ছা পূর্ব্বক বিষ্টি-গৃহীত পুরুষের ন্যায় ঐ অনিষ্টকর বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে থাকি, এইরূপে কখনো স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কখনো বা পরেচ্ছা-পরতন্ত্র হইয়া হিতবোধে অহিতাচরণ করি, এবং অহিত বোধে হিত হইতে বিরত হই, অবশ্যই ইহার কোনো বিশেষ কারণ আছে, অথচ সেই কারণটি আমার বুদ্ধিগম্য হইতেছে না, কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

পদ্য।

প্রণিপাত করি পিতে, চরণে তোমার।
ক্ষমা কর অপরাধ, সকল আমার॥
আপনি করেন প্রভু, এরূপ জল্পনা।
ভাল মন্দ যত কিছু, মনের কল্পনা॥
স্বভাবেতে সুশোভিত বস্তু সমুদয়।
প্রিয়াপ্রিয় ঈশ্বরের, নিরূপিত নয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি, বৃত্তিপাশ দিয়া।
রাখেন্ না কভু তিনি, বন্ধন করিয়া॥
আপনার কর্ম্মপাশে, বদ্ধ আছে জীব।
কর্ম্মপাশ, হোলে নাশ, জীব হয় শিব॥
নিকটেই ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যমান আছে।
তাপ নাহি যেতে পারে, কভু তার কাছে॥
সমুচিত সাধন, সঞ্চিত হোলে তার।
অনায়াসেই সেই সুখে, হয় অধিকার॥
আপনার বাক্যে যদি, না থাকে সংশয়।
এরূপ নিশ্চয় যদি, এরূপ নিশ্চয়॥
বল পিতে এ জগতে, কেন জীব সবে।
ক্ষণিক সুখের লোভে, ব্যগ্র হয় তবে ?॥
যে সুখ কেবলি হয়, দুখের আধার।
আদি-অন্ত দুদিগেই কষ্টভোগ সার॥
তাতেই ব্যাকুল হোয়ে, কেন জীব মরে ?।
কর্ম্মভোগ কোরে কেন, কর্ম্মভোগ করে ?॥
সুখের সে নয় যদি, সুখের সে নয়।
দেহে আর মনে কেন, এত কষ্ট লয় ?॥
দুখ আছে তায় যদি, দুখ আছে তায়।

মিছে কেন করিতেছে, অশেষ উপায় ? ॥
কি কারণ, অকারণ, দুখে কাল হরে ? ।
"ব্রহ্মানন্দ" লাভে কেন, যত্ন নাহি করে ? ॥
যে উপায়ে একবারে, দুখ পায় লয় ।
যে উপায়ে কেন সবে, ঐক্য নাহি হয় ? ॥
একেবারে পূরে যায়, চির মনোরথ ।
কেন তারা ছাড়ে সেই, প্রবৃত্তির পথ ? ॥
এমন পরমপথ করি পরিহার ।
কুপ্রবৃত্তি পথে কেন, বহে পাপভার ? ॥
এমন্ বিশ্বাস আছে, এমন্ বিশ্বাস ।
প্রাণিমাত্রে কোরে থাকে, সুখের আশ্বাস ॥
একান্তেই সাধে সবে, সুখের উপায় ।
কিছুতেই, কেহ, আর, দুখ নাহি চায় ॥
এমন নির্ম্মল সুখে, করিয়া নিবৃত্তি ।
বার বার কেন হয়, তাপেতে প্রবৃত্তি ? ॥
তাবতেই আশারথে, হইয়াছে রথি ।
প্রায় তো দেখিনি কারে, এপথের পথি ॥
সংসার-সুখেতে রত, সকলেরি মন ।
বিষমাথা-সুধা করে, সবাই ভোজন ॥
ইথেই সংশয়ে কই, আপনার কাছে ।
এবিষয়ে গুরুতর, বাধা কিছু আছে ॥
অবশ্যই আছে কোনো, দৈববিড়ম্বনা ।
নতুবা হইবে কেন, এমন ঘটনা ? ॥
বচনীয় নয় তাহা, প্রকাশিত নয় ।
পুন পুন, নহে কেন, হেন দশা হয় ? ॥
যদিও আমার মনে, হতেছে নিশ্চয় ।
ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কখনো এ নয় ॥
কেন না আপনি, যিনি, করুণানিধান ।
তিনি কি করেন কভু, দুখের বিধান ? ॥
কিছুতে না হয় ভবে, দুখের সঞ্চার ।
জীব সব সুখি হোক্, ইচ্ছা এই তাঁর ॥
আমরা অজ্ঞান তাই, না জেনে বিশেষ ।
স্বভাবের দোষে পাই, অনর্থক ক্লেশ ॥
তথাপি না দূর হয়, মনের সন্দেহ ।
অকারণে কোনো কিছু, করে না তো কেহ ॥
কেনই সে নিত্য-সুখে হইয়া বিরত ।
ইচ্ছায় অনিত্য সুখে, সদা হই রত ॥
কহিতে দুখের কথা, বিদরে হৃদয় ।
মনের প্রতিজ্ঞা কভু, স্থির নাহি রয় ॥
নিয়তই যে বিষয়ে, ভোগ করি দুখ ।
কোনো অংশে কিছুমাত্র, নাহি পায় সুখ ॥
তখন প্রতিজ্ঞা হয়, এমন প্রকার ।
প্রাণান্তেও এই কর্ম্ম, করিব না আর ॥
জোর কোরে গলাটিপে, কে যেন আসিয়া ।
তখনি তখনি দেয়, প্রবর্ত্ত করিয়া ।
এই আছে ক্ষান্ত হোয়ে, প্রতিজ্ঞা আসনে ।
কোথা হোতে আবার, প্রবৃত্তি আসে মনে ॥
কখনো বা, আপনার, ইচ্ছাপথে রই ।
পরইচ্ছা-পরতন্ত্র, কখনো বা হই ॥
হিতবোধে কভু করি, অহিত আচার ।
অহিত ভাবিয়া করি, হিত পরিহার ॥
ইহাতে কারণ এক, আছেই নিশ্চয় ।
সে কারণ আমার তো, জ্ঞানগম্য নয় ॥
অতএব কৃপা করি, কর উপদেশ ।
শুনিব বিশেষ আমি, শুনিব বিশেষ ॥

পিতা । উত্তর ॥ হে বৎস ! তুমি যে জীবের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা পূর্ব্বক বিবিধ প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইবে ইহা আশ্চর্য্য বিষয় নহে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণও ঐ সকল জীব-প্রবৃত্তির কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ কহেন ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানই জীব-প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ, অর্থাৎ যখন জীব কোনো একটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তাহার পূর্ব্বক্ষণে তাহার মনে এমত বোধ হইয়া থাকে, যে, এই কর্ম্ম করিলে আমার সুখ লাভ বা দুঃখ নিবৃত্তি অবশ্যই হইবে, সুতরাং এই কর্ম্ম আমার ইষ্ট-লাভের প্রতি-কারণ হইতেছে, ইহার দ্বারা কোনো অনিষ্ট হইতে পারিবে না, এই ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানের উদয় হইলেই তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, যতক্ষণ ঐ জ্ঞান না জন্মে ততক্ষণ জীব কোনোমতেই

কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব ইষ্ট সাধনতা-জ্ঞানই, যে জীব প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেহ কেহ যদিও জীব প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের কারণতা আছে, তথাপি ঐ জ্ঞানকে জাব-প্রবৃত্তির অসাধারণ কারণ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু যতক্ষণ জীব কোনো একটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার চরমফল পর্য্যন্ত লাভ না করে ততক্ষণ কোনোমতেই সেই বিষয়টি তাহার ইষ্ট-সাধন কি অনিষ্ট-সাধন তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে না, কেবল পরের দেখিয়া শুনিয়া অথবা উপদেশ বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করণের পূর্ব্বে তাহার ইষ্ট-সাধনতা নিশ্চয় করে, অতএব যদি ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞানকেই জীব-প্রবৃত্তির প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রোগী-পুরুষের কুপথ্য-সেবাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যেহেতু অপথ্য-সেবী পুরুষ কুপথ্য-সেবার পূর্ব্বে তাহার ইষ্টানিষ্ট ফলানুভব করিতে পারে না, কেহ তাহাকে কুপথ্য সেবা করিতে উপদেশও দেয় না, এবং কুপথ্যসেবা করিয়া যে কেহ আরোগ্য বা সুখ লাভ করিয়াছে ইহাও কখনো দেখে নাই, বরং কুপথ্য সেবা করিয়া যে অশেষ অনিষ্ট হয় তাহা শত শত বার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তৎকালেও তাহাকে সকলেই কুপথ্য-সেবা করিতে নিষেধ করিতেছে, এমত স্থলে কোনোমতেই ঐ রোগির ইষ্ট-সাধনজ্ঞান জন্মিতে পারে না। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে, লোভই রোগিকে কুপথ্য-সেবাতে প্রবৃত্ত করে, সুতরাং রোগির কুপথ্য-সেবা বিষয়ে লোভকেই প্রধান কারণ বলিতে হইবে, এবং কোনো কোনো তস্কর চৌর্য্যক্রিয়াতে রত হইয়া পুনঃ পুঃ কারাবাসাদি ঘটিত বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চৌর্য্যক্রিয়া যে তাহার সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট সাধন তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছে, অথচ আবার লোভ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ কর্ম্মেতেই প্রবৃত্ত হইতেছে, এস্থলেও লোভকেই প্রধান কারণ বলিতে হইবে, এইরূপে যখন কোনো কামুক পুরুষ পরভার্য্যা-গমন করিলে, যে, অশেষ অনিষ্ট হয় তাহা জানিয়া শুনিয়াও ঐ কদর্য্য মানসে পরগৃহে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার প্রবৃত্তির প্রতি কামকেই প্রধান কারণ বলিতে হইবে, এবং যখন কোনো ক্রোধী পুরুষ পরের প্রাণ নাশ করিলে যে, সেই অপরাধে স্বীয় প্রাণও নষ্ট হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া পরকীয় প্রাণ নাশে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার প্রবৃত্তির প্রতি-ক্রোধকেই প্রধান কারণ বলিতে হইবে, অতএব যদিও ইহারদিগের প্রবৃত্তির পূর্ব্বে কোনো কোনো অংশে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে হউক, কিন্তু ঐ জ্ঞান যে, কাম ক্রোধাদির অপেক্ষায় প্রধান কারণ এমত বলা যাইতে পারে না। কোনো পণ্ডিত কহেন "কাম ক্রোধাদিও জীব-প্রবৃত্তির মুখ্যকারণ নহে, যেহেতু যখন ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে কোনো পরাধীন ভৃত্য যখন তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পরের প্রাণ নাশ করিতে আজ্ঞা করে তখন ক্রোধাধীন না হইয়াও সে পরপ্রাণ নাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যখন তাহার প্রভু কামাধীন হইয়া পরস্ত্রী হরণ করিতে অনুমতি করে তখন ঐ ভৃত্য কামাতুর না হইয়াও অনায়াসেই পরভার্য্যা হরণ করে, যখন তাহার প্রভু লোভের বশীভূত হইয়া পরধন হরণ করিতে আদেশ করে তখন ঐ ভৃত্য লোভাক্রান্ত না হইয়াও পরস্ব হরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব জীব-প্রবৃত্তির প্রতি যে, কাম ক্রোধাদিই মুখ্যকারণ এমত বলা যাইতে পারে না, জগদীশ্বরের ইচ্ছাই জীব-প্রবৃত্তির মুখ্যকারণ, তিনি জীবমাত্রেরই প্রভু ও নিয়ন্তা, জীবের হৃদয়ে থাকিয়া যখন যাহাকে যে বিষয়ে যেরূপে প্রবৃত্ত করেন তখন সেই জীব সেই বিষয়ে সেইরূপেই প্রবৃত্ত হয়, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে পারে না" কোনো কোনো পণ্ডিত কহেন "পরমেশ্বরীয় ইচ্ছাও জীব প্রবৃত্তির মুখ্যকারণ হইতে পারে না। যদিও জগদীশ্বর জীবমাত্রেরই জনক, পালক, প্রভু, নিয়ন্তা, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু যেমত সামান্য প্রভু কখনো

কামের, কখনো ক্রোধের, কখনো বা লোভের বশীভূত হইয়া স্বীয় ভৃত্যকে তদুপযুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, তদ্রূপ তিনিও যে কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া জীব সকলকে নানা বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেছেন এমত কখনই হইতে পারে না, বিশেষতঃ পরমেশ্বরই যদি জীব-প্রবৃত্তির মুখ্যকারণ হইতেন তাহা হইলে কোনো একটি জীবও অশুভ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত না, কখনই জীব কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃখভোগ করিত না, তাহারদিগের কোনো ক্রিয়াও বিফলা হইত না, অর্থাৎ যে পরমকারুণিক পরমেশ্বর বিনা স্বার্থে আমারদিগকে শিশু সন্তানবৎ অনবরত লালন পালন করিতেছেন, তিনি কি আমারদিগের প্রতি এত নির্দ্দয় হইতে পারেন, যে, নিরর্থক আমারদিগকে অশুভ-বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া স্বীয় দয়াময় নামে কলঙ্কধ্বজা তুলিয়া দিবেন? আহা! যাঁহার অপ্রতিহত জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বিরচিত হইয়াছে তিনি কি ইহাও বুঝিতে পারেন না, যে, কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দুঃখি হইব, কোন্ বিষয়টি আমারদিগের কর্ত্তৃক বহুযত্নেও সুসিদ্ধ হইবে না, যদি জগদীশ্বরই আমারদিগকে প্রবৃত্ত করেন তবে কদাচই আমরা কুৎসিত-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দোষি বা নিন্দনীয় অথবা দণ্ডনীয় হইতে পারি না। আহা! নিরপেক্ষ জগৎপিতা কি এমত হইতে পারেন, যে, তাঁহার এক সন্তানকে শুভ-বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া সুখী করিবেন অপর তনয়কে অশুভ-বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখ ভোগের অধিকারী করিবেন? অতএব কোনোমতেই পরমেশ্বরকে জীব-প্রবৃত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না, জীব প্রবৃত্তির প্রতি-স্বভাবই কারণ, স্বভাব বশতই জীব সকল স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, যে ব্যক্তি যেমত স্বভাবাক্রান্ত হইয়া জীব-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই স্বভাবানুসারেই কর্ত্তব্য-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কেহই স্বভাবের অন্যথা করিয়া কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না" কোনো কোনো পণ্ডিত কহেন "স্বভাব নামক স্বতঃসিদ্ধ কোনো একটি বস্তুই নাই, কখনো স্বভাব শব্দে বস্তুর পূর্ব্বতন কারণাবস্থাকে, কখনো বস্তুর স্বরূপকে, কখনো পরমেশ্বরীয় নিয়মকে, কখনো বা বস্তুর কোনো গুণ বিশেষকে, কখনো বা জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকে, কখনো বা ঐ কর্ম্ম-জন্য সংস্কারকে নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতস্থলে জীবের অথবা জীবশরীরের কারণাবস্থা অর্থাৎ চৈতন্য, কিম্বা সত্ব রজ স্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি, অথবা জীবের স্বরূপ, পরমেশ্বরীয় নিয়ম, বস্তুর গুণ-বিশেষ ইহারা কেহই জীব-প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে না, যেহেতু উহারা সকলেই একরূপ, বিবিধপ্রকার প্রবৃত্তির প্রতি কখনই একরূপ কারণ হইতে পারে না, কারণের বিচিত্রতাই কার্য্যবৈচিত্র্যের হেতু, কখনই এক বর্ণ সুবর্ণ হইতে শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, বিবিধ বর্ণকার্য্য জন্মিতে পারে না, অতএব জীব-প্রবৃত্তির প্রতি জীবের প্রাক্তন-কর্ম্ম, বা কর্ম্ম-জন্য-সংসারই প্রধান কারণ। যে জীব পূর্ব্বে যেমত কর্ম্ম করিয়াছে পরেও সেই কর্ম্ম-জন্য সংস্কারের বশীভূত হইয়া তৎস্বজাতীয় ক্রিয়াতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-জন্য-সংস্কারই উত্তর কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রতি সর্ব্বাগ্রগণ্য কারণ, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, অতএব হে প্রিয়তম! এইরূপে যখন সর্ব্বজ্ঞকল্প মহাত্মাগণও জীব প্রবৃত্তির কারণ নিরূপণ করিতে গিয়া নানা কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ জীব, যে, উহাতে বিমুগ্ধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পূর্ব্ব-প্রদর্শিত ইষ্টস্বাধীনতা প্রভৃতি সকল গুলিই জীব-প্রবৃত্তির কারণ, উহাদিগের একটির অভাব হইলেও জীব কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না, এই পৃথিবীতে তুমি যত বস্তু দর্শন করিতেছ, ইহার মধ্যে কোনো একটি বস্তুও এমত নাই, যেবস্তু কেবল একটি কারণ হইতে জন্ম লাভ করে, সকল বস্তুই কতগুলি কারণ একত্র হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমত কোনো

কুম্ভকার একটি কুম্ভ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল একমাত্র মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়াই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, অবশ্যই তাহাকে দণ্ড, চক্র, সলিল, সূত্র প্রভৃতি কতগুলি কারণের আহরণ করিতে হয়, তদ্রূপ যখন যে বস্তুই উৎপন্ন হউক, সকল বস্তুতই সত্তালাভ করিতে কারণ সমূহের অপেক্ষা করে, সুতরাং জীব-প্রবৃত্তিও পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ বশতই হইয়া থাকে, যদিও মহর্ষিগণ ঐ সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্ব প্রধান, ইহা নিরূপণ করিতে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন, করুন, তদ্দর্শনে বিমুগ্ধ হওয়া উচিত নহে, ঐ বিস্তৃত বাগ্‌জাল কেবল জীবের বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত হওনের যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, প্রাচীনগণের প্রদর্শিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মপথে বুদ্ধি-বৃত্তি চালনা করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির জাড্য দূর হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তি প্রখরা হইয়া উঠে, তাহা হইলে তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে আর কোনো প্রয়াস পাইতে হয় না, বস্তুত কারণের মধ্যে কোনো একটি কারণের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নিরূপণ করাই দুঃসাধ্য, যেমত কোনো ব্যক্তি দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, তাহার তৃপ্তির প্রতি দুগ্ধ ও অন্ন এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান কারণ, বহা নিরূপণ করিতে গেলে যখন তৃপ্ত-পুরুষ কহে, আমি দুগ্ধ দিয়া অন্ন ভোজন করিয়াছি, তখন অন্নের প্রাধান্য ও দুগ্ধের অপ্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, যখন কহে অন্ন দিয়া দুগ্ধ খাইয়াছি, তখন দুগ্ধের প্রাধান্য অন্নের অপ্রাধান্ন প্রতীত হয়, অথচ দুগ্ধ ও অন্ন এতদুভয়ের মধ্যে একটির অভাব হইলেই, যে, তাহার তাদৃশ তৃপ্ত জন্মিত না, তাহাতেও কোনো সংশয় নাই, অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিকৃত স্থলেও সময়ে সময়ে বিষয় বিশেষে কারণ বিশেষের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য প্রতীয়মান হইলেও জীব-প্রবৃত্তির প্রতি, যে, উহারা সকলেই কারণ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, অর্থাৎ জীব নিবহ পূর্ব্বে যেমত যেমত কর্ম্ম করিয়াছে সেই সকল প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে তদীয় ফলভোগ করিতে পরমেশ্বর জীব সকলকে তদুপযুক্ত বিষয় বিশেষে প্রবৃত্ত করেন এবং তখন জীবের স্বভাব অর্থাৎ প্রবৃত্তিশীলারজো-গুণাত্মিকা-প্রকৃতিও তাহাতে সাহায্য করে, সুতরাং জীবগণও ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কোনো প্রকারেই হউক সেই বিষয়-বিষয়ক ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে জীবের সেই বিষয়ে সম্ভবমত কামাদির উদ্রেক হইয়া উঠে, কামাদির উদ্রেক হইলেক জীব সেই বিষয়ে কোনো এক প্রকার সুখের অভিলাষী হইয়া প্রবৃত্ত হয়। হে প্রিয়তম! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি জীব-প্রবৃত্তির প্রতি তাহার প্রাক্তনকর্ম্ম-জন্য সংস্কার কারণ না হইত তবে সকল জীবই একরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত, কোনোমতেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বশীভূত হইতেও পারিত না, যেহেতু তাহারদিগের শরীর-ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি সকলই এক রূপ অথচ একরূপ কারণ হইতে নানারূপ কার্য্য হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে যেরূপ ক্রিয়া করিয়া ,থাকে সেই ব্যক্তি ঐ প্রাক্তন-কর্ম্ম-বশতঃ পরেও তৎস্বজাতীয় ক্রিয়াতেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হয়, কখনই জীব এমত একটি কর্ম্মও করিতে পারে না, যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কখনই তৎকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় নাই, বিশেষতঃ যদি প্রাক্তন-কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরকে জীবের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মহিমাচন্দ্র বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য কলঙ্কাঙ্কিত হইয়া উঠে। ইহা কখনই সম্ভব হয় না, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর বিনাপরাধে এক ব্যক্তিকে নিয়ত অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া বিবিধ দুঃখগ্রস্ত করিবেন, অন্য ব্যক্তিকে বিনা কারণে নিয়ত সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সমূহ সুখভাজন করিবেন। যখন কোনো লৌকিক প্রভুই এমত নির্দ্দয় ও পক্ষপাতী হইতে পারে না তখন কিরূপে ত্রিলোক প্রভু ঐ রূপ গুরুতর দোষগ্রস্ত হইতে পারেন? অতএব অবশ্যই ইহা বলিতে হইবে, যে, যেমত

কোনো রাজা বিবিধ পদে নিয়ত-নিযুক্ত স্বীয় ভৃত্যগণের কর্ম্মানুসারে বেতন, দান দণ্ড বিধান ও পুরস্কার করিয়া কখনই পক্ষপাতাদি দোষগ্রস্ত হয়েন না, তদ্রূপ জগৎপতিও জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে শুভ বা অশুভ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া কোনোরূপ দোষভাগী হয়েন না, এইরূপে যেমত পরমেশ্বর জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া তাহারদিগকে কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে জীব-প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার না করিয়া কেবল প্রাক্তন-কর্ম্মকেও জীবপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্বতন কর্ম্ম সমূহ স্বীয় স্বীয় ফলভোগ-কালের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়, উহারদিগের এমত ক্ষমতাই নাই, যে, উহারা স্বয়ং সামঞ্জস্যরূপে স্ব স্ব ফল বিভাগ করিয়া দিতে পারে, অবশ্য একটি সর্ব্বজ্ঞ-চেতন পুরুষের অপেক্ষা করে, যিনি জীবের ক্রিয়াকালে সাক্ষীরূপ থাকিয়া ফলভোগ-কালে কার্য্যানুরূপ ফল বিভাগ করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন, যদি এমত বিবেচনা করা যায়, যে জীব স্বয়ংই চেতন পুরুষ, তাহাকে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে কি জন্য পুরুষান্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে? যদি কোনো এক চেতন পুরুষের এমত সামর্থ্য থাকে যে তিনি জীবের কর্ম্মানুসারে ফল বিভাগ করিয়া দিতে পারেন, তবে কি জন্যই বা জীব স্বয়ং চেতন পুরুষ হইয়াও স্বীয় কর্ম্ম-ফল বিভাগ করিয়া লইতে সামর্থ হইবে না? এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু যখন জীব প্রাতঃকালে যে কর্ম্ম করে সায়ংকালে তাহাই বিস্মৃত হইয়া যায়, তখন তাহার জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্ম রাশি কখনই স্মৃতিগোচর হইতে পারে না, বিশেষতঃ যদি জীবের স্বকর্ম্ম ভোগে স্বাধীনতা থাকিত তবে যে সকল কর্ম্মের ফল কেবল সুখময় সেই সকল কর্ম্মেরই ফলভোগ করিত, কখনই, যে কর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ করিতে হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইত না, অতএব অবশ্যই জীব ভিন্ন কোনো সর্ব্বজ্ঞ চেতন পুরুষকে জীব-প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তিনি নিরপেক্ষভাবে জীবের কর্ম্মানুসারে দণ্ড বা পুরস্কার করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হয়েন। উপরিভাগে যেমত জীব-প্রবৃত্তির প্রতি ঈশ্বরেচ্ছা ও প্রাক্তন-কর্ম্মের অপরিহার্য্য কারণত্ব প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ অবশ্য জীবের স্বভাবকেও ঐ বিষয়ের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যদি জীবের প্রবৃত্তি-স্বভাব না থাকিত, তবে কেহই তাহাকে কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না, যেমত যন্ত্র-যোগে স্নেহ-স্বভাব তিল সর্ষপাদি নিষ্পীড়ন করিলে তৈল লাভ হয় বলিয়া যদি পৃথিবীস্থ সমস্ত শিল্পী একত্র হইয়া যন্ত্রযোগে বালুকা নিষ্পেষণ করিতে থাকে, তবে কি কখনো বালুকা হইতেও এক বিন্দু তৈল নির্গত হইতে পারে? তাহা কখনই হয় না। অতএব বস্তুস্বভাবকে সকল বিষয়েই একটি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে জীব যখন যে বিষয়েই প্রবৃত্ত হউক, তখন সেই বিষয়ে তাহার অবশ্যই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান ব্যতীত কখনই জীব কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, যদিও কুপথ্য সেবী পুরুষ কুপথ্য সেবা করিলে, যে, তাহার অশেষ অনিষ্ট হইতে পারে ইহা বিশেষরূপে জানিয়াও কুপথ্য সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, হউক, তথাপি তাহার যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না জন্মিয়াই কুপথ্য-সেবাতে প্রবৃত্তি হয় এমত নহে, বস্তুতঃ ঐ রোগী তাৎকালিক দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা নিবৃত্তি-জনিত সুখকে এতই গুরুতর ইষ্টবোধ করে, যে, ঐ সুখের সহিত তুলনা করিয়া ভাবি সকলপ্রকার অনিষ্টকে অনিষ্ট মধ্যেই গণনা করে না, সুতরাং তাহার ইষ্টসাধনতাজ্ঞান জন্মিবার কোনো বাধাই রহিল না, এইরূপে জীব যখন যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তখন তদ্বিষয়ে তাহার যে কোনো প্রকারেই হউক, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান হইয়াই থাকে, তাহা হইলেই সেই বিষয়ে কামাদির উদ্রেক হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে,

অতএব হে প্রিয়তম ! জীব-প্রবৃত্তির প্রতি তদীয় প্রাক্তন-কর্ম্ম প্রভৃতি সকল গুলিই স্ব স্ব প্রধান কারণ, উহাদিগের মধ্যে একটির অভাবেও জীবের কোনো বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারিত না তাহাতে আর কোনো সংশয় করা যাইতে পারে না।

পদ্য।

প্রাণাধিক প্রিয়তম, হও তুমি সোঝা।
সোঝা হোলে বোঝা যায়, এতে নহে বোঝা॥
ক্রমে ক্রমে উপদেশ, করিতেছি যাহা।
স্বীকার করিয়া তুমি, মানিতেছ তাহা॥
এইরূপে সুধাইলে, সংশয় না রবে।
এখন্ পেয়েছি হাতে, পথে এসো তবে॥
ইচ্ছা আর অনিচ্ছায়, পরের ইচ্ছায়।
জীব যত কর্ম্ম করে, সন্দেহ কি তায় ?॥
এ, যে, বাপু, বিস্ময়ের, বিষয় তো নয়।
কেন তায় এত তবে, হতেছে বিস্ময় ?॥
যতদিন না বুঝিবে, নিগূঢ় তাৎপর্য্য।
ততদিন মুগ্ধ হবে, এ নহে আশ্চর্য্য॥
পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানি, মহাত্মা যে সব।
করেছেন এবিষয়ে, কত অনুভব॥
নিয়তই যুক্তিযোগে, তত্ত্ব নিরূপণে।
সকল সংশয় ছেদ, করিলেন মনে॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু, করিয়া উদ্দেশ।
করেছেন নানাবিধ, হেতুর নির্দ্দেশ॥
শাস্ত্রমতে যুক্তিমতে, হয়েছে সন্ধান।
প্রবৃত্তির হেতু ইষ্ট সাধনতা-জ্ঞান॥
দুখের বিনাশ হোয়ে, সুখ যাতে পায়।
জীবের প্রবৃত্তি যেন, সেদিগেই ধায়॥
যখন করিবে কোনো, ক্রিয়ার-সাধন।
আগে তার এপ্রকার, করে আলোচন॥
যদি করি এই কর্ম্ম, পাব তায় সুখ।
ইথে আর ঘটিবে না, কোনোরূপ দুখ॥
যদবধি এ জ্ঞানের, না হয় উদয়।
তদবধি কিছুতে কি, প্রবৃত্ত সে হয় ?॥
লাভের স্থিরতা বোধ, হইলে অন্তরে।
ক্ষণমাত্র, তাহে আর, বিলম্ব কি করে ?॥
শিব-সাধনতা মাত্র, হেতু জেনো তার।
সন্দেহ কি আর, তাহে, সন্দেহ কি আর ?॥

কোনো কোনো মহাশয়, কহেন এমন।
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান, যদিও কারণ॥
কিন্তু তাহা কোনোমতে, না হয় প্রধান।
সাধারণ বোলে তার, দিই অভিধান॥
কোনো জীব, কোনো কর্ম্মে করিয়া প্রবেশ
যত ক্ষণ নাহি পায়, ফল তার শেষ॥
ততক্ষণ শুভাশুভ, না হয় নিশ্চয়।
কিসে হবে ইষ্টসাধনতা জ্ঞানোদয় ?॥
নয়নে পরের ক্রিয়া, করে দরশন।
শ্রবণে পরের ক্রিয়া, করিছে শ্রবণ।
নহে কারো উপদেশ, করিয়া গ্রহণ।
বিষয়ে প্রবৃত্তি পায়, যত জীবগণ॥
স্থিররূপে উপকার, না জেনে নিশ্চয়।
ইষ্ট-লাভ হবে ইহা, করিয়া প্রত্যয়॥
প্রবেশের আগে করে, এমত বিচার।
অবশ্যই এই কর্ম্ম, উচিত আমার॥
যাহাতে সহজে হয়, দোষের সাধন।
প্রাণি প্রবৃত্তির সে কি, প্রধান কারণ ?॥
এ প্রমাণ কভু নয়, প্রমাণের মত।
স্বভাবত দেখা যায়, দোষ ইথে কত॥
এরূপ সিদ্ধান্ত যদি, হইত নির্যাস।
রোগির কুপথ্যে কভু, হতো না প্রয়াস॥
যেজন কুপথ্য করে, ইচ্ছা অনুসারে।
ভাল, মন্দ, আগে তার, জানিতে না পারে।
তখন কি থাকে তার, ফলের বিচার।
সেরূপ কুপথ্য করে, রুচি যাহে যার॥
কুপথ্যের উপদেশ, কেহ নাহি করে।
আপন লোভের দোষে, আপনি সে মরে॥
কুপথ্যের দোষ নয়, অগোচর তার।
দেখিতেছে, শুনিতেছে, অশেষ প্রকার॥
যে করে অপথ্যভোগ, ভোগে সেই দুখ।
কখনো কি পায় সেই, স্বাস্থ্যতার সুখ ?॥
অপথ্য সেবনে করে, সবাই বারণ।

তথাচ করে না সেই, নিষেধ শ্রবণ ॥
এখানে রোগির দেখ, রোগের সময়।
ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান, কখনো কি হয় ? ॥
আমার বিচারে এই, স্থির নিরূপণ।
লোভ হয় কুপথ্যের, প্রধান কারণ ॥
লোভ হোলে বলবান, বুদ্ধি করি নাশ।
অপথ্য সেবনে দেয়, পুন পুন আশ ॥
তস্কর প্রভৃতি দেখ কুজন সকল।
বার বার ভুগিতেছে, কুকর্ম্মের ফল ॥
"ধনঞ্জয় মন্ত্রে" রাজা, অভিষেক করে।
বেড়ী পায় কারাগারে, খেটে খেটে মরে ॥
কারা-মুক্ত হোয়ে নিজ, গৃহেতে আসিয়া।
তখনি তখনি পুন, চুরি করে গিয়া ॥
ভালরূপে সেতো জানে,কুকর্ম্মের ফল।
তথাচ তাহার লোভ, ক্রমেই প্রবল ॥
কিছুতেই নাহি যায়, সে প্রবৃত্তি তার।
কাজেই কহিতে হবে, লোভ মূলাধার ॥
গো-মেষ, ছাগল আদি, তৃণভোজি যারা।
কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া, শস্য খায় তারা ॥
বার বার ধরিয়া, প্রহার করে চাসা।
তথাচ না ছাড়ে সেই শস্যভোজ আশা ॥
ইহাতে লোভের কার্য্য করিব স্বীকার।
লোভই প্রবৃত্তি দেয়, এরূপ প্রকার ॥
পরপ্রিয়া-ভোগে রত, পুরুষ যখন।
সে সময়ে কাম হয়, প্রবৃত্তি কারণ ॥
তাহাতে অশেষ পাপ, সে তো জানে মনে।
জানে তো পাইবে দণ্ড, রাজার শাসনে ॥
তবু যে তাহার মনে, ধৈর্য্য নাহি থাকে।
কামের প্রবৃত্তি তারে, অন্ধ কোরে রাখে।
অবিকল এইরূপ, ক্রোধির স্বভাব।
ক্রোধের লালসা করে, বোধের অভাব ॥
বধিলে পরের প্রাণ, নিজ প্রাণ যাবে।
কখনো কখনো সে তো, মনেতে তা ভাবে ॥
তবু যে ক্রোধের কার্য্য, সাধে স্বেচ্ছাচারে।
দশায় পেয়েছে তারে, কি করিতে পারে ? ॥
অপর অপর হেতু, থাকে ইথে থাক্ ॥
সে বিষয়ে মিছে কেন, ব্যয় করি বাক্ ? ॥
লোভ, কাম, ক্রোধ হবে, মূল হেতু তার।
নিশ্চিত জানিবে ইথে অন্যথা কি আর ? ॥

*

বহু বিবেচনা করি, কোনো কোনো ধীর।
বিচারেতে করেছেন, এই মত স্থির ॥
কাম আদি প্রবৃত্তির, হেতু যদি নয়।
হয় হোক্ ফলে তারা, মুখ্য হেতু নয় ॥
যে কারণ সুগোচর, হতেছে প্রত্যক্ষ।
অবশ্য প্রমাণে হবে, প্রবল সে পক্ষ ॥
সকলের অবস্থা তো, না হয় সমান।
সহজে অবল কেহ, কেহ বলবান ॥
তারাই তো প্রভু হয়, ধনশালি যারা।
যাদের না থাকে ধন, দাস হয় তারা ॥
পরাধীন যারা তারা, আজ্ঞাধীন হয়।
দীনভাবে আজ্ঞা বোয়ে, দিন করে ক্ষয় ॥
কামাতুর প্রভু তার, হারা হোয়ে জ্ঞান।
পরনারী হরণেতে আজ্ঞা করে দান ॥
কামাধীন না হোয়ে সে, প্রভু আজ্ঞা মানে ;
বল করি পরবধূ, ধোরে ধোরে আনে ॥
ক্রোধী প্রভু যে সময়ে, আজ্ঞা করে দান।
অমুকের মাথা কেটে, এখনিই আন ॥
নিজে নয় ক্রোধাধীন, তথাচ সে জন।
অনায়াসেই পরমুণ্ড করিছে ছেদন ॥
যে সময়ে লোভি প্রভু, আজ্ঞা দেন তায়।
অমুকের ঘর, বাড়ী, লুটে নিয়ে আয় ॥
নিজে নহে লোভশীল, কিন্তু সেই জন।
পরের সর্ব্বস্ব করে, তখনি হরণ ॥
অতএব স্থিররূপে, হয় অনুমান।
কামাদি কখনো নয়, কারণ প্রধান ॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু, যে জন যা কয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা তার, মূল হেতু হয় ॥
জগতের অধিপতি, পরমেশ যিনি।
সকল জীবের হন, নিয়ন্তাই তিনি ॥
সকলের হৃদয়েতে, করিয়া বিহার।
যখন প্রবৃত্তি দেন, যেরূপ প্রকার।
তখনি সে জীব করে, সেরূপ প্রকার।
করিতে অন্যথা তার, সাধ্য আছে কার

কোনো কোনো পণ্ডিতের, উক্তি এই হয়।
তা নয়, তা নয়, নয়, নয় নয় নয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু, হেতু নয় তার।
তা হইলে ঈশ্বরেতে, ঘটে ব্যভিচার॥
যদিও ঈশ্বর হন, সর্ব্ব মূলাধার।
জনক, পালক, প্রভু, নিয়ন্তা সবার।
এখানেতে হবে এই, করিতে বিচার।
সামান্য প্রভুর মত, কার্য্য নয় তার॥
কাম, ক্রোধ, লোভের, অধীন যিনি নন।
তিনি কি জীবের কভু, প্রবর্ত্তক হন ?॥
কোনোমতে কিছুতেই, হবার যা নয়।
মিছে মিছি যত লোক, কেনই তা কয় ?॥
যদ্যপি হতেন তিনি, প্রবৃত্তির মূল।
তবে তো জীবের মনে, হইত না ভুল॥
হইত শিবের আশা, সকলের মনে।
পেত না প্রবৃত্তি কেহ, অশিব-সাধনে॥
সকলে করিত ভবে, সুখেতে সঞ্চার।
কারো ভাগ্যে দুঃখভোগ হইত না আর॥
কখনই কারো ক্রিয়া, হোতো না বিফল।
সকলেই প্রাপ্ত হোতো, অভিমত-ফল॥
কৃপাময় পিতা হন, সেই ভগবান্।
সমুদয় জীব হয়, তাঁহার সন্তান॥
অপার কৃপার নিধি, সত্য সনাতন।
অস্বার্থে করেন যিনি, লালন-পালন॥
এমন সদয় যিনি, এমন সদয়।
তিনি কি কখনো হন, নিদয় হৃদয়॥
কদাচই নহে তাঁর, এমন বিধান।
বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি, করেন প্রদান॥
কিছুতে সম্ভবে একি, কিছুতে সম্ভবে।
অকলঙ্ক নামে তাঁর, কলঙ্ক যে হবে॥
বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব, বিরচনা যাঁর।
এরূপ কি, বিবেচনা হতে পারে তাঁর ?॥
ও কথা বলে না যেন, ও কথা বলে না।
তা হোলে তো কিছু আর, কথাই চলে না॥
নিরূপণে কর যদি, এরূপ বিচার।
তা হোলে তো কাণ্ডজ্ঞান, কিছু নাই তাঁর॥
এমন অজ্ঞান, সে কি, এমন অজ্ঞান ?।
জেনে শুনে সন্তানেরে, দুখ করে দান॥
সকলেই অন্তর্যামী, আত্মা যেই হয়।
কিবা সাধ্য কি অসাধ্য, জ্ঞাত সেই নয় ?॥
সকল সমান যার, সকল সমান।
এরে সুখ, ওরে দুখ, সে করে না দান॥
নিরপেক্ষ হন যিনি, নিরপেক্ষ হন।
প্রবৃত্তির হেতু তিনি, নন কভু নন॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির প্রতি, "স্বভাবই" মূল।
কিছু নাই ভুল তায়, কিছু নাই ভুল॥
স্বভাবের বশ জীব, স্বভাবেই চরে।
যেরূপ স্বভাব যার, সে রূপ সে করে॥
যেরূপ স্বভাব লোয়ে, যে এসেছে ভবে।
সেরূপেতে দেহযাত্রা, সাঙ্গ তার হবে॥
কোন্ জ্ঞানী করেছেন, এমন নির্ণয়।
স্বভাবের শক্তি কোথা, স্বতসিদ্ধ নয়।
স্বভাবের ভাব দেখ, বিশেষ বিশেষ।
এক রূপে কখনো সে, না হয় নির্দ্দেশ॥
কেহ কয় ঈশ্বরীয়, নিয়ম যা হয়।
স্বভাব তারেই বলি, জানিবে নিশ্চয়।
কেহ কয় পূর্ব্বকৃত, কর্ম্ম যাহা হয়।
স্বভাব নামেতে দিই, তার পরিচয়॥
কেহ কয়, ক্রিয়াজন্য, সমস্কার যাহা।
তারেই "স্বভাব" বলি, অন্য নয় তাহা॥
কেহ কয়, এ স্বভাব, বস্তুর স্বরূপ।
কেহ কয়, তাহা নয়, আর এক রূপ॥
স্বভাব তো, এককালে, এক রূপ নহে।
সময়ে সময়ে তারে, নানারূপ কহে॥
ত্রিগুণা প্রকৃতি আদি, জীবের স্বরূপ।
ঈশ্বরের নিয়মাদি, যত যত রূপ॥
বস্তুগুণ, "কারণ অবস্থা" আদি করি।
সকলেই রহিয়াছে, একরূপ ধরি॥
প্রবৃত্তি তো, কখনই, একরূপ নয়।
প্রচুর প্রবৃত্তি-পর, প্রাণি সমুদয়॥
স্বভাবের এক ভাব, ভেবে দেখ মনে।
প্রবৃত্তির হেতু তবে, সে হবে কেমনে ?॥
স্বরূপ, যে, সরূপেই-স্বরূপ প্রকাশে।
কিছুমাত্র, শক্তি নাই, পরভাস ভাসে॥

সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা, সুবর্ণেই রয়।
শ্বেত, শ্যাম, নীল, আদি, বিবর্ণ না হয়॥
চিত্রের বিচিত্র ভাব, চিত্রই নির্ণিত।
এক বর্ণে নানা বর্ণ, না হয় চিত্রিত॥
জীবের "প্রাক্তন-কর্ম্ম" কিম্বা সমস্কার।
প্রবৃত্তির মূল হেতু, এই জেনো সার॥
এই তত্ত্ব নিরূপিত, বিশেষ বিচারে।
ইহাতে সংশয় আর, কি হইতে পারে?॥
পূর্ব্বেতে করেছে কর্ম্ম, যেরূপ প্রকার।
সেই কর্ম্মে জন্মেছে, যেরূপ সমস্কার॥
তাহারি হইয়া বশ, জীব শত শত।
অদৃষ্টের অনুসারে, কর্ম্ম করে যত॥
আগে আগে কর্ম্ম করে, যেরূপ প্রমাণে।
প্রবৃত্তি প্রবলা পরে, সেই পরিমাণে॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম, অধিক কি কব?।
অতিশয় সুকঠিন, এই অনুভব॥
এ সব সর্ব্বজ্ঞ সম, মহাজ্ঞানবান্।
করেছেন, নানারূপে, নানা অনুমান॥
জ্ঞান-শক্তি প্রভাবেতে, যত বড় যিনি।
তত দূর নিরূপণ, করিলেন তিনি॥
তাঁহারাই হয়েছেন, যখন বিস্ময়।
অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে, বিচিত্র সে নয়॥
কিন্তু বাপু, মনে কর, কথা পূর্ব্বকার।
ইষ্টসাধনাদি করি, যত কিছু আর॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু, এই সমুদয়।
একের অভাবে এর, কিছুই না হয়॥
পরস্পর যোগে এরা, প্রবর্ত্ত করায়।
সেই যোগে প্রবৃত্তির,-পথে প্রাণি ধায়॥
এই ভবে যত বস্তু, কর দরশন।
তার প্রতি আছে কত, পৃথক্ কারণ॥
একই কারণে শুধু, এক দ্রব্য হয়।
কখনই নয়, বাপু, কখনই নয়॥
গুটিকত কারণের, একত্র মিলন।
হইলে তো হয় তায়, কার্য্যের সাধন॥
কুম্ভকার এক মাত্র, ঘটের নির্ম্মাণে।
আয়োজন হেতু তার, কত দ্রব্য আনে॥
কেবল মৃত্তিকা লোয়ে, কি গড়িবে ছাই।
দড়ি, দণ্ড, চাকা, জল, সকলি তো চাই॥
যত কিছু বস্তু তুমি, দেখিছ সংসারে।
সকলেই জন্ম পায়, এরূপ প্রকারে॥
জীবের প্রবৃত্তি জেনো, সেরূপ প্রকার।
সমূহ কারণে তার, হতেছে সঞ্চার॥
যদি তুমি বল বাপু, এরূপ বচন।
পূর্ব্বতন যত সব, জ্ঞান-গুরুগণ॥
সংশয়-জলধি-জলে, হোয়ে কর্ণধার।
এত কেন বাক্য-জাল, করিল বিস্তার?॥
সংক্ষেপে কহিলে পর, বুদ্ধি তায় বাধে।
অধিক বচন ব্যয়, করিল কি, সাধে॥
বিস্তারিত বাক্য-জাল, নহে অন্য রূপ।
বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জনের, যন্ত্রের স্বরূপ॥
ক্রমে ক্রমে যত তায়, করিবে প্রবেশ।
ততই জড়তা যাবে, সূক্ষ্ম পাবে শেষ॥
কত দেখ উপকার, এই বাক্য-জালে।
কিছু মাত্র কষ্ট নাই, বুঝিবার কালে॥
এত কোরে করিলেন, কারণ নির্ণয়।
তবু তায় একেবারে, ঘোচে না সংশয়॥
উভয় কারণ যদি, থাকে বর্ত্তমান।
কেবা তার অপ্রধান, কেবাই প্রধান॥
একের প্রাধান্য করি, যদ্যপি স্বীকার।
হইবে অপর তবে, অনুগত তার॥
যখন কহিবে কেহ, এরূপ বচন।
তৃপ্ত আছি, দুধে ভাতে, করিয়া ভোজন॥
যখন দুগ্ধের নাম, আগেতে কহিবে।
তোষের প্রধান হেতু, দুগ্ধই হইবে॥
আগেতে অন্নের নাম, করিবে যখন।
তোষের প্রধান হেতু, অন্নই তখন॥
কিন্তু দেখ, দুধ, ভাত, করিয়া আহার।
উভয় সংযোগ বিনা, তৃপ্তি হয় কার?॥
একের অভাব হোলে, সে সুখ হবে না।
তবে আর দুধ, ভাত, কবে না কবে না॥
অপ্রধান, প্রধান, প্রভেদে, কিবা করে।
পরস্পর, যোগাযোগে, এক ভাব ধরে॥
প্রবৃত্তির হেতু, এরা, কারণ সবাই।
ছোটো বড়, ভেদ করি, প্রয়োজন নাই॥

করিয়াছে যত জীব, কর্ম্ম যে প্রকার।
হবেই হবেই শেষ, ফলভোগ তার॥
প্রাক্তন প্রবল হোয়ে, ঘটাবে প্রবৃত্তি।
হবে না হবে না, সেই, ভোগের নিবৃত্তি।
প্রবর্ত্তক, হোয়ে, তায়, নিজে ভগবান্।
কোরে দেন, শুভাশুভ, ফলের বিধান॥
তখন প্রকৃতি ধরে, আপন প্রকৃতি।
প্রকৃত কাজেতে সে তো, করে না বিকৃতি॥
ত্রিগুণের ধর্ম্ম যাহা, করিবে প্রকাশ।
হিত-বোধে হবে তায়, প্রবৃত্তি-প্রয়াশ॥
দুষ্কৃতির দোষ হোলে, জন্মে না সুকৃতি।
সুকৃতি যাহার থাকে, সে হয় সুকৃতী॥
কিছুতে না হয় এই, সূত্রের ছেদন।
কারণের বশে করে, কার্য্যের সাধন॥
ভাল, মন্দ, যাহা করে, প্রতি জনে জনে।
ইষ্টলাভ-আশা থাকে, প্রতি মনে মনে॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু, না হোলে এরূপ।
সৃষ্টির নিয়ম তবে, হইত বিরূপ॥
এক রূপ কারণের, ক্রিয়া একরূপ।
কিসে হবে কার্য্য তার, বহুবিধ রূপ॥
দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি, সম সবাকার।
সম সব, অবয়ব, আকার প্রকার॥
অথচ হতেছে ক্রিয়া, পৃথক প্রকার।
প্রাক্তনের-ভোগ তাই, করিব স্বীকার॥
ইতর প্রভৃতি প্রাণি, যত চরাচরে।
আগেতে করেছে যাহা, শেষে তাই করে॥
আগেতে যা করে নাই, শেষেতে করিবে।
কেমনেতে বল তার, প্রমাণ হইবে!॥
কে করে প্রবর্ত্ত, কিসে, প্রবৃত্তি, বা, পায়!।
অদৃষ্টের হাত তারা, কিরূপে ছাড়ায়!॥
প্রাক্তনেরে, ঠেলে ফেলে, দিয়ে রসাতল।
ঈশ্বর প্রবৃত্তিদাতা, এই যদি বল?॥
একেবারে ঘোরতর, দোষ হবে মূলে।
ঈশ্বরের, এ কলঙ্ক, যাবেনা কো ধুলে॥
যিনি হন, কৃপা, আর, শিবের সম্পদ।
তিনি নন পক্ষপাতী, ঘৃণার আস্পদ॥
ইহা কি কখনো বাপু, সম্ভাবনা হয়।
যিনি হন নিরপেক্ষ, শুদ্ধ কৃপাময়॥
অদোষে কি তিনি কারে, কোরে অনুরত।
দুঃখ দেন অবিরত, নির্দ্দয়ের মত॥
একজনে সাধু কর্ম্মে, কোরে অনুরাগী।
নিয়তই করিবেন, আনন্দের ভাগী॥
লৌকিক যে সব প্রভু, আছে এ সংসারে।
যখন একর্ম্ম তারা, করিতে না পারে॥
তখন সে প্রভু যিনি, ত্রিলোকের পিতে।
তিনি কি এমন কর্ম্ম, পারেন করিতে!॥
অতএব প্রাণাধিক, প্রাণের নন্দন।
সামান্য রাজার ধর্ম্ম, কর দরশন॥
শাসনের আসনেতে, আরূঢ় যে ভূপ।
তাহার অধীনে থাকে, ভৃত্য নানারূপ॥
সে সবার মান কিছু, এক রূপ নয়।
যে, যেমন পাত্র, তার, সেইরূপ হয়॥
কার্য্য অনুসারে হয়, মান, অপমান।
তিরস্কার, পুরস্কার, বেতন-বিধান॥
স্বভাবে ধরণীপতি, হন, এই মত।
সুবিচারপরায়ণ, পক্ষপাত-হত॥
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন।
সাধু ভূপতির হয়, এই সুলক্ষণ॥
প্রাক্তনের-ক্রিয়া তাঁর, করি, সুগোচর।
সুমতি প্রদান তাঁরে, করেন ঈশ্বর॥
যদিও প্রাক্তন তাঁর, ভাগ্যের ভাণ্ডার।
সুকৃতির ফলে হয়, সাধু-সমস্কার॥
একথা অন্যথা আমি, করিনে করিনে
কিন্তু তারে মূল বোলে, ধরিনে ধরিনে॥
সেই সব প্রাক্তনাদি-ক্রিয়া অনুসারে।
সাধু-পদে প্রবর্ত্ত, করেন, বিভু, তাঁরে॥
জড় তারা, হেতু বটে, কিন্তু নয় মূল।
ঈশ্বর করেন সব, কিছু নাই ভুল॥
রাজারে রাজার ক্রিয়া, করি বিতরণ।
আপনি করেন কার্য্য, রাজার মতন॥
করিয়াছে জীবগণ, কর্ম্ম যত যত।
ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন, সেই মত মত॥
যে, যেমন, যোগ্য তার, সেরূপ নিয়োগ।
নিজ নিজ ভাগ্যফল, সবে করে ভোগ॥

ক্রিয়াফলে কারো দুঃখ, কারো হয় তোষ।
ইহাতে কিছুই নাই, ঈশ্বরের দোষ॥
যে, যেমন, সেইরূপ, না করিলে তাকে।
ঈশ্বরের, কলঙ্কের সীমা নাহি থাকে॥
যদি বল, প্রবর্ত্তক এরূপ প্রকারে।
ঈশ্বরেতে, দোষ তবে, দিতে কেবা পারে!॥

ত্রিপদী।

ঈশ্বর কারণ নয়, কেবল প্রাক্তনে হয়,
জীব যত ভোগে অনুরত।
একথা তো কথা নয়, কত দূর দোষ হয়,
দেখ তায় গোলযোগ কত॥
পূর্ব্বতন কর্ম্ম যারা, ভোগের আগেতে তারা,
একে একে, হইয়াছে নাশ।
কর্ম্ম দেয় কর্ম্ম-ফল, কেমনে এমন বল,
সকলে করিবে উপহাস!॥
অচেতন তারা সবে, পরিমিত কিসে হবে,
কে রাখিবে স্থির পরিমাণ!॥
দাতা যদি না রহিল, ফলে, ফল, কি হইল,
কে করিবে রীতিমত দান?॥
চেতন আপনি যিনি, ভিতরের সাক্ষি তিনি,
সমুদয় করি দরশন।
ক্রিয়া যার, যে প্রকার, উপযুক্ত ফল তার,
সেরূপ করেন বিতরণ॥
যদি বল এই মত, সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বগত,
পুরুষের কিবা প্রয়োজন।
নিজ নিজ কার্য্য-মত, ফলভোগে হয় রত,
জীব যত, সবাই চেতন॥
শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রিয়া করি ফল লয়,
সমুদয় তাদের গোচর।
আপনারা পারে যাহা, পরের উপরে তাহা,
কেন তবে করিবে নির্ভর!॥
শুন বাপু, তবে কই, চেতন* চেতন কই,
অচেতন অজ্ঞানে সবাই।
সাক্ষি-চেতনের সম, থাকিবে না, কিছু ভ্রম,
এমন তো সম্ভাবনা নাই॥

এই জীব পরম্পরে, এখমি যে কর্ম্ম করে,
ক্ষণপরে স্মরণ না রয়।
পূর্ব্বজন্মে শতশত, কর্ম্ম করিয়াছে যত,
কেমনেতে মনে তার হয়।॥
বিশেষত প্রাণি যত, তোমার কথিত-মত,
ফলভোগে হইলে স্বাধীন।
আপনার রুচি-মত, ফল ভোগে হোয়ে রত,
কেহ কারো হোতো না অধীন॥
কারো না থাকিত খেদ, ছোটো, বড়, ভেদাভেদ
দূরে গেলে কে মানিত কায়।
কারে না দেখিতে দুখি, সকলেই হোলে সুখি,
দুঃখ তবে দাঁড়াতো কোথায়?॥
অতএব বাপধন, ক্রিয়া সাক্ষি যিনি হন,
পক্ষপাত কিছু নাই তার।
যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সেরূপ বুঝিয়া মর্ম্ম,
তিনি দেন, দণ্ড-পুরস্কার॥
ঈশ্বরেচ্ছা, বাপু আর, প্রাক্তনাদি সংস্কার,
প্রবৃত্তির হেতু যথা হয়।
জীবের স্বভাব যাহা, সেইরূপে হেতু তাহা,
অন্যথা হবার কভু নয়॥
স্বভাবত প্রাণিচয়, স্বভাবের বশে রয়,
স্বভাবের অনুগত চিত্ত।
স্বভাব না পেলে পরে, বিষয়-ভোগের তরে,
কেমনেতে হইবে প্রবৃত্ত!॥
তিল আদি বীজচয়, স্বভাবত স্নেহময়,
যন্ত্র-মুখে করিয়া অর্পণ।
পেষণ করিবে যত, তাহারা করিবে তত,
শরীরের রস বিতরণ॥
এ বলিয়া যদি তুমি, পৃথিবীর যত ভূমি,
মহযন্ত্রে করহ পেষণ।
স্নেহরস কোথা তার, কিসে পাবে উপকার,
মিছে হবে শরীর পতন!॥
স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম্ম কোথা পাবে তার,
কর্ম্মতায় হবে না সেরূপ।
প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কর্ম্ম আনে,
প্রকৃতির ধর্ম্ম এইরূপ॥

* চেতন।—মনুষ্য।

ইষ্টসাধনতা যায়, তাতেই প্রবৃত্তি পায়,
অকারণে না হয় প্রবেশ।
স্বভাব স্বভাবে রয়, অভাব হবার নয়,
স্বভাবেই স্বভাব বিশেষ ॥
রোগি জীব যে সময়, কুপথ্যে প্রবৃত্ত হয়,
একেবারে নাহি যায় জ্ঞান।
হবে ইথে অপকার, এ বোধ তো থাকে তার,
তবু যে, সে, নহে সাবধান ॥
কেন, না, সে ধৈর্য্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে,
বা করিলে প্রাণে মরে শেষ!।
যদিও না প্রাণ যাবে, পরে তো যাতনা পাবে,
তথাচ শুনে না উপদেশ ॥
যা, কহিবে, বটে তাই, অন্য কিছু হেতু নাই,
আশু সুখে করে অভিলাষ।
কাজেই প্রবৃত্তি ধরে, কুপথ্য করিলে পরে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দাহ হবে নাশ ॥

তৃষ্ণা, দাহে প্রাণে মরে, দেহ ছটফট্ করে,
হয় হেন ব্যাকুল হৃদয়।
মনে এই স্থির জানে, খেলেই বাঁচিবে প্রাণে,
তখন্ কি ধৈর্য্য আর হয়!॥
মন্দ হবে, ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোনোমতে
পরিণাম থাকে না বিচার।
"ব্যাধি" বোলে শুধু নয়, আধি* রোগে সমুদয়
ঘোটে থাকে এরূপ প্রকার ॥
মানসিক যত রোগে, কামাদি বৃত্তির ভোগে,
আশু সুখ পাবার কারণ।
ভাবি ভয় না ভাবিয়া, প্রবৃত্তির প্রেম নিয়া,
করে কত কুকর্ম্ম সাধন ॥
প্রাক্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়;
পরস্পর সমান প্রধান।
সবাই করায় ভোগ, একের না হোলে যোগ,
কিছু নাহি হয় সমাধান।

পুত্র। প্রশ্ন ॥ হে গুরো! যদিও আপনার উপদেশ-বাক্যে পুনঃ পুনঃ সংশয় করা উচিত হয় না, তথাপি সংশয় নিবৃত্তির পূর্ব্বে নীরব হইলেও উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব এ ভৃত্যের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যদি জীব-প্রবৃত্তির প্রতি তাহার প্রাক্তন-কর্ম্মজন্য-সংস্কারের কারণতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সদ্যঃ-প্রসূত-বালকের কিরূপে প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবৃত্তি হইতে পারে? ঐ বালকটি ঐ শরীর ধারণ করিয়া কখনই দুগ্ধপান করে নাই, কিরূপে তাহার দুগ্ধপান জনিত সংস্কার থাকিতে পারে? যদি দুগ্ধপান-জনিত সংস্কার না থাকিলেও বালকের দুগ্ধপানে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হইল, তবে কিরূপে ইহা বলা যায়, যে, জীব পূর্ব্বে যেমত যেমত কর্ম্ম করিয়াছে সেই কর্ম্মানুসারে পরেও তৎস্বজাতীয়-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইবে? যদিচ এমত বলা যায়, যে, ঐ বালক বর্ত্তমান-শরীরে দুগ্ধপান না করিলেও পূর্ব্বজন্মে বহুশত বার দুগ্ধপান করিয়াছে, তজ্জন্য-সংস্কারো তাহার মনে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, সেই সংস্কারই জীবনাদৃষ্ট সহকারে তৎকালে সমুদ্বুদ্ধ হইয়া ঐ বালককে প্রথমতঃ স্তনপান করিতে প্রবৃত্ত করিল তাহা হইলে ঐরূপে পূর্ব্বজন্ম তৎপূর্ব্বজন্ম তৎপূর্ব্বজন্মাদি পরম্পরায় বহু জন্ম স্বীকার করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব জন্মের চরমসীমা উপস্থিত হইলে আদি সৃষ্টিকালে অর্থাৎ যৎকালে জগদীশ্বর ঐ বালকটিকে প্রথমবার সৃষ্ট করিয়াছিলেন যাহার পূর্ব্বে আর ঐ বালক জন্ম-গ্রহণ করে নাই, সেই সময়ে কিরূপে বালকের প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবৃত্তি হইয়াছিল? তাহার পূর্ব্বেতে ঐ বালক স্তনপান করে নাই, তজ্জন্য কোনো সংস্কারো তাহার মনে ছিল না, অতএব জীব-প্রবৃত্তির প্রতি যে তদীয় প্রাক্তন-কর্ম্মের কারণতা আছে, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে? সুতরাং যদি আদি-সৃষ্টিকালে জীবের প্রাক্তন-কর্ম্ম-ঘটিত সাহায্য ব্যতীত জগদীশ্বর তাহারদিগকে বিনা কারণে নানা বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষগ্রস্ত হইলে কোন দোষ সম্ভাবনা না থাকে,

* আধি।—মানসিক রোগ, অর্থাৎ মনের রোগ।

তবে বর্ত্তমান-জন্মে পূর্ব্বজন্ম জনিত-কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া যদি তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-বিষয়ে প্রবর্ত্ত করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কী? বৃথা অনন্ত কোটি জন্ম স্বীকার করিয়াও যদি ঈশ্বরের বৈষম্য নৈর্ঘ্ণ্য দোষ দূর হইল না, তবে তিনি এই জন্মেই আমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে আমরা কখনো জন্মগ্রহণ করি নাই, এমত বলিতেই বা বাধা কি? বিশেষতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলেও বোধ হয় যদিও জগৎ কারণ জগদীশ্বর প্রাক্তন-কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া আমাদিগকে শুভাশুভ বিষয়ে যে প্রবর্ত্ত করেন, তাহা হইলে কোনোমতেই তাঁহাকে নির্দ্দয় বা পক্ষপাতী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তিনি বিনা-স্বার্থে-ই এই জগতের সৃজন, পালন, সংহরণ করিতেছেন, যাহারা স্বার্থপর হয় তাহারাই অন্যের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার, বা পক্ষপাত করিতে পারে, যে জগদীশ্বরে স্বার্থ-সম্বন্ধের গন্ধ মাত্র নাই, তিনি কিরূপে নির্দ্দয় বা পক্ষপাতী হইবেন? অতএব অবশ্যই তাঁহার এই ইতর-বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করণের কোনো বিশেষ তাৎপর্য্য থাকিতে পারে, তাহা আমারদিগের বুদ্ধিগম্য হয় না, না হইলেও কোনো ক্ষতি নাই, যেহেতু সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সমুদায় গূঢ়াভিপ্রায় কখনই অল্পজ্ঞ জীব-কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইতে পারে না, বস্তুতঃ জগদীশ্বর, যে, কি জন্য এই বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে একমাত্র লীলা ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হয় না, যখন তিনি লীলার নিমিত্তেই এই বিশ্ববিরচনা করিয়াছেন, তখন আমরা কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ সৎকার্য্য-রত, কেহবা সৎকার্য্য-বিরত হইয়াছি বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয় বা পক্ষপাতী বলিতে পারি না, যেমত লোকে কোনো যাত্রার অধিকারী স্বীয় নিযোজ্য-ভৃত্যগণকে স্বেচ্ছানুসারে নানা সজ্জায় সজ্জীভূত করে, এক ব্যক্তিকেই কখনো ঋষি, কখনো তপস্বী, কখনো তস্কর, কখনো বেশ্যা, কখনো ব্যাঘ্র, কখনো ভল্লুক, ইত্যাদি নানারূপে সাজাইতেছে, অথচ কেহই ঐ অধিকারিকে নির্দ্দয়, পক্ষপাতী বা অন্যায়কারী বলিয়া জানে না, তাহার নিযোজ্যগণও প্রভু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভুর ইচ্ছানুসারে মহানন্দে নানা রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, কেহই আপনাকে নিকৃষ্ট-পদস্থ দুঃখী বলিয়া অধিকারির প্রতি দোষারোপ করে না, তদ্রূপ বিশ্বযাত্রার অধিকারী স্বেচ্ছানুসারে যাহাকে, যে সং সাজাইয়াছেন, সে ব্যক্তি সেই সাজেই পরমানন্দে কাল হরণ করুক, ইহাতে দুঃখের বিষয় কি আছে? তন্নিমিত্ত পরমেশ্বরই বা কি জন্যই বৈষম্য নৈঘৃণ্য দোষগ্রস্ত হইবেন? অতএব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরই আমারদিগকে সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেছেন, তিনি যখন যে বিষয়ে আমাদিগকে প্রবর্ত্ত করেন, আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, এমত সিদ্ধান্ত করিলেও কোনো বিশেষ দোষ উপলব্ধি হয় না।

লঘুত্রিপদী।

পুন পুন চিত, হোয়ে সঙ্কুচিত,
অনুচিত কহে যাহা।
তাহে যত দোষ, হোয়ে আশুতোষ,
ক্ষমা কর প্রভু তাহা॥
আপনার সহ, করি অহরহ,
কলহ আপন-হিতে।
প্রকাশিয়ে সেহ, সমূহ সন্দেহ,
নাশ করি দেহ পিতে॥

করি প্রণিপাত, যদবধি তাত,
সংশয় আমার রবে।
করিব প্রস্তাব, যখন, যে, ভাব,
অন্তরে উদয় হবে॥
সন্দেহ সংহার, হইলে আমার,
কিছু আর নাহি কব।
পেয়ে উপদেশ, জানিয়া বিশেষ,
তখন নীরবে রব।

জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্ত-কারণ,
সমস্কার যারে কহে।
তাহাতে সংশয়, হতেছে উদয়,
সে কভু নিশ্চয় নহে॥
এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকারে,
দোষ হোতে পারে কত।
তোমার বচনে, সন্দেহ ভঞ্জনে,
সন্দেহ বাড়িছে যত॥
অদ্য যেই সুত, হইলে প্রসূত,
সমস্কার কোথা পাবে ?।
প্রসূতীর স্তন, করিয়া গ্রহণ,
কিরূপেতে ক্ষীর খাবে ?॥
পড়িলে অবনী, তখনি অমনি,
তাহার জননী সুখে।
কোলে করি নিয়া, বুকে শোয়াইয়া,
স্তন দেয় তার মুখে॥
মরি মরি আহা, কারে কই তাহা,
ভাবিয়া হারাই দিশে।
যেরূপে সে খায় কে তারে শেখায়,
প্রবৃত্তি সে পায় কিসে ?॥
জননী জঠরে অনল-কঠরে,
শীতল রাখেন যিনি।
তার মার স্তনে, সুধা-বিতরণে,
বালকে বাঁচান তিনি॥
করুণানিধান; রোধের-বিধান,
প্রবৃত্ত প্রদানকারী।
তাঁহারি কৃপায়, শিশু বেঁচে যায়,
উপদেশ পায় তাঁরি॥
বিনা সমস্কারে, দুগ্ধ খেতে পারে,
বিচারে হতেছে স্থির।
কী হবে মানিয়া, প্রাক্তনের ক্রিয়া,
নীরজ-দলের নীর॥
শিশুর ব্যাপার, যদি এ প্রকার,
স্বভাবে সম্ভবে ভবে।
শত শত বার, মরা বাঁচা আর,
কে করে স্বীকার তবে ?॥

তোমার বচনে, হেতু নিরূপণে,
গোলযোগ কত ঘটে।
স্থির করি মন, দেখুন এখন,
বটে কি, না, ইহা বটে॥
আপনার মতে, জীব এ জগতে,
আগে যাহা করিয়াছে।
ক্রিয়াবীন তার, এক সমস্কার
আছেই আছেই আছে॥
যার যাহা ফল, না হয় বিফল,
অদৃষ্ট কভু না মরে।
প্রথমে যে জন, করেছে যেমন,
শেষেতে তেমনি করে॥
এখনি যে সুত, হইল প্রসূত,
অমনি খেতেছে মাই।
পূর্ব্ব-সমস্কার, কারণ তাহার,
তাহাতে সংশয় নাই॥
কিসের অভাব আছেই স্বভাব,
স্বভাব লবেই লবে।
অদৃষ্টের ভোগ, সেই যোগাযোগ,
হবেই হবেই হবে॥
আছে জ্ঞান বল, যত কথা বল,
বল করি নিজ-পক্ষে।
ফলে কোথা ফল, এ নহে প্রবল,
শেষ কিসে পায় রক্ষে ?॥
আদির নির্ণয়, যদি তাহে হয়,
সংশয় কিছু না রহে।
হইয়া সম্মত, আপনার-মত,
মনোমত সবে কহে॥
আদি জন্ম কবে ? আদি জন্ম সবে,
সবে কবে এইমত।
তা-হোলে তো আর, খাটে না বিচার,
প্রমাণ করিব কত ?॥
জন্ম-জন্মান্তর, আছে নিরন্তর,
আসে যায় জীব যত।
তাহে কর ফাঁকি, কত জন্ম বাকী,
কত বা হয়েছে গত ?॥

আদি আছে যার, অন্ত চাই তার,
আদি অন্ত ছাড়া কিবা ?।
কাল-পরিচ্ছেদে, আদি অন্ত, ভেদে,
আসে যায় নিশা দিবা ॥
প্রভাত ধরিয়া, প্রভেদ করিয়া,
দিবা নিশি সীমা হয়।
রাশি-পক্ষ যত, হয় সেই মত,
সীমা ছাড়া কেহ নয় ॥
অতএব কই, জন্ম যারে কই,
আদি অন্ত চাই তার।
গোড়া বিনা আগা, কিসে থাকা লাগা,
ভোগেতে ভুলনে আর ? ॥
ধরাধামে যত, বস্তু শত শত,
আগাগোড়া ছাড়া নাই।
জীবের শরীর, আদি অন্ত স্থির,
শেষ কোরে বল তাই ॥
কে আগে জন্মিল, কি কর্ম্ম করিল,
অদৃষ্ট পাইল কিসে ?।
মূল নিরূপিত, হইলে নিশ্চিত,
তবে তো ভাঙিবে দিসে ॥
এরূপ প্রকারে, বিশেষ বিচারে,
প্রথম ধরিবে যবে।
নাহি পূর্ব্ব-ক্রিয়া, প্রাক্তন লইয়া,
গোল কত তায় হবে ॥
প্রথমে যখন, হইল নন্দন,
আদি জন্ম সেই তার।
কিছুই না জানে, তবে দুগ্ধ পানে,
কোথা পেলে সমস্কার ? ॥
ইহাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়,
সর্ব্বময় যারে বলে।
শিশু-সুত যত, দুগ্ধ-পানে রত,
তাহারি করুণাবলে।
যে হয় উচিত, বুঝিয়া বিহিত,
তাহে নিযোজিত করে।
তাহার ইচ্ছায়, জীব সমুদায়,
চরাচরে সুখে চরে ॥

কোথা সে অদৃষ্ট, সবারি অদৃষ্ট,
প্রমাণে সুদৃষ্ট নয়।
অপূর্ব্ব* স্বীকার, অপূর্ব্ব-বিচার,
দোষ ছাড়া কিসে হয় ? ॥
প্রাক্তন উপর, করিলে নির্ভর,
স্থির নাহি হোতে পারে।
যিনি সর্ব্বগত, পক্ষপাতহত,
কেমনে করিবে তাঁরে। ॥
আমার বচন, করিলে গ্রহণ,
দোষ কিছু নাহি হয়।
ভব-চরাচরে, পরম ঈশ্বরে,
পক্ষপাতী কেবা কয় ? ॥
ইহজন্ম বই, জন্ম আর কই,
প্রসঙ্গ করিনে তার।
মিছে তর্ক এনে, পূর্ব্বজন্ম মেনে,
কেবলি কলহ সার ॥

পয়ার।

ঈশ্বরের নিগূঢ়, যে, সার অভিপ্রায়।
মানবের বুদ্ধি কভু, সে পথে না ধায় ॥
গোপনীয় কি ভাব, রয়েছে, তাঁর মনে।
অজ্ঞান মানুষে তাহা, জানিবে কেমনে ! ॥
বিনা স্বার্থে সৃজিলেন, অখিল-সংসার।
ইথে কিছু নাহি তাঁর, নিজ-উপকার ॥
কেবলি লীলার হেতু, যে রচিল ভবে।
পক্ষপাত-দোষ তায়, কিরূপে সম্ভবে ? ॥
যে কোনো বিষয়ে হোক্, স্বার্থ থাকে যার।
সহজেই সেই করে, অন্যায় আচার ॥
নিরপেক্ষ নিত্যধন, নিরঞ্জন, যিনি।
এ ভব অনিত্য লীলা, করেছেন তিনি ॥
সংক্ষেপে সন্ধান করি, দেখ অনায়াসে।
লীলা-বিনা, আর কিছু, বুদ্ধিতে না আসে ॥
বিস্তারিত এই বিশ্ব, দৃশ্য মনোহর।
চরাচরে সুখে চরে, জীব বহুতর ॥
কেহ ছোটো, কেহ বড়, এইরূপ যত।
ইতর বিশেষ তায়, ভেদাভেদ কত ॥

অপূর্ব্ব—অদৃষ্ট পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্ম।

এ ভেদ প্রভেদ করে, শক্তি আছে কার।
কাজেই করিতে হবে, লীলার স্বীকার ॥
অনিত্য-ভবের সৃষ্টি, ক্রীড়ার কারণে।
আদি মাত্র জন্ম-লাভ, করে প্রতি জনে ॥
কেহ দুখী, কেহ সুখী, ভবের ভিতরে।
কেহ ভালো, কেহ কেহ, মন্দ ক্রিয়া করে ॥
এইমত রত যত, আমরা সবাই।
পরস্পর অবস্থায়, সমান না পাই ॥
সমান না হোলো, হলো, তাহে কিবা ক্ষতি।
সাধ্য কার দোষ দেয়, ঈশ্বরের প্রতি ? ॥
ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই রটে।
কোনোদিগে, কিছুতেই, দোষ নাহি ঘটে ॥
নাটকের সূত্রধার, যেরূপ প্রকার।
কোরে থাকে নানারূপ, যাত্রার প্রচার ॥
ভবযাত্রা অবিকল, হয় সেইমত।
একমাত্র অধিকারী, সেই সর্ব্বগত ॥
সামান্য যাত্রারপতি, ইচ্ছা অনুসারে।
সাজাতেছে কত সঙ, অশেষ প্রকারে ॥
অজা, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া, রাজা, প্রজা, কৃষি।
দাসী, দাস, আদি করি, যোগী আর ঋষি ॥
যে সাজে সাজায় যারে, সে ধরে, সে সাজ।
ধরিতে ইতর সাজ, নাহি করে লাজ ॥
কারো নাই অভিমান, কারো নাই দুখ।
সকলেই সাজে সাজে, পেয়ে সম সুখ ॥
একজন কতবার, কত সাজ ধরে।
অধিকারী, তুষ্ট যাহে, তাই মাত্র করে ॥
যাহারে যেমন, বলে, সে ধরে, সে বেশ।
ইতর-বিশেষ-ভেদে, নাহি রাগ দ্বেষ ॥
ঈশ্বরের খেলা হয়, সেরূপ এ ভবে।
তাঁহাতে বৈষম্য আদি, দোষ কিসে হবে ! ॥
অতএব পূর্ব্বকৃত, কর্ম্ম যাহা হয়।
প্রবৃত্তির কারণ সে, কোনোমতে নয় ॥
ঈশ্বর প্রবর্ত্তকারী, আপনিই হন।
করেন প্রবৃত্তি দান, যখন যেমন ॥
তখন প্রবৃত্তি পাই, সেরূপ প্রকার।
সেইরূপ কার্য্য করি, ইচ্ছা যাহা তাঁর ॥
প্রাক্তন প্রবৃত্তি হেতু, নয় নয় নয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা মূল, নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

পিতা। উত্তর ॥ হে প্রাণাধিক প্রিয়তম ! তোমার সুধাময়ী-জিজ্ঞাসা আমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে ; তুমি তত্ত্বোপদেশ লইতে প্রবৃত্ত হইয়া কখনই কুণ্ঠিত হইও না, অকুতোভয়ে মনের সংশয় সকল স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর, তাহা হইলে অবশ্যই হৃদয়াকাশে জ্ঞানমিহির উদিত হইয়া অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিবে। বৎস ! জীব-প্রবৃত্তির প্রতি তাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মের কারণতা আছে, কি, না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ জীবের পূর্ব্বজন্ম ও অপরজন্ম আছে কি, না, এতদ্বিষয়ক বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটি অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম কারনাত্মক-শরীর ত্রয়বিশিষ্ট চৈতন্য বা আত্মাকে জীব বলিয়া ব্যবহার করা যায়।—ইহা মনে রাখা আবশ্যক, এই জীব পূর্ব্বে কখনো ছিল না, পরেও থাকিবে না, এই জন্মই উহার প্রথম জন্ম, মৃত্যু হইলে একেবারেই শেষ হইয়া যাইবে, এমত সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অগ্রে এই সিদ্ধান্তের কারণ ও প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে হয়, যে, কোন্ কোন্ প্রমাণ দ্বারা ইহা নিশ্চিত হইল, সেই সেই প্রমাণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এমত একটি প্রমাণো পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা জীবের পূর্ব্বাপর জন্মের অভাব নিশ্চিত হইতে পারে, যদি এমত বলা যায়, যে, অসাক্ষিক বিষয় স্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ যেমত আমরা প্রত্যেক্ জীবের বর্ত্তমান জন্ম ও মৃত্যু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিয়া তাহার সত্যত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, তদ্রূপ কোনো একটি জীবও স্বীয়, বা, পরকীয় পূর্ব্ব, বা, পরজন্ম সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তৎসত্যত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে নাই, কেহই অদ্যাপি পূর্ব্ব, বা, পরলোক দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে নাই, যাহার সাক্ষ্য বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বাপর জন্মের অস্তিত্ব ও সত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে

পারে, সুতরাং জীবের পূর্ব্বাপর জন্ম-বিষয়ে কোনো একটি সাক্ষী না থাকাতে তাহার অসাক্ষিকতা প্রযুক্ত অভাব স্বীকার ব্যতীত কোনোমতেই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না, বৎস! যাহারা উপরি উক্ত প্রমাণের উল্লেখ করিয়া জীবের পূর্ব্বাপর জন্মের অভাব নিশ্চয় করিতে উদ্যত হয়, তাহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানসূর্য্য, যে অজ্ঞানরূপ মহামেঘে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই যেহেতু জীবের উৎপত্তি স্থিতি ভঙ্গাত্মক স্বভাবই তাহার পূর্ব্বাপর জন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অর্থাৎ যখন আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি, প্রত্যেক্ জীবই যথাক্রমে উৎপত্তি স্থিতি নাশের অধীন হইতেছে, তখন, যে, উহারা এইরূপে পুনঃপুনঃ জন্ম স্থিতি নাশের অধীন হইয়া থাকে, তাহাতে অন্য সাক্ষি অন্বেষণের আবশ্যক কি? উহাদিগের ঐ স্বভাবই, যে, মহাপ্রামাণিক সাক্ষিরূপে পরিগণিত হইতেছে,—এই জগতের মধ্যে কখনই কোনো বস্তু স্বীয় স্বভাবের অতিক্রম করিতে পারে না, দেখ যে জল পৃথিবী ও পার্থিব প্রত্যেক্ বস্তুতে রসরূপে বিদ্যমান থাকিয়া তরলতা, শীতলতা, কোমলতাদি স্বাভাবিকগুণে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে সেই জলই যখন সূর্য্য কর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে আকাশে আকৃষ্ট হইয়া মেঘাকারে পরিণত হইয়া যায় তখন আর আমরা তাহাকে তরল, শীতল, কোমল জল বলিয়া নির্দ্দেশ বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু যখন ঐ মেঘ, বায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া যথাকালে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন আবার যে জল, সেই জল, সেই তরলতা, শীতলতা, কোমলতাদি স্বাভাবিক-গুণের কিছু মাত্র অন্যথা হয় না।—সকলই আবার পূর্ব্ববৎ আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইতে থাকে, অতএব কোনো বস্তু আমাদিগের প্রত্যক্ষ-পথের অতীত হইলেই যে তাহার বর্ত্তমান স্বভাবের অভাব হইয়া অভাবাবস্থাপন্ন হইবে এমত নহে, সকল বস্তুই স্বস্বভাব ও কার্য্যকারণ ভাবানুসারে জ্ঞান-নেত্রের জ্যোতিতে প্রতিভাত হইয়া বিদ্যমান বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।—জ্ঞানবান পুরুষ যখন কোনো একটি বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন স্বাভাবিক বস্তু ও গুণরাশিই তদ্বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে, লৌকিক-প্রত্যক্ষ বা সাক্ষির কিছুই প্রয়োজন থাকে না, যদি লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও সাক্ষি-পুরুষের অপেক্ষা করিয়া বস্তু মাত্রের অস্তিত্ব প্রত্যয় করিতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগের (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) যদ্দ্বারা আমরা সকল বিষয়ের দর্শনাদি করিয়া থাকি, তাহাদিগকেই দেখিতে পাই না, অথচ অন্যেও দেখিতে পায় না, ইহা বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়েও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, শতবর্ষ পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়া গিয়াছে এক্ষণে তাহার কোনো সাক্ষী না থাকাতে তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারিতাম না।—হে বৎস! জীবের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম কেহ দেখিয়া আসিয়া সাক্ষ্যদেয় নাই বলিয়া যদি তাহার অভাব ঘটিতে পারিত, তবে পার্থিব সকল বস্তুরই ঐ দশা ঘটিত,—পৃথিবী সম্বন্ধীয় বস্তু দূরে থাকুক, জগৎপতি জগদীশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করণের সম্ভাবনা থাকিত না, যেমত অদ্যাপি কেহ জীবের পূর্ব্বাপর জন্ম দর্শন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান কারতে পারে নাই, তদ্রূপ কেহ পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় করিয়া আসিয়াও সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হয় নাই, যেমত জগদীশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে এই জগতের কার্য্য-কারণ-ভাব কখনই নিরূপিত হয় না, তদ্রূপ জীবের পূর্ব্বাপর জন্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিলেও সাংসারিক সকল নিয়মই একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় নিরূপিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ যখন জীব মাত্রেরই বর্ত্তমানাবস্থাতে জন্ম, স্থিতি, নাশ আমাদিগের প্রত্যক্ষে অনুভূত হইতেছে, তখন, যে, উহারা পূর্ব্বেও বহুশতবার ঐরূপে জন্মাদি লাভ করিয়াছে, পরেও জন্মাদির

অবশ্য অধীন হইবে, এতদ্বিষয় নিশ্চয় করিতে কোনো প্রমাণ বা সাক্ষ্য গ্রহণের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই, বরং যাহারা জীবের পূর্ব্বাপর জন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রতিবাদি হয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, তাহারা কিরূপে জানিতে পারিল, যে, এই জীবনিবহ পূর্ব্বে কখনই জন্মগ্রহণ করে নাই, পরে আর জন্মগ্রহণ করিবে না ? তাহারা কি পূর্ব্বজন্মের অতীত স্থান, বা, পরজন্মের ভবিষ্যৎ স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে একটি জীবো নাই, তাহারা সকলেই একেবারে গগনকুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, আর কোন ব্যক্তিই বা তাহাদিগকে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল ? কোথায় বা তাহারা এমত সাক্ষী পাইয়াছিল ? আহা ! প্রতিবাদিগণ যখন জীবের পূর্ব্বাপর জন্মকে অসাক্ষিক বলিয়া অস্বীকার করে, তখন ইহাও কি অনুসন্ধান করে না, যে, জীব পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, এতদ্বিষয়ের সাক্ষী কে ? কিরূপেই বা তাহারা স্বয়ং অসাক্ষিক অভাব স্বীকার করিয়া সসাক্ষিক পূর্ব্বাপর জন্মকে অসাক্ষিক বলিয়া উপেক্ষা করে ? হা, কি খেদের বিষয় ! যখন তাহারা প্রতিক্ষণেই লক্ষ লক্ষ জীবের জন্ম-স্থিতি নাশানুভব করিতেছে, তখন কি সাহসে এমত কল্পনা করে, যে, যতকাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার মধ্যে আর ঐ সকল জীব কখনো জন্মগ্রহণ করে নাই, পরেও যতকাল সৃষ্টি থাকিবে আর কখনোই উহারা জন্মগ্রহণ করিবে না, কেবল মধ্যে কয়েক দিনের নিমিত্তেই উহারা অকস্মাৎ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, আবার অকস্মাৎ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। হে পুত্র ! এক্ষণে তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি জীবের পূর্ব্ব বা পরজন্মকে অসাক্ষিক বলিয়া উপেক্ষা না করা গেল, তবে আর এমত কি প্রমাণ আছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঐ পূর্ব্বাপর-জন্মের অভাব নিশ্চিত হইতে পারে ? কখনই ইহা বলা যাইতে পারে না, যে, জগদীশ্বরের এমত শক্তিই নাই, যে, তিনি এই জীবসমূহকে বারবার সৃষ্টি করেন, যেহেতু যখন আমরা প্রত্যক্ষে দর্শন করিতেছি, যে, একজন স্বর্ণকার একটি স্বর্ণপিণ্ড হইতে হার, বলয়, কিরীটাদি রচনা করিয়া ক্ষণকালের পরে আবার ঐ অলঙ্কারগুলিকে গলাইয়া পূর্ব্ববৎ স্বর্ণপিণ্ড করিয়া তাহা হইতে নূতন নূতন অলঙ্কার বিরচনা করে, এইরূপে যখন সামান্য জীব বহু সহস্রবার এক সুবর্ণপিণ্ডকে বিবিধাকারে সুশোভিত করিয়া পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তখন অচিন্ত্য-রচনাশক্তিবিশিষ্ট জগদীশ্বরের কি এতই অল্প শক্তি, যে, তিনি কোনোমতেই জীবের কারণাবস্থা হইতে তাহাকে বারম্বার বিবিধাকারে সৃষ্টি করিতে পারেন না ? বহু আয়াসে একবার একটি জীবের সৃষ্টি করিলেই তাঁহার শিল্প-কৌশলের উপক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং যদি সর্ব্বশক্তি জগদীশ্বরেরই একটি জীবকে দুইবার বিভিন্ন আকারে সৃষ্টি করিতে শক্তি না থাকিত, তবে অগত্যা ইহাও স্বীকার করিতে হইত, যে, তিনি এই জীবকে পূর্ব্বে আর কখনো সৃষ্টি করিতে পারেন নাই পরেও পারিবেন না, এইবার বহু কষ্টে যাহা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে।—ফলতঃ যাহার হৃদয়ে কিছু মাত্র চেতনাশক্তি আছে, সে কখনই এমত কহিতে পারে না, যে, জগদীশ্বরের অসামর্থ্য প্রযুক্ত পূর্ব্বে কখনো এই জীবগণের সৃষ্টি হয় নাই, পরেও হইবে না। যেমত কখনো জগদীশ্বর, যে, এক জীবকে বহুবার সৃষ্টি করিতে অশক্ত হয়েন এমত বলা যায় না, তদ্রূপ এই জীব শরীরের স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় উপাদান কারণ পরমাণুপুঞ্জ যাহারা পরস্পর আকৃষ্ট ও সংযুক্ত হইয়া এই বিচিত্র শরীররূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাহারাও যে, সৃষ্টিকাল হইতে অন্ত-পর্য্যন্ত এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছিল,—ইহার পূর্ব্বে আর উহারদিগের আকর্ষণশক্তি বা সংযোগ গুণ ছিল না, সংপ্রতি কয়েক দিনের নিমিত্তেই উহারা সমবেত হইয়াছে, এই জীবটি মরিয়া গেলেই ঐ পরমাণুপুঞ্জের আকর্ষণশক্তি ও

সংযোগগুণ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আর কখনই উহারা সমবেত হইয়া নূতন-শরীর উৎপন্ন করিতে পারিবে না, এমত কল্পনাও হাস্যকরী ব্যতীত নহে। এবং জীবের অবিনাশী-আত্মা, যে, পূর্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, ইহা কখনই সম্ভব হয় না,—যদি আত্মার বিনাশ না হয় তবে যে সেই আত্মার বিশ্বসৃষ্টি কালাবধি এপর্য্যন্ত শরীরগ্রহণশক্তি ছিল না, সংপ্রতি কয়েক দিনের জন্যে ঐ শক্তিটি জন্মিয়াছে, এই বর্ত্তমান দেহ পাত হইলেই ঐ দেহ-ধারণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, আর কখনই ঐ আত্মা দেহধারণ করিতে পারিবে না, কেবল আকাশস্থ নিরালম্ব হইয়াই কালাতিপাত করিবে, এই সকল কল্পনাকে বাতুল-জল্পনাই বলিতে হয়।—যেহেতু ঐসকল কল্পনার প্রতি কোনো হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শনের উপায় নাই। যদিও উপরিভাগে প্রদর্শিত প্রমাণানুসারে ইহা অবাধে প্রতিপন্ন হইল, যে, কোনোমতেই জীবের পূর্ব্বাপরজন্মের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করা যায় না, তথাপি প্রস্তাবিত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ তোমার পূর্ব্ব প্রদর্শিত আপত্তি করা আবশ্যক হইতেছে। বৎস! সদ্যপ্রসূত বালকের প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সেই প্রমাণে জীবের পূর্ব্ব বা পরজন্মের অভাব নিশ্চিত হইতে পারে না, বরং ঐ প্রমাণ দ্বারা জীবের পূর্ব্ব ও পরজন্মের অস্তিত্বই সুদৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু যদি ঐ বালক পূর্ব্বে কখনো জন্ম গ্রহণ করিয়া দুগ্ধপান না করিত ? তবে তাহার মনে দুগ্ধপান-জনিত-সংস্কার না থাকাতে কোনোমতেই দুগ্ধপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না,—যদি প্রাক্তন-কর্ম্ম জন্য-সংস্কারের অপেক্ষা না করিয়া কেবল পরমেশ্বরই ঐ বালককে প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবর্ত্ত করিতেন তবে যে সকল বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া দুগ্ধপান করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ কোমল-শরীর পরিত্যাগ করে তাহারা পরমেশ্বরের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিল ? তিনি কি জন্য ঐ বালকগুলিকে স্তনপানে প্রবর্ত্ত করিতে বিস্মৃত হইয়া গেলেন ? ঐ বালক সকল কি তাঁহার দয়ার যোগ্যপাত্র নয় ? আহা! যখন ঐ বালকগুলি নিদারুণ জঠর-যন্ত্রণা ভোগান্তে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সাংসারিক সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া যায় তখন কি পরমেশ্বর পাষাণ হইয়া থাকেন ? কোনোমতেই কি তাঁহাতে দয়ার সঞ্চার হয় না ? কিম্বা ঐ সময়ে তাঁহার জীব-প্রবর্ত্তকতা শক্তি একেবারে লোপ হইয়া যায় ? তিনি কোনোমতেই ঐ সকল বালককে স্তনপানে প্রবর্ত্ত করিয়া রক্ষা করিতে পারেন না ? তাহা হইলে এমত অক্ষম পরমেশ্বর কিরূপে জগৎপালন করিতে সমর্থ হইবেন ? যদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের প্রবর্ত্তকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উপরি উক্ত কোনো দোষোদ্ভাবনারই সম্ভাবনা নাই।—ঐ সকল বালক পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মে যে সকল গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার প্রতিফল প্রদানার্থ পরমেশ্বর তাহাদিগকে দুগ্ধপানে নিবর্ত্ত করিয়াও কখনই দোষভাগী হইতে পারেন না, তৎকালীন ঐ বালকের প্রাক্তন-দুরদৃষ্ট-বশতই পূর্ব্বতন দুগ্ধপান-জনিত-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলনা, সুতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, তাহাতে পরমেশ্বরের কি দোষ আছে ? এইরূপে ঐ স্থলে জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মজন্য-সংস্কারের কারণতা স্বীকার না করিয়া যদি কেবল স্বভাবের কারণতা স্বীকার করা যায় তবে দুইটি সদ্যপ্রসূত বালকের প্রতি দুইপ্রকার স্বভাব কখনই নিরূপিত হইতে পারে না, যে, একটি বালক দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকিবে, আর একটি দুগ্ধপান না করিয়া মরিয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি এমত স্বাভাবিক নিয়ম স্বীকার করা যায়, যে, জীবগণ উপদেশ ও শিক্ষা ব্যতীত কেবল স্বভাববশতই ক্রিয়াবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে জীবের ঐ স্বভাবটির কখনই অভাব ঘটিতে পারিত না, কখনই কোনো জীব কোনো কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ বা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইত না,

তাহারা বিনা উপদেশ ও শিক্ষাতেই সকল কার্য্য ধার্য্য করিতে পারিত, অথচ পৃথিবীতে এমত একটি ক্রিয়াও নাই যাহা জীব উপদেশ ও শিক্ষা ব্যতীত অনায়াসে করিতে পারে, অতএব বালকের প্রথমতঃ স্তনপানে একমাত্র স্বভাবের কারণতা কোনোমতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুতরাং নবপ্রসূত বালকের প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবৃত্তির প্রতি তাহার প্রাক্তন-কর্ম্মজন্য-সংস্কারের কারণতা স্বীকার ব্যতীত আর কোনো উপায়ই নাই, তাহা স্বীকার করিলে আর কোনো দোষ বা অনুপপত্তির সঞ্চার হইতে পারে না।—যেমত আমরা নানা বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া সেই সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, কখনো শুভাদৃষ্ট-বশতঃ উপস্থিত সময়ে সেই সকল সদুপদেশানুসারে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সুখভোগ করিয়া থাকি, কখনো বা দুরদৃষ্ট-বশতঃ যথাকালে ঐ সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া অসৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃখভোগ করি, তদ্রূপ যে বালকের জন্মকালে শুভাদৃষ্ট উদিত হয় সে অনায়াসে দুগ্ধপান করিয়া জীবিত থাকিয়া সাংসারিক অশেষ সুখসম্ভোগ করে, যাহার প্রাচীন দুর্ভাগ্য উদিত হয়, সেই বালক প্রাক্তন-দুগ্ধপান-ঘটিত উপদেশ ও শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া দুগ্ধপান না করিয়া অকালেই জীবন ত্যাগ করে, অতএব তোমার প্রদর্শিত দূষণ এস্থলে দূষণ না হইয়া বরং মনোহর ভূষণ হইয়া উঠিল।—কিন্তু বাপু! তুমি যে একটি ম্লেচ্ছ-সিদ্ধান্ত শিখিয়া পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ, যথা,—"জীবপ্রবৃত্তির প্রতি প্রাক্তন-কর্ম্মজন্য সংস্কারের কারণতা মানিলে আদিসৃষ্টিকালে অর্থাৎ পরমেশ্বর যখন প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার পূর্ব্বে আর সৃষ্টি ছিল না, সেই সময়ে সদ্যপ্রসূত বালক কিরূপে প্রথমতঃ স্তনপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বৎস! তোমার মনে কিরূপে এই পূর্ব্বপক্ষটির সঞ্চার হইল? তুমি বালক-কালাবধি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, কি নাস্তিক, কি আস্তিক, উভয়মতের কোনো গ্রন্থেই তো একটি আদিসৃষ্টিকাল বর্ণিত হয় নাই, তবে তুমি আদিসৃষ্টিকাল-ঘটিত পূর্ব্বপক্ষটি কোথায় শিখিলে? যাহাহউক তোমার অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষটি চিত্তাহ্লাদকর বটে, ভাল বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি,—আদি-সৃষ্টিকালটি কি কোনো প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে? পৃথিবীতে এমত একটি প্রমাণও পাওয়া যায় না, যে প্রমাণ-দ্বারা পৃথিবীর আদিসৃষ্টিকাল নিরূপণ করা যায়, বৎস! ইহাও বিবেচনা করিতে হয়, যে, আদিসৃষ্টিকালের পূর্ব্বে জগদীশ্বর ছিলেন কি না? যদি না থাকেন তবে তাঁহার সৃষ্টি কবে হইল? কেই বা তাঁহাকে সৃষ্টি করিল? যদি ছিলেন, তবে তৎকালে তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল। তিনি কি পুত্র না জন্মিতেই পুত্রের বাপ হইয়া বসিয়াছেন? যখন জগৎসম্বন্ধের গন্ধও তাহাতে ছিল না তখন তিনি কিরূপে জগদীশ্বর হইতে পারেন? জগৎকারণত্ব, জগৎপালকত্ব, জগৎ সংহারকত্বই জগদীশ্বরের জগদীশ্বরত্ব, সুতরাং ঈশ্বরের এই ঈশ্বরত্ব নাশ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আদিসৃষ্টিকাল নিরূপিত হয় না, যেহেতু যে সময়ে সৃষ্টি হয় নাই, তখন তাঁহাকে জগৎকারণ বা জগৎপালক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, সে সময়ের পূর্ব্বে সৃষ্টিই ছিল না তখন তাঁহাকে জগৎসংহারক বলিবারও উপায় নাই, অথচ জগৎকারণত্বাদি কারণবশতই জগদীশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, উহারাই তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যদি এমত কোনো সময় থাকিত, যে সময়ে জগদীশ্বরের জগৎকারণত্বাদি স্বভাবের অভাব ঘটিত, তবে সেই সময়ে কখনই তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারিত না, বৎস! ইহাও কি সম্ভব হয়? যে, প্রথমতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত জগদীশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিতে জানিতেন না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার জগৎ-সৃষ্টিশক্তি জন্মিয়া জগৎ করিতে আরম্ভ করিলেন; বিশেষতঃ যখন এই জগন্মণ্ডলস্থিত প্রায় সমুদয় বস্তুরই উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ-ভাগিত্ব-স্বভাব আমারদিগের প্রত্যক্ষে

অনুভূত হইতেছে, তখন এই ক্ষণপরিবর্ত্তি পরিণাম-স্বভাবের কখনই অভাব হইতে পারে না, সুতরাং যেমত পূর্ব্বে তোমাকে বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়াছি, যে, জন্ম, স্থিতি, নাশাত্মক-স্বভাবাক্রান্ত জীবের পূর্ব্বজন্মের অভাব কোনো প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, ঐ স্বভাব বশতই জীবের পূর্ব্ব ও পরজন্মের অস্তিত্ব অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, তদ্রূপ তোমার অভিমত আদি-সৃষ্টিকালের পূর্ব্বে যে সৃষ্টি ছিল না, ইহাও কোনো প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, অবশ্যই যে ঐ কালের পূর্ব্বে ও সৃষ্ট্যাদি ক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, তদ্বিষয়ে জগতের বর্ত্তমান উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গাত্মক-স্বভাবই স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মহাপ্রবল প্রমাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং মহা প্রামাণিক সৃষ্টির অনাদিত্ববাদের কে অন্যথা করিতে পারে? বৎস। যেমত জীবের পূর্ব্ব ও পরজন্মের অস্তিত্ব ও জগতের অনাদিত্ব বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় নাই, তদ্রূপ জীবের প্রাক্তন-জন্মজনিত কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বরের জীবপ্রবর্ত্তকতা স্বীকার করিলে যে পরমকারুণিক পরমেশ্বর বৈষম্য নৈঘৃণ্যরূপ গুরুতর দোষগ্রস্ত হইবেন তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই,—তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ, সকল দোষ-সম্বন্ধ রহিত স্বার্থতৎপরতাশূন্য লীলাকর জগদীশ্বরকে কোনোমতে নির্দয় বা পক্ষপাতী বলা যায় না? বাপু। যদি তত্ত্বজ্ঞগণও তোমার মত ভাবে গদগদ হইয়া তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তো কোনো একটি বিষয়ের বস্তুতত্ত্ব নিরূপিত হইত না; ফলতঃ জগদীশ্বর যে, লীলার নিমিত্তে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, লীলাতে নিযুক্ত জীব-নিবহ ইতর-বিশেষভাবে নানাবস্থাপন্ন হইয়াও লীলাধিকারির প্রতি কোনো দোষারোপ করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে নির্দয় বা পক্ষপাতী বলা যায় না এমত নহে, কেবল তিনি যে, জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মের সাহায্য লইয়াই জীবগণকে নানা প্রকারে বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, এজন্যই জীবগণ স্বীয় প্রাক্তন-সুকৃত দুষ্কৃতানুসারে সৎ বা অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াও পরমেশ্বরকে নির্দয় বা পক্ষপাতী বলিতে পারে না। যদি জগদীশ্বরের জগৎ সৃষ্টিতে কোনো স্বার্থ নাই বলিয়াই তিনি আমারদিগকে অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখসাগরে মগ্ন করিলেও নির্দয় না হইয়া দয়াময় হইতে পারিতেন, তবে লোকে যে সকল খল, স্বীয় দুরাত্মস্বভাবানুসারে বিনা স্বার্থে এই জগতের অশেষ অনিষ্ট করে, তাহারাও কি করুণাময় হইতে পারিত না? অতএব জগদীশ্বর বিনা স্বার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই যে, নর গড়িতে বানর গড়িয়া বসিবেন, এবং নিরর্থক স্বীয়-সৃষ্ট সন্তানগণকে অসৎ কর্ম্মরূপ-নরকে নিমগ্ন করিয়া অসহ্য যাতনা প্রদানপূর্ব্বক তাহারদিগের নিয়ত হাহারব ও ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিবেন, অথচ তাঁহাকে নির্দয় বা পক্ষপাতী বলা হইবে না, এমত কখনই হইতে পারে না। ও বাপু। তুমি পৃথিবীতে কবে কোথায় এমত যাত্রা দেখিয়াছ যে যাত্রায় অধিকারী স্বীয় নিযোজ্য বালকগণের প্রাক্তনকর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া তাহারদিগকে আপনার ইচ্ছামত সাজে সাজাইয়া থাকে? তাহা হইলে ঐ হতভাগ্য অধিকারির যাত্রা এমত কুযাত্রা হইয়া উঠিত যে, কেহই তাহার যাত্রা দর্শন করিতে যাত্রা করিত না। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক বালক বাসুদেব সাজিবার উপযুক্ত, ক্রিয়া-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া তাহাই শিক্ষা করিয়াছে, কোনো বালক বাসুদেবের কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছুই শিক্ষা করে নাই, কেবল সখা সাজিয়া যাহা করিতে হয় তাহাই শিক্ষা করিয়াছে, অপর বালক ঐ উভয়ের কর্ত্তব্য বিষয়ে কোনো উপদেশ না পাইয়া ভল্লুক সাজিয়া যাহা করিতে হয় সেই বিষয়গুলি অভ্যাস করিয়াছে, এস্থলে যে সুবিজ্ঞ অধিকারী ঐ বালকগুলি পূর্ব্বে যেমত যেমত কর্ম্ম করিয়াছে, যাহার মনে যে বিষয়ের অভ্যাস জন্য সংস্কার বিদ্যমান আছে, তাহাকে তদনুসারে উত্তম বা অধম-পদে নিয়োগ করে,

সে অধিকারিকে কেহই অন্যায়কারী, পক্ষপাতী বা নির্দয় বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার নিযোজ্যগণও পরমসুখে আদিষ্ট-বিষয় সম্পন্ন করিয়া সভ্যগণের চিত্তরঞ্জন করিতে থাকে,—কিন্তু যদি কোনো উন্মত্ত অধিকারী নিযোগ্য-বালকগণের পূর্ব্বোক্ত প্রাক্তন-কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সখীকে ভালুক সাজাইয়া, বাসুদেবকে অশ্ব করিয়া, ভালুককে সখী সাজাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ যাত্রার অবস্থা এমত ভয়ঙ্করী হইবা উঠিবে যে, তাহাতে লোকের চিত্তবিনোদ হওয়া দূরে থাকুক বিরক্তির পরিসীমা থাকিবে না,—অতএব জগদীশ্বর লীলার নিমিত্তে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই যে বিনা কারণে স্বেচ্ছামতে কাহার সর্ব্বনাশ, কাহার বা স্বর্গ-বাস ঘটাইয়া দিয়া নির্দয় বা পক্ষপাতী হইবেন না, কোনোমতেই এমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না সুতরাং এক্ষণে ইহা অবাধে প্রতিপন্ন হইল, যে জগদীশ্বর জীবের পূর্ব্বজন্মজনিত সুকৃত, দুষ্কৃতানুসারে তাহারদিগকে যথাযোগ্য সুখজনক সৎকর্ম্মে বা অসুখজনক দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করিতেছেন ও করিবেন, এবং এই অনাদি-পরম্পরাগত-সংসার-প্রবাহ তাঁহার আজ্ঞার অধীনে প্রতিনিয়তই চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, জীব সকল পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ জন্ম-স্থিতি-নাশের অধীন হইয়া বিশ্বাধিকারির বিশ্বযাত্রা সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইতেছে, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের সম্ভাবনা কি আছে ?।

একাবলী।

তোমার মুখের, অমৃত বাণী।
শুনিয়া অন্তরে, সন্তোষ মানি॥
যতনে যতই, করিবে তত্ত্ব।
ততই পাইবে, নিগূঢ় তত্ত্ব॥
লহ উপদেশ, হে প্রিয়তম !।
ক্রমেতে ঘুচিবে, মনের ভ্রম॥
সংশয় উদয়, হোলে হৃদয়ে।
প্রকাশ করিবে, অকুতোভয়ে॥
বোধবিধু তাহে, বিকাস হবে।
অজ্ঞান-তিমির, কিছু না রবে॥
যদবধি মনে, সন্দেহ রহে।
নীরবে থাকা তো উচিত নহে॥
বাপু হে, প্রস্তাব, করিবে যত।
সন্দেহ-ভঞ্জন, করিব তত॥
বল বল বল, বলিবে কত।
উত্তর করিতে, নহি বিরত॥
আঁধারে রয়েছ, প্রদীপ জ্বালো।
তবে তো দেখিবে, হইলে আলো॥
আলো বিনা আঁখি, মিছে কি হবে ?।
আঁধারে রতন, কে পায় কবে ?॥

পয়ার।

বাপু হে, তোমার মনে, হতেছে সংশয়।
পূর্ব্ব আর পরজন্মে, কর না প্রত্যয়॥
প্রত্যয়ে ব্যত্যয় করি, হতেছ অস্থির।
আমি যাহা বলিয়াছি, স্থির তাই স্থির॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু, করিতে নির্ণয়।
তুলিতেছে মিছে তর্ক, যুক্তি যাহা নয়॥
জীবের প্রবৃত্তি যাহা, দেখিছ সংসারে।
স্থির হোয়ে মর্ম্ম লও, বিশেষ বিচারে॥
"প্রাক্তনাদি" হেতু, তার হোতে নাহি পারে
কে বলে তোমারে, বাপু, কে বলে তোমারে ?
পূর্ব্বকার জন্মকৃত কর্ম্ম না মানিলে।
মিছামিছি, মাথামুণ্ড, বিচার করিলে॥
কোটিবর্ষে হবে না কো, বোধের উদয়।
তিমিরে আচ্ছন্ন রবে, তোমার হৃদয়॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির প্রতি, কারণ যা হয়।
"অদৃষ্ট, প্রাক্তন" আদি, তাহারেই কয়॥
ইহাতে উদয় হোলে, সন্দেহ তোমার।
কাজেই করিতে হবে, এরূপ বিচার॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম, শাস্ত্রে যাহা পাই।
আছে, কি, না, আছে তাহা, স্থির করা চাই॥
উত্থাপন যদি কর, আপত্তি এরূপ।
নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ॥
সুখ দুখ ভোগাভোগ, কে করে সংসারে ?।
জীব-বোলে বাচ্য তবে, করা যায় কারে ?॥

স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ-শরীরযুক্ত, যিনি।
চেতন,—বা, আত্মা, নামে, উক্ত হন তিনি
সেই, আত্মা, যিনি এই, শরীর আগারে।
"জীব" বোলে ব্যবহার, করা যায় তাঁরে ॥
একথা অবশ্য তুমি, করিবে স্বীকার।
ইহাতে সংশয় মাত্র, কিছু নাই আর ॥
নিজ-মনে এইগুলি, রাখিয়া স্মরণ।
ধীর হোয়ে কর দেখি, তত্ত্ব-নিরূপণ ॥
এই "জীব" পূর্ব্বে কভু, জন্মে নাই আর।
পরেও হবে না আর, জন্মলাভ তার ॥
সবে মাত্র এলো জীব, এই জন্ম লোয়ে।
মোরে গেলে একেবারে, যাবে শেষ হোয়ে ॥
এমত সিদ্ধান্ত যদি, কর সপ্রমাণ।
করিতে হইবে তার, কারণ সন্ধান ॥
যাতে না প্রমাণ আছে, না আছে কারণ।
কেমনে প্রামাণ্য করি, সে সব বচন ? ॥
অকারণে কহিতেছে, কথা যে সকল।
কোনোমতে নহে তাহা, বিশ্বাসের স্থল ॥
পূর্ব্বাপর জন্ম যাহা, অলীক সে হয়।
বল বল কিরূপেতে, করিবে নিশ্চয় ? ॥
কোথায় প্রমাণ পেলে, তত্ত্ব-নিরূপণে।
অভাব নির্ণয় তার, করিবে কেমনে ? ॥

"এরূপ যদ্যপি বল, তুলে এক ছল।"
"অসাক্ষিক বিষয়ের, সাক্ষিতে কি ফল ? ॥"
"মরা বাঁচা, এই দুই, হতেছে প্রত্যক্ষ।
"প্রয়োজন নাহি ইথে, প্রমাণ পরোক্ষ ॥"
"সব জীব একবার, জন্মলাভ করে।"
"সেই জীব সময়েতে, ক্রমে সব মরে ॥"
"সত্যরূপে দেখিতেছি, আমরা সবাই।"
"অপর-সাক্ষির আর, আবশ্যক নাই ॥"
"পূর্ব্ব-পর জন্মের, প্রমাণ নাহি পাই।"
"মোরে কেহ, অদ্যাবধি, ফিরে আসে নাই ॥"
"নিজ চোকে দৃষ্টি করি, গিয়া পরলোকে।"
"কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে, এই নরলোকে ? ।"
"অতএব কার বাক্যে, করিয়া নির্যাস।"
"শত শত জন্মে আমি, করিব বিশ্বাস ? ॥"
"কিছুতেই সত্যরূপে, সাক্ষি নাই যার।"
"কাজেই করিব তার, অভাব স্বীকার ॥"

বাপধন ! ছিছি তুমি, এমন্ তনয়।
বিচারের ধর্ম্ম কভু, এমন্ ত নয় ॥
প্রাণি তত্ত্ব-নিরূপণ, কঠিন ব্যাপার।
সহজে সংশয় ছেদ, হোতে পারে কার ? ॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম, নাহি মানে যারা।
অদ্যাবধি মাতৃগর্ভে বাস করে তারা ॥
ঘোরতর মহামেঘে, আঁধার করিয়া !
জ্ঞানরূপ রবিকর, রেখেছে ঢাকিয়া ॥
দেখিতে না পায় কিছু, দেখিতে না পায়।
সন্দেহ কি তায়, বাপু, সন্দেহ কি তায় ? ॥
পূর্ব্ব আর বর্ত্তমান, জন্ম পর পর।
আছেই আছেই আছে, আছে নিরন্তর ॥
যত দেখ চরাচরে, চরে জীব সবে।
আগে ছিল, মধ্যে হোলো, পরে পুন হবে।
জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ এই, জীবের স্বভাব।
কিছুতেই যার আর, না হয় অভাব ॥
আপনারে, অন্য পরে, কর দরশন।
জন্ম-স্থিতি-নাশ-ছাড়া, নহে কোনো জন ॥
এই জন্ম, এই নাশ, সাক্ষ্য করে দান।
পূর্ব্বাপর জন্মে আর, কি চাই প্রমাণ ? ॥
স্বভাবেই সিদ্ধ হয়, এরূপ প্রকার।
স্বভাব স্বভাব সেধে, সাক্ষ্য দেয় তার ॥
ইথেই তোমার মনে, সন্দেহ রবে না।
প্রমাণের হেতু আর, ভাবিতে হবে না ॥
এখনি সহজে হবে, তথ্য-নিরূপণ।
এজগতে যত কিছু, কর দরশন ॥
স্বভাবে অভাব তারা, ধরে না ধরে না।
স্বভাবের অতিক্রম, করে না করে না ॥
স্বভাব আপন ভাব, হরে না হরে না।
অবস্থার ভেদে কভু, মরে না মরে না ॥
দেখহ প্রচুররূপে, প্রবল প্রমাণ।
রসরূপ পৃথিবীতে জল বিদ্যমান ॥

পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট, সে জলের ভাব।
তরল, সরল, আর, শীতল স্বভাব॥
তাপন আপন প্রভা, করি প্রকটন।
ক্রমে ক্রমে সেই জল, করে আকর্ষণ॥
আকাশে আকৃষ্ট হোয়ে, সেই বারিচয়।
মেঘাকারে পরিণত, হয় সে সময়॥
আর এক ভাব ধরে, তখন সে জল।
নয়নে না দৃষ্ট হয়, কোমল তরল॥
ধূম্রাকার, অন্ধকার, নানারূপ ধরে।
খেচর হইয়া বন, ঘনরূপে চরে॥
সেই ঘন, ঘন ঘন, পবনপ্রহারে।
যখন ভূতলে পড়ে, জলের আকারে॥
পুনরায় দেখা যায়, যে জল, সে জল।
তরল, সরল, সেই, কোমল শীতল॥
পুন হয় সমুদয়, পূর্ব্বের মতন।
স্বরূপ গুণের তায়, কে করে পতন?॥
যেরূপ দেখিলে এই, জলের ব্যাপার।
সকলি নিশ্চয় জেনো, সেরূপ প্রকার॥
যদি কিছু নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর।
তাহাতে কি হবে তার, গুণের অন্তর?॥
কিছু কাল দৃষ্টিপথে না রয় না রয়।
স্বভাবে অভাব তার, কদাচই নয়॥
জ্ঞাননেত্রে যে দেখিবে, বস্তু সমুদয়।
তার কাছে অভাব, কি, দৃষ্ট কভু হয়?॥
অবোধে না দেখে বলে, অভাব হয়েছে।
সে বলিবে বিদ্যমান, সকলি রয়েছে॥
কার্য্য আর কারণ, অবস্থা, এই তিন।
সকল পদার্থ এই, তিনের অধীন॥
ঈশ্বরের কৃপায়, যে, জ্ঞানশক্তি পায়।
কোনোরূপ ভ্রম নাহি, স্পর্শ করে তায়॥
কোনো এক জ্ঞানবান্, করেন যখন।
কোনো এক বিষয়ের, তত্ত্ব-নিরূপণ॥
বস্তুর স্বভাব গুণ, হয় যে প্রকার।
তখন সেরূপ তিনি; করেন বিচার॥
লৌকিক-প্রমাণ-সাক্ষি, কিছু নাহি চান।
জ্ঞানেতে করেন শুধু, কারণ সন্ধান॥
যে বিষয় দৃষ্ট হয়, জ্ঞানের গোচরে।
সে বিষয়ে সাক্ষ্য কি, প্রয়োজন করে?॥
যে সকল, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, নাহি হয়।
তাদের অস্তিত্বে যদি, না কর প্রত্যয়॥
অজ্ঞানেতে সবে যদি, এইরূপ বলে।
জগতের কার্য্য যত, কিসে তবে চলে?॥
নয়নাদি ইন্দ্রিয় তো, সবারি সমান।
দৃষ্টি আদি ক্রিয়া যাহে, হয় সমাধান॥
সে সব ইন্দ্রিয় কেহ, দেখিতে না পাই।
এ বোলে কি বলা যাবে, চোক্, কাণ, নাই?॥
নিজ চোকে, নিজ চোকে, দেখিতে না পাই।
কিছু ক্ষতি নাই, তায়, কিছু ক্ষতি নাই॥
ঘট-পট-আদি করি, হেরি যে সকল।
তেজরূপ নয়নের, জ্যোতির সে বল॥
নয়নে না হয় কভু, শ্রুতি দরশন।
সে শ্রবণ করিতেছে, বচন শ্রবণ।
নাসা আর রসনারে, দেখা নাহি যায়।
রস আর ঘ্রাণের, প্রত্যক্ষ হয় তায়॥
শ্রুতি, নেত্র, নাসা, জিব, স্ব স্ব গুণ লোয়ে।
নিয়ত দিতেছে সাক্ষ্য, বদনেতে রোয়ে॥
অথচ ইন্দ্রিয় নাই, যদি কেহ কয়।
পাগল, পাগল, সেই, জানিবে নিশ্চয়॥
শতবর্ষ গত হোলো, ঘটিয়াছে তাহা।
প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখো, হইতেছে যাহা॥
সে সব ঘটনা আগে, দেখিয়াছে যারা।
অদ্যাপি জগতে কেহ, বেঁচে নাই তারা॥
রয়েছে সকল কার্য্য, দেখিতেছে সবে।
চাক্ষুষ্ সাক্ষির বল, অপেক্ষা কি তবে?॥

ত্রিপদী।

প্রাণাধিক শুন শুন, অধিক কি কব পুন,
মিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া
বৃথা হোলো পরিশ্রম, গেল না তোমার ভ্রম,
মানিবে না প্রাক্তনের ক্রিয়া॥
ক্ষণেক নীরবে রও, এক মনে তত্ত্ব লও,
তবে যাবে সংশয় কাটিয়া।
ভ্রান্ত তুমি যার মতে, তারে আমি ভালমতে,
দেখাইব চোকে হাত দিয়া॥

কার্ বাক্যে ভুলিতেছ, বৃথা বাদ তুলিতেছ,
উলিতেছ সংশয়-সাগরে।
গরল বিতর্ক হর, তরল-স্বভাব ধর,
কথা শুন সরল-অন্তরে॥
প্রাক্তনাদি কর্ম্মফলে, যত জীব ধরাতলে,
যায়, আসে, শত শত বার॥
মোরে পুন ধরে দেহ, স্বচক্ষে দেখেছে কেহ,
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার॥
করিলে এরূপ উক্তি, বিচারে চলে না যুক্তি,
সমুদয় মিথ্যা হোয়ে যায়।
যত কিছু এ ভুবনে, তত্ত্ব তার নিরূপণে,
দেখ-সাক্ষী পাইবে কোথায়?॥
পার্থিব-পদার্থচয়, পেত না কো পরিচয়,
একেবারে একে হোতো আর।
তোমাদের মতে চোলে, ঈশ্বর আছেন বোলে,
কেহ না করিত অঙ্গীকার॥
ধরে প্রাণি বহু দেহ, যেরূপ দেখেনি কেহ,
তর্ক কর এই কথা নিয়া।
ঈশ্বরের কাছে গিয়া, ঈশ্বরের মত ক্রিয়া,
সেরূপ, কে, এসেছে, দেখিয়া?॥
সৃষ্টিকারী যিনি হন, দৃষ্টিপথে নাহি রন,
অথচ মানিতে হয় তাঁরে।
কার্য্য যাঁর, এ সংসার, কারণরূপেতে তার
ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপার॥
এরূপ না মানো যদি, উথলিয়া ভ্রান্ত-নদী,
ডুবাইবে নিয়ম-নগর।
খাইলে অজ্ঞান-জল, বিমল যুক্তির স্থল,
হইবে না জ্ঞানের গোচর॥
আছে জন্ম পূর্ব্বাপর জ্ঞানগুরু বিজ্ঞবর,
পরস্পর করেন স্বীকার।
জন্ম-স্থিতি-নাশ জেনে, ভূত ভবিষ্যৎ মেনে,
সুনিয়মে চলিছে সংসার॥
একমাত্র জন্ম হয়, যাহারা এ কথা কয়,
তাদের জিজ্ঞাসা কর গিয়া।
মোলেই ফুরায়ে যায়, নাহি আসে পুনরায়,
জানিয়াছে কেমন্ করিয়া?॥

পূর্ব্বে জীব জন্মে যথা, তাহারা কি গিয়া তথা,
ফিরে এসে কহিছে এমন?।
মোলে আর জন্ম নাই, গিয়া, ভবিষ্যৎ-ঠাঁই,
চোকে কি করেছে দরশন!॥
একবার জন্মে সব, মোলেই হোলেই সব,
কর্পূরের মত উপে যায়।
কিছু দিন মাত্র রোয়ে, অলীক-পদার্থ হোয়ে,
একে একে লোপ সব পায়॥
যে সব প্রত্যক্ষবাদি, হোয়ে ঘোর প্রতিবাদি,
না মানেন পূর্ব্ব-সমস্কার।
জ্ঞাননেত্র নাহি পান, অন্ধবৎ বোকে যান,
তাঁদের বিচারে নমস্কার॥
পূর্ব্বাপর মানিবে না, কার্য্য, হেতু জানিবে না,
আনিবে না যুক্তির বিচার।
নাস্তিক কাহারে বলে, সে কথা কি গাছে ফলে
নাস্তিকতা কারে বলি আর?॥
ইহাঁদের উপদেশে, সকলে চলিলে দেশে
ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নাহি রবে।
পরিপূর্ণ পাপভারে সর্ব্বমতে এ সংসারে,
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে।
জন্ম নিয়া প্রাণিচয়, স্বভাবে প্রবৃত্ত হয়,
অদৃষ্টের অপেক্ষা না রাখে।
মোরেই পাইবে লয়, এরূপ যদ্যপি হয়,
ঈশের ঈশত্ব কোথা থাকে?॥
মিছে খেদ করি আহা! কহিলাম আমি যাহা,
যদি তাহা না কর প্রমাণ।
জগতের কর্ত্তা যেই, জগতে হইবে সেই,
অচেতন জড়ের সমান॥
তোমাদের উক্তি নিয়া, উপদেশ-পথে গিয়া,
যদি আমি এরূপ বুঝাই।
সবে কবে এ প্রকার, এক বিনা দুইবার,
রচিবার শক্তি তাঁর নাই॥
চোকে দেখা নহে শোনা, স্বর্ণকার লোয়ে সোনা,
করে দেখো কেমন ব্যাপার।
সুবর্ণ সুবর্ণ রেখে, ভেঙে চুরে থেকে থেকে,
গড়িতেছে কত অলঙ্কার॥

সোনা মাত্র এক খণ্ড, করি তাহা খণ্ড খণ্ড,
করে ভূষা বিবিধ প্রকার।
পুন পোড়াইয়া তাই, জড় করি এক ঠাঁই,
পূর্ব্ববৎ গড়ে পুনর্ব্বার॥
এ প্রকারে বারে বারে, একজন স্বর্ণকারে,
যদি পারে গড়িতে এরূপ॥
স্বর্ণখণ্ড উপলক্ষ, তাহে খণ্ড লক্ষ লক্ষ,
নাহি করি স্বরূপে বিরূপ॥
অতএব বাপধন! যিনি হন নিত্যধন,
নিরুপম সর্ব্ব মনোরম।
মহাশিল্পী মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তি বিশ্বকর,
এতই কি হবেন অক্ষম!॥
কারণ-অবস্থা নিয়া, স্বীয়-শক্তি সমর্পিয়া,
জীবেরে গড়িতে বারবার।
হোয়ে এই ভবধব, হন তিনি পরাভব,
কিছুই কি শক্তি নাই তাঁর?॥
এক জীবে একবার রচিতে ক্ষমতা তাঁর,
বহু শ্রম করেন স্বীকার।
সেই জীবে সে প্রকারে, দুইবার রচিবারে,
হোয়ে যায় শক্তির সংহার?॥
যিনি হন সর্ব্বশক্তি, হরিছ তাঁহার শক্তি,
শক্তিহীন কহিছ অনাসে।
শুনিলে এরূপ কথা, উপহাস যথা তথা,
পাগলে পাগল বোলে হাসে॥

পদ্য।

কেন বাপু করিতেছ, প্রলাপ দর্শন?।
ভাল নয়, ভাল নয়, এসব বচন॥
তোমাদের অভিপ্রায়, যেরূপ প্রকার।
ঈশ্বরের কর্ম্মে তায়, ঘটে ব্যভিচার॥
প্রাণি সব মোরে গিয়ে অমনি ফুরায়।
পুনর্ব্বার কেহ আর, জন্ম নাহি পায়॥
কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অতিশয়।
ঈশ্বরীয় মহিমায়, কলঙ্ক যে হয়॥
আগেতে ছিল না শক্তি, জীব গড়িবারে।
পরেও রবে না তাহা, সেই অনুসারে॥
মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া।
করিছেন মিছে লীলা, জীব গড়াইয়া॥
এরূপ অক্ষম যদি, সেই ভগবান্।
কেমনে বলিব তাঁরে, সর্ব্বশক্তিমান্!॥
শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব, অর্থ-লোপ কোরে।
ছলে আর বলে তাঁর, বল লও হোয়ে?॥
এতকাল মরিলাম, এতশাস্ত্র ঘেঁটে।
উঠিতে পারিনে তবু, তোমাদের এঁটে॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যদি, বলে দেও কেটে।
"সর্ব্বশক্তিময় নাম" ফেলো তাঁর ছেঁটে॥
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত, কভু নাই তাঁয়।
এমন্ অন্যায় কথা, বলা নাহি যায়॥
বিচিত্র সকল শক্তি, তাঁতেই সম্ভবে।
হবেই হবেই ইহা, বলিতেই হবে॥
ভূষণ-কার্য্যের কর্ত্তা, যথা স্বর্ণকার,
উপাদান-কারণ, সুবর্ণ হয় তার॥
জীব-সৃজনের ঈশ, কর্ত্তা যে প্রকার।
পরমাণু,—উপাদান—কারণ,—তাহার॥
যে সকল পরমাণু, একত্র হইয়া।
বিদ্যমান মনোহর, শরীর ধরিয়া॥
সৃষ্টি কালাবধি আর, অদ্য হয় গত।
পরস্পর এই সব, পরমাণু যত॥
আকর্ষণ যোগাযোগ, শক্তি হোয়ে হারা।
আগেতে কি ছাড়া ছাড়া হোয়ে ছিল তারা?
আকর্ষণযোগে হোয়ে, জড় এক ঠাঁই।
এতকাল সমবেত, হোতে পারে নাই?॥
অধুনা কেবল মাত্র, সমবেত হোয়ে।
প্রকাশিত হইতেছে, দেহ-নাম লোয়ে?॥
হোলে পরে, এ জীবের জীবন সংহার।
তাদের সে শক্তি পুন, থাকিবে না আর?॥
যোগাযোগ-গুণ আর, রবে না রবে না।
পূর্ব্ববৎ সমবেত হবে না হবে না?॥
তা নয়, তা নয়, বাপু, তা নয়, তা নয়।
কথার মতন কথা, একথা, কি হয়?॥
পরমাণু পুঞ্জ সদা, যুক্ত পরস্পরে।
চিরকাল সমভাবে, সমগুণ ধরে॥
পোড়ে সেই সর্ব্বকর, ঈশ্বরের করে।
নূতন নূতন দেহ, বিরচনা করে॥

এরূপ যদ্যপি তুমি, না কর স্বীকার।
নিশ্চয় তোমার তবে, বুদ্ধির বিকার॥
আত্মা হন অবিনাশী, মানিতে তো হবে।
শরীর-গ্রহণ-শক্তি, হোলো তাঁর কবে!॥
আত্মার কি সবে এই, নবকলেবর?।
আবার হবে না দেহ, দেহ গেলে পর!॥
দেহ-ধারণার শক্তি, একেবারে যাবে।
রবেন্ কি ভবিষ্যতে, নিরালম্ব-ভাবে?॥
এরূপ কি সম্ভাবনা, হোতে কভু পারে?।
কি কব তোমারে আর, কি কব তোমারে?।
কারো কাছে হেন কথা, বোল্‌োনা কো গিয়া।
যে শুনিবে সেই দেবে, হেসে উড়াইয়া॥

*

যে আপত্তি পূর্ব্বেতে, করেছ উত্থাপন।
এখন্ করিব আমি, তাহার খণ্ডন॥
কাণ পেতে শুন যদি, মনোযোগ দিয়া।
বিদ্যার সার্থক তবে, প্রকাশ করিয়া॥
বিশ্বাস তোমার কাছে, স্থান যদি পায়।
কাটিব তোমার কথা, তোমারি কথায়॥
যে সুত প্রসূত হোয়ে, পড়িল অবনী।
স্তনপান করিতেছে, তখনি অমনি॥
তুমি বল স্বভাবেতে, দুগ্ধ সেই খায়।
ঈশ্বরের করুণায়, প্রাণে বেঁচে যায়॥
প্রথম সে স্তনপানে, প্রবৃত্তি দেখিয়া।
মানিবে না পূর্ব্বাপর প্রাক্তনের ক্রিয়া॥
সে প্রবৃত্তি কথা যদি, এরূপেতে কবে।
পূর্ব্বাপর জন্ম তবে, মানিতেই হবে!॥
শিশুটি না প্রথমে, জন্মিলে একবার।
মাই খেতে কখনো, পেত না সমস্কার॥
আগে আগে দুগ্ধপান, করিয়াছে জাই।
সমস্কারে এক্ষণে, খেতেছে তাই মাই॥
প্রাক্তনের ফলে হয়, যেই সমস্কার।
যদ্যপি না লোয়ে বিভু, তার সহকার॥
বালকেরে আপনি, প্রবৃত্তি দিয়া দান।
বাঁচান্ করুণা করি, করুণানিধান॥
ইহাতে করুণাময়, নাম হোলে তাঁর।
কলঙ্কের পরিসীমা, নাহি থাকে আর॥

সে প্রবৃত্তি হোলে পরে, ঈশ্বরের ক্রিয়া।
তবে আর কোনো শিশু, যেত না মরিয়া॥
সব ছেলে বেঁচে যেতো, আসিয়া অবনী।
হাহাকার করিত না, কাহারো জননী॥
দেখ দেখ, যত শিশু, পড়িয়া ধরায়।
অমনি মায়ের কোল, শূন্য করি যায়॥
ঈশ্বরের বুকে বাঁশ, দিয়েছে কি আগে?।
প্রাণনাশ করিলেন, সেই রাগে রাগে?॥
ঈশ্বরের সর্ব্বনাশ, কি করেছে তারা?।
দুগ্ধপান না করিয়া, প্রাণে যায় মারা॥
তোমারি বচনে নাই, তাদের তো পাপ।
তবে কেন শোকে মরে তাদের মা, বাপ?॥
প্রথমেতে জন্মে নাই, জন্ম এই সবে।
বিনা কর্ম্মে আদি জন্মে, পাপ কিসে হবে!॥
আপনি নীরব হবে, আপন বিচারে।
কষ্ট পেয়ে কেন তারা, মরে অনাহারে!॥
অপার কৃপার ধন, সেই ভগবান।
তাঁর কাছে একরূপে, সকলি সমান॥
নিরপেক্ষ নিরাময়, নিত্য নিরঞ্জন।
সমনেত্রে, সকল, করেন, দরশন॥
প্রবর্ত্তক হোলে তিনি, এমন কি হয়?।
অনাহারে অকালেতে, যায় যমালয়॥
একেরে প্রবৃত্তি দিয়ে, রাখেন বাঁচিয়ে।
অপরে নিদয় হোয়ে, ফেলেন মারিয়ে?॥
কভু জ্ঞানে, কভু হন, ভ্রমেতে আকুল॥
তার বেলা ভুল নাই, এর্ বেলা বেলা ভুল?॥
জগতের পালক যে, ভোলা যদি হয়।
পালনের শক্তি তাঁর, কিরূপেতে রয়?॥
ভোলা মহেশ্বর বটে, কিন্তু নন ভোলা।
বিচারীয় যত কিছু, সব আছে তোলা॥
যার যাহা, ঘটে তাহা, তাহারি কপালে।
কিছুমাত্র ভুল নাই, বিচারের কালে॥
সদয়-হৃদয় সেই, দয়ার নিধান।
কখনই নন তিনি, নিদয় পাষাণ॥
সকলেই নিজ নিজ, ভাগ্যভোগ করে।
কর্ম্মগুণে বাঁচে আর, কর্ম্ম দোষে মরে॥
জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মে, করিয়া নির্ভর।

প্রবৃত্তি প্রদাতা হন, যদ্যপি ঈশ্বর ॥
এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয়।
একেবারে ঘুচে যায়, সকল সংশয় ॥
ঈশ্বর অপক্ষপাতী, হইবে প্রমাণ।
তাঁহাতে বৈষম্যদোষ, কে করিবে দান ? ॥
আহা আহা, মরি, বাপু, যিনি সর্ব্বসার।
প্রণিপাত কর কর, চরণে তাঁহার ॥
করিয়াছ অপরাধ, অশেষ প্রকার।
তাঁর কাছে, ক্ষমা-ভিক্ষা, চাহ একবার ॥
যে জীবের পূর্ব্বকার, শুভাদৃষ্ট আছে।
ঈশ্বরের কৃপাবলে, সেই জীব বাঁচে ॥
আছেই সোপান তার, আছেই সোপান।
কাজেই প্রবৃত্তি পেয়ে, স্তন করে পান ॥
যার আছে দুরদৃষ্ট, সে করিবে ভোগ।
কেমনে করেন প্রভু, প্রবৃত্তি-প্রয়োগ ? ॥
দুরদৃষ্ট-দোষে সেই, প্রবৃত্তি না পায়।
দুগ্ধপান না করিয়া, কালগৃহে যায় ॥
আর এক কথা বাপু, না কহিলে নয়।
শুনিলে এখনি হবে, বোধের উদয় ॥
"স্বভাব স্বভাব" এক, ধরিয়াছ "বোল"।
স্বভাবের ক্রিয়া বোলে, করিতেছ গোল ॥
স্বভাবের কারণতা, নহে বলবান।
কি উপায়ে তুমি তার, করিবে প্রমাণ ॥
এখনি ভূমিষ্ঠ হোলো, যে দুই নন্দন।
তাদের নিকটে গিয়া, কর দরশন ॥
হইবে তোমার মনে, প্রতীতি উদয়।
দুজনের একরূপ, স্বভাব কি হয় ? ॥
এখনি পরীক্ষা করি, হও অবগত।
উভয়ের স্বভাবের ভেদাভেদ কত ! ॥
এক জন তখনি, করিয়া দুগ্ধপান।
অনায়াসে বাঁচাইবে, আপনার প্রাণ ॥
আর জন প্রবত্ত, হবে না দুগ্ধপানে।
তখনিই আপনি, সে, মোরে যাবে প্রাণে ॥
স্বভাবের কারণতা, করিলে স্বীকার।
দেখ তায়, কত হয়, দোষের সঞ্চার ! ॥
প্রবৃত্তির মূল যদি, হইত স্বভাব।
এরূপে কদাচ তায়, হোতো ।
উভয়ের ভাব তবে, হইত সমান।
অকালে কখনো কারো, যেত না কো প্রাণ ॥
বিশেষত এমন্ তো, বিবেচনা চাই।
স্বভাবের প্রধানতা, কোথা আমি পাই ? ॥
স্বাভাবিক নিয়মের, অধীন সবাই।
উপদেশ শিখিতে কি, প্রয়োজন নাই ? ॥
স্বভাবে সকল কার্য্য, সিদ্ধ যদি হবে ?।
উপদেশ নিতে তবে, ব্যগ্র কেন সবে ! ॥
বাবা তুমি হাবা নও, দেখ না বিশেষে।
কে, কোথা, শিক্ষিত হয়, বিনা উপদেশে ! ॥
যে পেয়েছে উপদেশ, যেমন্ যেমন্।
সে জন করিছে কার্য্য, তেমন্ তেমন্ ॥
শুধুমাত্র স্বভাবেতে, নির্ভর করিয়া।
যেজন না কর্ম্ম করে, উপদেশ নিয়া ॥
কখনো তাহার ক্রিয়া, না হয় সফল।
পদে পদে ভাগ্যে ফলে, বিপরীত ফল ॥
নানারূপ উপদেশ, করিয়া গ্রহণ।
কোনোরূপ কার্য্য করি, আমরা যখন ॥
তখন সৌভাগ্য বাপু! হইলে উদয়।
তবেই তো শুভকর-কার্য্য করা হয় ॥
নচেৎ দুর্ভাগ্য-দোষে, হিতে বিপরীত।
তাতেই প্রবৃত্ত হই, যা নয় উচিত ॥
হিতকার্য্য করে যেই, সেই পায় সুখ।
যেজন অহিত করে, তারি ঘটে দুখ ॥
সময়ে না হোলে পরে, ভাগ্যের উদয়।
উপদেশ শিক্ষা সব, ভুলে যেতে হয় ॥
বিস্মৃত না হয় যেই, কপালের বলে।
ক্রিয়ারূপ-বৃক্ষে তার, শুভ ফল ফলে ॥
অবিকল সেইরূপ, শিশুর ব্যাপার।
প্রবৃত্তির মূল মাত্র, পূর্ব্ব-সমস্কার।
প্রাক্তনের গুণে হোলে, প্রবৃত্তি উদয়।
অনায়াসে দুগ্ধ খেয়ে, বেঁচে তবে রয় ॥
অদৃষ্ট-বিগুণে যার, সেরূপ না ঘটে।
থাকে না জীবন আর, তার দেহ-ঘটে ॥
তত্ত্ব-নিরূপণে এই, নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
হরণ করিবে সব, ভ্রমরূপ ধ্বান্ত ॥
অতএব দেখ বাপু, দূষণ তোমার।

এখন হইল চারু-ভূষণ আমার ॥
তোমার, যে, দ্বিধা ছিল, সব ঘুচিয়াছে।
বুঝিতে এখনো আর, অপেক্ষা কি আছে! ॥
কতই বকিব আর, এ বড় জঞ্জাল।
করিয়াছ পূর্ব্বপক্ষ "আদি সৃষ্টিকাল" ॥
"বিলিতি বচন,, এ, যে, বিলিতি বচন।
কার্ কাছে শিক্ষা পেয়ে, শিখেছ এমন ? ॥
কতই হাসিব আর, ভেবে মরি তাই!।
হিঁদু হিঁদু-গন্ধ ইথে, কিছুমাত্র নাই ॥
এমন সিদ্ধান্ত যাহা, শুনিবার নয়।
কেমনে তোমার মনে, হইল উদয় ? ॥
"আদি সৃষ্টি" অনাসৃষ্টি, সৃষ্টি-ছাড়া হয়।
কে তোমারে কয়, বাপু, কে তোমারে কয় ? ॥
পৃথিবীতে আছে যত, আস্তিক, নাস্তিক।
কখনো কহে না কেহ, এমন অলীক ॥
অদ্যাবধি যত যত, শাস্ত্র হইয়াছে।
তার মাঝে আদি সৃষ্টি, কোন্ শাস্ত্রে আছে ? ॥
আমার তো হোয়ে গেল, বয়সের শেষ।
নয়নে পড়েছে জাল, শিরে নাই কেশ ॥
ভ্রমণ করিতে কোনো, দেশ নাই আর।
পড়িয়াছি কত শাস্ত্র, শেষ নাই তার ॥
কোনোকালে কোনো খানে, শুনি নাই যাহা।
ফাঁকি তুলে, অদ্য তুমি, কহিতেছ তাহা ॥
ম্লেচ্ছ বিনা কোনো শাস্ত্রে, নাই এ দৃষ্টান্ত।
কাজে কাজে তাই বলি, "বিলিতি-সিদ্ধান্ত ॥"
"করিতেছ তুমি বাপু, এই অনুমান।"
"সকলের আগে যবে, জন্মিল সন্তান ॥"
"তখন অদৃষ্ট লাভ, সেই সবই তার।"
"দুগ্ধপানে কেমনে, পাইল সমস্কার ?।"
"আদি সৃষ্টি কালে যেই, প্রথম জন্মিল।"
কেমনে প্রবৃত্তি পেয়ে, প্রাণেতে বাঁচিল! ॥
আদি-সৃষ্টি বোলে যারে, করিছ স্বীকার।
তাই হয় পূর্ব্বপক্ষ, প্রস্তাবে তোমার ॥
বুঝেছি বুঝেছি, আর বোঝাতে হবে না।
উত্তর শুনিলে এই, সন্দেহ রবে না।
জগতে কি আছে কোনো, প্রমাণ এমন ?।
"আদি-সৃষ্টি-কাল, যাহে, হয় নিরূপণ ? ॥
সৃষ্টিছাড়া, আদি-সৃষ্টি" সৃষ্টিতে যা নাই।
কি প্রমাণে প্রস্তাব, করিলে তুমি তাই ? ॥
"আদি-সৃষ্টি-কাল" বোলে, কাহারে ধরিবে।
বিচারে কিরূপে তার, নির্দ্দেশ করিবে ? ॥
আদি সৃষ্টি আরম্ভের, পূর্ব্বের যে কাল।
জ্ঞানের সে গম্য নয়, বিষম বিশাল ॥
ছিলেন্, কি, না, ছিলেন, ঈশ্বর তখন।
আগেই করিতে হবে, সেই নিরূপণ ॥
ছিলেন্ না, এইরূপ, স্থির যদি হয়।
কবে তাঁর সৃষ্টি হোলো, করহ নির্ণয় ? ॥
কে ছিল তখন, বল, কে ছিল তখন ?।
কে আসিয়া, সে ঈশ্বরে, করিল সৃজন ? ॥
ছিলেন, যদ্যপি কর, এমত স্বীকার।
ঈশ্বরত্ব-শক্তি হোসে, কিরূপেতে তাঁর ? ॥
সে কালে কেমনে হন, সর্ব্বশক্তিমান্।
কেবা তাঁরে, সেই শক্তি, করিল প্রদান ? ॥
প্রমাদ ঘটিবে বাপু, প্রমাণ করিতে।
কে হয় ছেলের বাপ, ছেলে না হইতে ? ॥
সংসার-সম্বন্ধ-গন্ধ, ছিল না যখন।
কেমনে ভবের পতি, হবেন তখন ? ॥
সৃজন, পালন, নাশ, এই মাত্র তিন।
ইহাই তো ঈশ্বরের, শক্তির অধীন ॥
ভাঙাগড়া, গড়াভাঙা, হয় তাঁর ক্রিয়া।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, এই তিন নিয়া ॥
এই সব শক্তি তাঁর, করিলে হরণ।
আদি-সৃষ্টিকাল তবে, হয় নিরূপণ ॥
হেনকাল, কবে কার, হয়েছে গোচর ?।
ছিলেন্ না, যে কালেতে, আপনি ঈশ্বর ? ॥
একথা কি কারো মনে, ভাল কভু লাগে ?
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি, ঈশ্বরের আগে ? ॥
গাভী বিনা দুগ্ধ হয়, হাসি পায় শুনে।
কারণ অভাবে কার্য্য হবে কার গুণে ? ॥
কারক, পালক আর, তারক যেজন।
তারে ছেড়ে কিসে হোলো, সৃষ্টির সৃজন ?
বিশ্বপতি নাম যাহে, করেন ধারণ।
চিরকাল বিদ্যমান, সে সব কারণ ॥
প্রতিক্ষণ তারা দেয়, এই পরিচয়।

"ঈশ্বর, অনাদি নিত্য, সর্ব্বশক্তিময় ॥„
আপনি অনাদি তিনি, আদি নাই তাঁর।
কাজেই মানিতে হবে, অনাদি-সংসার ॥
যে হয় অনাদি তাঁর, অনাদি রচনা।
কোথা হোতে কর তবে, আদির সূচনা ? ॥
অনাদি প্রণালীক্রমে, সৃষ্টির ব্যাপার।
জন্ম-স্থিতি-নাশ এই, তিন সাক্ষি তার ॥
মহাপ্রামাণিক-সাক্ষী, বর্ত্তমান যার।
সামান্য সাক্ষির কিবা, আবশ্যক তার ? ॥
ঈশ্বর আপনি নিজে, অনাদি যেমন।
পূর্ব্বাপর জন্ম হয়, অনাদি তেমন ॥
আছেই এরূপ আছে, সংশয় কি তার।
এ কথা খণ্ডন করে, হেন সাধ্য কার ? ॥

ত্রিপদী।

প্রাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে,
করিতেছ এরূপ বিচার।
"ঐশিক-আদেশমত, কার্য্য করে জীব যত,
ঈশ্বরের লীলা মূলাধার ॥"
"যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর,
লীলাকর যাত্রাকর সম।"
"কেবলি লীলার তরে, অনিত্য এ চরাচরে,
সৃজিলেন পুরুষ-পরম ॥"
"স্বার্থি হোলে দোষ পাই, কিছু যার স্বার্থ নাই,
সে করে না অন্যায় আচার।"
"লীলাকারী সেই প্রভু, পক্ষপাতী নন কভু,
পক্ষপাত কিসে হবে তাঁর ? ॥"
"যাত্রা করে যাত্রাকরে, যারে যাহা আজ্ঞা করে,
সেই করে সেরূপ প্রকার।"
"ধরিতে অশেষ সজ্জা, কারো মনে নাহি লজ্জা,
সমান আনন্দ সবাকার ॥"
"সেইরূপ লীলাকারী, ভবযাত্রা-অধিকারী
ইথে তাঁর কিছু নাই দোষ।"
"নিজ ইচ্ছা অনুসারে, যে সাজে সাজান্ যারে
সেই সাজে সে হয় সন্তোষ ॥"

পয়ার।

বাপু হে, জিজ্ঞাসা করি, কহ সবিশেষ।
কোন্ জ্ঞানী দিয়াছেন, হেন উপদেশ ? ॥
করিতে জ্ঞানের তত্ত্ব, দেখিছ প্রলাপ্।
ভ্যালা ভ্যালা, ভ্যালা বটে, ভ্যালা মোর্ বাপ্ !
যাত্রার দৃষ্টান্ত দিয়া, ঈশ্বরের সহ ॥
ত্রিভুবন ছাড়া যাহা, সেই কথা কহ ॥
অলৌকিক-লৌকিক-তো, ভেদ করা চাই।
না কর, না কর, তাহে, ক্ষতি কিছু নাই ॥
বটে বটে, বটে সব, ঈশ্বরের খেলা।
এ বচনে কেহ আর, করিবে না হেলা ॥
সুকৃতি, দুষ্কৃতি, দুটি, করিতেছে মেলা।
তাদের তো পায়ে কোরে, নাহি যায় ঠেলা ॥
চিরকেলে বস্তু তারা, বিনাশের নয়।
তাদেরি প্রভাবে বাপু, যত কিছু হয় ॥
প্রাক্তন-কর্ম্মের মাত্র, সহকার নিয়া।
করেন ত্রিলোকপতি, সমুদয় ক্রিয়া ॥
একথা কহিলে পরে, সব দিক্ রয়।
কিছুতেই তাঁর আর, দোষ নাহি হয় ॥
নতুবা বিচার করি, আর যত কবে।
এক এক দোষ তায়, রবেই তো রবে ॥
ভবধব ভগবান্, স্বার্থপর নন।
করিলেন এই সৃষ্টি, লীলায় কারণ ॥
সুখি দুখি,—ছোটো—বড়, দোষ নাই তায়।
বল বল, বল, ইটি, শোভা কিসে পায় ? ॥
যিনি হন, স্বার্থহীন, দীন দয়াময়।
তাঁর, ধর্ম্ম কখনো তো, এপ্রকার নয় ॥
স্বার্থপর নন বোলে, পরব্রহ্ম যিনি।
কারে সুখি, কারে দুখি, করিবেন তিনি ? ॥
কেহ বা করিবে ভোগ, সকল সম্পদ।
কেহ বা করিবে ভোগ, বিপুল বিপদ ? ॥
বিনা দুখে কেহ কেহ, সব সুখ পাবে।
নিরন্তর হাহাকারে, কারো দিন যাবে ? ॥
কেহ বা সুকর্ম্ম করি, স্বর্গেতে চড়িবে।
কেহ বা কুকর্ম্ম করি, নরকে পড়িবে ? ॥
সর্ব্ব-দোষহীন যিনি, সর্ব্ব-গুণধাম।
এরূপ ইচ্ছায় তাঁর, ইচ্ছাময় নাম ? ॥
এভাবে প্রবৃত্তকারী, তিনি যদি হন।
দয়াময় নন কভু, দয়াময় নন ॥
অতি বড় ভয়ঙ্কর, অতিশয় ক্রূর।

তাঁর চেয়ে কেহ নাই, নির্দয় নিষ্ঠুর ॥
ধরাধামে আছে কত, পামর পাপিষ্ঠ।
বিনাস্বার্থে করে যারা, পরের অনিষ্ট ॥
কখনো করে না ভুলে, পর উপকার।
ইচ্ছাধীন পাপ করে, অশেষ প্রকার ॥
স্বার্থহীন কার্য্যে যদি, দোষ নাহি হবে।
তারা কেন দয়াময়, নাহি হয় তবে ? ॥
তাদের না দেও কেন, কৃপাময় নাম ?।
তাদের চরণে কেন, কর না প্রণাম ? ॥
স্বার্থহীন হোয়ে যদি, সেই সৃষ্টিকর।
গড়িতে গড়িতে নর, গড়েন্ বানর ॥
এমন ইতর ইচ্ছা, মুগ্ধ করে যাঁকে।
ঈশ্বর নামের তাঁর, মর্য্যাদা কি থাকে ? ॥
আপনার হাতে গড়া, সন্তান সকলে।
নিরর্থক ডোবাবেন, নরকের জলে ? ॥
অসৎ প্রবৃত্তি দিয়া, ঘটায়ে অসুখ।
ইচ্ছা করি দেখিবেন, ইতর কৌতুক ? ॥
করিবেন নানাবিধ, দুখ দরশন ?।
শুনিবেন শোক-পূর্ণ, রোদন-বচন ? ॥
ওরে বাপ, বড় পাপ, কব আর কায় ?
নিশ্চয় কি এই তাঁর, গূঢ় অভিপ্রায় ? ॥
ইহাতেও তাঁর ভাবে, যেতে হবে গোলে ?।
ফুটিতে কি পারিব না, দয়াহীন বোলে ? ॥
"স্বেচ্ছায় করেন যত, অনিষ্ট বিধান।"
"অথচ আমার প্রভু, করুণানিধান ॥"
স্বচ্ছাচারি দয়াময়, ভবঅধিকারী।
এ কথাটি আমি বাপু, বলিতে কি পারি ? ॥
এ, যে, বড়, ভয়ানক, তত্ত্ব-নিরূপণ।
পারে না, পারে না, কভু, হইতে এমন ॥

ত্রিপদী।

লৌকিক-উপমা নিয়া, ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া,
যাত্রার যে কথা তুলিয়াছ ?।
নাটকের সূত্রধার, কোরে থাকে স্বেচ্ছাচার,
এপ্রকার কোথা দেখিয়াছ ? ॥

যাত্রার যে অধিকারী, সে নয় অন্যায়কারী,
কার্য্য সব করে ন্যায়মত।
যাহারা অধীন তার, গুণ যার যে প্রকার,
সেই হয় সেইরূপে রত ॥
বালকাদি ভাঁড় যত, অভ্যাসে হইয়া রত,
যে করেছে যেমন সাধন।
সেরূপ সে ধরে সাজ, তাহে তার কিবা লাজ,
করে কাজ তাহারি মতন ॥
সাজিতে ভিখারী, কৃষি, মহীপাল যোগী, ঋষি,
যাতে যার আছে অধিকার।
তারেই সাজায় তাই, কিছুই অন্যথা নাই ॥
পাগল্ তো নহে সূত্রধার ॥
নীতিজ্ঞ নিপুণ নট, কার্য্য নাহি করে নট,
বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহার।
শুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি যাত্রা,
সাধুরবে করে পুরস্কার ॥
অনিপুণ অধিকারী, হোলে পরে স্বেচ্ছাচারী,
কাজে কাজে একে করে আর।
নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তারে দেয় সেই সজ্জা,
যার যাতে নাই সমস্কার ॥

অজারে সাজায় ঋষি, ঋষিরে সাজায় কৃষি,
বিপরীত দোষ কত তায়।
অযাত্রার সেই যাত্রা, যাহে ঘটে গঙ্গাযাত্রা,
তার যাত্রা কে শুনিতে যায় ? ॥

কেলিকিল* যত তার, বাধ্য নাহি থাকে আর,
অতিশয় অন্যায় দেখিয়া।
দরশক লোক যত, কাণ্ড দেখে জ্ঞান-হত,
হাসে কত ব্যলীক বলিয়া ॥

যাত্রার উপমা দিয়া, সংসার-যাত্রার ক্রিয়া,
যদি চাও প্রমাণ করিতে।
শাস্ত্রমতে দিয়ে যুক্তি, করিলাম যত উক্তি,
সেই মতে হইবে আসিতে ॥
যে শিখেছে যেইরূপ, তার সজ্জা সেইরূপ,
যে প্রকার দেয় যাত্রাকর।

* কেলিকিল।—যাত্রার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক।

ভবযাত্রা-অধিকারী, সেরূপ প্রবর্ত্তকারী,
প্রাক্তনের কর্ম্মে করি ভর ॥
এরূপ কহিলে পর, রক্ষা পায় পরস্পর,
ন্যায়পর হন সর্ব্বগত।
যার যথা ক্রিয়াযোগ, সুখ দুখ করে ভোগ,
প্রবৃত্তি সে পায় সেই মত ॥
সংসার-চক্রের মত, ঘুরিতেছে ক্রমাগত,
আদি অন্ত স্থির নাই তার।
এই হয়, এই রয়, ক্ষণপরে পায় লয়,
ক্রমশই সৃজন সংহার ॥
আপন অপূর্ব্ব-সাজে, সকলে অপূর্ব্ব সাজে,
অপূর্ব্ব এ লীলার প্রবাহ্।
সবে তাঁর আজ্ঞাধারি, একমাত্র অধিকারী,
বিশ্বযাত্রা করেন নির্ব্বাহ ॥
যার তুমি কর তত্ত্ব, ধর তার সার-তত্ত্ব,
মোহে-মত্ত হোও না কো আর।
হোলে পরে গঙ্গাযাত্রা, এরূপ সংসারযাত্রা,
করিতে হবে না পুনর্ব্বার ॥

পুত্র। প্রশ্ন ॥ হে গুরো। যদিও আপনার উপদেশামৃত-ধারা বৃষ্টি-দ্বারা আমার তাপিত হৃদয় ক্রমেই সুশীতল হইতেছে, তথাপি অজ্ঞানান্ধ মন পুনঃ-পুনঃ সংশয়-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আপনাকে বারবার পরিশ্রমজনিত ক্লেশ প্রদানে বিরত হয় না, প্রভো! যদিও আমি নিশ্চিত-রূপেই বুঝিয়াছি, যে, যেমত ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশাদির, কাঠিন্য, শৈত্য, দগ্ধৃত্ব, শোষকত্ব, অবকাশাদি স্বাভাবিকভাবেই গুণের কখনই অন্যথা অনুমান করা যায় না, অর্থাৎ এই বর্ত্তমান পৃথিবীর কঠিনতা পূর্ব্বে ছিল না বা পরেও থাকিবে না, এই জল যাহা শৈত্যগুণে ভূষিত হইয়া আমারদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে তাহা পূর্ব্বে শীতল না হইয়া উষ্ণ-প্রকৃতি ছিল, বা হইবে। এই অনল পার্থিব-বস্তুরাশিকে দাহন করিতেছে, অগ্রে তাহার দাহিকাশক্তি না থাকিয়া শীতলতা ছিল, বা পরে শীতল হইবে। এই বায়ু যাহা সকল সরস-বস্তুকে শুষ্ক করিতেছে, পূর্ব্বে তাহার শোষকতা ও বেগগতি প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ ছিল না, বা পরেও থাকিবে না। এই আকাশ যাহা বস্তু মাত্রকেই অবকাশ প্রদান করিতেছে, পূর্ব্বে তাহার অবকাশ প্রদাতৃত্বশক্তি ছিল না, পরেও থাকিবে না, কখনই এই সকল স্বভাববিরোধি-কল্পনা করা যায় না; তদ্রূপ উৎপত্তি-স্থিতিনাশাত্মক-স্বভাববিশিষ্ট জীবের ওজগতের যে, জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদি স্বভাব পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থাকিবে না, কদাচই ইহা কোনো প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করা যায় না, সুতরাং অগত্যা জীব আর জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে: হউক, কিন্তু জীবের ও জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে উহাদিগের প্রতি জগদীশ্বরের কারণতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? যদি জীব, জগৎ ও জগদীশ্বর, তিনিই অনাদি-সিদ্ধ নিত্য, তবে কখনই জগদীশ্বরকে জগৎকারণ বলা যায় না? যেহেতু কারণ ও কার্য্য কখনই সমকাল-স্থায়ি হইতে পারে না,—অবশ্যই কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। এই পৃথিবীতে এমত একটি কার্য্য-কারণ-ভাবো দৃষ্টিগোচর হয় না, যে স্থলে কার্য্যকারণের সমকালীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে, কারণ স্বয়ং পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিয়া পরে কার্য্যের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ কুম্ভকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, ইহারা পূর্ব্বে মৃত্তিকা, সূত্ররাশি ও সুবর্ণের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া পরে ঘটপট-কুণ্ডলের সৃষ্টি করিতে পারে, যদি উহারা পূর্ব্বে না থাকিত, তবে কখনই ঘট-পট-কুণ্ডলের সৃষ্টি হইতে পারিত না, এবং ঘট-পট-কুণ্ডলের প্রতি যে উহারা কারণ তাহাও নিরূপিত হইত না। বিশেষতঃ যদি জীব অনাদি-সিদ্ধ-নিত্য-চেতন পুরুষই হইত, তবে সে কি জন্য পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া মান্য করিত? কি জন্যই বা তাঁহার অধীন হইয়া চলিত? বরং যখন পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিতে আসিতেন

তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরেরই ঈশ্বর হইয়া বসিত, কখনই তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইত না। ইহাও কি কখনো সম্ভব হয় যে, বিনা কারণেই জীব সকল পরমেশ্বরের তুল্য স্বভাব পাইয়াও স্ব স্ব স্বাধীনতা পরমেশ্বরের হস্তে বিক্রয় করিয়াছে, অতএব যদিও স্বভাবানুসারে জীব ও জগতের অনাদিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে, তথাপি অবশ্যই কার্য্য-কারণ-ভাবের অনুরোধে জীব ও জগতের "আদিসৃষ্টিকাল" স্বীকার করা আবশ্যক, তাহা হইলে আর "অনবস্থা" দোষও স্বীকার করিতে হয় না, অনবস্থা স্বীকারো আপনাদিগের শাস্ত্রেই গুরুতর দোষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং যদি ঈশ্বরের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ জন্মিবে বলিয়া জীব ও জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়া অনবস্থা দোষ গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয় বলিয়া পরমেশ্বরের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ স্বীকার করিতেই.বা বাধা কি ?

পয়ার।

জনক কনকভাষা, মাথায় আমার।
প্রণিপাত, করি তাত, চরণে তোমার॥
আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয়।
শীতল হতেছে তাহে, তাপিত-হৃদয়॥
কিন্তু পিতে, তবু চিতে, রয়েছে সংশয়।
ছেদন করুন্ প্রভু, হইয়া সদয়॥
মনের্ তো অধিক, ধারণা গুণ নাই।
কাজেই সন্দেহ হয়, বার বার তাই॥
তত্ত্ব-নিরূপণ হেতু, কার কাছে যাবো ?।
এ প্রকার জ্ঞানগুরু, কোথা আর পাবো ?॥
বুঝেছি বুঝেছি মনে, বুঝেছি নিশ্চয়।
বস্তুর স্বভাব কভু, অভাব না হয়॥
ক্ষিতির কাঠিন্য-গুণ, ক্ষিতিতেই রয়।
কিছুতেই তার আর, অন্যথা না হয়॥
শীতল, তরল, হয়, জলের স্বভাব।
কখনো না হয় সেই, গুণের অভাব॥
অনলের দাহকতা, অনলে সঞ্চরে।
দাহিকা গুণের সে, কি, ব্যতিক্রম করে ?।
বাতাসের শোষকতা, স্বভাব,—সভাবে।
সদাকাল সেই গুণ, থাকে সমভাবে।
আকাশের গুণ হয়, অবকাশ দান।
প্রচুর পরীক্ষা করি, পেতেছি প্রমাণ॥
সভাবেই আছে এরা, ধরিয়া স্বভাব।
কদাচই অভাই, না, হয় অনুভাব॥
ছিল, আছে, পরেতেও, এ ভাবেই রবে।
হবেই হবেই ইহা, মানিতেই হবে॥
মানিতে হইলে এই, ভূতের ব্যাপার।
জীবের বিষয়ে তবে, সন্দেহ কি আর ?॥
যথাক্রমে বার বার, স্থিতি, জন্ম, নাশ।
ইথেই প্রবল-রূপে, প্রমাণ প্রকাশ॥
এক মাত্র জন্ম-লাভ, করে জীবগণ।
পারিনে পারিনে আর, বলিতে এমন॥
এই জীব, ছিল জীব, হবে পুন পরে।
চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে, চরাচরে চরে॥
তত্ত্ব-নিরূপণ-পথে, হইলে চলিতে।
অবশ্য হবেই হবে, অনাদি বলিতে॥
অনাদি যেমন সেই, বিশ্বপতি শিব।
তেমতি অনাদি, এই, বিশ্ব আর জীব॥
যত দূর জানিলাম, মানিলাম তাই।
তথাচ বিশ্বাস মনে, নাহি পায় ঠাঁই॥
ভবধব, এই ভব, আর ভবচর।
সমানে অনাদি যদি, হয় পরস্পর ?॥
অনাদি-জীবেতে আর, অনাদি-ভুবনে।
ঈশ্বরের কারণতা, মানিব কেমনে ?॥
যেরূপ অনাদি-সিদ্ধ-নিত্য, সর্ব্বসার।
এরাও অনাদি-সিদ্ধ-নিত্য, সে প্রকার॥
এখানেতে সে অনাদি, নিত্য-নিরঞ্জন।
কি বলিয়া জগতের, হবেন কারণ ?॥
কারণ, কারণ, আর, কার্য্য যাহা হয়।
উভয়েতে সমকালে, স্থায়ি কভু নয়॥
যে সময়ে কার্য্যের, উদ্ভব হয় নাই।

তার আগে কারণের, অবস্থিতি চাই ॥
কার্য্য আর কারণের, সম কালীনতা ।
কখনই হয় নাই, এরূপ স্থিরতা ॥
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয়, প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।
কারণ আপনি আগে, হয় বর্ত্তমান ॥
পরে করে করে যত, কার্য্যের সঞ্চার ।
সন্দেহ কি আর, ইথে, সন্দেহ কি আছ ॥
কুম্ভকার, বস্ত্রকার, আর স্বর্ণকার ।
মাটি, সুতা, কনক, লইয়া সহকার ॥
পরে করে ঘট, পট, বসন, ভূষণ ।
কর দরশন, প্রভু, কর দরশন ॥
এ সব কারণ যদি আগে না থাকিতো ।
ঘট, পট, ভূষণাদি, কভু না হইতো ॥
কার্য্যগুলি দূরে থাক্, হবে কি প্রকারে ? ।
কারণ নির্দ্দেশ কেবা, করিত সংসারে ? ॥
ঘটাদি কার্য্যের প্রতি, উহারা কারণ ।
ইহাও তো, কখনো, হোতো না নিরূপণ ? ॥
কার্য্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দিশে ।
ঈশ্বরে জগৎপতি, বলি আমি কিসে ? ॥
অনাদি যত্তপি হয়, ভব চরাচর ।
ঈশ্বর কেমনে হন, ভবের ঈশ্বর ? ॥
তাদের উপরে তাঁর কারণতা কই ? ।
কি কারণে কারণ, তাঁহারে তবে কই ? ॥
অনাদি-চেতন যদি, শরীরি সকলে ।
কি কারণে, জগদীশে, পিতা তারা বলে ? ॥
নিত্যরূপে যদি হয়, তারাই প্রধান ।
পিতা বোলে কেন তারে, দিলে তবে মান ? ॥
নিজ নিজ ক্ষমতায়, বড় যদি হয় ।
কেন তাঁরে স্বাধীনতা, করিল বিক্রয় ? ॥
কেন তাঁরে, ভয় করে, এরূপ প্রকার ? ।
কেনই বা অধীনতা, করিল স্বীকার ? ॥
তারা তো পারিত নিজে, হইতে ঈশ্বর ।
ঈশ্বরে করিয়া রাজা, কেন দিলে কর ? ॥
বস্তুত, কি, ইহা হয়, বিশ্বাসের-স্থান ? ।
ঈশ্বরের সহ জীব, সমান প্রধান ? ॥
স্বভাবে সমান হোলে, সেই প্রাণিচয় ।
কখনো কি, স্বাধীনতা, করিত বিক্রয় ? ॥
হোতো না হোতো না কভু, হোত না অধীন ।
থাকিত থাকিত তাবা, থাকিত স্বাধীন ॥
এতক্ষণ দেখিলাম, করি প্রণিধান ।
যত্তপি করিতে হয়, স্বভাব-সন্ধান ॥
জীব আর জগৎ, যা হয়, তাই হয় ।
অনাদি বলিতে হবে, না বলিলে নয় ॥
জীব আর জগতের, নিত্যতা স্বীকারে ।
কার্য্য-কারণের ভাবে, দোষ হোতে পারে ॥
এখন্ দেখুন, মনে, করিয়া বিচার ।
"আদি সৃষ্টিকাল" যদি না করি স্বীকার ॥
"ঈশ্বর" কারণ, বোলে, মত যারা গড়ে ।
তাদের সে মতে দোষ, পড়ে, কি, না, পড়ে ? ॥
গ্রাহ্য যদি নাহি হয়, প্রস্তাব আমার ।
"অনবস্থা" দোষ, তবে, করুন্ স্বীকার ॥
"অনবস্থা" বিষয়তে, শাস্ত্রকার যাঁরা ।
গুরুতর দোষ বোলে, লিখেছেন তারা ॥

প্রবৃত্ত হইয়া এই, তত্ত্বের বিচারে ।
বিভুর বৈষম্য আদি, দোষ নাশিবারে ।
জীবে আর ভবে যদি, নিত্য বলা যায় ।
বলুন্ বলুন্ যাহা, নিজ অভিপ্রায় ॥
অনবস্থা দোষ কিসে, হইবে খণ্ডন ? ।
তাহার উপায় তবে, করুন এখন ? ॥

এ দিগ্‌ ও দিগ্‌, প্রভু, যে দিগ্‌ লইবে ।
এক দিগে দোষ তায়, হইবে হইবে ॥

কার্য্য-কারণাদি-ভাব, ইথে যদি পাই ।
এ দোষ স্বীকারে তবে, কোনো বাধা নাই ॥

সে দোষেতে পার পাই, হইয়া সন্তোষ ।
"বিচারেতে হারিব না, এ, যে, বড় দোষ ॥"
পড়ে তো, পড়ুক, দোষ, ঈশ্বরের ঘাড়ে ।
"অনবস্থা" খণ্ডনেতে, বিচার কে ছাড়ে ? ॥

পিতা। উত্তর॥ হে প্রাণাধিক প্রিয়-শিশো! তুমি কি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ কর নাই ? যদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যথার্থ মর্ম্মার্থ অবধারিত হইত তাহা হইলে কদাচই

এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইত না, যাহা হউক, এক্ষণে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বৎস! সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে তোমার প্রদর্শিত কোনো দোষেরই সম্ভাবনা নাই; অবশ্যই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের স্থিতি স্বীকার করিতে হয়, কখনই কারণ পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিলে তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু ইহা বলিয়াই যে, একটি আদি সৃষ্টিকাল স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে, যেহেতু যাহার আদি নিরূপিত হয় না, তাহাকেই অনাদি বলা যায়, কোনো বস্তু অনাদি হইলেই যে তাহাকে নিত্য বলিতে হইবে এমত নয়, কেবল তাহাকেই নিত্য বলা যায়, যাহার কখনই উৎপত্তি ও নাশ না হয়, সুতরাং জগতের অনাদিত্ব আছে বলিয়া কদাচ তাহাকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যখন এই বিশ্ব-সম্বন্ধীয় প্রায় প্রত্যেক বস্তুরই পর্য্যায়-ক্রমে জন্ম-স্থিতি-নাশাত্মক-স্বভাব আমাদিগের প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে তখন ঐ স্বভাব বশতঃ যেমত স্থিতির অনাদিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে তদ্রূপ জন্ম ও নাশেরো অনাদিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, যদি জগতের উৎপত্তি ও নাশ না থাকিয়া একমাত্র স্থিতির অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হইত, তবে এই জগৎ অবশ্যই জগদীশ্বরের সমকালীন ও নিত্য হইতে পারিত, তাহা হইলে জগতের প্রতি জগদীশ্বরের কারণতাও সম্ভাবিত হইত না, যখন জগৎ একবার উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল পরে নাশগ্রস্ত হয়, আবার নাশের পরে উৎপত্তি, উৎপত্তির পরে স্থিতি, স্থিতির অন্তে নাশ, এইরূপে অনাদিকালাবধি যথাক্রমে উৎপত্তি স্থিতি নাশের অধীন হইতেছে, তখন তাহাকে কিরূপে পরমেশ্বরের সমকালীন বা নিত্য বলা যাইতে পারে? কি জন্যই বা তাহার প্রতি পরমেশ্বরের কারণতা ঘটিবে না? যে বস্তু ক্ষণে ক্ষণে নাশের অধীন হইতেছে তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বরের স্থিতি আছে তাহাতে সন্দেহ কি? পরমেশ্বর কখনই উৎপন্নও হয়েন না, সুতরাং তাঁহার নাশও নাই। যে সময়ে জগতের প্রলয় হইয়া যায় তখন তিনি বর্ত্তমানই থাকেন, বর্ত্তমান থাকিলেই আবার জগতের সৃষ্টি করিতেও পারেন, তাহাতে কার্য্য-কারণ ভাবের কি অনুপপত্তি আছে? যখন জগতের সত্তা উৎপত্তি ও নাশের গ্রাসে পতিত হইয়া রহিয়াছে, উৎপত্তি হইলেই জগতের সত্তা লাভ হয়, আবার নাশ হইলেই সত্তার বিধ্বংস হইয়া যায়, তখন ঐ অকিঞ্চিৎকর সত্তার সহিত জগদীশ্বরীয় অবিনাশি সত্তার এমকালীনতা কখনই ঘটিতে পারে না, তাহা না ঘটিলেই কার্য্য-কারণ-ভাবঘটিত কোনো প্রকার অনুপপত্তিরো সম্ভাবনা নাই। বৎস! তুমি যে জীবাত্মার অনাদিত্ব শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পরমেশ্বরে তুল্য স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ তাহা নিতান্ত অসম্ভাবিত বিষয় নয়, কিন্তু জীবাত্মার পরমেশ্বরের তুল্য স্বভাব আছে বলিয়াই যে তাহারা তাঁহার অধীন হইবে না, অথবা তিনি তাঁহাদিগকে আজ্ঞার অধীন রাখিতেও পারিবেন না এমত নহে, বোধ করি জীবাত্মার স্বরূপটি, কি, তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে বুঝিতে পার নাই, তজ্জন্যই তোমার মনে এমত অকিঞ্চিৎকর সংশয় উদিত হইয়াছে, যাহা-হউক এক্ষণে বিশেষরূপে জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে উপস্থিত প্রস্তাবের এতই বাহুল্য হইয়া উঠিবে, যে, কোনোমতেই তুমি প্রস্তাবিত বিষয়ের মর্ম্মবধারণ করিতে পারিবে না, অতএব তোমাকে সংক্ষেপে এতাবন্মাত্র উপদেশ করিতেছি, যে, জীবগণ কেবল এক মাত্র জগদীশ্বরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সুতরাং যে বস্তু যাহার প্রতিবিম্ব হয় সেই বস্তু অবশ্যই তাহার সমান স্বভাব লাভ করে তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই, অথচ ইহাও জানা আবশ্যক, যে, প্রতিবিম্ব মাত্রেই স্ব-স্ব বিম্বের অধীন, তাহারা স্বীয় বিম্বের এতই অধীন হয়, যে, ঐরূপ অধীনতা জগতে আর কুত্রাপিই দৃষ্টিগোচর হয় না, অনুমান করি তুমি বাল্যক্রীড়া করিতে করিতে ইহা অনেকবার

দেখিয়া থাকিবে যে, সূর্য্যাভিমুখে একখানি দর্পণ রাখিলেই ঐ দর্পণে সূর্য্যদেব-প্রতিবিম্বিত হয়েন, ঐ দর্পণস্থ-সূর্য্য সমানরূপে গগনস্থ-সূর্য্যের স্বভাব ধারণ করে, অর্থাৎ আকাশ-স্থিত-সূর্য্যের যে দাহকত্ব-প্রকাশকত্ব-স্বভাব আছে দর্পণস্থিত সূর্য্যেও সেই স্বভাবের অভাব হয় না, যেমত গগনবিহারি-সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে আমাদিগের চাক্ষুষ-তেজের অভিভব হইয়া চক্ষুর্দ্বয় একেবারে সঙ্কুচিত ও অভিভূত হইয়া যায়,—তদ্রূপ ঐ দর্পণস্থ সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি সংযোগ করিলেও ঐ দশাই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যদিও ঐ প্রতিবিম্ব স্বীয় বিম্ব অর্থাৎ গগনচর দিবাকরের দাহকত্বাদি স্বভাব ধারণ করিয়াছে, করুক, তথাপি উহাকে কখনই সূর্য্যের তুল্য সকল গুণাক্রান্ত বলা যায় না ; কোনো কালেই উহার এমত সামর্থ্য হয় না, যে, সূর্য্যের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারে, বরং দর্পণখানি সূর্য্যাভিমুখ হইতে স্থানান্তরিত করিলেই তৎক্ষণাৎ ঐ প্রতিবিম্ব বিম্বে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। বৎস : এই স্থলে একবার বিশেষরূপে নিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে জীব জগদীশ্বরের প্রতিবিম্ব, তাহাকে জগদীশ্বর হইতে অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, যেহেতু প্রতিবিম্ব মাত্রই বিম্ব হইতে বিভিন্ন বস্তু নয়, অথচ তাহাকে পরমেশ্বরের পুত্র বলিতেও কোনো বাধা নাই, কারণ বিম্ব হইতেই প্রতিবিম্বের সত্তা লাভ হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের কৃপাতেই জীব সকল স্থিতি ও প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই, কেন না প্রতিবিম্বের স্থিতি ও পালন নিতান্তই বিম্বের অধীন,—পরমেশ্বর, যে, জীবের সংহারক, তাহাও অসম্ভাবিত নয়, কারণ প্রতিবিম্ব মাত্রেই স্ব স্ব বিম্বে বিলীন হইয়া থাকে,—কিন্তু জীব নিবহ যে ঈশ্বরের তুল্য স্বভাববিশিষ্ট তাহাতেও কোনো আপত্তি নাই, যেহেতু উহারা অনাদি-অনন্ত-নিত্য ও চেতন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, অথচ উহাদিগকে সাক্ষাৎ-পরমেশ্বর বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ উহারা শরীর-ইন্দ্রিয়-সঙ্গের দোষে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এমত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, উহাদিগের স্বরূপের তুল্যতা পরমেশ্বরে আছে বলিলে একপ্রকার তাঁহার বিশুদ্ধ-স্বরূপে কলঙ্কারোপ করা হয় ;—কিন্তু বাপু ! যেমত দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের বক্র-মলিন ভগ্নত্বাদি দর্পণগত অবস্থানুসারে নানা দুরবস্থা হইলেও কখনই তাহার গগনস্থ-সূর্য্য-গত-দাহকত্ব স্বভাবের অন্যথা হয় না, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্গের দোষে জীবাত্মার যত দুর্দ্দশা হইতে পারে, হউক, কিন্তু কখনই উহাদিগের স্বপ্রকাশ নিত্য-চেতন-স্বরূপের অভাব ঘটিবে না, অথচ স্বয়ং নিত্য-চেতন হইয়াও পরমেশ্বরের অধীনতাও ত্যাগ করিতে পারিবে না যেহেতু দর্পণস্থ-সূর্য্য কদাচ গগনগত-সূর্য্যের অধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব জীবের অনাদিত্ব ও নিত্যসিদ্ধ চৈতন্য আছে বলিয়াই যে উহারা একেবারে পরমেশ্বরের পরমেশ্বর হইয়া উঠিবে এমত সম্ভাবনা কি আছে ? বাপু ! জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে যে অনবস্থা দোষ হয় বিবেচনা করিয়াছে, ইহাও তোমার ভ্রান্তিমাত্র, যেহেতু শাস্ত্রে অপ্রামাণিক অনবস্থাকেই দোষ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, প্রামাণিক অনবস্থাকে কখনই দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, যেহেতু অনবস্থার দোষরূপে গণ্য হওনের কারণ এই যে, অনবস্থা স্বীকার করিলে কোনোমতেই মূল-কারণ নিরূপিত হয় না, যখন জগদীশ্বরকে জগতের মূল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে, তখন এই অনবস্থা কখনই দোষ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যদি মূল কারণ জগদীশ্বর না হইতেন, অথবা জগদীশ্বরের একটি জগদীশ্বর থাকিতেন, তবে ঐ নির্ম্মূল-অনবস্থা দোষাবহ হইত, যে স্থলে অনবস্থাই যথার্থ তত্ত্ব, সে স্থলে অনবস্থা স্বীকার করিলে কি জন্য তত্ত্ব নিরূপিত হইবে না ? যেমত বীজাঙ্কুর ও ঘূর্ণিত রথচক্র মধ্যস্থ শলাকা অর্থাৎ পাকি সমূহের

মধ্যে কোন্‌টি আদিম তাহা নিরূপণ করিতে হইলে উহার কোন্‌টি আদিম কখনই তাহা নিরূপিত হয় না, অগত্যা-অনবস্থা স্বীকার ব্যতীত গতিই নাই, সুতরাং সে স্থলে কদাচই অনবস্থাকে দোষ বলিয়াও গণ্য করা যায় না, তদ্রূপ যখন জগতের অনাদিত্বই যথার্থ তত্ত্ব, ইহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইতেছে, তখন তদ্বিষয়ে অনবস্থাকে কখনই দোষের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

।পদ্য।

এতদিন মিছে মিছে, মোলেম্ বকিয়া।
লইলে না সারমর্ম্ম, মনোযোগ দিয়া॥
এক কাণে কথাগুলি, প্রবেশ করিয়া।
বাহির হইয়া গেল, আর কাণ দিয়া?॥
সে সকল প্রণিধান, হইলে তোমার।
বার বার প্রস্তাবনা, করিতে না আর?॥
যা হোক্ তা হোক্ বাপু, বলি তবে পুন।
এক ভাবে স্থির হোয়ে, মন দিয়া শুন॥
অনাদি সংসার এই, এরূপ স্বীকারে।
বল তায় কি প্রকারে, দোষ হতে পারে?॥
কারণের আগে কভু, কার্য্য নাহি হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে, কি আছে সংশয়?॥
প্রথমত কারণ, থাকিয়া বর্ত্তমান।
পরেতে করিবে যত, কার্য্যের নির্ম্মাণ॥
কিন্তু বাপু এইরূপ, বচনে তোমার।
"আদিসৃষ্টি-কাল" কেন, করিব স্বীকার?॥
মানিতেই হবে এক, "আদিসৃষ্টিক্রিয়া"।
এ কথাটি কে বলেছে, মাথাদিব্যি দিয়া?॥
কিছুতে না হয় যার, আদির নির্ণয়।
তারেই "অনাদি" বোলে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
আদি নাহি স্থির হয়, করিয়া বিচার।
"অনাদি" বলিব তাই, সজীব-সংসার॥
বিচারে "অনাদি" বটে, বলিতেই হয়।
কিন্তু বাপু কোনোমতে, নিত্য তারা নয়॥
নিত্য বোলে "তারে" শুধু, করিব নির্যাস।
যাহার কখনো নাই, জন্ম আর নাশ॥
জগৎ "অনাদি" বটে, প্রমাণেতে পাই।
যে গুণে, সে, "নিত্য" হবে, সে গুণ তো নাই॥
ভব আর ভবচর, নিত্য হোলে পরে।
কেন তারা বার বার, জন্মে আর মরে?॥
বার বার এপ্রকার, জন্ম আর নাশ।
স্বভাবেই অনিত্যতা, পেতেছে প্রকাশ॥
ঈশ্বরের জন্ম নাই, নাহিকো সংহার।
সদাকাল সমভাবে, স্থিতির সঞ্চার॥
জন্ম আর নাশের, অধীন নন যিনি।
একমাত্র চিরন্তন, নিত্যধন তিনি॥
যেরূপ যদ্যপি হোতো, জীবের স্বভাব।
কখনই হইত না, স্থিতির অভাব॥
নিত্য বোলে নির্দ্দেশ, অবশ্য হোতো তবে।
ঈশ্বরের সমকালী, বলিতই সবে॥
থাকিত না তাহে আর, কিছুই সন্দেহ।
ঈশ্বরের কারণ তা, মানিত না কেহ॥
ঈশ্বর যে গুণে হন, ভবের কারণ।
বলি তবে, সে কথাটি, করহ শ্রবণ॥
অনাদি সময়াবধি, অখিল-সংসার।
পুন পুন সৃষ্ট হোয়ে, হতেছে সংহার॥
ইথেই সহজে হয়, তত্ত্ব নিরূপণ।
জগতের প্রতি হন, ঈশ্বর কারণ॥
বিশ্বের প্রলয়-দশা ঘটে যে সময়।
কিছুই না রয় আর, কিছুই না রয়॥
কেবল একাকী মাত্র, সেই ভগবান্।
স্বরূপ স্বভাব সহ, রন বর্ত্তমান॥
কারণরূপেতে তাঁর, প্রভাব প্রচার।
স্বভাবে করেন তাই, সৃষ্ট পুনর্ব্বার॥
অবিনাশী নিত্যরূপ, জেনে সেই ঈশে।
কার্য্য-কারণের ভাবে, দোষ দিব কিসে?॥
জগতের "সত্তা" বাপু, নিত্য কভু নয়।
এখন তোমার মনে হোলো তো প্রত্যয়?॥
উদ্ভব সময়ে সেই, সত্তার সঞ্চার।
সংহার সময়ে সেই, সত্তার সংহার॥
ঈশ্বরের অবিনাশী, সত্তার সহিত।

ইহার তুলনা করা, হয় কি উচিত ?॥
সভাবে স্বভাবে যার, এতই ক্ষীণতা।
কিসে তার গ্রাহ্য হবে, সমকালীনতা ?॥

*

জীবাত্মা অনাদি হয়, এ কথা শুনিয়া।
স্বভাবে নির্দ্দেশ কর, ঈশ্বর বলিয়া॥
হইবে তোমার মনে, এমন্ উদয়।
ইহা কিছু নিতান্তই, অসম্ভব নয়॥
ঈশ্বরের সহ তার, স্বভাবে তুলনা।
রাখো রাখো মনে রাখো, ভুল না ভুল না॥
এবোলে কি জীব তাঁর, অধীনে রবে না ?।
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন, হবে না হবে না ?॥
ঈশ্বরো কি আপনার, শক্তি হারাইয়া।
রাখিতে অক্ষম হন্, অধীন করিয়া ?॥
স্বাধীন ঈশ্বর সম, হয় জীবগণ।
বোলো না বোলো না আর, বোলো না এমন ?

ত্রিপদী।

জীবাত্মাটি কারে কয়, কাহার স্বরূপ হয়,
হয় নাই হৃদয়-অঙ্গম।
ইথেই তোমার মনে, মূলতত্ত্ব-নিরূপণে,
বার বার হইতেছে ভ্রম॥
বিশেষ করিয়ে তার, যদি বলি সুবিস্তার,
বড়ই বাহুল্য হয় তবে।
শুনিতে শুনিতে শেষ, উপদেশে হবে দ্বেষ,
কিছুই তো মনে নাহি রবে॥
তত্ত্বী হোয়ে যত তত্ত্ব, যে জন করুক তত্ত্ব
এর চেয়ে কঠিন কি আছে!।
এখন যা আমি কই, আমাতে সম্ভব কই,
নিগূঢ় জানিব কার কাছে!
সংক্ষেপেতে বোলে যাই, ধারণা করিতে তাই,
অধিক হবে না পরিশ্রম।
এখনি সংশয় যাবে, ভিতরের ভাব পাবে,
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম!
এ জগতে জীব যত, নিজবোধ হোয়ে হত,
সকলেই জীব জীব কয়।
নিজে জীব কি পদার্থ, নাহি জানে ফলিতার্থ,
সার অর্থ কেহ নাহি লয়॥

ভ্রম সব হর হর, স্থির ভাব ধর ধর,
কর কর স্বরূপ-নির্ণয়।
ঈশ্বর আপনি "বিম্ব," জীব তাঁর "প্রতিবিম্ব"
এই জীব আর কিছু নয়॥
প্রতিবিম্ব যেবা যার, সমান স্বভাব তার,
অবশ্য, সে করিবে ধারণ।
প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিম্বের সমান তবে,
বলিতেই হবে এ বচন॥
কিন্তু প্রতিবিম্ব যারা, বিম্বের নিকটে তারা,
এতই অধীন হোয়ে রয়;
পৃথিবীতে সে প্রকার, অধীনতা কোথা আর,
কভু কার, দৃষ্ট নাহি হয়॥

পদ্য।

তোমার মনেতে বাপু, আছে তো এখন্।
ছেলেবেলা, ছেলেখেলা, করেছ যখন্॥
কতবার দেখিয়াছ, খেলিয়া খেলিয়া।
রবির ছবির আগে, মুকুর রাখিয়া॥
দর্পণ ভানুর ভাগে, যদি রাখা যায়।
তাপন আপন আভা, দান করে তায়॥
মুকুরস্থ সেই রবি, প্রতিবিম্ব-রূপ।
স্বভাবত সম হয়, সূর্য্যের স্বরূপ॥
আকাশের রবি যথা, চক্ষে দেয় তাপ।
দর্পণের রবি ধরে, সেরূপ প্রতাপ॥
তবে বাপ, এখন্ তো, হও অবগত।
বিম্বে আর প্রতিবিম্বে, ভেদাভেদ কত॥
রবি-ছবি থেকে সেই, দর্পণ ভিতরে।
সমান দাহিকা শক্তি, যদ্যপিও ধরে॥
তবু সে সূর্য্যের সহ, সমান কি হয় ?।
সেই কর, রবি কর, আর কিছু নয়॥
সূর্য্যের অধীন হোয়ে, রবেই সে রবে।
অধীনতা ছেড়ে দিতে, সাধ্য নাহি হবে॥
বরণ এখনি দেখো, দর্পণ ভাঙিয়া।
যার কর, তার করে, মিশাইবে গিয়া॥
কাহার প্রভাবে আর, সে ক্ষমতা রয়।
তখনই প্রতিবিম্ব, বিম্বে পায় লয়॥
এখানে বিশেষ করি, কর অনুভব।
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, এই জীব সব।

যাঁহার প্রভাবে জীব, জন্ম পায় দান।
হয় কি, না, হয় তাঁরা, তাঁহার সন্তান ?॥
জন্ম স্থিতি-পালনের, কর্ত্তা হয় যেই।
কে কহিবে, জগতের পিতা নহে সেই !॥
বিম্ব হোতে প্রতিবিম্ব, করিলে স্বীকার।
ঈশ্বর হবেন তবে, কর্ত্তা সবাকার॥
স্থাপক-পালক তিনি, হলেন নির্ণয়।
বলি সেতো পারিবে না, সংহারক নয় ?॥
প্রতিবিম্ব মাত্র যদি, বিম্বে পায় লয়।
সংহারক বলিতে, কি, থাকিল সংশয় ?॥

*

জীবের অনাদি-নিত্য, অনন্ত-চেতন।
বলিতে হইল যদি, এরূপ বচন॥
কার্য্যেও ঈশ্বর সম, বলা যদি যায়।
বিশেষ আপত্তি কিছু, করিনে কো তায়॥
ঈশ্বরের স্বরূপ, এরূপ, হোক্ নর।
বলিতে তো পারিব না, "সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"
দেহেন্দ্রিয় সঙ্গদোষে, জীব সমুদয়।
স্বরূপে বিরূপ করি, হতেছে বিস্ময়॥
আত্মরূপ ভুলে গিয়ে হয়েছে এমন।
কেবলি চেতন নাম, কাজে অচেতন॥
তুলনায় উপমায়, কহিলে সমান।
ঈশ্বরে করিতে হয়, কলঙ্ক প্রদান॥
মুকুরের মূর্ত্তি হয়, যেরূপ প্রকার।
প্রতিবিম্ব-রবি পায়, সেরূপ আকার।
গগনের রবি তায়, না হন বিরূপ।
স্বভাবে সমান ভাবে, সরূপে স্বরূপ॥
প্রচুর প্রভায় হবে, প্রকাশ প্রকাশ।
দাহিকার শক্তি তাঁর, হবে না কো নাশ॥
তপন-বিম্বের এই, যেরূপ প্রমাণ।
ঈশ্বর-বিম্বের ভাব, সেরূপ সমান॥
দেহাদি-ইন্দ্রিয়-দোষ, জীবাত্মার ভোগ।
পরম-আত্মার তায়, কিছু নাই যোগ॥
যে কিছু দুর্দ্দশা হোক্, জীবাত্মারি হবে।
নির্লেপ নির্গুণে তাহা, কিরূপে সম্ভবে !॥
তিনি নিত্য-স্বপ্রকাশ, চেতন স্বরূপ।
স্বরূপেতে কখনই, না হয় বিরূপ॥

যখন দুর্ব্বল এত, যত জীবগণে।
ঈশ্বরের অধীনতা, ছাড়বে কেমনে !॥
কিরূপেই সে ক্ষমতা, হবে বল তার ?।
প্রতিবিম্ব বই, সে তো অন্য নয় আর॥

*

এমন কি শক্তি আছে, তাই প্রকাশিয়া!।
বসিবেক, ঈশ্বরের, ঈশ্বর হইয়া!॥
নূতন প্রস্তাব এক, করিয়াছ শেষে।
উত্তর করিতে তার, পেট-ফাটে হেসে॥
জগৎ "অনাদি" বোলে, করেছি প্রমাণ।
"অনবস্থা" দোষ তায়, তুমি কর দান ?॥
বিষম বিষম, এ যে, বড়ই বিষম।
এত কেন ভ্রম, বাপু, এত কেন ভ্রম ?॥
অনবস্থা, বোলে যার, না হয় প্রমাণ।
তাহাতেই দোষ দেন, যত জ্ঞানবান॥
প্রামাণিক অনবস্থা, দোষের না হয়॥
শপথ করিয়া বাপু, শাস্ত্রে এই কয়॥
অনবস্থা স্বীকারেতে, দোষ নাই যায়।
ঈশ্বরের দুরবস্থা, কেন হবে তায় ?॥
জগতের মূল হেতু, অনাদি-ঈশ্বর।
নিরূপণে হতেছেন, জ্ঞানের গোচর॥
তখন অনাদি সৃষ্টি, অবশ্যই হবে।
"আদিসৃষ্টিকাল„ তুমি কোথা পাও তবে ?॥
স্রষ্টা আর সৃষ্টি যদি, অনাদি হইল।
অনবস্থা দোষ তবে, কোথায় রহিল ?॥
মূল-হেতু, যদি সে, ঈশ্বর, না হইতো।
ঈশ্বরের কিম্বা এক, ঈশ্বর থাকিতো॥
তবেই পারিতে তুমি, বলিতে এমন।
মূলহীন অনবস্থা, দোষের কারণ॥
অববস্থা আপনিই, "তত্ত্ব", হয় যথা।
সেখানে কি আর কারো, খাটে কোনো কথা॥
অনবস্থা, এ অবস্থা, না করি গ্রহণ।
হবে না, হবে না কভু, তত্ত্ব নিরূপণ॥
যে প্রকার বীজ আর, অঙ্কুর দেখিয়া।
একেবারে যেতে হয়, বিস্ময় হইয়া॥
উভয়ের মধ্যে কারে, "কারণ" কহিব ?।
"কার্য্য" বোলে কারেই বা নির্দ্দেশ করিব ?॥

বীজ, না থাকে কভু, গাছ্, নাহি হয়। করিতে পারে না কেহ, আদির নিশ্চয়॥
গাছ্, না থাকিলে বল, বীজ কিসে রয়?॥ সেখানেতে অনবস্থা, করিব স্বীকার।
উভয়ের মধ্যে এর্, আদি কেবা হয়। না করিলে কোনোমতে, গতি নাই আর॥
কিছুতে সিদ্ধান্ত তার, হবে না নির্ণয়। জগতের "অনাদিত্ব" যথার্থ যখন।
সেইরূপ রথচক্র, চে সময়ে ঘোরে। বিচারেতে এই হোলো, তত্ত্ব-নিরূপণ॥
আদি-অন্ত নিরূপণে, সবে পড়ে ঘোরে॥ তখন এ "অনবস্থা" কেহই কবে না।
চক্রঘোরে চক্রঘোর, ভাঙিবার নয়। দোষ বোলে গণ্য আর, হবে না হবে না॥

লেখনী পরিত্যাগের সময়ে গ্রন্থকর্ত্তার নিবেদন

হে গুণগ্রাহি সাধুগণ!—আমরা যতদিন এই পুস্তকখানি প্রকাশ করি নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার দোষ গুণাদি সমস্ত বিষয়ের বিচারের ভার কেবল আমারদিগের উপরেই নির্ভর করিত।—এইক্ষণে সেই সমুদয় সংপূর্ণরূপে শুদ্ধ আপনারদিগের বিবেচনার অধীনে অর্পিত হইল, ইহাতে এই সূত্রে অস্মদাদির অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্নরূপে দুইপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহার প্রথম ভাবটি এই "দোষজনিত-নিন্দা ও অপযশের ভয়"—দ্বিতীয় ভাবটি, এই "যদি কোনো গুণ থাকে তজ্জন্য যথা-সম্ভব প্রশংসারূপ-পুরস্কার প্রাপণের প্রত্যাশা"—ফলতঃ সুখ্যাতি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা কি আছে বলিতে পারি না, দোষ-জন্য অপযশ লাভের অধিক সম্ভাবনাই দেখিতেছি, তবে এই এক বিশেষ ভরসা এবং সাহস আছে, যে, সাধু সদাশয় মহাশয়েরা হংস এবং জলধরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন।—মরাল যেরূপ নীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীর গ্রহণ করে, এবং নীরধর যেমন লবণ নীরধির নীর পান করিয়া সুধা-বর্ষণ করেন, সেইরূপ গুণগ্রাহক সুজনেরা দোষ দর্শন না করিয়া গুণের প্রতিই কটাক্ষ করিয়া থাকেন।—অপিচ ভুজঙ্গ যেমন অমৃত ভোজন করিয়া বিষ-সৃষ্টি করে, সেইরূপ ছলগ্রাহি লোকেরা অন্যের গুণ গৌরব গোপন করত শুদ্ধ ছলনা পূর্ব্বক দোষ প্রকাশ করিতেই থাকেন। কিন্তু এইস্থলে কেহ যেন এমত বিবেচনা না করেন, যে, কথিত পুস্তক একেবারেই দোষশূন্য রহিয়াছে, আমরা এবম্প্রকার অভিমান করিতেছি, যাঁহারা যথার্থরূপে দোষোল্লেখ পূর্ব্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারদিগের নিকট চিরকাল উপকার-ঋণে বদ্ধ থাকিব, এবং জ্ঞানদাতা গুরু বলিয়া স্বীকার করিব, ও পূজা করিব।—কিন্তু যদিস্যাৎ কেহ অকারণে অলীক দোষ ব্যাখ্যা করেন তবে নিম্ন প্রকাশিত কবিতাই পাঠ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে হইবেক।

যথা।

গৃহ্লাতি সাধুরপরস্তু গুণং ন দোষং, বালস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধ মসৃগ্বিহায়,
দোষান্বিতো গুণিগুণং পরিহায় দোষং। ত্যক্ত্বাপয়োরুধিরমেব ন কিং জলৌকা॥ ১

পদ্য।

দোষ পরিহার করি, যত সাধুগণ। কেবল পরের গুণ, করেন গ্রহণ॥
গুণির গুণের গ্রাম, করিয়া সংহার। দোষি লোকে করে শুধু, দোষের প্রচার॥
শিশুমুখে স্তন দিলে, চুষে খায় ক্ষীর। জোঁক্ খায় সেই স্তনে, কেবল রুধির॥
অতএব প্রণিপাত, সাধুর চরণে। সকল সফল হয়, যাঁহার স্মরণে॥

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।